SRI AUROBINDO



WRITINGS IN BENGALI

INCLUDING EDITORIALS FROM DHARMA

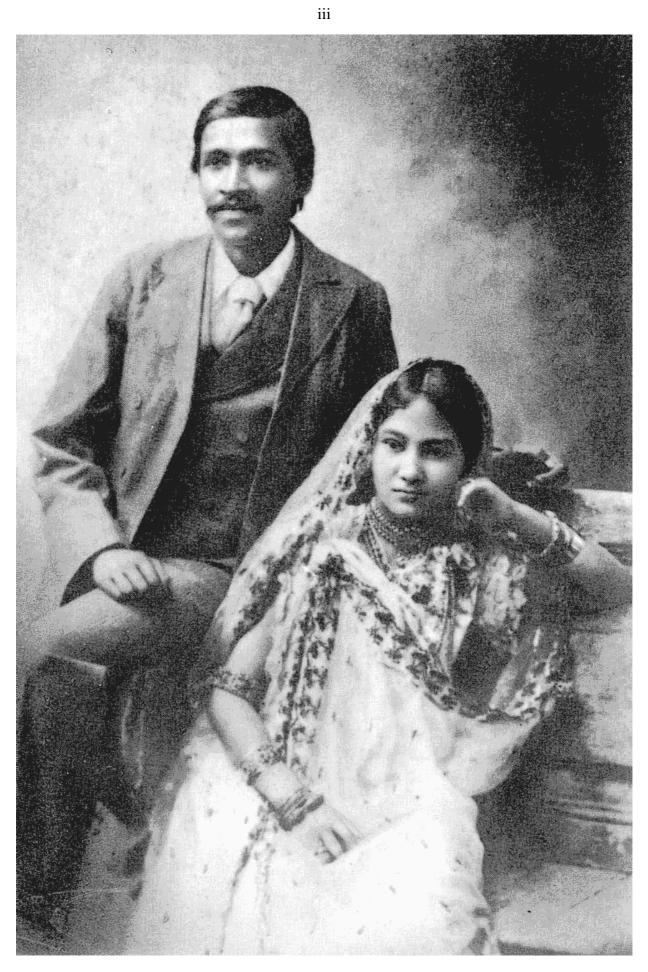
SRI AUROBINDO BIRTH CENTENARY LIBRARY-PONDICHERRY

VOLUME 4

SRI AUROBINDO BIRTH CENTENARY LIBRARY - DE LUXE EDITION

© Sri Aurobindo Ashram Trust 1972. Published by Sri Aurobindo Ashram Pondicherry. Printed at the Sri Aurobindo Ashram Press - Pondicherry - India

PRINTED IN INDIA



Sri Aurobindo and his wife Mrinalini Devi – 1905

NOTE

Volume 4 in the SRI AUROBINDO BIRTH CENTENARY LIBRARY contains Sri Aurobindo's original Bengali writings.

Sri Aurobindo started learning Bengali, his mother tongue, in England, as a probationer for the Indian Civil Service. After his return to India he began a serious study of the language with a view to acquiring proficiency in reading, writing and speaking. During his stay at Baroda he wrote some poetry in Bengali, attempting even a long poem called "Usha-Haran Kabya". A few lines from this work are reproduced here for the first time.

It is to this poem that his brother, Manmohan, himself a poet, refers in his letter to Rabindranath Tagore, dated October 24, 1894. We quote from it the following extract:

"Aurobinda is anxious to know what you think of his book of verses¹, but I have explained to him how busy you are just now; and that you will write later when you have a little more leisure to do justice to his book. I myself think that he is possessed of considerable powers of language and a real literary gift, — but is lacking in stuff and matter, perhaps in warmth of temperament. But those pieces on Parnell², consisting of fine philosophic reflection, show, I think, that he might do great things. Unfortunately he has directed (or rather misdirected) all his energies to writing Bengali poetry. He is at present engaged on an epic (inspired I believe by Michael Madhusudan) on the subject of Usha and Aniruddha."

He wrote several articles for the earlier issues of *Yugantar*, a Bengali revolutionary weekly started by his brother Barin and others under his guidance in March 1906. But not a single copy of this journal has so far been traced.

The earliest available Bengali writings of Sri Aurobindo besides "Usha-Haran Kabya" are the three letters to his wife Mrinalini Devi written between 1905 and 1907. These were produced as exhibits in the Alipore Conspiracy Case in 1908, and having attracted public notice were reproduced in various journals and in book-form soon afterwards.

After his acquittal in 1909 Sri Aurobindo started a Bengali weekly called *Dharma*, and wrote most of the editorial comments and leading

¹ SONGS TO MYRTILLA published a year later, in 1895.

Charles Stewart Parnell (1891) and Hie Jaeet (Centenary Volume 5, pp. 15, 11).

articles for it until his withdrawal to Chandernagore in February 1910. Most of these leading articles were published in book-form in 1920 under the title Dharma O Jatiyata by Prabartak Publishing House, Chandernagore. In the present volume these articles are arranged under two sections, "Dharma" and "Jatiyata" (Religion and Nationalism). The editorial comments from Dharma are published here in a separate section for the first time.

Some of the articles on the Gita from Dharma were separately brought out in book-form in 1920 by the Prabartak Sangha under the title Gitar Bhumika.

Karakahini (Tales of Prison Life) was first serialised in nine parts in the Bengali monthly, Suprabhat in 1909-1910. This series remained incomplete as Sri Aurobindo left Bengal in 1910. The essay, "Karagriha O Swadhinata" (Prison and Freedom), was published in Bharati, a Bengali journal, about the same time. Karakahini came out in bookform in 1920 from Chandernagore.

In 1918 Sri Aurobindo wrote "Jagannather Rath" (the Chariot of Jagannath) fox Prabartak, a journal published from Chandernagore. The article was published in bookform in 1921 along with some others under the same title by the Prabartak Publishing House.

His letter to Barin, also known as "Letter from Pondicherry", written in 1920 was first published in Narayana, a journal edited by C. R. Das. It was also issued as a booklet in the same year and later along with "Letters to Mrinalini" under the title Sri Aurobinder Patra (Letters of Sri Aurobindo) by the Prabartak Publishing House.

A number of articles on the Vedas, Upanishads and other subjects found in Sri Aurobindo's manuscripts were first put together in book-form in 1955 under the title Vividha Rachana. In this volume they have been distributed in various sections.

The letters Sri Aurobindo wrote to some women disciples who did not know English were published as Patrawali in two parts, the first in 1951 and the second in 1959.

The original sources of all articles are indicated in the Table of Contents.

Contents

HYMN TO DURGA (<i>Dharma</i> , No. 9, October, 1909)	
POETRY	5
From Usha-Haran Kabya	7
A Dream (Suprabhat, 1909-1910)	11
THE IDEAL OF FORGIVENESS (<i>Dharma</i> , No. 26, February, 1910) THE VEDA	
THE SECRET OF THE VEDA (Vividha Rachana, 1955)	21
AGNI — THE DIVINE ENERGY (Vividha Rachana, 1955)	26
THE RIG-VEDA (Vividha Rachana, 1955)THE UPANISHADS	
THE UPANISHADS (Dharma, No. 15, December, 1909)	43
THE INTEGRAL YOGA IN THE UPANISHADS (Vividha Rachana, 1955)	45
THE ISHA UPANISHAD (1) (Vividha Rachana, 1955)	47
THE ISHA UPANISHAD (2) (Vividha Rachana, 1955) THE PURANAS	
THE PURANAS (<i>Dharma</i> , No. 17, December, 1909) THE GITA	
THE DHARMA OF THE GITA (Dharma, No. 2, August, 1909)	57
SANNYASA AND TYAGA (Dharma, No. 3, September, 1909)	60
THE VISION OF THE WORLD-SPIRIT (<i>Dharma</i> , No. 23, February, 1910)	
AN INTRODUCTION TO THE GITA (<i>Dharma</i> , Nos. 7-24, 1909-1910) DHARMA	
THE CHARIOT OF JAGANNATHA (Prabartak, 1918)	113
THE THREE STAGES OF HUMAN SOCIETY (Vividha Rachana, 1955)	116
AHANKARA (Dharma, No. 5, September, 1909)	118
INTEGRALITY (Vividha Rachana, 1955)	120
HYMNS AND PRAYERS (Dharma, No. 24, February, 1910)	121
OUR RELIGION {Dharma, No. 1, August, 1909)	124
MAYA (<i>Dharma</i> , No. 3, August, 1909)	127
NIVRITTI (Dharma, No. 12, November, 1909)	131
PRAKAMYA (<i>Dharma</i> , Nos, 17 and 18, 1909-1910)NATIONALISM	
THE OLD AND THE NEW (Vividha Rachana, 1955)	139
THE PROBLEM OF THE PAST (Dharma, No. 6, September, 1909)	140
THE COUNTRY AND NATIONALISM (<i>Dharma</i> , No. 14, December, 1909)	146
THE TRUE MEANING OF FREEDOM (<i>Dharma</i> , No. 8, October, 1909)	
A WORD ABOUT SOCIETY (Vividha Rachana, 1955)	150

Fraternity (<i>Dharma</i> , No. 23, February, 1910) 151	
INDIAN PAINTING (Dharma, No. 25, February, 1910)	154
HIROBUMI ITO (Dharma, No. 10, November, 1909)	156
NATIONAL RESURGENCE (Dharma, No. 5, September, 1909)	158
Our Hope (Dharma, No. 20, January, 1910)	162
EAST AND WEST (<i>Dharma</i> , No. 22, January, 1910)GURU GOVINDSINGH	
GURU GOVINDSINGH (<i>Dharma</i> , No. 8, October, 1909) EDITORIAL COMMENTS	
EDITORIAL COMMENTS (<i>Dharma</i> , 1909-1910)TALES OF PRISON LIFE	
TALES OF PRISON LIFE (Suprabhat, 1909-1910)	257
Prison and Freedom (Bharati)	298
THE ARYAN IDEAL AND THE THREE GUNAS (Suprabhat, 1909-1910).	305
NEW BIRTH (<i>Dharma</i> , No, 2, August, 1909)LETTERS	
Letters to Mrinalini (1905-1907)	317
Letter to Barin (1920)	327
LETTERS TO N. AND S. (Published, 1951 & 1959)	337

ভূমিকা

শ্রীজরবিন্দ বাংলা লেখা আরম্ভ করেছিলেন বিলেত থেকেই—কতকটা তাঁর পিতৃদেবের নির্দেশ অমান্য করেই, কারণ, প্রথমতঃ গোড়ার দিকে না হ'লেও কলেজ জীবনে বাঙ্গালীদের সঙ্গে যথেপট মিলতে ও মিশতে পেরেছিলেন, তারপর সিভিল সাভিসে তিনি বাংলা গ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় ভাষা হিসাবে। এ প্রসঙ্গে তবে একটি মজার গল্প তিনি আমাদের বলেছিলেন। তাঁদের বাংলা শিক্ষক ছিল একজন ইংরেজ—পাকা ইংরেজ। মাপ্টার মশাই–এর বিদ্যা পরীক্ষা করবার জন্য তাঁর এক দুপ্ট ছাত্র একটি বাংলা লেখা (বিশ্বিম থেকে নকল করে) তার হাতে দিয়ে বলে, "স্যার, এই বাংলা লেখাটি বড় কঠিন, বুঝতে পারছি না, একটু বুঝিয়ে দেবেন?" মাপ্টার মশাই লেখাটি বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখলেন, উল্টেপান্টে পরখ করলেন, তারপর আই. সি. এস-ই রায় দিলেন, "This is not Bengali."

শ্রীঅরবিন্দ বাংলা রীতিমত শিখতে আরম্ভ করেন বরোদায় এসেই—সভূতে, লিখতে, বলতে। তার প্রথম ফলই হ'ল বৃদ্ধিমচন্দ্রের উপর প্রবন্ধাবলী, ক্রমে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি কবিওয়ালাদের অনুবাদ। বসুমতী সংস্করণের সকল গ্রন্থাবলী তাঁর পুস্তকাগারে ছিল, অনেক অনেক মন্তব্য পড়বার সময় তিনি সেই সব পুস্তকে লিখে রেখেছেন, ষথা, মধুসূদনের কয়েকটা কবিতার উপর। বাংলা লেখাতেও (কাব্য রচনায়) হাত দিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর ভাই (অর্থাৎ দাদা) মনমোহন ঘোষ এক কৌতূহলের সংবাদ পরিবেশন করেছেন। মন-মোহন রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন, অরবিন্দের কবিতার বই সম্বন্ধে আপ-নার কী মনে হয় তা জানবার জন্যে সে উৎসুক, কিন্তু আপনি এখন কত ব্যস্ত আছেন তা আমি তাকে বুঝিয়ে বলেছি এবং জানিয়েছি যে তার বই-এর প্রতি সুবিচার করার জন্যে আপনার অবসরমত আপনি তাকে পরে লিখবেন। সে এখন ব্যস্ত বাংলা কবিতা লেখায়; ু ইংরেজী কবিতায় সে সুন্দর সুদক্ষ, এখন সে র্থা সময় নল্ট করছে বাংলা কবিতা লেখার চেষ্টায়—–লিখছে ঊষা-হরণ কাব্য (মধ্সূদনী চং-এ)। মনমোহন কিন্তু নিজেও ঠিক ঐ বিষয়ে এক কাব্য লিখে-ছেন।

যা হোক আমাদের এই সংগ্রহের মধ্যে বাংলা ভাষায় তাঁর প্রথম লেখার নিদর্শন হ'ল মৃণালিনীর নিকট পত্রাবলী। আর সর্বাশেষ হ'ল পণ্ডিচেরীতে লিখিত পত্রাবলী কয়েকজন সাধিকার কাছে। পণ্ডি-চেরীর পূর্বের্ব বেশির ভাগ বাংলা লেখা হয়েছিল "ধন্মর্ম" পত্রিকার জন্য। "ধন্মর্ম" পত্রিকার সব লেখাই শ্রীঅরবিন্দের হাত থেকে,শেষের কয়েকটি সংখ্যা ছাড়া। কারাকাহিনী এবং আর এক আধটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল অন্যত্ত। পশুচেরীতে তিনি লিখেছিলেন ঋগ্বেদ সম্বন্ধে, কিছু অনুবাদ ও টীকা। প্রীঅরবিন্দের বাংলা রচনার রীতি একদিকে যেমন সংস্কৃত ঘেঁষা (যথা, দুর্গান্তোত্ত এবং জগন্নাথের র্থ ও আমাদের ধন্ম্ম), অন্যদিকে সহজ সরল কথ্যরীতিও তাঁর সমানে আয়ন্তাধীন ছিল। বিষয় এবং উদ্দেশ্য অনুসারে এই বিভিন্নতা। প্রীঅরবিন্দের বাংলা লেখাগুলি সবই প্রবন্ধাকারে, কেবল গীতা এবং কারাকাহিনী ছাড়া। এ দুটিও অসম্পূর্ণ গ্রন্থ—পুন্তকাকারে সংগৃহীত হ'লেও। বর্ত্ত-মান গ্রন্থাবলীতে তাই পুন্তকগুলি ভেঙ্গে দিয়ে বিষয় অনুসারে বিভিন্ন প্রবন্ধ বিভিন্ন প্রয়ায়ে সাজান হয়েছে।

দুর্গা-স্ভোত্র

মাতঃ দুর্গে ! সিংহ্বাহিনি স্ব্পান্তিদায়িনি মাতঃ শ্বিপ্রিয়ে ! তোমার শক্ত্যংশজাত আমরা বঙ্গদেশের যুবকগণ তোমার মন্দিরে আসীন, প্রার্থনা করিতেছি;—-গুন, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও॥

মাতঃ দুর্গে ! যুগে যুগে মানবশরীরে অবতীর্ণ হইয়া জন্ম জন্ম তোমারই কার্য্য করিয়া তোমার আনন্দধামে ফিরিয়া যাই। এইবারও জন্মিয়া তোমারই কার্য্যেরতী আমরা, ওন, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, সহায় হও॥

মাতঃ দুর্গে ! সিংহবাহিনি, ত্রিশূলধারিণি, বম্ম-আর্ত-সুন্দর-শরীরে মাতঃ জয়দায়িনি । তোমার প্রতীক্ষায় ভারত রহিয়াছে, তোমার সেই মঙ্গলময়ী মূর্তি দেখিতে,উৎসুক। শুন, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও॥

মাতঃ দুর্গে ! বলদায়িনি, প্রেমদায়িনি, জানদায়িনি, শক্তিস্বরূপিণি ভীমে, সৌম্য-রৌদ্র-রূপিণি ! জীবন-সংগ্রামে ভারত-সংগ্রামে তোমার প্রেরিত যোদ্ধা আমরা, দাও, মাতঃ, প্রাণে মনে অসুরের শক্তি, অসুরের উদ্যম, দাও, মাতঃ, হৃদয়ে বুদ্ধিতে দেবের চরিত্র, দেবের জান।

মাতঃ দুর্গে ! জগৎশ্রেষ্ঠ ভারতজাতি নিবিড় তিমিরে আচ্ছর ছিল। তুমি, মাতঃ, গগনপ্রান্তে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছ, তোমার স্বর্গীয় শরীরের তিমির-বিনাশী আভায় উষার প্রকাশ হইল। আলোক বিস্তার কর, মাতঃ, তিমির বিনাশ কর॥

মাতঃ দুর্গে ! শ্যামলা সব্বসৌন্দর্য্য-অলঞ্তাজান প্রেম শক্তির আধার বসভূমি তোমার বিভূতি, এতদিন শক্তিসংহরণে আত্মগোপন করিতেছিল। আগত যুগ, আগত দিন, ভারতের ভার ক্ষক্ষে লইয়া বঙ্গজননী উঠিতেছে, এস, মাতঃ, প্রকাশ হও॥

গ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

₹

মাতঃ দুর্গে ! তোমার সন্তান আমরা, তোমার প্রসাদে তোমার প্রভাবে মহৎ কার্য্যের মহৎ ভাবের উপযুক্ত হই । বিনাশ কর ক্ষুদ্রতা, বিনাশ কর স্থার্থ, বিনাশ কর ভয় ॥

মাতঃ দুর্গে ! কালীরাপিণি, নৃমুভমালিনি দিগম্বরি, কুপাণপাণি দেবি অসুর-বিনাশিনি ! কুরনিনাদে অভঃস্থ রিপু বিনাশ কর । একটিও যেন আমাদের ভিতরে জীবিত না থাকে, বিমল নিশ্মল যেন হই, এই প্রার্থনা মাতঃ, প্রকাশ হও॥

মাতঃ দুর্গে। স্থার্থে ভয়ে ক্ষুদ্রাশয়তায় ফ্রিয়মাণ ভারত। আমাদের মহৎ কর, মহৎপ্রয়াসী কর, উদারচেতা কর, সত্যসঙ্গল্প কর। আর অল্পাশী, নিশ্চেষ্ট, অলস, ভয়ভীত যেন নাহই।।

মাতঃ দুর্গে! যোগশজি বিস্তার কর। তোমার প্রিয় আর্যা-সন্তান, লুপ্ত শিক্ষা, চরিত্র, মেধাশজি, ডজিব্রদ্ধা, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য সত্যক্তান আমাদের মধ্যে বিকাশ করিয়া জগৎকে বিতরণ কর। মানব সহায়ে দুর্গতিনাশিনি জগদ্ধে, প্রকাশ হও।

মাতঃ দুর্গে ! অন্তঃস্থ রিপু সংহার করিয়া বাহিরের বাধাবিম্ন নিশ্র্নল কর । বলশালী পরাক্রমী উন্নতচেতা জাতি ভারতের পবিন্ত কাননে, উম্ব্র জেরে, গগন-সহচর পর্বততলে পূতসলিলা নদীতীরে, একতায় প্রেমে, সত্যে শক্তিতে, শিল্লে সাহিত্যে, বিক্রমে ভানে শ্রেষ্ঠ হইয়া নিবাস করুক, মাতৃচরণে এই প্রার্থনা, প্রকাশ হও॥

মাতঃ দুর্গে ! আমাদের শরীরে যোগবলে প্রবেশ কর । যন্ত তব, অওভ বিনাশী তরবারী তব, অভান-বিনাশী প্রদীপ তব আমরা হইব, বঙ্গীয় যুবকগণের এই বাসনা পূর্ণ কর। যন্ত্রী হইয়া যন্ত্র চালাও, অওভ-হন্ত্রী হইয়া তরবারী ঘুরাও, জানদীপ্তিপ্রকাশিনী হইয়া প্রদীপ ধর, প্রকাশ হও॥

মাতঃ দুর্গে ! তোমাকে পাইলে আর বিসর্জন করিব না, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া রাখিব। এস মাতঃ, আমাদের মনে প্রাণে শরীরে প্রকাশ্হও॥ বীরমার্গপ্রদশিনি, এস! আর বিসর্জন করিব না। আমাদের অখিল জীবন অনবচ্ছিন্ন দুর্গাপূজা, আমাদের সব্ব কার্য্য অবিরত পবিত্র প্রেমময় শক্তিময় মাতৃসেবারত হউক, এই প্রার্থনা, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও॥ **POETRY**

কবিতা

সবাই পাগল তোৱা ঘুৱি' ধরাতল

সবাই পাগল তোরা ঘুরি' ধরতেল, সুন্দর জীবন লডি', জন্মগৃত্যদার, সহস্র খেলানা ঘরে, প্রকৃতি সম্বল, কৃষ্ণ সাথী, দুঃখ দুঃখ কর অনিবার।

ভগবান আমারই, আমার ব্রন্ধাণ্ড। মদাবহ প্রকৃতির হাসি নভঃখলে, মোর জন্য হাতে ধরে রবি সুধাভাণ্ড, আমার আনন্সস্তোতে তটিনী উছলে।

আমার রজনী-রাজ্যে জ্যোৎয়া রাজধানী, আমার সমুদ্রফেনা হাস্য দেবতার, আমার প্রণয়ঙ্গুলে কৃষ্ণ অভিমানী, শিবের পৃহিণী কালী স্বজনী আমার।

স্বরগ হইতে শুনি' আসি ধরাতলে, কি বা অমূল্য নিধি পেয়েছে মানব, এত কথা, এত নেশা দুঃখ দুঃখ বলে, আঁকড়ি ধরিয়া বসে টানিলে কেশব।

দুঃখ-অভিমানী জীব জগৎ-সংসারে বিচরে স্থপন-ঘোরে বিষাদ-নেশায়, ক্রন্দন-মদিরা যেন পান করিবারে দুঃখ দুঃখ বলে মন্ত তৃষ্ণার্ড ধরায়।

কাছে প্রেমময় সিশ্কু, ডাকে মৃদুস্বরে—– ছাড় তৃষ্ণা, ছাড় দুঃখ, সখা তোর আমি, Ъ

গ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

তুলিয়া নিজ অঞ্চলে ফেলে দিতে দৃরে অন্ধ প্রকৃতির ক্রোড়ে আসিয়াছি নামি।

যাই স্বৰ্গধামে ফিরি। প্রনে প্রকাশি দীপ্ত পক্ষদল, শুনি সনাতন তান। আনন্দ-বিহুগ আমি ব্রহ্মাণ্ড-মিবাসী আনন্দ-আকাশে গাহি অমৃতের গান।

STORIES

কাহিনী

A DREAM (Suprabhat, 1909-1910)

বিরক্ত হইয়া চাবকাইবার লোক চাও, আমাকে সেই সাধ মিটাইবার জন্য ডাকিয়াছ। চাবুকের প্রহার খাইতে আসিয়াছি—ন্যে যথা মাং প্রপদান্তে। তবে যদি প্রহারের আগে আমার মুখে শুনিতে চাও, আমার প্রণালী বুঝাইয়া দিব। কেমন রাজী আছ ?" হরিমোহন বলিল, "পারিবি ত ? দেখিতেছি বড় বকিতে জানিস, কিন্তু তোর মত কচি ছেলে যে আমাকে কিছু শিখাইতে পারিবে, তাহা বিশ্বাস করিব কেন?" বালক আবার হাসিয়া বলিল, "এস, দেখ, পারি কি না।"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হরিমোহনের মাথায় হাত দিলেন। তখনই দরিদ্রের সৰ্ব শরীরে বিদ্যুতের স্ত্রোত খেলিতে লাগিল, মূলাধারে সুণ্ত কুণ্ডলিনী শক্তি অগিনময়ী ভুজ্জিনীর আকারে গর্জন করিয়া ব্রহ্মরন্ত্রে ছুটিয়া আসিল, মস্তিক্ষ প্রাণ-শক্তি-তরঙ্গে ভরিয়া গেল। পর মুহুর্তে হরিমোহনের চারিধারে ঘরের দেওয়াল যেন দূরে পলাইতে লাগিল, নামরাপময় জগৎ যেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অনঙ্কে লুক্কায়িত হইল। হরিমোহন বাহ্যজানশূন্য হইল। যখন আবার চৈতন্য হইল, সে দেখিল কোন অচেনা বাড়ীতে বালকের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছে, সম্মুখে গদীতে বসিয়া গালে হাত দিয়া একজন বৃদ্ধ প্রগাঢ় চিভায় নিমগন র**হি**য়াছেন। সেই ঘোর দুশ্ভিডা বিকৃত হাদয়বিদারক নিরাশা বিমর্ষ মুখমণ্ডল দেখিয়া হরি-মোহন বিশ্বাস করিতে চায় মাই যে, এই রুদ্ধ গ্রামের হর্ত্তা কর্ত্তা তিনকড়ি শীল। শেষে অতিশয় ভীত হইয়া বালককে বলিল, "কি করিলি কেম্টা, চোরের মত ঘোর রাক্রিতে পরের বাড়ীতে চকিলি ? পুলিশ আসিয়া ধরিয়া প্রহারের চোটে দুইজনের প্রাণ বাহির করিবে যে ! তিনকড়ি শীলের প্রতাপ জানিস না ?" বালক হাসিয়া বলিল, "খুব জানি ৷ কিন্তু চুরি আমার পুরাতন ব্যবসা, পুলিশের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে, ভয় নাই। এখন তোমাকে সূক্ষদৃপ্টি দিলাম, র্দ্ধের মনের ভিতর দেখ। তিনকড়ির প্রতাপ জান, আমার প্রতাপও দেখ।" তখন হরিমোহন র্দ্ধ তিনকড়ির মন দেখিতে পাইল । দেখিল, যেন শন্তু-আক্রমণে বিধ্বস্ত ধনাঢ্যা নগরী, সেই তীক্ষ্ণ ওজন্মিনী বৃদ্ধিতে কত ভীষণ মৃতি পিশাচ ও রাক্ষস প্রবেশ করিয়া শান্তি বিনাশ করিতেছে, ধ্যানভঙ্গ করিতেছে, সুখ লুষ্ঠন করিতেছে। যুদ্ধ প্রিয় কনিষ্ঠপুত্রের সঙ্গে কলহ করিয়াছেন, তাড়াইয়া দিয়াছেন 🖟 র্দ্ধকালের স্নেহের পূত্রকে হারাইয়া শোকে মিয়মাণ, অথচ ক্রোধ, গবর্ব, হঠকারিতা হৃদয়দারে অর্গল দিয়া শান্তী হইয়া বসিয়া আছে। ক্ষমার প্রবেশ নিষেধ করিতেছে। কন্যার নামে দুশ্চরিত্রা বলিয়া কলঙ্ক রটিয়াছে, রুদ্ধ তাঁহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া প্রিয়কন্যার জন্য কাঁদিতেছেন ; রুদ্ধ জানেন সে নির্দোষ, কিন্তু সমাজের ভয়, লোকলজ্জা, অহন্ধার, স্বার্থ স্নেহকে চাপিয়া ধরিয়াছে। সহস্র পাপের স্মৃতিতে রুদ্ধ ভীত হইয়া বারবার চমকিয়া উঠিতেছে, তথাপি পাপ প্রবৃত্তির সংস্কারে সাহস বা বল নাই। মাঝে মাঝে মৃত্যু ও পরলোকের চিন্তা বৃদ্ধকে অতি নিদারুণ বিভীষিকা দেখাইতেছে । হরিমোহন দেখিল, মরণ-চিন্তার পশ্চাৎ হইতে বিকট যমদৃত কেবলই উকি মারিতেছে ও কপাটে ঠক্ ঠক্ করিতেছে। যতবার এইরূপ শব্দ হয় রদ্ধের অন্তরাত্মা উয়ে উন্মন্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠে। এই ভয়ঙ্কর ম্বপ্ন ১৩

দৃশ্য দেখিয়া হরিমোহন আতঙ্কে বালকের দিকে চাহিয়া বলিল, "এ কিরে কেল্টা, আমি ভাবিতাম রুদ্ধ পরম সুখা।" বালক বলিল, "ইহাই আমার প্রতাপ। বল দেখি কাহার প্রতাপ বেশী, ও-পাড়ার তিনকড়ি শীলের, না বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীকৃষ্ণের ? দেখ, হরিমোহন, আমারও পুলিশ আছে, পাহারা আছে, গবর্ণমেন্ট আছে, আইন আছে, বিচার আছে, আমিও রাজা সাজিয়া খেলা করিতে পারি, এই খেলা কি তোমার ভাল লাগে ?" হরিমোহন বলিল, "না বাবা। এ ত বড় বদ্ খেলা। তোর বুঝি ভাল লাগে?" বালক হাসিয়া বলিল, "আমার সব খেলা ভাল লাগে। চাবকাইতেও ভালবাসি, চাবুক খাইতেও ভালবাসি।" তাহার পর বলিল, "দেখ হরিমোহন, তোমরা কেবল বাহিরটা দেখ, ভিতরটা দেখিবার সূক্ষদৃষ্টি এখনও বিকাশ কর নাই। সেইজন্যই বল, তুমি দুঃখী, আর তিনকড়ি সুখী। এই লোকটির কোনই পাথিব অভাব নাই--অথচ তোমার অপেক্ষা এই লক্ষপতি কত অধিক দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কেন, বলিতে পার ? মনের অবস্থায় সুখ, মনের অবস্থায় দুঃখ। সুখ–দুঃখ মনের বিকার মাব্র। যাহার কিছু নাই বিপদই যাহার সম্পত্তি, ইচ্ছা করিলে সে বিপদের মধ্যেও পরম সুখী হইতে পারে। আবার দেখ তুমি যেমন নীরস পুণ্যে দিন কাটাইয়া সুখ পাইতেছ না, কেবল দুঃখ চিন্তা করিতেছ, ইনিও সেইরাপ নীরস পাপে দিন কাটাইয়া কেবলই দুঃখ চিন্তা করেন। তাই পুণ্যের ক্ষণিক সুখ ও পাপের ক্ষণিক দুঃখ বা পুণ্যের ক্ষণিক দুঃখ পাপের ক্ষণিক সুখ। এই দ্বন্দে আনন্দ নাই। আনন্দ-আগারের ছবি আমার কাছে ; আমার কাছে যে আসে যে আমার প্রেমে পড়ে, আমাকে সাধে, আমার উপর জোর করে, অত্যাচার করে—– সে আমার আনন্দের ছবি আদায় করে ৷" হরিমোহন আগ্রহপূৰ্বক শ্রীকৃষ্ণের কথা গুনিতে লাগিল। বালক আবার বলিল, "আর দেখ হরিমোহন, গুচ্চ পুণ্য তোমার। নিকট নীরস হইয়া পড়িয়াছে অথচ সংস্কারের প্রভাব তুমি ছাড়িতে পার না ; সেই তুচ্ছ অহঙ্কার জয় করিতে পার না। রুদ্ধের নিকট পাপ নীরস হইয়া পড়িয়াছে অথচ সংস্কারের প্রভাবে তিনিও তাহা ছাড়িতে না পারিয়া—ইহজীবনে নরক্ষত্রণা ভোগ করিতেছেন। ইহাকে পুণ্যের বন্ধন পাপের বন্ধন বলে। অঞানজাত সংস্কার সেই বন্ধনের রজ্জু। কিন্তু রুদ্ধের এই নরক্যন্তণা বড় গুভ অবস্থা। তাহাতে তাহার পরিভাগ ও মঙ্গল হইবে।"

হরিমোহন এতক্ষণ নীরবে কথা শুনিতেছিল, এখন বলিল, "কেল্টা তোর কথা বড় মিঠে, কিন্তু আমার প্রত্যয় হইতেছে না। সুখ দুঃখ মনের বিকার হইতে পারে, কিন্তু বাহ্যিক অবস্থা তাহার কারণ। দেখ, ক্ষুধার জ্বালায় মন যখন ছট্ফট্ করে, কেহ কি পরম সুখী হইতে পারে ? অথবা যখন রোগে বা যন্ত্রণায় শরীর কাতর হয়, তখন কি কেহ তোর কথা ভাবিতে পারে ?" বালক বলিল, "এস, হরিমোহন, তাহাও তোমাকে দেখাইব।" এই বলিয়া বালক আবার হরিমোহনের মাথায় হাত দিল, স্পর্শ অনুভব করিবামান্ত হরিমোহন দেখিল আর তিনকড়ি শীলের বাড়ী নাই, নির্জন সুরম্য পর্শ্বতের বায়ুসেবিত শিখরে একজন সন্ত্রাসী আসীন, ধ্যানে মগন, চরণ প্রান্তে প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র প্রহরীর ন্যায় শায়িত। ব্যাঘ্র দেখিয়া

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

১৪

হরিমোহনের চরণদ্বয় অগ্রসর হইতে নারাজ হইল, কিন্তু বালক ভাহাকে টানিয়া সন্মাসীর নিক্ট লইয়া গেল। বালকের সঙ্গে জোরে না পারিয়া হরিমোহন অগত্যা চলিল। বালক বলিল, "দেখ হরিমোহন।" হরিমোহন চাহিয়া দেখিল, সন্ন্যাসীর মন তাহার চক্ষের সামনে খোলা খাতার মত রহিয়াছে, তাহার পৃষ্ঠায় পুষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণ নাম সহস্রবার লেখা। সন্ধাসী নিবিককর সমাধির সিংহছার পার হইয়া স্য্যা-লোকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন। আবার দেখিল, সন্মাসী অনেকদিন অনাহারে রহিয়াছে, গত দুই দিন শ্রীর ক্ষৎপিপাসায় বিশেষ কল্ট পাইয়াছে। হরিমোহন বলিল, "এ কিরে কেল্টা ? বাবাজী তোকে এত ভালবাসেন অথচ ক্ষুৎপিপাসা ভোগ করিতেছেন। তোর কি কোন কাণ্ডজান নাই! এই নির্জন ব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণো কে তাঁহাকে আহার দিবে !" বালক বলিল, "আমি দিব, কিন্তু আর এক মজা দেখা।" হরিমোহন দেখিল, ব্যাঘ্র উঠিয়া তাহার থাবার এক প্রহারে। নিকটবন্তী বলমীক ভালিয়া দিল। ক্ষুদ্র শতশত পিপীলিকা ব্যহির হইয়া ক্রোধে সন্ন্যাসীর গায়ে উঠিয়া দংশন করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী ধ্যানমণ্ন, নিশ্চল, অটল। তখন বালক সন্যাসীর কর্ণকুহরে অতি মধুর স্বরে একবার ডাকিল, "সখে !" সম্রাসী চক্ষ উন্মীলন করিলেন ৷ প্রথমে মোহ-জালাময় দংশন অনুভব করেন না, তখনও কর্ণকুহরে সেই বিশ্ববান্ছিত চিত্তহারী বংশীরব বাজিতেছে—মেমন র্ন্দাবনে রাধার কানে বাজিয়াছিল : তাহার পরে শত শত দংশনে বুদ্ধি শরীরের দিকে আকুষ্ট হইল। সন্ধাসী নড়িলেন না—সবিসময়ে মনে মনে বলিতে। লাগিলেন, "এ কি ? আমার এমন ত কখন হয় নাই। যাক্, শ্রীকৃষ্ণ আমার সঙ্গে ক্রীড়া **ক**রিতেছেন, ক্ষুদ্র পিপীলিকাচয়রাপে আমাকে দংশন করিতেছেন।" হরিমোহন দেখিল, দংশমের জালা বুদ্ধিতে আর পৌছে না, প্রত্যেক দংশনে তিনি তীর শারীরিক আনন্দ অনুভব করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চারণপূৰ্বক অধীর আনন্দে হাততালি দিয়া মৃত্য করিতে লাগিলেন। পিপীলিকাণ্ডলি মা**টি**তে পড়িয়া পলাইয়া গেল। হরিমোহন সবিসময়ে জিঞাসা করিল, "কেপ্টা, এ কি মায়া।" বালক হাততালি দিয়া দুইবার এক পায়ের উপর ঘুরিয়া উচ্চহাস্য করিল। "আমিই জগতের একমার যাদুকর ! এ মায়া বুঝিতে পারিবে না, এই আমার পরম রহস্য । দেখিলে? যন্ত্রপার মধ্যেও আমাকে ভাবিতে পারিলেন ত! আবার দেখা "সন্ন্যাসী প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বসিলেন ; শরীর ক্ষুৎপিপাসা ভোগ করিতে লাগিল, কিন্ত হ্রিমোহন দেখিল সল্যাসীর বুদ্ধি সেই শারীরিক বিকার অনুভব করিতেছে মাল. কিন্তু তাহাতে বিকৃত বা লিপ্ত হইতেছে না। এই সময়ে পাহাড় হইতে কে বংশী∹ বিনিন্দিত স্বরে ডাকিল, "সখে।" হরিমোহন চমকিল। এ যে শ্যামসুন্দরেরই মধুর বংশীবিনিন্দিত শ্বর। তাহার পরে দেখিল, শিলাচয়ের পশ্চাৎ হইতে একটি সুন্দর কৃষ্ণবৰ্ণ বালক থালায় উত্তম আহার ও ফল লইয়া আসিতেছে। হরিমোহন হত-বৃদ্ধি হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিল। বালক তাহার পার্থে দাঁড়াইয়া আছে, অথচ যে বালক আসিতেছে, সেও অবিকল শ্রীকৃষ্ণ। অপর বালক আসিয়া সন্মাসীকে আলো দেখাইয়া বলিল, "দেখু, কি এনেছি।" সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "এলি ?

শ্বপ্ন ১৫

এতদিন না খাওয়াইয়া রাখিলি যে? যাক্ এলি ত বোস্, আমার সঙ্গে খা।" সন্ন্যাসী ও বালক সেই থালার খাদ্য খাইতে বসিল, পরস্পরকে খাওয়াইতে লাগিল, কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল। আহার শেষ হইলে বালক থালা লইয়া অঞ্চকারে মিশিয়াগেল।

হরিমোহন কি জিঞাসা করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ দেখিল শ্রীকৃষ্ণ আর নাই, সন্মাসীও নাই, ব্যাঘ্রও নাই, পর্বতও নাই। সে একটি ভদ্র পলীতে বাস করিতেছে; বিন্তর ধনদৌলত আছে, স্ত্রী-পরিবার আছে, রোজ ব্রাক্ষণকে দান করিতেছে, ডিক্ষুককে দান করিতেছে, ত্রিসন্ধ্যা করিতেছে, শাস্ত্রোক্ত আচার স্যত্নে রক্ষা করিয়া রঘুনন্দন-প্রদশিত পথে চলিতেছে, আদর্শ পিতা, আদর্শ স্বামী, আদর্শ পুত্র হইয়া জীবনযাপন করিতেছে। কিন্তু পর মুহর্ত্তে ভীত হইয়া দেখিল যে যাহারা সে ভদ্রপল্লীতে বাস করে তাহাদের মধ্যে লেশমাল্ল সভাব বা আনন্দ নাই, যন্ত্রবৎ বাহিরের আচার রক্ষাকেই পুণ্যব**ৎ জান করিতেছে। প্রথমটা হরি**-মোহনের যেমন আনন্দ হইয়াছিল, এখন তেমনি যন্ত্রণা হইতে লাগিল। তাহার। বোধ হইল যেন তাহার বিষম তৃষ্ণা লাগিয়াছে, কিন্তু জল পাইতেছে না, ধূলি খাইতেছে, কেবলই ধূলি কেবলই ধূলি অনন্ত ধূলি খাইতেছে। সেই স্থান হইতে পলামন করিয়া সে আর এক পলীতে গেল, সেখানে একটি প্রকাণ্ড অট্রালিকার সম্মুখে অপূর্ণ্ব জনতা ও আশীর্ণ্বাদের রোল উঠিতেছিল। হরিমোহন অগ্রসর হইয়া দেখিল, তিনকড়ি শীল দালানে বসিয়া সেই জনতার মধ্যে অশেষ ধন বিতরণ করিতেছেন, কেহই নিরাশ হইয়া ফিরিতেছে না। হরিমোহন উচ্চহাস্য করিল। সে ভাবিল, "একি স্বপ্ন! তিনকড়ি শীল আবার দাতা?" তাহার পরে সে তিনকড়ির মন দেখিল। বুঝিল, সেই মনে লোভ, ঈর্যা, কাম, স্বার্থ ইত্যাদি সহস্র অকৃণিত ও কুপ্রবৃত্তি দেহি দেহি রব করিতেছে। তিনকড়ি পুণোর খাতিরে, যশের খাতিরে, গবের বশে সেই ভাবভলি ছাপাইয়া রাখিয়াছেন, অতৃপ্ত রাখিয়াছেন, চিত হইতে তা**ড়াই**য়া দেন নাই। এই সময় আবার কে হরিমোহনকে ধরিয়া তাড়াতাড়ি পরলোক ভ্রমণ করাইয়া আনিল। হরিমোহন হিন্দুর নরক, মুসলমানের নরক, গ্রীকদের নরক, হিন্দুর স্বর্গ, খৃষ্টানের স্বর্গ, মুসলমানের স্বর্গ, গ্রীকদের স্বর্গ, আর কত নরক, কত স্বর্গ দেখিয়া আসিল। তাহার পরে দেখিল, সে নিজ বাড়ীতে পরিচিত ছেঁড়া মাদুরে ময়লা তোষকে ভর দিয়া বসিয়া আছে, সম্মুখে শ্যামসুন্দর। বালক বলিল, "বড় রাগ্রি হইয়াছে, বাড়ীতে না ফিরিলে সকলে আমাকে বকিবে, ্মারামারি আরম্ভ করিবে । সংক্ষেপে বুলি । যে স্বর্গ নরক দেখিলে, সে স্বপ্ন–় জগতের, ক্লুনাস্পট। মানুষ মরিলে স্বর্গ নরকে যায়, গত জন্মের ভাব অন্যত্র ভোগ করে। তুমি পূব্রজনো পুণ্যবান ছিলে, কিন্তু প্রেম তোমার হাদয়ে স্থান পায় নাই, না তুমি ঈশ্বরকে ভালবাসিয়াছ, না মানুষকে। প্রাণত্যাগের পরে স্বপ্রজগতে ্সেই ভদুপল্লীতে বাস করিয়া পূৰ্ব জীবনের ভাব ভোগ করিতে লাগিলে, ভোগ করিতে করিতে সে ভাব আর ভাল লাগে না, প্রাণ আকুল হইতে লাগিল, সেখান হইতে পিয়া ধূলিময় নরকে বাস করিলে, শেষ জীবনের পুণ্যফল ভোগ করিয়া

গ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

১৬

আবার তোমার জন্ম হইল। সেই জীবনে ক্ষুদ্র কুদ্র নৈমিত্তিক দান ভিন্ন, নীরস বাহ্যিক ব্যবহার ভিন্ন কাহারও অভাব দূর করিবার জন্য কিছু কর নাই বলিয়া এই জন্মে তোমার এত অভাব। আর এখনও যে মীরস পুণ্য করিতেছ, তাহার। কারণ এই যে কেবল স্থঞ্জগতের ভোগে পাপ পুণা সম্পূর্ণ ক্ষয় হয় না, পৃথিবীতে কিশ্মাফল ভোগে ক্ষয় হয়। তিনকড়ি গত জন্মে দাতাকণ ছিলেন, সহস্ত ব্যক্তির আশীৰ্বাদে এই জন্মে লক্ষপতি ও অভাবশ্ন্য হইয়াছেন, কিন্তু চিত্তভদ্ধি হয় নাই বলিয়া অতৃণ্ড কুপ্রবৃত্তি এখন পাপ দারা তৃণ্ড করিতে হইয়াছে। কর্ম্মবাদ বুঝিলে কি ? পুরস্কার বা শাস্তি নহে—-কিন্তু অমঙ্গলের ছারা অমঙ্গল সৃষ্টি, এবং মঞ্চল দারা মঙ্গল স্থিট। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। পাপ অওভ, তাহা দারা দুঃখ স্পট হয় : পুণা শুভা, তাহা দারা সুখা স্পট হয়। এই ব্যবস্থা চিত্ত দারি জেনা, অঙ্ভ বিনাশের জন্য। দেখ হরিমোহন, পৃথিবী আমার বৈচিন্ন্যময় জগতের অতি ক্ষুদ্র অংশ, কিন্তু সেখানে কর্ম্ম দ্বারা অগুভ বিনাশ করিবার জন্য তোমরা জন্মগ্রহণ কর। যখন পাপ-পুণ্যের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া প্রেম-রাজ্যে পদার্পণ কর, তখন এই কার্য্য হইতে জব্যাহতি পাও। পরজন্ম তুমিও জব্যাহতি পাইবে। আমি আমার প্রিয় ভগিনী শক্তি ও তাহার সহচরী বিদ্যাকে তোমার কাছে পাঠাইব, কিন্তু দেখ, এক সর্ত্ত আছে, তুমি আমার খেলার সাথী হইবে, মুক্তি চাহিতে পারিবে না। রাজী ?" হরিমোহন বলিল, "কেল্টা, তুই আমাকে গুণ করিলি! তোকে কোলে লইয়া আদর করিতে বড় ইচ্ছা করে, যেন এই জীবনে আর কোন বাসনা

বালক হাসিয়া বলিল, "হরিমোহন, কিছু বুঝিলে ?" হরিমোহন বলিল, "বুঝিলাম বই কি।" তাহার পরে একটু ভাবিয়া বলিল, "ওরে কেল্টা, আবার ফাঁকি দিলি ৷ অশুভ স্জন করিলি কেন, তাহার ত কোন কৈফিয়ৎ দিস্ নি ৷" এই বলিয়া সে বালকের হাত ধরিল। বালক হাত কাড়িয়া লইয়া হরিমোহনকে। শাসাইয়া বলিল, "দূর হ ় এক ঘন্টার মধ্যে আমার সব ৩০ত কথা বাহির করিয়া লইবি?" বালক হঠাৎ প্রদীপ নিবাইয়া সরিয়া সহাস্যে বলিল, "কই, হরিমোহন, চাবুক মারিভে একেবারে ভুলিয়া গেলে যে। সেই ভয়ে তোমার কোলে বসিলাম না, কখন বাহ্যিক দুঃখে চটিয়া আমাকে উত্তম শিক্ষা দিবে! তোমার উপর আমার লেশমাত্র বিশ্বাস নাই।" হরিমোহন অন্ধকারে হাত বাড়াইল, কিন্তু বালক আরও সরিয়া বলিল, "না, সে সুখ তোমার পরজন্মের জন্য রাখিলাম। আসি।" এই বলিয়া অন্ধকার রজনীতে বালক কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। হরিমোহন নূপুর-ধ্বনি শুনিতে শুনিতে জাগিয়া উঠিল। জাগিয়া ভাবিল, "এ কি রকম স্বপ্ন দেখিলাম! নরক দেখিলাম, স্বর্গ দেখিলাম, তাহার মধ্যে ভগবানকে তুই বলিলাম, ছোট ছেলে ব্ৰায়া কত ধমক দিলাম। কি পাপ! যা হোক, প্ৰাণে বেশ শান্তি অনুজৰ করিতেছি ।" হরিমোহন তখন কৃষ্ণবর্ণ বালকের মোহন মৃতি ভাবিতে বসিল এবং মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল, "কি সুন্দর! কি সুন্দর!"

ক্ষমার আদর্শ

চন্দ্র ধীর গতিতে মেঘের কোলের ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। নীচে নদী কুল কুল শব্দে বায়ুর সঙ্গে সুর মিশাইয়া নাচিতে নাচিতে বহিয়া যাইতেছিল। আধ জোছনা আধ অন্ধকারে মিশিয়া পৃথিবীর সৌন্দর্য্য অপূর্ব দেখাইতেছিল। চারিদিকে ঋষির আশ্রম। এক একটি আশ্রম নন্দন-বনকে ধিক্কার প্রদান করিতে-ছিল। এক একখানি ঋষির কুটির তরু, পুজা ও রক্ষলতা শোভিত হইয়া অপূৰ্ব প্রী ধারণ করিয়াছিল। একদিন এইরূপ জ্যোৎস্বাপুলকিত রাত্তে রক্ষয়ি বশিষ্ঠদেব সহধশ্মিণী অরুদ্ধতী দেবীকে বলিতেছিলেন, "দেবী, ঋষি বিশ্বামিত্রের নিকট হুইতে একটু লবণ ভিক্ষা করিয়া আন।" এই প্রশ্নে অরুন্ধতী দেবী বিদিমত হুইয়া জিজাসা করিলেন "প্রভু. এ কি আজা করিতেছেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ৷ যে আমার শতপুত্র হইতে বঞ্চিত করিয়াছে——" এই কথা বলিতে বলিতে দেবীর সূর অশুচপূর্ণ হইয়া উঠিল, সমস্ত পূর্বসমৃতি জাগিয়া উঠিল, সে অপূর্ব শান্তির আলয় গভীর হাদয় ব্যথিত হইল, তিনি বলিতে লাগিলেন,—-"আমার শতপুত্র এই জোছনাশোভিত রাত্রে বেদগান করিয়া বেড়াইত, শতপুত্রই আমার বেদ্ভ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, আমার এইরূপ শতপুত্রই সে বিন্দট করিয়াছে; তাহার আশ্রম হইতে আমাকে লবণ ভিক্ষা করিয়া আনিতে বলিতেছেন ? আমি কিংকর্ভব্যবিমূঢ় হইয়াছি।" ধীরে ধীরে ঋষির মখ জ্যোতিপূর্ণ হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে সাগরোপম হাদয় হইতে এই কয়টি বাক্য নিস্ত হইল,—"দেবী, আমি তাহাকে যে ভালবাসি।"অুকুক্কতীর বিসময় আরও বৃদ্ধিত হইল, তিনি ব্লিলেন, "আপনি যদি তাহাকে ভালবাসেন ত তাহাকে 'রক্ষষি' বলিয়া সম্বোধন করিলেই তো জঞাল মিটিয়া যাইত, আমাকেও শতপুত্র হইতে বঞ্চিত হইতে হইত না।" ঋষির মুখ অপূৰ্ব শ্ৰী ধারণ করিল,বলিলেন, "তাহাকে ভালবাসি বলিয়াই ত তাহাকে ব্ৰহ্মষি বলি নাই, আমি তাহাকে ব্রহ্মীষ বলি নাই বলিয়াই তাহার ব্রহ্মীষ হইবার আশা আছে।"

আজ বিশ্বামিত্ব ক্রোধে জানশূন্য। আজ আর তাঁহার তপস্যায় মনোনিবেশ হইতেছে না। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছেন আজ যদি বশিষ্ঠ তাঁহাকে ব্রহ্মষি না বলেন তাহা হইলে তাঁহার প্রাণ সংহার করিবেন। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি তরবারি হস্তে কুটির হইতে বহিগত হইলেন। ধীরে ধীরে বশিষ্ঠদেবের কুটির পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বশিষ্ঠদেবের সমস্ত কথা শুনিলেন। মুণ্টিবদ্ধ তরবারি হস্তে শিথিল হইয়া পড়িল। ভাবিলেন, "কি ক্রিয়াছি, না জানিয়া কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, না জানিয়া কাহার

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

১৮

নিশ্বিকার চিত্তে বাথা দিতে চেম্টা করিয়াছি।" হাদয়ে শত রুশ্চিক দংশন যন্ত্রণা অনুভূত হইল। অনুতাপে হাদয় দংধ হইতে লাগিল। দৌড়িয়া গিয়া বশিঠের পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। কিছুক্ষণ বাক্যসফূতি হইল না, ক্ষণপরে বলিলেন,— "ক্ষমা করুন, কিন্তু আমি ক্ষমাভিক্ষারও অযোগ্য।" গশ্বিত হাদয় অন্য কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু বশিষ্ঠ কি করিলেন ? বশিষ্ঠ দুই হাত দিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন, "উঠ, রক্ষয়ি উঠ।" দিওণ লজ্জায় বিশ্বামিত্র বলিলেন, "প্রভু, কেন লজ্জা দেন।" বশিষ্ঠদেব উত্তর করিলেন, "আমি কখনও মিথ্যা বলি না--আজ তুমি ব্রহ্মমি হইয়াছ, আজ তুমি অভিমান ত্যাগ করিয়াছ। আজ তুমি ব্রহ্মমি-পদ লাভ করিয়াছ।" বিশ্বামিত বলিলেন, "আমাকে আপনি ব্রহ্মজান শিক্ষা দিন।" বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন, "অনন্তদেবের নিকট যাও, তিনিই তোমাকে ব্রহ্মজান শিক্ষা দিবেন।" অনন্তদেব যেখানে পৃথিবী মন্তকে ধরিয়া আছেন বিশ্বামিত্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনস্তদেব বলিলেন, "আমি তোমায় ব্ৰহ্মজান শিক্ষা দিতে পারি যদি তুমি এই পৃথিবী মস্তকে ধারণ করিতে পার।" তপোবলে গণিবত বিশ্বামিত্র বলিলেন, "আপনি পথিবী ত্যাগ করুন আমি মন্তকে ধারণ করিতেছি।" অনন্তদেব বলিলেন, "ধারণ কর, আমি ত্যাগ করিলাম।" শূন্যে পৃথিবী ঘূরিতে ঘূরিতে পড়িতে লাগিল।

বিশ্বমিত্র ডাকিয়া বলিতেছেন, "আমি সমস্ত তপস্যার ফল অর্পণ করিতেছি পৃথিবী ধৃত হউক— ।" তথাপি পৃথিবী স্থির হইল না । উচ্চৈঃস্বরে অনন্তদেব বলিলেন, "বিশ্বামিত্র এত তপস্যা কর নাই যে পৃথিবী ধারণ করিবে, কখনও কি সাধুসঙ্গ করিয়াছ ? তাহার ফল অর্পণ কর।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "এক মুহুর্ড বশিষ্ঠের সঙ্গ করিয়াছি।" অনন্তদেব বলিলেন, "তবে সেই ফল অর্পণ কর।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "আমি সেই ফল অর্পণ করিতেছি।" ধীরে ধীরে পৃথিবী স্থির হইল। তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন, "এখন আমায় ব্ৰহ্মজ্ঞান দিন।" অন্তদেব বলিলেন, "মুর্খ বিখামিত যাঁর এক মুহুর্ড সঙ্গফলে পৃথিবী ধৃত হইল তাঁহাকে ছাডিয়া আমার নিকট ব্রহ্মজান চাহিতেছ ?" বিশ্বামিরের ক্রোধ হইল, ভাবিলেন বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে তবে প্রতারণা করিয়াছেন। দুত তাঁহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "আপনি আমায় কেন প্রতারণা করিলেন ?" বশিষ্ঠদেব অতি ধীর গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "আমি যদি তখন তোময়ে ব্রহ্মজান শিক্ষা দিতাম, তোমার তাহাতে বিশ্বাস হইত না, এখন তোমার বিশ্বাস হইবে।" বিশ্বামিল বশিষ্ঠের নিকট ব্রহ্মজান শিক্ষা করিলেন। ভারতে এমন ঋষি ছিলেন, এমন সাধ্ ছিলেন, এমন ক্ষমার আদর্শ ছিল। এমন তপস্যার বল ছিল যাহা দারা পৃথিবী ধারণ করা যায়। ভারতে আবার সেইরূপে ঋষি জন্মগ্রহণ করিতেছেন যাঁহাদের প্রভায় পৃশ্বতন ঋষিদিগের জ্যোতি হীনপ্রভ হইয়া যাইবে, যাঁহারা আবার ভারতকে পৃ^{ৰু}ৰ্বগৌরৰ হইতে অধিকতর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

THE VEDA বৈদ

বেদ রহস্য

বেদসংহিতা ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সভ্যতা ও অধ্যাত্মভানের সনাতন উৎস। কিন্তু এই উৎসের মূল অগম্য পর্বতের গুহায় নিলীন, তাহার প্রথম স্রোতও অতি প্রাচীন ঘনকন্টকময় অরণ্যে পুষ্পিত রক্ষলতা ও গুলেমর বিচিত্র (আবরণে) আরত। বেদ রহস্যময়। ভাষা, কথার ভঙ্গী, চিন্তার গতি অন্য যুগের সৃষ্টি, অন্য ধরণের মনুষ্যবুদ্ধিসভূত। এক পক্ষে অতি সরল, যেন নিম্মল সবেগ পর্বতনদীর প্রবাহ, অথচ এই চিন্তাপ্রণালী আমাদের এমনই জটিল বোধ হয়, এই ভাষার অর্থ এমনই সন্দিশ্ব যে মূল চিন্তা ও ছত্তে হত্তে ব্যবহৃত সামান্য কথাও লইয়া প্রাচীনকাল হইতে তর্ক ও মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। পরম পণ্ডিত সায়নাচার্য্যের টীকাপড়িয়া মনে এই ধারণা উৎপন্ন হয় যে বেদের কখনই কোনও সংলগ্ন অর্থ ছিল না, নয় যাহা ছিল তাহা বেদের পরবর্তী ব্রাহ্মণেরচনার অনেক আগে সর্ব্বপ্রাসী কালের অতল বিস্মৃতি–সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল।

সায়ন বেদের অর্থ করিতে গিয়া মহা বিদ্রাটে পড়িয়াছেন। যেন (কেহ) এই ঘোর অন্ধকারে মিথ্যা আলোকের পিছনে দাঁড়াইয়া বার বার আছাড় খায়, গর্ষ্তে পক্ষে ময়লা জলে পড়ে, হয়রাণ হইয়া যায়, অথচ ছাড়িতেও পারে না। আর্য্যাধিশের আসল পুস্তক, অর্থ করিতেই হয়, কিন্তু এমন হেঁয়ালির কথা, এমন রহস্যাময় নানা নিগৃছ চিন্তার জড়িত সংশ্লেষণ যে সহন্ত স্থলে অর্থই করা হয় না, যেখানে কোনও রকমেই অর্থ হয় সেখানেও প্রায়ই সন্দেহের ছায়া আসিয়া পড়ে। এই সঙ্কটে অনেক বার সায়ন নিরাশ হইয়া ঋষিদের মুখে এমন ব্যাকরণের বিরোধী ভাষা, এমন কুটিল জড়িত ভয় বাক্যরচনা, এমন বিক্ষিণত অসংলয় চিন্তা আরোপ করিয়াছেন যে তাঁহার টীকা পড়িয়া এই ভাষা ও চিন্তাকে আর্য্য না বলিয়া বর্ণ্বরের বা উন্মন্তের প্রলাপ বলিতে প্রবৃত্তি হয়। সায়নের দোষ নাই। প্রাচীন নিরুক্তকার যাক্ষও তদুপ বিল্লাট করিয়াছেন আর যাক্ষের অনেক পূর্ণ্ববর্তী ব্রান্ধণকারও বেদের সরল অর্থ না পাইয়া কল্বনার সাহায্যে mythopoeic faculty—র আশ্রয়ে দুরাহ ঋক্গুলির ব্যাখ্যা করিবার বিফল চেন্টা করিয়াছেন।

ঐতিহাসিকেরা এই প্রপালী অনুসরণ করিয়া নানান কল্পিত ইতিহাসের আড়ম্বরে বেদের সুকৃত সরল অর্থ বিকৃত ও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন। একটি উদাহরণে এই অর্থ-বিকৃতির ধরণ ও মাল্রা বোঝা যাইবে। পঞ্চম মণ্ডলের দিতীয় সুক্তে অগ্নির নিম্পেষিত বা ছাপান (গুছিত) অবস্থা আর অতি-বিলম্বে তাহার রহৎ প্রকাশের কথা আছে। "কুমারং মাতা যুবতিঃ সমুন্ধং গুহা বিভৃত্তিন দদাতি পিলে।—কমেতং তুং যুবতে কুমারং পেষী বিভৃষি মহিষী জজান।

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

২২

পবীহি গর্ভঃ শরদের ববর্ধহপশ্যং জাতং যদসূত মাতা।" ইহার অর্থ, "যুবতী মাতা কুমারকে ছাপান রাখিয়া ভহায় অথাৎ ভণ্ত স্থানে নিজ জঠরে বহন করেন, পিতাকে দিতে চান না। হে যুবতী, এই কুমার কে, যাহাকে তুমি সম্পিল্ট হইয়া অর্থাৎ তোমার সঙ্গুচিত অবস্থায় নিজের ভিতরে বহন কর ? মাতা যখন সঙ্গুচিত অবস্থা ছাড়িয়া মহতী হয়, তখন কুমারকে জন্ম দেন। অনেক বৎসর ধরিয়া গভঁস্থ শিশু রুদ্ধি পাইয়াছে, যখন মাতা তাহাকে প্রসব করিলেন, তখন তাহাকে দেখিতে পাইলাম ৷" বেদের ভাষা সব্বএই একটু ঘন, সংহত, সারবান, অল্প কথায় বিস্তর অর্থ প্রকট করিতে চায়, ইহা সত্ত্বেও অর্থের সরলতা, চিন্তার সামঞ্জস্যের হানি হয় না। ঐতিহাসিকেরা সূজের এই সরল অর্থ বৃঝিতে পারেন নাই, যখন মাতা পেষী তখন কুমারং সমূব্ধং, মাতার সম্পিষ্ট অর্থাৎ সঙ্গুচিত অবস্থায় কুমারেরও নিজিপট অর্থাৎ ছাপান অবস্থা হয়, ঋষির ভাষা ও চিন্তার এই সামঞ্জস্য লক্ষ্য কিম্বা হাদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাঁহারা পেষী দেখিয়া পিশাচী বঝিলেন, ভাবিলেন কোনও পিশাচী অগ্নির তেজ হরণ করিয়াছে, মহিষী দেখিয়া রাজার মহিষী বুঝিলেন, কুমারং সম্বধং দেখিয়া কোনও বাহ্মণকুমার রথের চাকায় নিম্পেষিত হইয়া মরিয়াছে ইহাই বুঝিলেন। এই অর্থে বেশ একটা লাসা আখ্যায়িকাও স্পিট হইল। ফলে সোজা ঋকের অর্থ দুরাহ হইয়া গেল, কুমার কে, জননী কে, পিশাচী কে, অগ্নির না ব্রাহ্মণকুমারের গল্প হইতেছে, কে কাহাকে কি বিষয়ে কথা বলিতেছে, সব গণ্ডগোল। সব্বগ্রই এইরূপ অত্যাচার, অযথা কল্পনার দৌরাত্মে বেদের প্রাঞ্জল অথচ গভীর অর্থ বিকৃত বিকলাস হইয়া পড়িয়াছে, অন্যত্র যেখানে ভাষা ও চিভা একটু জটিল, টীকাকারের কৃপায় দুব্বোধাতা ভীষণ অস্পূশ্য মূত্তি ধারণ করিয়াছে।

স্বতন্ত স্বতন্ত স্থাক্ বা উপমা কেন, বেদের আসল মশ্ম লইয়া অতি প্রাচীন কালেও বিস্তর মতভেদ ছিল। গ্রীসদেশীয় মুহেমেরের (Euhemeros) মতে গ্রীকজাতির দেবতারা চিরসমরণীয় বীর ও রাজা ছিল, কালে অন্য প্রকার কুসংস্কারে ও কবির উদ্দাম কল্পনায় দেবতা বানাইয়া স্বর্গে সিংহাসনারাত্ করা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতেও য়ুহেমের-পন্থীর অভাব ছিল না। দৃষ্টাভ স্বরূপ ভাহারা বলিত আসলে অখিদয় দেবতাও নয়, নক্ষত্রও নয়, বিখ্যাত দুইজন রাজা ছিলেন, আমাদেরই মত রজমাংসের মানুষ, তবে যদি মৃত্যুর পরে দেবভাবাপর অপরের মতে সবই Solar myth, অর্থাৎ সূর্য্য চন্দ্র আকাশ হয় 🖡 তারা বৃষ্টি ইত্যাদি বাহ্য প্রকৃতির ক্রীড়াকে কবিকল্পিত নামরূপে সাজাইয়া মনুষ্যাকৃতি দেবতা করা হইয়াছে । বৃত্ত মেঘ, বলও মেঘ, আর যত দস্যু দানব দৈত্য আকাশের মেঘ মাত্র, বৃপ্টির দেবতা ইন্দ্র এইসকল সূর্যাকিরণের অব-রোধকারী জলবর্ষণে বিমুখ কুপণ জলধরকে বিদ্ধ করিয়া বৃষ্টিদানে পঞ্চনদের সংতনদীর অবাধ স্রোতঃ-স্জনে ভূমিকে উকারা, আহাকে ধনী ও ঐশ্বর্গশালী করিয়া তোলেন। অথবা ইন্দ্র মিত্র অর্থ্যমা ভগ বরুণ বিষ্ণু সবাই সূর্য্যের নাম-রাপ মাত্র, মিত্র দিনের দেবতা, বরুণ রাত্রির, ঋভুগণ ঘাঁহারা মনের বলে ইন্দের অধ্ব অধিদয়ের রথ নির্মাণ করেন, তাঁহারাও আর কিছুই নন, সূর্যোর কিরণ। অপর দিকে অসংখ্য গোঁড়া বৈদিকও ছিল, তাহারা কম্মকাণ্ডী ritualist । তাহারা বলে দেবতা মনুষ্যাকৃতি দেবতাই বটে, প্রাকৃতিক শক্তির সর্বব্যাপী শক্তিধরও বটে, অপিন একসময়েই বিগ্রহ্বান দেবতা এবং বেদীর আশুন, পাথিব অপিন, বাড়বানল ও বিদ্যুৎ এই তিন মূন্তিতে প্রকৃতিত, সরস্বতী নদীও বটে দেবীও বটে, ইত্যাদি । ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে দেবতারা স্তবস্তুতিতে সম্ভুত্ট হইয়া পরলোকে স্থর্গদান, ইহলোকে বল, পুরু, গাভী, অশ্ব, অল্ল ও বল্প দান করেন, শক্তুকে সংহার করেন, স্থাতার বেআদেবী নিন্দুক সমালোচকের মাথা বজাঘাতে চুর্ণ করেন, ইত্যাদি শুভ মিন্তকার্য্য সম্পন্ন করিতে সর্ব্দা ব্যস্ত হন। প্রাচীন ভারতে এই মতই প্রবল ছিল।

তথাপি এমন চিভাশীল লোকের অভাব ছিল না যাঁহারা বেদের বেদছে, ঋষির প্রকৃত ঋষিত্বে আস্থাবান ছিলেন, ঋকসংহিতার আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিতেন, বেদে বেদান্তের মূল তত্ব খুঁজিতেন। তাঁহাদের মতে ঋষিরা দেবতার নিকট যে জ্যোতিন্দান প্রার্থনা করিতেন, সে ভৌতিক সূর্য্যের নয়, জ্ঞান-সূর্যোর, গায়ত্মী-মজ্রোক্ত সূর্যোর, বিশ্বামিন্ত যাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। এই জ্যোতি সেই "তৎসবিতুর্বরেণ্যং দেবস্য ভর্গঃ" এই দেবতা ইনি, "যো নো ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ," যিনি আমাদের সকল চিন্তা সত্যতত্ত্বের দিকে প্রেরিত করেন। ঋষিরা তমঃ ভয় করিতেন—রান্তির নহে, কিন্তু অজ্ঞানের সেই ঘোর তিমির। ইন্তু জীবাজ্মা বা প্রাপ; ব্রু মেঘও নয়, কবিকল্পিত অসুরও নয়—যাহা আমাদের পুরুষার্থকে ঘোর অজ্ঞানের অন্ধকারে আবৃত করিয়া রোধ করে, যাহার মধ্যে দেবগণ অপ্রে নিহিত ও লুপ্ত হইয়া, (পরে) দেববাক্যজনিত উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে নিস্তারিত ও প্রকট হন, তাহাই বৃত্ত। সায়নাচার্য্য ইহাদের "আত্মবিদ" নামে অভিহিত করিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাদের বেদব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন।

এই আশ্ববিদ্কৃত ব্যাখ্যার দৃষ্টান্তস্বরাপ রহূগণ পুত্র গোতম ঋষির মরুৎন্তোর (উল্লেখ) করা যায়। সেই সূজে গোতম মরুদ্গণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের নিক্ট "জ্যোতি" ভিক্ষা করিয়াছেন—

> যূয়ং তৎ সত্যশবস আবিষ্ণ্ড মহিত্বনা বিধ্যতা বিদ্যুতা রক্ষঃ ॥ গূহতা গুহুং তমো বিযাত বিশ্বমন্ত্রিণম্ জ্যোতিষ্কর্ডা যদুশমসি ॥ ১-৮৬-৯,১৫

কর্ম্মকাগুনিরে মতে এই ঋক্ষয়ের ব্যাখ্যায় জ্যোতিকে ভৌতিক সূর্যোরই জ্যোতি বৃঝিতে হয়। "যে রক্ষঃ সূর্যোর আলোককে অন্ধকারে ঢাকিয়া। ফেলিয়াছে, মরুদ্গণ সে-রক্ষকে বিনাশ করিয়া সূর্যোর জ্যোতি পুনঃ দৃষ্টিগোচর করুন।" আমবিদের মতে অন্যরূপ অর্থ করা উচিত, যেমন, "তোমরা সত্যের বলে বলী, তোমাদের মহিমায় সেই প্রমতভ্বপ্রকাশিত হোক, ভোমাদের বিদ্যুৎসম আলোকে রক্ষকে বিদ্ধা কর। হাদ্রূপ গুহায় প্রতিষ্ঠিত অন্ধকার গোপন কর, অর্থাৎ সেই

অন্ধকার যেন সত্যের আলোকবন্যায় নিমখন, অদৃশ্য হইয়া যায়। পুরুষার্থের সকল ভক্ষককে অপসারিত করিয়া আমরা যে জ্যোতি চাই, তাহা প্রকটিত কর।" এখানে মরুদ্গণ মেঘহন্তা বায়ু নহেন, পঞ্চপ্রাণ। তমঃ হাদয়গত ভাবরূপ অন্ধকার, পুরুষার্থের ভক্ষক ষড় রিপু, জ্যোতিঃ পরম তত্ত্বসাক্ষাৎরূপ জানের আলোক। এই ব্যাখ্যায় অধ্যাত্মতত্ত্ব, বেদান্তের মূলকথা, রাজ্যোগের প্রাণায়াম-প্রণালী একযোগে বেদে পাওয়া গেল।

এই গেল বেদে স্বদেশী বিদ্রাট। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কোমর বাঁধিয়া আসরে নামায় এই ক্ষেত্রে ঘোরতর বিদেশী বিদ্রাটও ঘটিয়াছে। সেই বন্যার বিপুল তরজে আমরা আজ পর্য্যন্ত হাবুড়ুবু খাইয়া ভাসিতেছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রাচীন নিরুক্তকার ও ঐতিহাসিকদের পুরোন ভিত্তির উপরেই নিজ চকচকে নব কল্পনা–মন্দির নিশ্মাণ করিয়াছেন ৷ তাঁহারা যাক্ষের নিরুক্ত তত মানেন না, বালিন ও পেল্লগ্রাদে নবীন মনোনীত নিরুক্ত তৈয়ারি করিয়া তাহারই সাহায্যে বেদের ব্যাখ্যা করেন। সেই প্রাচীন ভারতব্যীয় টীকা<mark>কারদে</mark>র myth∹এর বিচিত্র নবমূতি বানাইয়া, প্রাচীন রঙের উপর নূতন রং ফলাইয়া এই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়াছেন। এই য়ুরোপীয় মতেও বেদোক্ত দেবতা বাহ্য প্রকৃতির নানা ক্রীড়ার রূপক মাজ ৷ আর্য্যেরা সূর্য্য চন্দ্র তারা নক্ষত্র ঊষা রাত্রি বায়ু ঝটিকা খাল নদী সমুদ্র পব্বতি বৃক্ষ ইত্যাদি দৃশ্যবস্তর পূজা করিতেন। এই সকলকে দেখিয়া বিসময়ে অভিভূত বর্কর জাতি এইগুলির বিচিত্র গতিকে কবির রূপকচ্ছলে স্তব করিত। আবার তাহারই মধ্যে নানা দেবতার চৈত্ন্যময় ক্রিয়া বুঝিয়া সেই শক্তিথরের সঙ্গে সখ্য স্থাপন ও তাঁহাদের নিকট যুদ্ধে বিজয়লাভ ধনদৌলত দীর্ঘজীবন আরোগ্য ও সম্ভতি কামনা করিতেন, রাল্লির অন্ধকারে বড় ভীত হইয়া যাগযঞ্জে সূর্য্যের পুনরুদ্ধার করিতেন ৷ ভূতেরও আতঙ্ক ছিল, ভূত তাড়াইবার জন্য দেবতার নিকটে কাতরোজি করিতেন। যজে স্বৰ্গলাভের আশা ও প্ৰবল (ইচ্ছা) ইত্যাদি ইত্যাদি প্ৰাগৈতিহাসিক বৰ্ষরের উচিত ধারণা ও কুসংস্কার।

যুদ্ধে বিজয়লাভ, যুদ্ধ কাহার সঙ্গে ? ইহারা বলেন, পঞ্চনদনিবাসী আর্যা-জাতির সমর আসল ভারতবাসী দ্রাবিড়জাতির সঙ্গে, আর প্রতিবেশীদের মধ্যে যে যুদ্ধবিগ্রহ সতত ঘটিয়া আসে, সেই আর্যাতে আর্যাতে ভিতরের কলহ। যেমন প্রাচীন ঐতিহাসিক বেদের স্বতন্ত স্বতন্ত ঋক্ বা সূক্তকে আধার করিয়া নানান ইতিহাস গঠন করিতেন, ইহাদেরও ঠিক সেই প্রণালী। তবে বিচিত্র অতিপ্রাকৃতঘটনায় ভরা বিচিত্র গল্প না বানাইয়া, জার (জরপুত্র) বৃষ ঋষির সারথ্যে ব্রাহ্মণকুমারের রথচক্রে নিম্পেষণ, মন্তপ্রয়োগে পুনজীবন দান, পিশাচীকৃত অপিনতজের হরণ ইত্যাদি ইত্যাদি অভুত কল্পনা না করিয়া আর্যা ত্রিৎসুরাজ সুদাসের সঙ্গে মিশ্রজাতীয় দশজন রাজার যুদ্ধ, একদিকে বশিষ্ঠ অপরদিকে বিশ্বামিত্তের পৌরোহিত্য, পর্বেতগুহানিবাসী দ্রাবিড় জাতি দ্বারা আর্য্যদের গাভী হরণ ও নদীর স্রোত বন্ধন, দেবগুনি সরমার উপমা-ছলে দ্রাবিড়দের নিকট আর্য্যদৌত্য বা

রাজদৃতী প্রেরণ, প্রভৃতি সত্য বা মিথ্যা সম্ভব ঘটনা লইয়া প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লিখিতে চেপ্টা করেন। এই প্রাকৃতিক ক্রীভার পরস্পর-বিরোধী রূপকের আর তাহার সঙ্গে এই ইতিহাস সম্বন্ধী রূপকের মিল্ল করিছে গিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিত্তন্যগুলী বেদের যে অপূর্ব্ব গোল করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। তবে তাঁহারা বলেন না কি, আমরা কি করিব, প্রাচীন বর্বর কবিদের মন গোলমেলে ছিল, সেই জন্যই এইরাপ গোঁজামিল করিতে হইয়াছে, আমাদের ব্যাখ্যা কিন্তু ঠিক, খাঁটি, নির্ভুল। সে যাহাই হৌক, ফলে প্রাচ্য পণ্ডিতদের ব্যাখ্যায় বেদের অর্থ ফেমন অসংলগ্ন গোলমেলে দুরাহ ও জটিল হইয়াছিল, পশ্চোতাদের ব্যাখ্যায় সেইরূপই রহিয়াছে। সবই বদলাইয়াছে, অথচ সবই সমান। টেমস, সেন (Seine) ও নেবা (Neva) নদীর শত শত বজ্রধর আমাদের মন্তকের উপর নব পাণ্ডিত্যের স্বর্গীয় সপ্তনদী বর্ষণ করিয়াছেন সত্য, তাঁহাদের কেহও বৃত্তরুত অন্ধকার সরাইতে পারেন নাই। আমরা যেই তিমিরে, সেই তিমিরে।

তপোদেব অগিন

এই যজে জীবই যজমান, গৃহস্থামী, জীবের প্রকৃতি গৃহপত্নী, যজমানের সহধন্মিনী, কিন্তু পুরোহিত কে হইবে ? জীব যদি স্বয়ং স্বয়জের পৌরোহিত্য সম্পাদন করিতে ষয়ে, যক্ত সূচারুরূপে পরিচালিত হইবার আশা নাই-ই বলা যায় ; কারণ জীব অহঙ্কার দ্বারা চালিত, মানসিক প্রাণিক ও দৈহিক ত্রিবিধ বন্ধনে জড়িত। এই অবস্থায় **স্থপৌরোহি**ত্য গ্রহণ করায় অহকার**ই হোতা** ঋত্বিক এমন কি যজের দেবতা সাজে, তাহা হইলে অবৈধ যজেবিধানে মহৎ অনর্থ ঘটিবার আশঙ্কা। প্রথমে নিতান্ত বন্ধ অবস্থা হইতে সে মুক্তি চায়। আর যদি বন্ধনমুক্ত হইতে হয়, স্বশক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির আশ্রয় লইতেই হইবে। প্রিবিধ যুপরজ্জুর শিথিলীকরণের পরেও যজ চালাইবার মত নিম্পোষ জান ও শক্তি হঠাৎ প্রাদুর্ভূত বা সত্বরে সুগঠিত হয় না। দিব্য জ্ঞান ও দিব্য শক্তির প্রয়োজন, তাহার যক্ত দ্বারা**ই** আবির্ভাব ও সুগঠন সভব। আর জীব মুক্ত হইলেও, দিব্যঞ্জানী ও দিব্যশক্তিমান হইলেও যজের ভর্তা অনুমন্তা ঈশ্বরও যজফলের ভোজা হয়, কিন্তু কম্মকর্তা হয় না। দেবতাকেই পুরোহিতরূপে বরণ করিয়া বেদের উপর সংস্থাপিত করিতে হইবে। দেবতা স্বয়ং মানব হৃদয়ে প্রবিষ্ট **প্রকা**শিত ও প্রতি**ঠিত** না হওয়া পর্য্যন্ত মানবের পক্ষে দেবজ ও অমরজ অসাধ্য, সত্য বটে দেবতা জাগ্রত হওয়ার আগে সেই বোধনার্থে মন্তদ্রভটা ঋষিগণ যজমানের পৌরোহিত্য স্থীকার করেন, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র সুদাস ভূসদস্যু ও ভরতপুত্রের হোতা হন। কিন্তু দেবতাকে আহশন করিয়া বেদীর উপরে পুরোহিত ও হোতার স্থান দিবার জনোই সেই মন্ত-প্রয়োগ ও হবিঃপ্রয়োগ। দেবতা অন্তরে জাগ্রত না হইলে কেহ জীবকে তরণ করিতে পারে না। দেবতাই ল্লাণকর্তা। দেরতাই যক্তের একমাল্ল সিদ্ধিদাতা পুরোহিত।

দেবতা যখন পুরোহিত হন তখন তাঁহার নাম অগ্নি, তাঁহার রূপও অগ্নি। অগ্নির পৌরোহিত্য সক্রিসুন্দর সফল যজের মুখ্য উপায় ও প্রার্ভ। এইজন্যই ঋণ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম স্ভের প্রথম ঋকে অগ্নির পৌরোহিত্য নিশিদ্ভট করা হইয়াছে।

এই অগ্নি কে? অগ্ ধাতুর অর্থ শক্তি, যিনি শক্তিমান তিনি অগ্নি। আবার অগ্ ধাতুর অর্থ আলোক বা দ্বালা, যে-শক্তি দ্বলন্ত জানের আলোকে উদ্ভাসিত, জানের কম্মবল স্থারূপ, সেই শক্তির শক্তিধর অগ্নিরূপ। আবার অগ্ ধাতুর অন্য অর্থ পূর্বাত্ব ও প্রধানত্ব, যে-জানময় শক্তি দগতের আদিতত্ব হইয়া দ্বগতের অভিব্যক্ত সকল শক্তির মূল ও প্রধান, সেই শক্তির শক্তিধর অগিন। আবার অগ্
ধাতুর অর্থ নয়ন (প্রচালন), জগতাদি সনাতন পুরাতন প্রধান শক্তির যে শক্তিধর
জগৎকে নির্দিদ্দট পথে নির্দিদ্দট গন্তব্যধামের দিকে লইয়া অগ্রসের হইতেছেন,
যে কুমার দেবসেনার সেনানী, যিনি পথে প্রদর্শক, যিনি প্রকৃতির নানা শক্তিকে
জানে বলে স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্তিত করিয়া সুপথে চালিত করেন, সেই শক্তিধর
অগিন। বেদের শত শত সূক্তে অগিনর এই সকল গুণ ব্যক্ত স্তত হইয়াছে। জগতের
আদি, জগতের প্রত্যেক স্ফুরণে নিহিত, সকল শক্তির মূল ও প্রধান, সকল দেবতার
আধার, সকল ধশ্মের নিয়ামক, জগতের নিগৃত উদ্দেশ্য ও নিগৃত সত্যের রক্ষক
এই অগিন আর কিছুই নন, ভগবানের ওজঃ-তেজঃ-ভ্রাজঃ-স্বরূপ সর্বব্রুনামিণ্ডিত
পরম-জানাত্মক তপঃশক্তি।

সচিচদানন্দের সৎতত্ত্ব চিন্ময় । এই যে সতের চিৎ, সে-ই আবার সতের শক্তি । চিৎশক্তিই জগতের আধার, চিৎশক্তিই জগতের আদিকারণ ও স্রন্টা, চিৎশক্তিই জগতের নিয়ামক ও প্রাণস্থরাপ । চিন্ময়ী যখন সৎপুরুষের বক্ষস্থলে মুখ লুকাইয়া স্তিমিতলোচনে কেবল সতের স্থরাপ চিন্তায়ী যখন সংপুরুষের বক্ষস্থলে মুখ লুকাইয়া স্তিমিতলোচনে কেবল সতের স্থরাপ চিন্তায়ী বাখন তানার বাখন চিন্ময়ী মুখ তুলিয়া নয়ন উন্মীলন করিয়া সৎপুরুষের মুখ ও তনু সপ্রেমে দেখেন, সৎপুরুষের অনন্ত নাম ও রূপ ধ্যান করেন, কৃত্রিম বিচ্ছেদ-মিলন জনিত সম্ভোগের লীলা সমরণ করেন, তখন সেই আনন্দের অজস্ত্র প্রবাহ তাহার উন্মন্ত বিক্ষোভ বিশ্বানন্দের অনন্ত তরঙ্গ সৃষ্টি করে। চিৎশক্তির এই নানা ধ্যান এই এক-মুখী অথচ বহুমুখী সমাধিই তপঃশক্তির নামে অভিহিত। সৎপুরুষ যখন তাঁহার চিৎশক্তিকে কোনও নামরূপসূজন, কোনও তত্ত্ববিকাশ, কোনও অবস্থাপ্রাপিতর উন্দেশ্যে সংগৃহীত, সঞ্চালিত, শ্ববিষয়ের উপর সংস্থাপিত করেন, তখন তপঃশক্তির প্রয়োগ হয়। এই তপঃপ্রয়োগই যোগেশ্বরের যোগ। ইহাকেই ইংরাজীতে Divine Will বা Cosmic Will বলে । এই Divine Will বা তপঃশক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্ট, চালিত, রক্ষিত হয়। অন্নিই এই তপঃ।

চিৎশক্তির দুই দিক দেখি, চিনায় ও তপোময়, সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিস্বরূপ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুইটিই এক। ভগবানের জ্ঞান সর্ব্বশক্তিময়, তাঁহার শক্তি সর্ব্বজ্ঞানময়। তিনি আলোকজ্ঞান করিলেই আলোকস্থিট অনিবার্যা, কারণ তাঁহার জ্ঞান তাঁহার শক্তির চিনায় স্বরূপ মাত্র। আবার জগতের যে কোন জড়স্পন্দনেও, যেমন অণুর নৃত্যে বা বিদ্যুতের লম্ফনে, জ্ঞান নিহিত, কারণ তাঁহার শক্তি তাঁহার জ্ঞানের স্ফুরণ মাত্র। কেবল আমাদের মধ্যে অবিদ্যার ভেদবৃদ্ধিতে, অপরা প্রকৃতির ভেদগতিতে, জ্ঞান ও শক্তি বিভিন্ন অসম ও পরস্পরে যেন কলহপ্রিয় বা অমিলে ক্লিপ্ট ও খব্বীকৃত হইয়া পড়িয়াছে অথবা ক্লীড়ার্থে সেইরূপ অসমতা ও কোন্দলের চং করে। প্রকৃতপক্ষে জগতের ক্ষুদ্রতম কর্ম্মবা সঞ্চারে জগবানের সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বশক্তি নিহিত, ইহার ব্যতিরেকে বা ইহার কমেতে সে কর্ম্মবা সঞ্চার ঘটাইবার কাহারও শক্তি নাই। যেমন ঋষির বেদ-

বাক্যে বা শক্তিধর মহাপুরুষের যুগপ্রবর্তনে, তেমনি মূর্খের নির্থক বাচালতায় বা আক্রান্ত ক্ষুদ্র কীটের ছট্ফটানিতে এই সক্রজান ও সক্রশক্তি প্রযুক্ত হয়। তুমি আমি যখন জানের অভাবে শক্তির অপচয় করি বা শক্তির অভাবে জানের নিখ্নল প্রয়োগ করি, সর্ব্বজানী সর্ব্শক্তিমান আড়ালে বসিয়া সেই শক্তিপ্রয়োগকে তাঁহার জান দারা, সেই জানপ্রয়োগকে তাঁহার শক্তিদারা সামলান ও চালান বলিয়া সেই ক্ষুদ্র চেপ্টায় জগতে একটা কিছু হয়। নিদিদ্দট কম্ম হইয়া উঠিল, তাহার উচিত কম্মফলও সাধিত হইল। ইহাতে আমার তোমার অজ মনোরথ ও প্রত্যাশা ব্যর্থ হইল বটে, কিন্তু সেই বৈফলোই তাঁহার গুঢ় অভিসন্ধি সাধিত হয় এবং সেই বৈফল্যেই আমাদের কোনও ছদাবেশী কল্যাণ ও জগতের মহান উদ্দেশ্যের এক ক্ষুদ্রতম অংশের ক্ষুদ্র আংশিক অংগচ অত্যাবশ্যক উপকার সিদ্ধি হয়। অওভ, অজ্ঞান ও বৈফল্য ছদাবেশ মাজ। অশুভে শুভ, অজ্ঞানে জ্ঞান, বৈফল্যে সিদ্ধি ও শক্তি ৩°ত হইয়া অপ্রত্যাশিত কম্ম সম্পাদন করে ৷ তপঃ–অগ্নির নিগ্ঢ় অবস্থিতি ইহার কারণ। এই অনিবার্যা শুভ, এই অখণ্ডনীয় ভানে, এই অবিভিগ শক্তি ভগবানের অগ্নিরূপ ৷ যেমন সৎপুরুষের চিৎ ও তপঃ এক, যেমন দুইটিই আনন্দের স্পন্দন, সেইরূপে তাঁহার প্রতিনিধি-স্বরূপ এই অগ্নিরও জ্ঞান ও শক্তি অবিচ্ছিন্ন এবং দুই্টিই শুভ ও কল্যাণকর।

জগতের বাহিরের আকৃতি অন্যরূপ, সেখানে অনৃত, অঞ্চান, অওভ, বৈফল্যই প্রধান। অথচ এই ছেলেকে ভয় দেখান মুখোসের ভিতরে মাতৃমুখ লুকায়িত। এই অচেতন, এই জড়, এই নিরানন্দ ভেল্কী মাত্র, ভিতরে জর্গৎপিতা জগন্মাতা জগতাঝা সাচিদানন্দ আসীন। এইজন্য বেদে আমাদের সাধারণ চৈতন্য রালী নামে অভিহিত । আমাদের মনের চরম বিকাশও জ্যোৎস্নাপুলকিত তারা-নক্ষএমণ্ডিত ভগবতী রাজীর বিহার মার। কিন্তু এই রাজীর কোলে তাঁহার ভগিনী দৈবী উষা অনভপ্রসূত ভাবী দিব্যজানের আলোক লইয়া লুক্কায়িত। পাথিব-চৈতন্যের এই রাল্লিতেও তপঃ-অগিন পুনঃপুনঃ জাজল্যমান হইয়া ঊষার আভাতে আলোক বিস্তার করেন। তপঃ-অগিনই অন্ধ জগতে সত্যুচেতন্যময়ী উষার জন্মমুহূর্ত প্রস্তুত করিতেছেন। পরম দেবতা এই তপঃ-অগ্নিকে জগতে প্রেরণ ও স্থাপন করিয়াছেন, প্রত্যেক পদার্থ ও জীবজন্তুর অন্তরে নিহিত হইয়া বিশ্বের সমস্ত গতিকে অগিনই নিয়মন করিতেছেন। ক্ষণিক অন্তের মধ্যে সেই অগিনই চির্ভন সত্যের রক্ষক, অচেতনে ও জড়ে অগিনই অচেতনের নিগ্ঢ় চৈতন্য, জড়ের প্রচ্ছ গতি শক্তি। অজ্ঞানের আবরণে অগ্নিই ভগবানের গূঢ় জ্ঞান, পাপের বৈরূপ্যে অগ্নিই তাঁহার সনাতন অকলঙ্ক শুদ্ধতা, দুঃখ-দৈন্যের বিমর্য কুয়াশায় অগ্নিই তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বডোগী আনন্দ, দুর্ব্বলতা ও জড়তার মলিন বেশে অগিনই তাঁহার সর্ব্ববাহক সর্ব্বক্ষম বিশারদ ক্রিয়াশক্তি। একবার এই কৃষ্ণ আবরণ ভেদ করিয়া যদি অগ্নিকে আমাদের অন্তরে প্রস্কলিত প্রকাশিত উন্মুক্ত ও উর্দ্ধগামী করিতে পারি, তিনিই দৈবী ঊষাকে মানবচৈতন্যে আনিয়া দেবগণকে ভিতরে জাগাইয়া অনৃত অজ্ঞান নিরানন্দ বৈফল্যের কৃষ্ণ আবরণকে সরাইয়া আমাদিগকে অমর

ও দেবভাবাপন্ন করিয়া তুলিবেন। অগিনই অন্তর্ম্থ দেবতার প্রথম ও প্রধান জাগ্রত রূপ। তাঁহাকে হাদয়বেদীতে প্রজ্বলিত করিয়া পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া—— তাহার সূবর্ণ প্রকাশক স্থালা জান, তাহার সর্ব্বদাহক ও পাবক স্থালা শক্তি—— সেই জানময় শক্তিময় স্থলন্ত আশুনে আমাদের এই সকল তুল্ছ সুখ-দুঃখ, এই সকল ক্ষুদ্র পরিমিত চেপ্টা ও বৈফল্য, এই সমুদ্য় মিথ্যা ও মৃত্যু সমপিত করি। পুরাতন ও অন্ত ভুস্মীভূত হৌক, নূতন ও সত্য জাস্থল্যমান সাবিশ্লীরূপে গগনে—স্পশী তপঃ—অগিন হইতে আবির্ভত হইবে।

ভূলিও না যে সকলই আমাদের অন্তরে, মানবের ভিতরেই অগ্নি, ভিতরেই বেদী, হবিঃ ও হোতা, ভিতরেই ঋষি, মন্ত্র ও দেবতা, ভিতরেই রক্ষের বেদগান, ভিতরেই ব্রহ্মদ্বেষী রাক্ষস ও দেবদ্বেষী দৈত্য, ভিতরেই বৃত্র ও বৃত্তহন্তা, ভিতরেই দেবদৈত্য যুদ্ধ, ভিতরেই বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র অসিরা অত্তি ভৃগু অথবর্বা সুদাস ভূসদস্যু দাসজাতি ও পঞ্চবিধ ব্রহ্মানেৃষী আর্য্যগণ। মানবের আত্মা ও জগৎ এক। তাহার ভিতরেই দূর ও নিকট, দশ দিক, দুই সমুদ্র, সপত নদী সপত ভুবন। দুই শুপ্ত সমুদ্রের মাঝখানে আমাদের এই পাথিব জীবন প্রকাশিত। নিম্নের সমুদ্র সেই গুহ্য অনভ চৈতন্য যাহা হইতে এই সমুদয় ভাব ও রুতি, নাম ও রূপ অহরহঃ মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্তে প্রাদুর্ভূত, যেমন ভগবতী রাজীর কোলে তারানক্ষত্র প্রসফুটিত হয়। ইহাকে আধুনিক ভাষায় অচেতন (inconscient) বা অচেতন-চৈতন্য(subconscient) বলে, বেদের অপ্রকেতং সলিলং, প্রভাহীন সমুদ। প্রভাহীন হইলেও সে অচেতন নয়, তাহার মধ্যে প্রজাতীত বিশ্বচৈতন্য সক্রজানে জানী সক্রকশের্ম সমর্থ হইয়া যেন অবশ সঞ্চরে জগতের সৃষ্টি ও গতি সম্পাদিত করে। উপরে গুহ্য মুক্ত অনন্ত চৈতন্য যাহাকে অতিচৈতন্য (superconscient) বলে, যাহার ছায়া এই অচেতন–চেতন। সেখানে সচিচদানক জগতে পূর্ণপ্রকাশিত,––সত্যলোকে অনন্ত সৎরূপে তপলোকে অনন্ত চিৎ-রূপে, জনলোকে অনন্ত আনন্দরূপে, মহর্লোকে বিশাল বিশ্ব-আত্মার সত্যরূপে। মধ্যস্থ পাথিব চৈতন্য বেদোক্ত পৃথিবী। এই পৃথিবী হইতে জীবনের আরোহণীয় পর্বত গগনে উঠে, তাহার প্রত্যেক সানু আরোহণের একটি সোপান, প্রত্যেক সানু সপ্তলোকের একটি লোকের অভঃস্থ রাজ্য। দেবতারা আরোহণের সহায়, দৈত্যরা শত্রু ও পথরোধক। এই পর্বেতারোহণই বৈদিক সাধকের যজগতি, যজের সহিত পরমলোকে পরম আকাশে আলোকসমুদ্রে উঠিতে হইবে । আরোহণের এই অগ্নিই সাধনস্বরূপ, এই পথের নেতা, এই যুদ্ধের যোদ্ধা, এই যজের পুরোহিত । বৈদিক কবিগণের অধ্যাত্মজান এই মূল উপমার উপর প্রতিষ্ঠিত যেমন রুদ্দাবনবাসী প্রেমিক গোপ-গোপীর উপর বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানসকল। এই উপমার অর্থ সর্ব্বদা মনে রাখিলে বেদতত্ত্ব হাদয়ঙ্গম করা সহজ হইয়া উঠে।

ঋগ্যেদ

ভূমিকা

"আর্য্য" পরিকায় "বেদ রহস্যে" বেদ সম্বন্ধে যে নৃতন মত প্রকাশিত হইতেছে, এইগুলি সেই মতের অনুযায়ী অনুবাদ। সেই মতে, বেদের প্রকৃত অর্থ আধ্যাত্মিক, কিন্তু গুহা ও গোপনীয় বলিয়া অনেক উপমা, সন্ধেত-শব্দ, বাহ্যিক যক্ত-অনুষ্ঠানের যোগ্য বাক্যসকল দারা সেই অর্থ আর্ত। আবরণ সাধারণের পক্ষে অভেদ্য, দীক্ষিত বৈদিকের পক্ষে পাতলা ও সত্যের সর্বাঙ্গপ্রকাশক বস্তু মান্ত ছিল। উপমা ইত্যাদির পিছনে এই অর্থ খুঁজিতে হইবে। দেবতাদের "গুণ্ত নাম" ও স্ব স্থ ক্রিয়া, "গো" "অর" "সোমরস" ইত্যাদি সক্ষেতশব্দের অর্থ, দৈত্যদের কশ্ম ও গূঢ় অর্থ, বেদের রূপক, myth ইত্যাদির তাৎপর্য্য জানিতে পারিলে বেদের অর্থ মোটা-মুটি বোঝা যায়। অবশ্য তাহার গূঢ় অর্থের প্রকৃত ও সূক্ষ্ম উপলব্ধি বিশেষ জান ও সাধনার ফল, বিনা সাধনে কেবল বেদাধ্যয়নে হয় না।

এই সকল বৈদতত্ব বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা রহিয়াছে। আপাততঃ কেবল বেদের মুখ্য কথা সংক্ষেপে বলিব। সেই কথা এই: জগৎ ব্রহ্মময় কিন্তু ব্রহ্মতত্ব মনের অজ্যে। অগন্ত্য ঋষি বলিয়াছেন "তৎ অভূতং," অর্থাৎ সকলের উপরে ও সকলের অতীত, কালাতীত। আজও নহে, কলা নহে, কে তাহা জানিতে পারিয়াছে? আর সকলের চৈতন্যে তাহার সঞ্চার, কিন্তু মন যদি নিকটে গিয়া নিরীক্ষণ করিবার চেল্টা করে, "তৎ" অদৃশ্য হয়। কেনোপনিষদের রূপকেরও এই অর্থ, ইন্দ্র ব্রক্ষের দিকে ধাবিত হন, নিকটে এলেই ব্রহ্ম অদৃশ্য। তথাপি তৎ "দেব"–রূপে জ্যে।

দেবও "অঙুত", কিন্তু ত্রিধাতুতে প্রকাশিত—অর্থাৎ দেব সন্ময়, চিৎশক্তিময়, আনন্দময়। আনন্দতত্ত্বে দেবকে লাভ করা যায়। দেব নানারূপে, বিবিধ নামে জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া ও ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই নামরূপসকল বেদের দেবতা সকল।

বেদে বলে, প্রকাশ্য জগতের উপরে ও নিম্নে দুই সমুদ্র আছে। নিম্ন অপ্রকেত "হাদ্য" বা হাদসমুদ্র, ইংরাজিতে যাহাকে subconscient বলে——উপরে সৎসমুদ্র, ইংরাজিতে যাহাকে superconscient বলে। দুটিকে গুহা বা গুহাতত্ত্ব বলে। ব্রহ্মণজাতি অপ্রকেত হইতে বাক্ দারা ব্যক্তকে প্রকাশ করেন, রুদ্র প্রাণ-তত্ত্বে প্রবিষ্ট হয়ে রুদ্রশক্তিদারা বিকাশ করেন, উপরের দিকে জোর করিয়া তোলেন, ভীম তাড়নায় গন্তব্যপথে চালান, বিষ্ণু ব্যাপক শক্তিদারা ধারণ করিয়া এই নিত্যগতির সৎসমুদ্র বা জীবনের সপত নদীর গন্তব্যস্থল অবকাশ দেন। অন্য সকল দেবতা এই গতির কম্মকারক, সহায়, উপায়।

ঋণ্ডেবদ ৩১

সূর্য্য সত্যজ্যোতির দেবতা, সবিতা অর্থাৎ স্কন করেন, ব্যক্ত করেন, পূষা অর্থাৎ পোষণ করেন, "সূর্যা" অর্থাৎ অনৃতের অক্তানের রাত্রি হইতে সত্যের জানের আলোক জন্মাইয়া দেন। অগ্নি চিৎশক্তির "তপঃ," জগৎকে নিশ্মাণ করেন, জগতের সক্ববস্তুর ভিতরে রহিয়াছেন। তিনি ভূতত্ত্বে অগ্নি, প্রাণতত্ত্বে কামনা ও ভোগপ্রেরণা, যাহা পান তাহা ভক্ষণ করেন, মনস্তত্ত্ব চিন্তাময় প্রেরণা ও ইচ্ছাশক্তি, মনের অতীত তত্ত্বে জানময় ক্রিয়াশক্তির অধীধর।

প্রথম মপ্তল--সূক্ত ১

মূল ও ব্যাখ্যা

অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতং যজস্য দেবম্ ঋত্বিজম্। হোতারং রত্বধাত্মম্ ॥ ১ ॥

অগ্নিকে ভজনা করি যিনি যজের দেব পুরোহিত, ঋত্বিক, হোতা এবং আনন্দ– ঐশ্বর্য্যের বিধানে শ্রেষ্ঠ।

ঈড়ে--ভজামি, প্রার্থয়ে, কাময়ে। ভজনা করি।

পুরোহিতং—যে যজে পুরঃ সম্মুখে স্থাপিত ; যজমানের প্রতিনিধি ও যজের সম্পাদক।

ঋণ্ডিজম্---যে ঋতু অনুসারে অর্থাৎ কাল দেশ নিমিত্ত অনুসারে যক্ত সম্পাদনকরে।

হোতারং––ষে দেবতাকে আহান করিয়া হোম নিপ্সাদন করে ৷

রত্বধা——সায়ন রত্নের অর্থ রমণীয় ধন করিয়াছেন। আনন্দময় ঐশ্বর্য্য বলিলে যথার্থ অর্থ হয়।

"ধা"-র অর্থ যে ধারণ করে বা বিধান করে বা যে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে। অগ্নি পূর্কেভির্ ঋষিভির্ ঈড়োা নূতনৈতর্ উত।

স দেবাঁ এহ বক্ষতি॥ ২॥

যে অগ্নি পূর্বে ঋষিগণের ডজনীয় ছিলেন, তিনি নূতন ঋষিদেরও (উত) ডজনীয়। কেননাতিনিদেবগণকে এই স্থানে আনয়ন করেন।

ভজনীয়ত্বের কারণ নিদ্দিপ্ট হইতেছে, 'স' শব্দ সেই আভাস দেয়। এহ বক্ষতি—ইহ আবহতি। অগ্নিস্বর্থে দেবতাদিগকে আনয়ন করেন।

অগ্নিনা রয়িম্ অগ্নবৎ পোষম্ এব দিবে দিবে

যশসং বীরবভমম্॥ ৩॥

রিয়িং—-রত্নর যে অর্থ, রয়িঃ, রাধঃ, রায়ঃ ইত্যাদির সেইই অর্থ। তবে রত্ন শব্দে "আনন্দ" অর্থ অধিক প্রস্ফুট।

গ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

৩২

ইৎ—–এব

অরবং——অরুয়াং। প্রাণ্ড হয় বা ভোগ করে। পোষম্ প্রভৃতি রিয়ির বিশেষণ। পোষং অর্থাং যে পুষ্ট হয়, যে রিদ্ধি পায়। যশসং——সায়ন যশ শব্দের অর্থ কখন কীত্তি কখন অর করিয়াছেন। আসল অর্থ বোধহয় যেন সাফল্য, লক্ষাস্থান প্রাণ্ডি ইত্যাদি। দীপ্তি অর্থও সঙ্গত কিন্তু এখানে তাহা খাটেনা।

> অগ্নে যম্যজ্ম অধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূর্ অসি স ইদ্ দেবেষু গক্ষতি ॥ ৪ ॥

যে অধ্বর যভের সর্বাদিকে তুমি ঘিরিয়া প্রাদুর্ভূত, সেই যঞ্জ দেবদের নিকট গমন করে।

অধ্বরং—ধ্বৃধাতু হিংসা করা। সায়ন "অহিংসিত যজ্য" অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু "অধ্বর" শব্দ স্বয়ং ষজবাচক হইয়া গিয়াছে, "অহিংসিত" শব্দের সেইরূপ পরিণাম অসম্ভব। অধ্বন্ অর্থ পথ, অধ্বর পথগামী বা পথস্বরূপই হইবে। যজ্ঞ দেবধাম গমনের পথ ছিল আবার যজ্ঞ দেবধামের পথিক বলিয়া সর্ব্বে খ্যাত। এই অর্থ সঙ্গত। অধ্বর যে অধ্বনের মত অধ্ ধাতু সম্ভূত, ইহার এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে অধ্বা ও অধ্বর দুইটিই আকাশ অর্থে ব্যবহৃত ছিল। পরিভূঃ——পরিতো জাতঃ। দেবেমু——সপত্মী দারা লক্ষ্যস্থান নিদ্পিত।

অগ্নিহোঁতা কবিক্লতুঃ সত্যশ্চিত্রপ্রবস্তমঃ। দেবো দেবেভিরাগমৎ॥ ৫ ।।

যদঙ্গ দাগুষে তুমগ্নে ভদ্রং করিষাসি। তবেৎ সত্যমঙ্গিরঃ ॥ ৬ ॥

উপ তাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্ত্ধিয়া বয়ম্। নমো ভ্রন্ত এমসি॥ ৭॥

রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিম্। বর্ধমানং স্বে দমে ॥ ৮॥

স নঃ পিতেব স্নবেহগ্নে স্পায়নো ভব। সচস্থা নঃ স্বস্তয়ে॥ ৯॥

অনুবাদ .

যিনি দেবতা হইয়া আমাদের যজের পুরোহিত, ঋত্বিক ও হোতা সাজেন এবং অশেষ আনন্দ বিধান করেন,সেই তপোদেব অগ্নিকে ডজনা করি। ১ ঋণ্গেবদ ৩৩

যেমন প্রাচীন ঋষিদের তেমনই আধুনিক সাধকদেরও এই তপোদেবতা ভজনারযোগ্য। তিনিইদেবগণকে এই মর্ত্যলোকে আনয়ন করেন। ২

তপঃ-অগ্নি দারাই মানুষ দিব্য ঐশ্বর্যা প্রাপত হয়। সেই ঐশ্বর্যা অগ্নিবল দেন দিন বিদ্ধিত, অগ্নিবলৈ বিজয়স্থলৈ অগ্নসর, অগ্নিবলৈ বছল বীরশভিসিম্পন্ন হয়। ৩

হে তপঃ-অগ্নি, যে দেবপথগামী যজের সর্বাদিকে তোমার সভা অনুভূত, সেই আত্ম-প্রয়াসই দেবতার নিকট পহঁছিয়া সিদ্ধ হয়। ৪

এই তপঃ-অগ্নি যিনি হোতা, সত্যময়, সত্যদৃষ্টিতে যাঁহার কম্মশক্তি স্থাপিত, নানাবিধ জ্যোতিম্ময় শ্রৌতজানে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই দেবর্দকে লইয়া যজে নামিয়া আসুন। ৫

হে তপঃ-অগ্নি, যে তোমাকে দেয়, তুমি যে তাহার শ্রেয়ঃ স্পটি করিবেই, ইহাই তোমার সত্যসন্তার লক্ষণ। ৬

অগ্নি, প্রতিদিন দিবারাত্রে আমরা তোমার নিকট বুদ্ধির চিন্তা দারা আত্ম-সমর্পণকে উপহারস্বরূপে বহন করিয়া আগত হই। ৭

দেবোনাুখ সকল প্রয়াসের নিয়ামক, সত্যের দীপ্তিময় রক্ষক, যিনি স্বীয় ধামে সর্বাদা বিদ্যিত হইতেছেন, তাহারই নিকট আগত হই। ৮

যেমন পিতার সামীপ্য সন্তানের সুলভ, তুমিও সেইরূপে আমাদের নিকট সুলভহও। দৃঢ়সঙ্গীহইয়াকল্যাণগতিসাধিতকর। ৯ ७8

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা আধ্যাত্মিক অর্থ

বিশ্বযুক্ত

বিশ্বজীবন একটি রহৎ যজস্বরাপ। সেই যজের দেবতা স্বয়ং ভগবান, প্রকৃতি যজদাতা। ভগবান শিব, প্রকৃতি উমা, উমা হাদয়ের অন্তরে শিবরাপকে ধারণ করিয়াও প্রত্যক্ষ-শিবরাপহারা, প্রত্যক্ষ শিবরাপকে পাইবার জন্য লালায়িত। এই লালসা বিশ্বজীবনের নিগূঢ় অর্থ।

কিন্তু কি উপায়ে সফল মনোরথ হয় ? পুরুষোভমকে পহঁছিয়া পাইবার কোন্পথ প্রকৃতির নিদিপ্ট ? নিজ স্বরূপে পহঁছিয়া পুরুষোত্মের স্বরূপকে পাইবার কি উপায় ? চক্ষে অঞ্চানের আবরণ, চরণে স্থূলের সহস্র নিগড়। স্থূল সভা অনন্ত সংকেও যেন সাভে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, নিজেও যেন বন্দী হইয়া পড়িয়াছে, স্বয়ংগঠিত এই কারাগারের হারান চাবি আর হাতে পায় না। জড়-প্রাণশক্তির অবশ সঞ্চারে অনভ উলুক্ত চিৎ-শক্তি যেন বিমৃচু, নিলীন, অভিভূত, অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। অনস্ত আনন্দ যেন তুচ্ছ সুখ-দুঃখের অধীন প্রাকৃত চৈতন্য সাজিয়া ছদ্মবেশে বেড়াইতে বেড়াইতে নিজের স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছে, আর তাহাকে খুঁজিয়া পায় না, খুঁজিতে খুঁজিতে আরও দুঃখের অসীম পক্ষে নিমজ্জিত হইয়া যায় । সত্য যেন অনৃতের দিধাময় তরঙ্গে ডুবিয়া গিয়াছে । মানসাতীত বিজ্ঞানতত্ত্ব অনন্ত সত্যের প্রতিষ্ঠাস্থল। বিজ্ঞানতত্ত্বের ক্রিয়া পাথিব-চৈতন্যে হয় নিষিদ্ধ নয় বিরল, যেন আড়াল হইতে ক্ষণিক বিদ্যুতের উন্মেষ মান্ত। সত্যানৃতে দোলায়মান ভীরু খঞা বিমূঢ় মানসতত্ত্ব ঘুরিয়া ফিরিয়া সত্যকে অন্বেষণ করিতেছে, রাক্ষসী প্রয়াসে সত্যের আভাসকে পাইতেও পারে কিন্তু সত্যের পূর্ণ প্রকৃত জ্যোতিশর্ময় অনন্ত রূপকে আর পায় না। যেমন জানে, তেমনই কম্মেও সেই-ই বিরোধ, সেই-ই অভাব, সেই-ই বৈফল্য। সহজ সত্যকম্মের হাস্যময় দেবন্ত্যের স্থানে প্রাকৃত ইচ্ছাশজির নিগড়বদ্ধ চেপ্টা, সত্য-অস্ত্য পাপ-পুণ্ বিষ-অবিষ কম্ম-অকম্ম-বিকম্মের জটিল পাশে ছটফট করিতেছে। বাসনা-হীন বৈফল্যহীন আনন্দময় প্রেমময় ঐক্যরসে মন্ত ভাগবতী ক্রিয়া-শক্তি মুক্ত, অকুষ্ঠিত, অসফলিত ৷ তাহার স্বাভাবিক সহজ বিশ্বময় সঞ্চরণ প্রাকৃত ইচ্ছা-শক্তির অসম্ভব। সাম্ভের অনুতফাঁদে পড়া এই পাথিব প্রকৃতির সেই অন্ভ সৎ, সেই অনম্ভ চিৎশজি, সেই অনম্ভ আনন্দ-চৈতন্য লাভ করিবার কি বা আশা, কি বা উপায় ?

যজই উপায়। যজের অর্থ আত্মসমর্পণ, আত্মবলিদান। যাহা তুমি আছ্, যাহা তোমার আছে, যাহা ভবিষ্যতে শ্বচেল্টায় বা দেবকুপায় হইতে পার, যাহা কম্মপ্রবাহে অর্জন বা সঞ্চয় করিতে পার, সবই সেই অমৃতময়ের উদ্দেশে হবিঃরূপে তপঃ অগ্নিতে ঢাল। ক্ষুদ্র সর্ব্বশ্ব দানে জনন্ত সর্ব্বশ্ব লাভ করিবে। ষজে যোগ নিহিত। যোগে আনন্তা, অমরত্ব ও ভাগবত আনন্দ্রাপ্তি বিহিত। ইহাই প্রকৃতির উদ্ধারের পথ।

ঋগ্বেদ ৩৫

জগতী দেবী সেই রহস্য জানেন। অতএব সেই বিপুল আশায় তিনি অনিদ্রিত অশান্ত, দিনরান্ত্রি বৎসর পর বৎসর যুগ পরে যুগ তিনি যজই করিতেছেন। তাঁহার সমস্ত কল্মা, সমস্ত চেল্টা সেই বিশ্বযক্তের অসমান্ত। যাহাই উৎপাদন করিতে পারিয়াছেন, তাহাই বলি দিতেছেন। তিনি জানেন, সকলের ভিতরে সেই নীনাময় অকুষ্ঠিত মনে রসাস্থাদন করিতেছেন, যঞ্চ বলিয়া সর্ব্ব চেল্টা সর্ব্ব তপস্যা গ্রহণ করিতেছেন। তিনিই বিশ্বযক্তকে আন্তে আন্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাঁকিয়া বাঁকিয়া উত্থানে পতনে জানে অজানে জীবনে মৃত্যুতে নিদ্দিল্ট পথে নিদ্দিল্ট গন্তব্যধামের দিকে সর্ব্বদাই অপ্রসর করাইয়া দিতেছেন। তাঁহার ভরসায় প্রকৃতিদেবী নিভীক অকুষ্ঠিত বিচারহীন। সর্ব্বেই সর্ব্বদাই ভাগবতী প্রেরণা বুঝিয়া স্কুন ও হনন, উৎপাদন ও বিনাশ, জান ও অজান, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, পক্ অপক্, কুৎসিৎ সুন্দর, পবিত্র অপবিত্র, যাহা হাতে পান সবই সেই রহৎ চিরন্তন হোমকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতেছেন। খুল সুদ্ধা যজের হবিঃ, জীব যজের বদ্ধ পন্ত। যজের মন-প্রাণদেহরূপ ত্রিবন্ধনযুক্ত যুপকাণ্ঠে জীবকে বাঁধিয়া রাখিয়া প্রকৃতি তাহাকে অহরহঃ বলি দিতেছেন। মনের বন্ধন অজান, প্রাণের বন্ধন দুঃখ, বাসনা ও বিরোধ, দেহের বন্ধন মৃত্যু।

প্রকৃতির উপায় নিদ্দিষ্ট হইল, কিন্তু এই বদ্ধ জীবের কি উপায় হইবে ? উপায় যজ্ঞ, আন্মদান, আত্মবলি। তবে প্রকৃতির অধীন না হইয়া, প্রকৃতির দারা। দত্ত না হইয়া স্বয়ং উঠিয়া দাঁড়াইয়া যজমান সাজিয়া সক্ষি দিতে হইবে ৷ ইহাই বিশ্বের নিগৃত রহস্য যে পুরুষই যেমন যজের দেবতা, পুরুষও যজের বস্তু। জীবও। পুরুষ। পুরুষ নিজ শরীর মন প্রাণ বলিরূপে, যজের প্রধান উপয়েরূপে, প্রকৃতির হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার এই আত্মদানে এই গুণ্ত উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে যে একদিন চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতিকে নিজ হাতে লইয়া প্রকৃতিকে যজের সহধশ্মিণী করিয়া শ্বয়ং যক্ত সম্পাদন করিবেন। এই গুণ্ড কামনা পূরণার্থে নরের স্পটে। নরম্ভিতে তিনি সেই লীলা করিতে চান। আঅ্সুরূপ, অমরজ, অনত আনন্দের বিচিত্র আস্থাদন, অনত জান, অনত শক্তি, অনত প্রেম নরদেহে নরচৈতন্যে ভোগ করিতে হইবে। এই সকল আনন্দ প্রথমের নিজের মধ্যে আছেই, পুরুষ নিজের মধ্যে সনাতনরূপে সনাতন ভোগ করিতেছেন ৷ কিন্তু মানবকে সৃষ্টি করিয়া বহুতে একত্ব, সাঙ্কে অনন্ত, বাহ্যতে আন্তরিকতা, ইন্দ্রিয়ে অতীন্দ্রিয়, পাথিবে অমরলোকত্ব, এই বিপরীত রস গ্রহণে তিনি তৎপর। আমাদেরই মধ্যে মনের উপরে, বুদ্ধির ওপারে ৩০ত সত্যময় বিজ্ঞানতত্ত্বে বসিয়া, আবার আমাদেরই মধ্যে হৃদয়ের নীচে চিত্তের যে ভপ্ত স্তর, যেখানে হৃদয়ভহা, যেখানে নিহিত গুহ্য চৈতন্যের সমুদ্র, হাদয়া মন প্রাণ দেহ বুদ্ধি যে সমুদ্রের ক্ষুদ্র তরঙ্গ মাত্র, সেইখানে বসিয়া এই পুরুষ প্রকৃতির অন্ধ প্রয়াস, অন্ধ অন্বেষণ, দ্বন্দ্ব প্রতিঘাতে ঐক্যস্থাপনের চেল্টার রসাম্বাদন করিতেছেন। উপরে সজানে ভোগ, নিম্নে অজ্ঞানে ভোগ, এইরাপ দুইটাই একসঙ্গে চলিতেছে। কিন্তু চির্দিন এই অবস্থায় মগন **হইলে** তাঁহার নিগ্ঢ় প্রত্যাশা, তাঁহার চরম **উদ্দেশ্য** সিদ্ধ হয় না ।

গ্রীঅরবিন্দের বাপলা রচনা

এইজন্য প্রত্যেক মানুষের জাগরণের দিন বিহিত। অন্তরম্থ দেবতা একদিন অবশ পূণ্যহীন প্রাকৃত আত্মবলি ত্যাগ করিয়া সঞ্জানে সমন্তে যজ্ঞ সম্পাদন আরম্ভ করিবেন। এই সজান সমন্ত যজ্ঞ বেদোজ "কম্ম্ম"। তাহার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ, বিশ্বময় বহুত্বে সম্পূর্ণতা, যা বেদে বিশ্বদেব্য ও বৈশ্বানরত্ব বলে, আর একাত্মক প্রমদেবসভায় অমরত্বলাভ। এই বেদোক্ত দেবগণ অব্বাচীন সাধারণের হেয় ইন্দ্র অগ্নি বরুণ নামক ক্ষুদ্র দেবতা নন, ইহারা ভগবানের জ্যোতিম্ময় শক্তিধর নানা মূত্তি। আর এই অমরত্ব পূরাণোক্ত তুচ্ছ স্বর্গ নয়, বৈদিক শ্বাষ্থিদের অভিলম্বিত "স্বর্", অনভলোকের প্রতিষ্ঠা, বেদোক্ত অমরত্ব, সক্রিদানস্বময় অনন্ত সন্তাও চৈতন্য।

প্রথম মন্তল--সূক্ত ১৭

মূল

ইন্দ্রাবরুণয়োরহং সম্রাজোরব আ রণে। তা নো মৃড়াত ঈদুশে॥ ১॥ গন্তারা হি স্থাহবসে হবং বিপ্রস্য মাবতঃ। ধর্তারা চর্ষণীনাম্॥ ২॥ অনুকামং তর্গয়েথামিন্দ্রাবরুণ রায় আ। তা বাং নেদিষ্ঠমীমহে॥ ৩॥ যুবাকু হি শচীনাং যুবাকু সুমতীনাম্। ভূয়াম বাজদাব্যাম্॥ ৪॥ ইন্দ্রঃ সহস্রদাব্যাং বরুণঃ শংস্যানাম্। ক্রতুর্ভবত্যুক্থাঃ॥ ৫॥ তয়োরিদবসা বয়ং সনেম নি চ ধীমহি। স্যাদুত প্ররেচনম্॥ ৬॥ ইন্দ্রাবরুণ বামহং হবে চিত্রায় রাধ্যে। অসমান্ৎসু জিন্তামসকৃতম্॥ ৭॥ ইন্দ্রাবরুণ ন্ নু বাং সিষাসন্তীষু ধীপ্রা। অসমভ্যং শর্ম যাজ্তম্ ॥ ৮॥ বামগ্রেতু সুপটুতিরিন্দ্রাবরুণ যাং হবে। যাম্ধাথে সধ্যতুতিম্॥ ৯॥

অনুবাদ

হে ইন্দ্র, হে বরুণ, তোমরাই সমাট, তোমাদিগকেই আমরা রক্ষকরূপে বরণকরি,——সেইযেতোমরা এইরূপ অবস্থায় আমাদের উপর উদয় হও। ১

কারণ, যে জানী শক্তি-ধারণ করিতে পারেন, তোমরা তাঁহার যজস্বলে রক্ষণার্থেউপস্থিত হও। তোমরাই কার্য্যসকলের ধারণকর্তা। ২

আধারের আনন্দ-প্রাচুর্য্যে যথা-কামনা আত্মতৃপিত অনুভব কর, হে ইন্দ্র ও বরুণ, আমরা তোমাদের অতিনিকট সহবাস চাই। ৩

যে সকল শক্তি এবং যে সকল সুবুদ্ধি আন্তরিক ঋদি বর্দ্ধন করে, সেই সকলের প্রবলঅাধিপত্যে আমরা যেন প্রতিষ্ঠিত থাকি। ৪

৩৬

ঋ্ব্যেবদ ৩৭

যাহা যাহা শক্তিদায়ক ইন্দ্র তাহার এবং যাহা যাহা প্রশস্ত ও মহৎ বরুণ তাহারই স্পৃহণীয় প্রভূহন। ৫

এই দুই জনের রক্ষণে আমরা স্থির সুখে নিরাপদে থাকি এবং গভীর ধানে সমর্থহই। আমাদের সম্পূর্ণ শুদ্ধি হৌক। ৬

হে ইক্ত, হে বরুণ, আমরা তোমাদিগের নিকট চিত্রবিচিত্র আনন্দলাভার্থে যুক্ত করি, আমাদিগকে সর্বাদা জয়ী কর। ৭

হে ইন্দ্র, হে বরুণ, আমাদের বুদ্ধির সকল রতি যেন বশ্যতা স্বীকার করে, সেই র্তিসকলে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে শান্তি দান কর। ৮

হে ইন্দ্র, হে বরুণ, এই যে সুন্দর স্তব তোমাদিগকে যজরাপে অর্পণ করি, সে যেন তোমাদের ভোগ্য হয়, সেই সাধনার্থ স্তববাক্য তোমরাই পুষ্ট ও সিদ্ধিযুক্ত করিতেছ। ৯

ব্যাখ্যা

প্রাচীন ঋষিগণ যখন আধ্যাত্মিক যুদ্ধে আন্তর শতুর প্রবল আক্রমণে দেবতা– দের সহায়তা লাভ প্রার্থনা করিতেন, সাধনপথে কিঞিৎ অগ্রসর হইয়া অসম্পূর্ণতা বোধে পূর্ণতা প্রতিষ্ঠা মানসে "বাজঃ" বা শক্তির স্থায়ী জমাট অবস্থা কামনা করিতেন অথবা অভর-প্রকাশ ও আনন্দের পরিপূর্ণতায় তাহারই প্রতিষ্ঠা করিতে যোগ করিতে বা রক্ষা করিতে দেবতাদের আহান করিতেন, তখন আমরা প্রায়ই জানাইতে দেখি । অধিনদ্বয়, ইন্দ্র ও বায়ু, মিলু ও বরুণ এইরূপ সংযোগের উদাহরণ। এই ভাবে ইন্দ্র ও বায়ু নহে, মিত্র ও বরুণ নহে, ইন্দ্র ও বরুণের এইরূপ সংযোগ করিয়া কন্বংশজ মেধাতিথি আনন্দ, মহত্বসিদ্ধি ও শাভির প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার এখন উচ্চ বিশাল ও গঞ্জীর মনের ভাব। তিনি চান মুক্ত ও মহৎ কম্ম, চান প্রবল তেজস্বী ভাব কিন্তু সেই বল স্থায়ী ও গভীর বিশুদ্ধ জানে প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই তেজ শান্তির বিশাল পক্ষদ্বয়ে আরুঢ় হইয়া কম্ম-আকাশে বিচরণ করিবে, তিনি চান আনন্দের অনন্ত সাগরে ভাসমান হইয়াও, আনন্দের চিত্রবিচিত্র তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াও সেই স্থৈর্য, মহিমা ও চিরপ্রতিষ্ঠার অনুভব । তিনি সেই সাগরে মজিয়া আত্মজান হারা হইতে, সেই তরঙ্গে লুলিতদেহ হইয়া হাবুডুবু খাইতে অনিচ্ছুক। এই মহৎ আকাঙ্ক্ষা লাভের উপযুক্ত সহায়তাকারী দেবতা ইন্দ্র ও বরুণ। রাজা ইন্দ্র, সমাট বরুণ। সমস্ত মানসিকর্ত্তি, অস্তিত ও কর্ম্মকারিতার কারণ যে মানসিক তেজ ও তপঃ, ইন্দ্রই তাহার দাতা এবং র্**রদের আক্রমণ হই**তে তাহার রক্ষা করেন। চিন্ত ও চরিত্রের যত মহৎ ও উদার ভাব, যাহার অভাবে মনের এবং কম্মের ঔদ্ধত্য, সংকীণতা, দুর্ব্বলতা বা

প্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

৩৮

শিখিলতা ভাৰশ্যভাবী, বরুণই তাহার স্থাপন করেন ও রক্ষা করেন। অতএব এই স্জের প্রারম্ভে ঋষি মেধাতিথি এই দুজনেরই সহায়তা ও সখ্য বরণ করেন। ইন্দাবরুণয়োরহমব আর্ণে।"সম্রাজোঃ"––কেননা তাহারাই সম্রাট। অতএব "ঈদৃশে", এই অবস্থায় বা অবসরে (যে মনের অবস্থার বর্ণনা করিলাম) জিনি নিজের জন্যে ও সকলের জন্যে তাহাদের প্রসন্নতা প্রার্থনা করেন––তা নো মুডাত ঈদ্শে। যে অবস্থায় দেহের, প্রাণের, মনের, বিজ্ঞানাংশের সকল রুভি ও চেল্টা স্বস্থানে সমারত ও সংরত, কাহারও জীবের উপর আধিপত্য, বিদ্রোহ বা যথেচ্ছাচার নাই, সকলেই স্ব স্ব দেবতার পরাপ্রকৃতির বশ্যতা স্বীকার করিয়া স্ব স্থ কম্ম ভগবৎনিদিদেট সময়ে ও পরিমাণে সানন্দে করিতে অভ্যস্ত, যে অবস্থায় গভীর শান্তি অথচ তেজস্বী সীমারহিত প্রচণ্ড কর্ম্মশন্তি, যে অবস্থায় জীব স্থরাজ্যের স্বরাট, নিজ আধাররূপ আন্তরিক রাজ্যের প্রকৃত সমাট, তাহারই আদেশে বা তাহারই আনন্দার্থে সকলর্তি সূচারুরূপে পরস্পরের সহায়তা পৃক্রিক কম্ম করে অথবা তাহার ইচ্ছা হইলে গভীর তম্যেরহিত নিষ্কম্মতায় মগ্ন হইয়া অতল শাভি অনিকাচনীয় রসায়াদন করে, প্রথম যুগের বৈদাভিকেরা সেই অবস্থাকে স্বারাজ্য বা সাম্রাজ্য বলিতেন। ইন্দ্র ও বরুণ সেই অবস্থার বিশেষ অধিকারী তাহারাই সমাট। ইন্দ্র সমাট হইয়া আর সকল র্ভিকে চালিত করেন, বরুণ সমাট হইয়া আর সকল র্ত্তিকে শাসন করেন এবং মহিমান্তি করেন।

এই মহিমান্তি অমরদমের সম্পূর্ণ সহায়তা লাভে সকলে অধিকারী নহেন ৷ যিনি জানী, যিনি ধৈর্য্যে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই অধিকারী। বিপ্র হওয়া চাই, মাবান হওয়া চাই। বিপ্র ব্রাহ্মণ নহে, বি ধাতুর অর্থ প্রকাশ, বিপ্ ধাতুর অর্থ প্রকাশের ক্রীড়া, কম্পন বা পূর্ণ উচ্ছাস, যাঁহার মনে জানের উদয় হইয়াছে, যাঁহার মনের দার জানের তেজয়সী ক্রীড়ার জন্য মুক্ত, তিনিই বিপ্র। মা ধাতুর অর্থ ধারণ। জননী গর্ভে সন্তানের ধারণকলী বলিয়া মাতা শব্দে অভিহিত। আকাশ সকল ভূতের সকল জীবের জন্ম, ক্রীড়া ও মৃত্যু স্বকুক্ষিতে ধারণ করিয়া স্থির অবিচলিত হইয়া থাকে বলিয়া সকল কম্মের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণম্বরূপ বায়ুদেবতা মাতরিশ্বা নামে খ্যাত। আকাশের ন্যায় যার ধৈর্য্য ও ধারণশক্তি, প্রচণ্ড ঘূণিবায়ু যখন দিঙ্মণ্ডলকে আলোকিত করিয়া প্রচণ্ড হক্ষারে রক্ষ, জন্ত, গৃহ পর্যান্ত টানিয়া রুদ্র ভয়ঙ্কর রাসলীলার নৃত্য অভিনয় করে, আকাশ যেমন সেই ক্রীড়াকে সহ্য করে, নীরবে স্বসুখে মগ্ল হইয়া থাকে, যিনি সেইরাপ প্রচণ্ড বিশাল আনন্দ, প্রচণ্ড রুদ্র কর্ম্মস্রোত এমন কি শরীর বা প্রাণের অসহ্য যন্ত্রণাকেও, স্বীয় আধারে সেই ক্রীড়ার উন্মুক্ত ক্ষেত্র দিয়া অবিচলিত ও আত্মসুখে প্রফুল্ল থাকিয়া সাক্ষীরূপে ধারণ করিতে সমর্থ, তিনিই মাবান। যখন এইরূপ মাবান বিপ্ল, এইরূপ ধীর জানী স্বীয় আধারকে বেদী করিয়া যজার্থে দেবতাদের আহান করে, ইন্ত ও বরুণের সেইখানে অকুষ্ঠ গতি, আঁহারা স্বেচ্ছায়ও উপস্থিত হন, যজ রক্ষা করেন, তাহার সকল অভীপিসত কম্মের আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা সাজিয়া (ধর্তারা চর্যণীনাং) বিপুল আনন্দ, শক্তি ও জ্ঞানপ্রকাশ প্রদান করেম।

ঋ্বেদ ৩৯

প্রথম মণ্ডল--সূক্ত ৭৫

মূল

জুষর সপ্রথন্তমং বচো দেবপসরন্তমম্। হব্যা জুহান আসনি ॥ ১॥ অথা তে অঙ্গিরন্তমাগ্নে বেধন্তম প্রিয়ম্। বোচেম ব্রহ্ম সানসি॥ ২ ॥ কন্তে জামির্জনানামগ্নে কো দারধ্বর। কো হ কপিমনসি প্রিতঃ॥ ৩॥ তুং জামির্জনানামগ্নে মিরো অসি প্রিয়ঃ। সাধা সাধিত্য ইড়াঃ॥ ৪॥ যজা নো মিরাবরুণা যজা দেবাঁ ঋতুং র্হও। অগ্নে যক্ষি তুং দমম্॥ ৫॥

অনুবাদ

যাহা ব্যক্ত করিতেছি তাহা অতিশয় বিস্তৃত ও রুহৎ এবং দেবতার ভোগের সামগ্রী, তাহা তুমি সপ্রেমে আত্মসাৎ কর। যতই হব্য প্রদান কর, তোমারই মুখে অর্পণ কর। ১

হে তপঃ-দেব ! শক্তিধরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বিধাতা, আমি যে হাদয়ের মন্ত্র ব্যক্ত করিতেছি তাহা তোমার প্রিয় এবং আমার অভিলমিতের বিজয়ী ভোক্তা হৌক। ২

হে তপঃ–দেব অগ্নি! জগতে কে তোমার সঙ্গী ও দ্রাতা ? তোমাকে দেবগামী সংগ্যদিতে কে সমর্থ? তুমি বাকে? কার অন্তরে অগ্নি আগ্রিত? ৩

অগ্নি ! তুমিই সর্ব্বপ্রাণীর ভাতা, তুমিই জগতের প্রিয় বন্ধু, তুমিই সখা এবং তোমার সখাদের কাম্য। ৪

মিত্র ও বরুণের উদ্দেশ্যে, দেবতাদের উদ্দেশ্যে র্হৎ সত্যের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর। অগ্নি! সেই সত্য তোমারই নিজের গৃহ, সেই লক্ষ্যস্থলে যজকে প্রতিষ্ঠিত কর। ৫

তৃতীয় মণ্ডল--সূক্ত ৪৬

মূল

যুধাস্য তে ব্যভস্য স্থবাজ উগ্রস্য যূনঃ স্থবিরস্য ঘৃষ্ণেরঃ।
অজুর্যতো বজিণো বীর্যাহণীক্ত শুন্তস্য মহতো মহানি ॥ ১॥
মহাঁ অসি মহিষ রুষ্ণোভির্ধনম্পৃদুপ্র সহমানো অন্যান্।
একো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা স যোধয়া চ ক্ষয়য়া চ জনান্॥ ২॥
প্র মাল্লভী রিরিচে রোচমানঃ প্র দেবেভিবিশ্বতো অপ্রতীতঃ।
প্র মজানা দিব ইক্তঃ পৃথিব্যাঃ প্রোরোর্মহো অন্তরিক্ষাদৃজীষী॥ ৩॥

গ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

উরুং গভীরং জনুষাভ্যুহগ্রং বিশ্বব্যচসমবতং মতীনাম্। ইস্তং সোমাসঃ প্রদিবি সুতাসঃ সমুদ্রং ন স্তবত আবিশন্তি॥ ৪॥ যং সোমমিক্ত পৃথিবীদ্যাবা গভং ন মাতা বিভৃতস্থায়া। তং তে হিন্তি তমু তে মৃজভাধবর্যবো র্ষভ পাতবা উ॥ ৫॥

80

অনুবাদ

যে দেবতা পুরুষ যোদ্ধা ওজস্বী স্বরাট,যে দেবতা নিতাযুবা স্থিরশক্তি প্রথরদীপ্তিরাপ ও অক্ষয়, অতি মহৎ সেই শুট্ডিধর বজ্রধর ইন্দ্র, অতিমহৎ তাঁহার বীরকশ্ম সকল। ১

হে বিরাট, হে ওজস্থী, মহান তুমি, তোমার বিস্তার-শক্তির কম্ম দ্বারা তুমি আর সকলের উপর জোর করিয়া তাহাদের নিকট আমাদের অভিলমিত ধন বাহির কর। তুমি এক, সমস্ত জগতে যাহা যাহা দৃষ্ট হয় তাহার রাজা, মানুষকে যুদ্ধে প্রেরণা দিয়ো, তাহার জেতব্য স্থিরধামে তাহাকে স্থাপন করো। ২

ইন্দ্র দীপ্তিরাপে প্রকাশ হইয়া জগতের মাগ্রা সকল অতিক্রম করিয়া যায়, দেবদেরও সকল দিকে অনন্তভাবে অতিক্রম করিয়া সকলের অগম্য হয়। সঙ্গে ঋজুগামী এই শক্তিধর তাঁহার ওজস্বিতায় মনোজগতে, উরু ভূলোক এবং মহান প্রাণজগৎকে অতিক্রম করিয়া যায়। ৩

এই বিস্তৃত ও গভীর, এই জন্মতঃ উগ্র ও ওজস্বী, এই সর্বাবিকাশক ও সর্বাচিভাধায়ক ইন্দ্রনপ সমুদ্রে জগতের মদ্যকররসপ্রবাহ সকল মনোলোকের মুখে অভিবাক্ত হইয়া স্রোতিস্বিনী নদনদীর মত প্রবেশ করে। ৪

হে শক্তিধর, এই আনন্দমদিরা মনোলোক ও ভূলোক মাতা যেমন অজাত শিশুকে ধারণ করে সেইরূপে তোমারই কামনায় ধারণ করে। অধ্বরের অধ্বয়াঁ তোমারই জন্যে হে র্ষভ, তোমারই পানার্থে সেই আনন্দপ্রবাহকে ধাবিত করে, তোমারই জন্যে সেই আনন্দকে মাজিত করে। ৫

নবম মণ্ডল—সূজ ১

মূল

স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্থ সোম ধারয়া। ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ॥১॥

স্বাদুত্য মাদকত্ম ধারায় পূত্রোতে বহ, সোমদেব, ইন্দ্রপানার্থে তুমি অভিযূতহইয়াছ। ১

THE UPANISHADS



উপনিষদ্

আমাদের ধশর্ম অতি বিশাল ও নানা শাখা-প্রশাখা-শোভিত। তাহার মূল গভীরতম জানে আরাচ, তাহার শাখাগুলি কম্মের অতি দূর প্রান্ত পর্যান্ত বিস্তৃত। যেমন গীতার অশ্বথরক্ষ, উর্দ্বমূল ও অধঃশাখঃ, তেমনই এই ধশর্ম জানপ্রতিষ্ঠিত, কশর্মপ্রেরক। নির্ভি তাহার ডিভি, প্রর্ভি তাহার গৃহ ছাদ দেওয়াল, মুক্তি তাহার চূড়া। মানবজাতির সমস্ত জীবন এই বিশাল হিন্দুধ্মর্ম-রক্ষের আশ্রিত।

সকলে বলে বেদ হিন্দুধন্দের্যর প্রতিষ্ঠা, কিন্তু অল্প লোকেই সেই প্রতিষ্ঠার স্বরূপ ও মন্দ্র্য অবগত আছে; প্রায়ই শাখাগ্রে বসিয়া আমরা দুই একটি সুস্বাদ্ধ নশ্বর ফলের আস্বাদে মজিয়া থাকি, মূলের কোনও সন্ধান রাখি না। আমরা শুনিয়াছি বটে যে বেদের দুই ভাগ আছে, কন্দর্যকাণ্ড ও জানকাণ্ড, কিন্তু আসল কন্দর্যকাণ্ড কি বা জানকাণ্ড কি তাহা জানি না। আমরা মোক্ষমূল্লর কৃত ঋণ্ডেবদের ব্যাখ্যা পড়িয়া থাকিতে পারি বা রমেশচন্দ্র দত্তের বাঙ্গালা অনুবাদ পড়িয়া থাকিতে পারি, কিন্তু ঋণ্ডেবদ কি তাহা জানি না। মোক্ষমূল্লর ও দত্ত মহাশয়ের নিকট এই জান পাইয়াছি যে ঋণ্ডেবদের ঋষিগণ প্রকৃতির বাহা পদার্থ বা ভূতসকলকে পূজা করিতেন, সূর্যা চন্দ্র বায়ু অগ্নি ইত্যাদির স্তব-স্তোগ্রই সনাতন হিন্দুধন্দের সেই অনাদ্যনন্ত অপৌক্ষয়েয় মূল জান। আমরা ইহাই বিশ্বাস করিয়া বেদের, ঋষিদের ও হিন্দুধন্দের্যর অবমাননা করিয়া মনে করি যে আমরা বড়ই বিদ্বান, বড়ই "আলোকপ্রাণ্ড"। আসল বেদে সত্য সত্য কি আছে, কেনই বা শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাজানী ও মহাপুরুষগণ এই স্তবস্তোগ্রগুলিকে অনাদ্যনন্ত সম্পূর্ণ অল্লান্ড জান বিলিয়া মানিতেন, তাহার কোন অনুসন্ধান করি না।

উপনিষদই বা কি, তাহাও অত্যন্ত লোক জানে। যখন উপনিষদের কথা বলি, আমরা প্রায়ই শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিপ্টাদৈতবাদ, মধ্বের দৈতবাদ ইত্যাদি দার্শনিক ব্যাখ্যার কথা ভাবি। আসল উপনিষদে কি লেখা রহিয়াছে, তাহার প্রকৃত অর্থ কি, কেন পরস্পরবিরোধী ষড় দর্শন এই এক মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ষড়দর্শনের অতীত কোন্ নিগৃঢ় অর্থ সেই জ্ঞানভাণ্ডারে লভা হয়, এই চিন্তাও করি না। শঙ্কর যে অর্থ করিয়া গিয়াছেন, আমরা সহস্ত বর্ষকাল সেই অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, শঙ্করের ব্যাখ্যাই আমাদের বেদ, আমাদের উপনিষদ, কল্ট করিয়া আসল উপনিষদ কে পড়ে? যদি পড়ি, শঙ্করের ব্যাখ্যার বিরোধী কোন ব্যাখ্যা দেখিলে আমরা তখনই তাহা ভুল বলিয়া প্রত্যাখ্যান

∗ মারোম্বার (Max Müller)

করি। অথচ উপনিষদের মধ্যে কেবল শঙ্করলব্ধ জান নহে, ভূত বর্তমান ভবিষ্যতে যে আধ্যাত্মিক জান বা তত্ত্তান লব্ধ হইয়াছে বা হইবে, সেইগুলি আর্য্য ঋষি ও মহাযোগী অতি সংক্ষিপ্তভাবে নিগৃঢ় অর্থপ্রকাশ শ্লোকে নিহিত করিয়া গিয়াছেন।

উপনিষদ কি ? যে অনাদ্যনন্ত গভীরতম সনাতন জ্ঞানে সনাতন ধর্ম্ম আরাঢ়মূল, সেই জানের ভাভার উপনিষদ। চতুর্কেদের স্তাংশে সেই জান পাওয়া যায়, কিন্তু উপমাচ্ছলে স্তোত্তের বাহ্যিক অর্থ দারা আচ্ছাদিত, যেমন আদর্শে মানবের প্রতিমৃতি। উপনিষদ অনাচ্ছন্ন প্রম্ভান, আসল মনষ্যের অনারত অবয়ব। ঋণেবদের বক্তা ঋষিগণ ঐশ্বরিক প্রেরণায় আধ্যাত্মিক জ্ঞান শব্দ ও ছন্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন, উপনিষ্দের ঋষিগণ সাক্ষাদ্দর্শনে সেই জানের স্বরূপ দেখিয়া অল্প ও গম্ভীর কথায় সেই জান ব্যক্ত করিলেন। অদৈতবাদ ইত্যাদি কেন, তাহার পরে যত দার্শনিক চিভা ও বাদ ভারতে, য়ুরোপে, এশিয়ায় স্থট হইয়াছে, Nominalism, Realism, শূন্যবাদ, ডারউয়িনের ক্রম-বিকাশ, কম্তের Positivism, হেগেল, কান্ত, স্পিনোজা, শোপনহাওর Utilitarianism, Hedonism, সকলই উপনিষদের ঋষিগণের সাক্ষাদ্দর্শনে দৃষ্ট ও ব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু অন্যৱ <mark>যাহা খণ্ডভাবে দৃষ্ট, স</mark>ত্যের অংশমাত্র হইয়াও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রচারিত, সত্য-মিখ্যা মিশ্রিত করিয়া বিকৃতভাবে বণিত, তাহা উপনিষদে সম্পূৰ্ণভাবে, নিজ প্ৰকৃত সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া, গুদ্ধ অধ্ৰান্ত-ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব শঙ্করের ব্যাখ্যায় বা আর-কাহারও ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ না হইয়া উপনিষদের আসল গভীর ও অখণ্ড অর্থগ্রহণে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

উপনিষদের অর্থ গৃঢ় স্থানে প্রবেশ করা। ঋষিগণ তর্কের বলে, বিদ্যার প্রসারে, প্রেরণার স্রোতে উপনিষদুক্ত জ্ঞানলাভ করেন নাই, যে গৃঢ়স্থানে সম্যুক জ্ঞানের চাবি মনের নিভূত কক্ষে ঝুলান রহিয়াছে, যোগদারা অধিকারী হইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেই চাবি নামাইয়া তাঁহারা অল্লাভ জ্ঞানের বিস্তীর্ণ রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। সেই চাবি হস্তগত না হইলে উপনিষদের প্রকৃত অর্থ খুলিয়া যায় না। কেবল তর্কবলে উপনিষদের অর্থ করা ও নিবিড় অরণ্যে উচ্চ উচ্চ রক্ষাপ্র মোমবাতির আলোকে নিরীক্ষণ করা একই কথা। সাক্ষাদ্দর্শনই সূর্য্যালোক, যাহা দ্বারা সমস্ত অরণ্য আলোকিত হইয়া অনুষণকারীর নয়নগোচর হয়। সাক্ষাদ্দর্শন যোগেই লভ্য।

উপনিষদে পূর্ণযোগ

পূর্ণযোগ, নরদেহে দেবজীবন, আঅপ্রতিষ্ঠিত, ভগবৎশক্তিচালিত পূর্ণলীলা, যাহাকে আমরা মনুষ্যজন্মের চরম উদ্দেশ্য নির্দেশ করিয়া প্রচার করি, এই সিদ্ধান্তের মূল ভিত্তি যেমনই বুদ্ধি-গঠিত নূতন চিন্তা নহে, তেমনই কোনও প্রাচীন পুঁথির হরফ, কোনও লেখা-শাস্তের প্রমাণ বা দার্শনিক সূত্রের দোহাই তাহার নহে। ভিত্তি পূর্ণতর অধ্যাত্মজান, ভিত্তি আত্মায় বুদ্ধিতে হাদয়ে প্রাণে দেহে ভাগবত সন্তার জ্লন্ত অনুভূতি। এই জান কিছু নূতন আবিক্ষার নয়, অতি পুরাতন, নিতাস্ত সনাতন। এই অনুভূতি বেদের প্রাচীন ঋষির, উপনিষদের সত্যদ্রভা চরম জানীর,—-"সত্যশুত কবয়ঃ" যাঁহারা, তাঁহাদেরই অনুভূতি। কলির পতিত ভারতের নৈরাশ্যে-ঘেরা, ক্ষুদ্রাশয়তায় ও বিফল প্রয়ত্ন প্রাণে নূতন শোনায় বটে,--যেখানে অধিকাংশই আধ-মানুষ হইয়া জীবন যাপন করিতে সম্ভুত্ট, পুরা মনুষ্যত্ত্বের সাধনা কজন করে, সেখানে নবদেবত্বের কা কথা। কিন্তু এই আদর্শ লইয়াই আমাদের শক্তিধর আর্য্য পূর্ব্ব পুরুষেরা জাতির প্রথম জীবন গঠন করিলেন। এই জ্ঞানসূর্য্যের উল্লাসভরা উষাকালে আত্মস্থ আনন্দ-বিহলের সোমরস-প্লাবিতক্ঠে বেদগানের আহানধ্বনি উঠিয়া বিশ্বদেবতার চরণপ্রান্তে পৌছিল। মনুষ্যের আত্মায়, মনুষ্যের জীবনে সক্রবিধ দেবত্ব গঠন দারা সেই অমর বিশ্বদেবের মহীয়সী প্রতিমূর্তি স্থাপন করার উচ্চাশা ছিল ভারত-সভ্যতার বীজমন্ত। ক্রমশঃ সেই মন্ত ভুলিয়া ্যাওয়া, হ্রাস করা, বিকৃত করা, এই দেশের ও এই জাতির অবনতি ও দুর্গতির কারণ। আবার সেই মন্ত উচ্চারণ, আবার সেই সিদ্ধির সাধনা, পুনরুখান ও উন্নতির একমাত্র শ্রেষ্ঠপথ ও একমাত্র অনিন্দ্য উপায় । কেননা, ইহাই পূর্ণ সত্য,--যেমন ব্যশ্টির তেমনি সম্পিট্র সাফল্য এইখানে। মনুষ্যের সাধনা, জাতির গঠন, সভাতার স্থিট ও ক্রমবিকাশ, এই সকলের গৃঢ় তাৎপর্য্য ইহাই। অন্য যে সকল উদ্দেশ্যের পিছনে আমাদের প্রাণ ও বুদ্ধি হয়রান হয়, সে সকল গৌণ উদ্দেশ্য, আংশিক, দেবতাদের সত্য অভিসন্ধির সহায় মাত্র। অন্য যে সকল খণ্ড-সিদ্ধি লইয়া আমরা উল্লসিত হই, সেই সকল কেবল পথের আরামগৃহ, মার্গস্থ পর্ব্বতশিখরে জয়পতাকা প্রোথিত করা। আসল উদ্দেশ্য আসল সিদ্ধি মনুষ্যের মধ্যে, কয়েকজন বিরল মহাপক্তয় নয়, সকলের মধ্যে জাতিতে, বিশ্ব-মানবে ব্রক্ষের বিকাশ ও স্বয়ং-প্রকাশ, ভগবানের প্রকট শক্তিসঞ্চারণ, জানময় আনন্দময় লীলা।

এই জান, এই সাধনের প্রথম রূপ ও অবস্থা আমরা দেখিতে পাই ঋণ্ণেবদে।

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

ভারত-ইতিহাসের মুখেই আর্যাধর্ম্ম মন্দিরের দারস্থ স্তুপে খোদিত আদিলিপি। ঋপেবদই যে তাহার আদিম বাণী, সেকথা আমরা ঠিক নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না, কারণ ঋণ্ডেবদের ঋষিগণও স্বীকার করেন যে তাঁহাদের অগ্রবর্তী যাঁহারা ছিলেন, আর্য্য জাতির আদি পূর্বেপুরুষেরা, "পূর্বের পিতরো মনুষ্যা", এই পত্য আবিজার করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই দেবজীবনলাভের সাধনমার্গ পরবভী মানবের সত্যের ও অমৃতত্ত্বের পড়া। তবে ইহাই বলেন, প্রাচীন ঋষিরা যাহা দেখাইয়াছিলেন নূতন ঋষিরাও তাহাই অনুসরণ করিতেছেন, যে দিব্য বাক্ উচ্চারণ করিয়াছিলেন পিতৃগণের সেই বাণীর প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই ঋণ্বেদের মন্ত, অতএব ঋপেবদে এই ধন্দের্মর যে স্বরূপ দেখিতে পাই তাহাকেই তাহার আদিরাপ বলা যায়। ইহারই অতি মহৎ অতি উদার রাপান্তর উপনিষদের জান, বেদান্তের সাধনা । বেদের বৈশ্বদেব্য জ্ঞান ও দেবজীবন সাধনা, উপনিষ্দের আঅজান ও রক্ষপ্রাণিতর সাধনা দুইটি সমন্য়-ধম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত—-বিশ্ব-পুরুষ ও বিশ্বশক্তির নানা দিক, রক্ষের সকল তত্ত্বকে একত্র করিয়া বৈশ্বদেব্য, সর্কাম্ রক্ষের অনুভূতি ও অনুশীলন তাহার মূল কথা। তাহার পরে বিল্লেখণের যুগ আরম্ভ হয়। সত্যের একটি না একটি খণ্ড দর্শন লইয়া বেদান্তের পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা, সাংখ্য যোগ ন্যায় বৈশেষিক বিভিন্ন সাধনা সৃষ্টি করে; শেষে খণ্ড দর্শনের খণ্ড লইয়া অদৈতবাদ, দৈতবাদ, বিশিশ্টাদৈতবাদ, বৈষ্ণব শৈব পুরাণ তন্তু সমন্যের চেপ্টাও কোনও দিন থামে নাই, গীতায়, তন্তে, পুরাণেও সেই চেপ্টা দেখি, প্রত্যেকে কতকটা কৃতার্থও হইয়াছে, অনেক নৃত্ন অধ্যাত্ম অনুভূতিও অর্জন করা হইয়াছে, তবে বেদ উপনিষদের তুল্য ব্যাপকতা আর পাই না। ভারতের আদিম আধ্যাত্ম-বাণী যেন বুদ্ধির অতীত কোনও সর্কব্যাপী উজ্জ্বল জানালোক হইতে উদ্ভূত, যাহাকে অতিক্রম করা দূরের কথা, যেখানে পৌছানও বুদ্ধিপ্রধান পরবর্তী যুগদের অসাধ্য বা কঠিন হইয়া যায়।

8৬

ঈশ উপনিষদ

5

ঈশ উপনিষদের সোজা অর্থ গ্রহণ করার এবং তাহার নিহিত রক্ষাতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব হাদয়লম করার পক্ষে প্রধান অন্তরায় শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত
মায়াবাদ আর উপনিষদের উপর শঙ্কর-প্রণীত ভাষ্য। সাধারণ মায়াবাদ নির্ভির
একমুখী প্রেরণা ও সন্মাসীর প্রশংসিত কম্মবিমুখতার সহিত ঈশ উপনিষদের
সম্পূর্ণ বিরোধ, শ্লোকগুলির অর্থকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া উল্টা অর্থ স্লিট না করিলে
এই বিরোধের সমাধান করা অসম্ভব। যে উপনিষদে লেখা আছে

কুর্ব্বনেবেহ কম্মানি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ

আর লেখা আছে

ন কম্ম লিপ্যতে নরে যে উপনিষদ সাহস করিয়া বলিয়াছে

> অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি য অবিদ্যামুপাসতে ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ

আরও বলিয়াছে

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা

আর ইহাও বলিয়াছে

সম্ভূত্যামৃত্মশ্ৰুতে,

সেই উপনিষদের সঙ্গে মায়াবাদ ও নির্ভি-পথের মিল হইবে কি প্রকারে ? শঙ্করের পরে যদি দাক্ষিণাত্যে অদৈত মতের প্রধান নিয়ন্তা, সেই বিদ্যারণ্য ইহা বুঝিয়াই এই বারটি প্রধান উপনিষদের তালিকা হইতে নিকাচন করিয়া তাহারই স্থানে নৃসিংহতালীয় উপনিষদকে বসাইয়া দিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য প্রচলিত বিধানকে উল্টাইয়া সেইরূপ দুঃসাহস করেন নাই। তিনি বুঝিলেন, ইহা শুন্তি, মায়া শুন্তির প্রতিপাদ্য তত্ত্ব, অতএব এই শুন্তির অর্থও প্রকৃত মায়াবাদের অনুকূল ভিন্ন প্রতিক্র হইতে পারে না।

জগতী যদি পৃথিবীই হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই সকল যাহা কিছু গমনশীলা পৃথিবীতে গমনশীল হয়, অর্থাৎ যত মনুষ্য, পশু, কীট, পাখী, নদ, নদী ইত্যাদি। এই অর্থ বড় অসম্ভব। উপনিষদের ভাষায় সক্ষমিদম্ শব্দে সক্ষিই জগতের যাবৎ বস্তু লক্ষিত হয়, পৃথিবীর নয়। অতএব জগতী শব্দে বুঝিতে হইবে জগৎকাপে প্রকটিত গমনশীলা শক্তি, জগৎ শব্দে যত কিছু প্রকৃতির গতির একটা গতি, হয় প্রাণীরাপে অথবা পদার্থরাপে বিদামান। বিরোধ হয় সম্বর ও জগতের যা-কিছু, এই দুইটির মধ্যে। যেমন স্থার স্থাণু, প্রকৃতি ও শক্তি

গমনশীলা, সর্বাদা কম্মে ও জগৎব্যাপী গতিতে ব্যাপৃত, সেইরাপ জগতে যাহা কিছু আছে তাহার গতির ক্ষুদ্র একটি জগৎ, তাহাও সর্বাদাই প্রতি মুহূর্ত্ত স্পিট-স্থিতি-প্রলয়ের সন্ধিস্থল, চঞ্চল, নশ্বর, স্থানুর বিপরীত। একদিকে ঈশ্বর, একদিকে পৃথিবী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু জঙ্গম, ইহাতে সেই নিত্য বিরোধ ফুটে না। এক-দিকে স্থাণু ঈশ্বর, অপর দিকে চঞ্চলা প্রকৃতি ও তাহার স্পট জগতের মধ্যে প্রকৃতির অধিকৃত যাহা কিছু আছে,—যাবতীয় অস্থায়ী বস্তু, এই সর্বাজনলক্ষিত নিতা-বিরোধ লইয়া উপনিষ্পের আরম্ভ।

এই বিরোধ ও তাহার সমাধানের উপর সমস্ত উপনিষদ গঠিত। পরে ঈশ্বর কি আর জগৎ কি তাহার বিচার করিতে গিয়া উপনিষৎকার তিনবার তাহাই অন্যপ্রকারে উত্থাপন করিয়াছেন। প্রথম ব্রহ্মের বেলায় পুরুষ ও প্রকৃতির বিরোধ অনৈজদ্ একং মনসো জবীয়ঃ…তদ্ এজতি তল্লৈজতি—এই ক্যটি শব্দে তিনি ব্যাইমাছেন যে দুইটি ব্রহ্ম, পুরুষও ব্রহ্ম, প্রকৃতি আর প্রকৃতিরূপী জগৎও ব্রহ্ম। তাহার পর আত্মার কথায়, ঈশ্বর ও যাহা কিছু জগতের তাহাদের বিরোধ। আত্মাই ঈশ্বর, পুরুষ

নিংড়াইলে নিশ্চয় প্রকৃত লুকায়িত অর্থ অর্থাৎ মায়াবাদ—–যন্ত্রণায় বাধ্য হইয়া বাহির হইয়া আসিবে। এই উপলব্ধির বশীভূত হইয়া শঙ্করাচার্য্য ঈশ উপনিষদের ভাষ্য প্রথয়ন করিয়াছেন।

দেখা যাক একদিকে শাস্কর ভাষ্য কি বলে আর অপর দিকে সত্য সত্য উপ-নিষদই কি বলে। উপনিষৎকার ঈশ্বরতত্ত্ব ও জগৎতত্ত্বকে প্রথমেই পরস্পরের সম্মুখ করিয়া মিলাইয়া এই দুইটির মূল সম্বন্ধ নির্দেশ করিলেন।

ঈশা বাস্যমিদং সর্বাং য় কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
ইহার সোজা অর্থ "ঈশ্বরের বাস করিবার অর্থে এই সকল বিদ্যমান, যাহা কিছু
জগতীর মধ্যে জগৎ" অর্থাৎ গমনশীলার মধ্যে গমনশীল। ইহা সহজে বোঝা
যায় যে বিশ্ববিকাশে দুইটি তত্ত্ব প্রকটিত হয়, স্থাণু ও জগতী, নিশ্চল সর্বাব্যাপী
নিয়ামক পুরুষ ও গমনশীলা প্রকৃতি। ঈশ্বর ও শক্তি। স্থাণুকে যখন ঈশ্বর নাম
দেওয়া হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ এই যে, জগতী
ঈশ্বরের অধীন, তাঁহা দ্বারা নিয়ন্তিত, তাঁহার ইচ্ছায় প্রকৃতি সকল কম্ম করেন।
এই পুরুষ ওধু সাক্ষী ও অনুমন্তা নয়, জাতা ঈশ্বর, কম্মের নিয়ন্তা, প্রকৃতি কম্মের
নিয়ন্তা নহে, নিয়তি মাত্র, কল্লী বটে কিন্তু কর্তার অধীনে, পুরুষের আজাধীন
হইয়া তাঁহার কার্য্যকারিণী শক্তি।

তাহার পর ইহাও দেখা যায় যে, এই জগতী শুধু গমনশীলা শক্তি, শুধু জগৎকরণস্থরাপ তত্ত্ব নয়, সে জগৎরাপেও বর্ত্তমান। জগতী শব্দের সাধারণ অর্থ পৃথিবী, তবে এখানে তাহা খাটে না। "জগত্যাম্ জগৎ" এই দুই শব্দের সংযোগে উপনিষৎকার ইঙ্গিত করিয়াছেন যে দুইটির ধাতুগত অর্থ উপেক্ষণীয় নহে। তাহারউপর জাের দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য।

ঈশ উপনিষ্দ

₹

ঈশ উপনিষদ পূর্ণযোগ-তত্ত্ব ও পূর্ণ আধ্যাত্মসিদ্ধি-পরিচায়ক, অস্ক্লেতে বহু সমস্যা সমাধানকারী, অতি মহৎ অতল গভীর অর্থে পরিপূর্ণ শুন্তি। আঠার শ্লোকে সমাপত কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার মন্ত্রে জগতের ততােধিক মুখ্য সত্য ব্যাখ্যাত। এইরাপ ক্ষুদ্র পরিসরে অনন্ত অমূল্য সম্পত্তি——infinite riches in a little room——শুন্তিতেই পাওয়া যায়।

সমন্য়-জান সমন্য়-ধৰ্মা, বিপরীতের মিলন ও একীকরণ এই উপনিষদের প্রাণ। পাশ্চান্ত্য দর্শনে একটি নিয়ম আছে যাহাকে Law of contradiction বলে, বিপরীতের পরস্পর বহিষ্করণ বলা যায়। দুইটি বিপরীত সিদ্ধান্ত একসঙ্গে টিকিতে পারে না, মিলিত হইতে পারে না, দুইটি বিপরীত গুণ এক সময়ে এক স্থানে এক আধারে এক বস্তুর সম্বন্ধে যুগপৎ সত্য হইতে পারে না। এই নিয়ম অনুসারে বিপরীতের মিলন ও একীকরণ হইতেই পারে না। ভগবান যদি এক হন, তিনি হাজার সর্ক্শক্তিমান হউন বহু হইতে পারেন না। অনন্ত কখন সাভ হয় না। অরূপের রূপ হওয়া অসাধ্য, সে সরূপ হইলে তাহার অরূপত্ব বিন্দ্ট হয়। রহা যে এক সময়েই নিগুঁপ ও সগুণ, উপনিষদ যেমন ভগবানের সম্বন্ধে বলে যে তিনি "নিগুণো ভণী", এই সিদ্ধান্তকেও এই যুক্তি উড়াইয়া দেয় ৷ ্রক্ষের নিগুঁণজ, অরাপজ, একজ, অনভজ যদি সত্য হয়, তাহার সভণজ, সরাপজ, বহুজ, সান্ততা মিথাা, "ব্রহ্ম সত্যং জগুরিখ্যা" মায়াবাদীর এই সর্বাধ্বংসী সিদ্ধান্ত এই দার্শনিক নিয়মের চরম পরিণতি। ঈশ উপনিষদের দ্রুটা ঋষি প্রতিপদে এই নিয়মকে দলন করিয়া প্রতি শ্লোকে তাহার যেন অসারত্ব ঘোষণা করিয়া বৈপ-রীত্যের মধ্যে বিপরীত তত্ত্বের গুণ্ত হাদয়ে মিলন ও একীকরণের স্থান বাহির করিয়া চলিতেছেন। গতিশীল জগৎ ও স্থাণু পুরুষের একত্ব, পূর্ণ ত্যাগে পূর্ণ ভোগ, পূর্ণ কম্মের্ম সনাতন মুজি, রক্ষের গতির মধ্যেই চিরস্থাণুত্ব, চিরন্তন স্থাণুত্বে অবাধ অচিন্ত্য গতি, অক্ষর ব্রহ্ম ও ক্ষর জগতের একত্ব, নিগুণ ব্রহ্ম ও সগুণ বিশ্বপুরুষের একত, যেমন অবিদ্যায় তেমন বিদ্যায় পরম অমরত্ব লাভের অভাব, যুগপৎ বিদ্যা অবিদ্যা সেবনে অমরত, জন্মচক্রঘুরণেও নয়, জন্মবিনাশেও নয়, যুগপৎ সভূতি ও অসভূতির সিদ্ধিতে পরম মুক্তি ও পরম সিদ্ধি, এইগুলিই উপনিষদের উচ্চকণ্ঠে প্রচারিত মহাতথ্য।

দুর্ভাগ্যবশতঃ উপনিষদের অর্থ লইয়া অনর্থক গোল করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য উপনিষ্দের প্রধান প্রায়ই সক্জিনস্বীকৃত টীকাকার, কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্ত যদি গৃহীত হয়, শঙ্করের মায়াবাদ অতল জলে ডুবিয়া যায়। মায়াবাদের

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

¢0

প্রতিষ্ঠাতা দার্শনিকদের মধ্যে অতুল্য অপরিমেয় শক্তিশালী। যমুনানদী স্থপথ-ত্যাগে অনিচ্ছুক হওয়ায় তৃষিত বলরাম যেমন লাগলাকর্ষণে তাহাকে টানিয়া হিঁচডাইয়া চরণপ্রান্তে হাজির করিয়া দিলেন, শঙ্করও গন্তব্যস্থলের পথে এই মায়াবাদনাশী উপনিষ্ণকে পাইয়া তাহার অর্থ টানিয়া হিঁচড়াইয়া স্বমতের সহিত মিলাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাহাতে উপনিষদের কি দুর্দশা হইয়াছে, দুয়েকটি দৃষ্টান্তে বোঝা যায়। উপনিষদে বলা আছে যাহারা একমাত্র অবিদ্যাকে উপাসনা করে, তাহারা ঘোর অন্ধকারে পতিত হয়, আবার যাহারা একমার বিদ্যাকে উপাসনা করে, তাহারা যেন আরও গাঢ় অন্ধকারে প্রবেশ করে ৷ শঙ্কর বলেন, বিদ্যা ও অবিদ্যা এই স্থলে সাধারণ অর্থে আমি বুঝিব না, বিদ্যার অর্থ এখানে দেববিদ্যা ৷ উপনিষদে বলা আছে, "বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভবেনামৃতমশ্বতে," অসম্ভূতি দারা মৃত্যুকে জয় করিয়া সম্ভূতি দারা অমরত্ব **ভোগ করিব। শ**ঙ্কর বলেন, পড়িতে হয় "অসভূত্যামৃতং," বিনাশের অর্থ এখানে জন্ম। দ্বৈতবাদী একজন টীকাকার ঠিক এইভাবে "তত্তমসি" কথা পাইয়া বলেন, "অতৎ ভুমসি" পড়িতে হইবে। শঙ্করের পরবর্তী একজন প্রধান মায়াবাদী আচার্য্য অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, ঈশ উপনিষদকে মুখ্য প্রমাণস্বরূপ উপনিষদের তালিকা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া নৃসিংহোভরতাপনীয়কে তাহার স্থলে 'প্রমোট' (promote) করিয়া চরিতার্থ ইইলেন । বাস্তবিক এইরাপ গায়ের জোরে স্বমত স্থাপনের প্রয়োজন নাই। উপনিষদ অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত দিক, কোন একমাত্র দার্শনিক মতের পরিপোষক নয় দেখায় বলিয়া সহস্ত দার্শনিক মত এই এক বীজ হইতে অঙ্কুরিত হইয়াছে। প্রত্যেক দর্শন অনভ সত্যের এক একটি দিক বুদ্ধির সম্মুখে শৃঙ্খলিতভাবে উপস্থিত করে। অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত বিকাশ, অনন্ত ব্রহ্মে পৌছিবার পথও অগণ্য।

THE PURANAS

পুরাণ

পুরাণ

পূর্বে প্রবন্ধে উপনিষ্ণদের কথা লিখিয়াছি এবং উপনিষ্ণদের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিবার প্রণালী দেখাইয়াছি। উপনিষদ যেমন হিন্দুধন্মের প্রমাণ, পুরাণও প্রমাণ ; শুনতি যেমন প্রমাণ, স্যৃতিও প্রমাণ, কিন্ত একদরের নহে। শুনতি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের সঙ্গে যদি স্মৃতির বিরোধ হয়, তাহা হইলে স্মৃতির প্রমাণ গ্রহণীয় নহে। যাহা যোগসিদ্ধ দিব্যচক্ষুপ্রাণ্ড ঋষিগণ দর্শন করিয়াছেন, অন্তর্য্যামী জগদ্ভক তাঁহাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধিকে শুবণ করাইয়াছেন, তাহাই শুনতি। প্রাচীন জান ও বিদ্যা, যাহা পুরুষপরস্পরায় রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাই স্মৃতি। শেষোক্ত জান অনেকের মুখে অনেকের মনে পরিবত্তিত, বিকৃতও হইয়া আসিতে পারে, অবস্থান্তরে নূতন নূতন মত ও প্রয়োজনের অনুকূল নূতন আকার ধারণ করিয়া আসিতে পারে। অত্এব স্মৃতি শুনতির ন্যায় অদ্রান্ত বলা যায় না। স্মৃতি অপৌক্ষষেয়নহে, মনুষ্যের সীমাবদ্ধ পরিবর্ত্তনশীল মত ও বুদ্ধির স্থিট।

পুরাণ স্মৃতির মধ্যে প্রধান। উপনিষদের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পুরাণে উপন্যাস ও রূপকাকারে পরিণত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভারতের ইতিহাস, হিন্দুধস্মের উত্তরোত্তর রুদ্ধি ও অভিব্যক্তি, পুরাত্তন সামাজিক অবস্থা, আচার, পূজা, যোগ-সাধন, চিন্তা-প্রণালীর অনেক আবশ্যক কথা পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন পুরাণকার প্রায় সকলে হয় সিদ্ধ, নয় সাধক ; তাঁহাদের জান ও সাধনলব্ধ উপলব্ধি তাঁহাদের রচিত পুরাণে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বেদ ও উপনিষদ **হিন্দু**ধস্মের আসল প্রত্য প্রাণ সেই প্রত্যের ব্যাখ্যা । ব্যাখ্যা আসল প্রত্যের সমান হইতে পারে না । তুমি যে ব্যাখ্যা কর আমি সেই ব্যাখ্যা না-ও করিতে পারি, কিন্তু আসল গ্রন্থ পরি-বর্তুন বা অগ্রাহ্য করিবার কাহারও অধিকার নাই। যাহা বেদ ও উপনিয়দ মিলে না, তাহা হিন্দুধস্মের অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, কিন্তু পুরাণের সঙ্গে মিল না হইলেও নূতন চিভা গৃহীত হইতে পারে। ব্যাখ্যার মূল ব্যাখ্যাকর্তার মেধাশভিদ, জ্ঞান ও বিদ্যার উপরে নির্ভর করে। যেখন, ব্যাসদেবের রচিত পুরাণ যদি বিদ্যমান থাকিত তাহার আদর প্রায় শুন্তির সমান হইত ; তাহার অভাবে ও লোমহর্ষণ রচিত পুরাণের অভাবে যে অস্টাদশ পুরাণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে সকলের সমান আদর না করিয়া বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের ন্যায় যোগসিদ্ধ ব্যক্তির রচনাকে অধিক মূল্যবান বলিতে হয়, মার্কণ্ডেয় পুরাণের মত পণ্ডিত অধ্যাত্মবিদ্যাপরায়ণ লেখকের রচনাকে শিব বা অগ্নিপুরাণ অপেক্ষা গভীর জ্ঞানপূর্ণ ব**লি**য়া চিনিতে হয়। তবে ব্যাসদেবের পুরাণ যখন আধুনিক পুরাণ-গুলির আদিগ্রন্থ, এইগুলির মধ্যে যেটি নিকৃষ্ট তাহাতেও হিন্দুধন্দের্মর তত্ত্বপ্রকাশক

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

œ8

অনেক কথা নিশ্চয় রহিয়াছে, এবং যখন নিকুপ্ট পুরাণও জিজাসু বা ভক্ত যোগাভ্যাসরত সাধকের লেখা, তখন রচয়িতার স্থপ্রয়াস-লশ্ধ জান ও চিন্তাও আদরণীয়।

বেদ ও উপনিষদ হইতে পুরাণকে স্বতন্ত করিয়া বৈদিক ধর্ম্ম ও পৌরাণিক ধর্ম্ম বিলিয়া ইংরাজীশিক্ষিত লোক যে মিথ্যা ভেদ করিয়াছে, তাহা দ্রম ও অজ্ঞানসভূত। বেদ ও উপনিষদের জ্ঞান সর্ব্বসাধারণকে বুঝায়, ব্যাখ্যা করে, বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে, জীবনের সামান্য সামান্য কার্য্যে লাগাইবার চেম্টা করে বিলিয়া পুরাণ হিন্দুধম্মের প্রমাণের মধ্যে গৃহীত। যাঁহারা বেদ ও উপনিষদ ভুলিয়া পুরাণকে স্বতন্ত ও যথেম্ট প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারাও দ্রান্ত। তাহাতে হিন্দুধম্মের অদ্রান্ত ও অপৌক্ষষেয় মূল বাদ দেওয়ার দ্রম ও মিথ্যাক্তানকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, বেদের অর্থ লোপ পায়, পুরাণের প্রকৃত অর্থও লোপ পায়। বেদের উপর পুরাণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুরাণের উপযোগ করিতে হয়।

THE GITA

গীতা

গীতার ধম্ম

যাঁহারা গীতা মনোযোগপূকাক পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মনে হয়ত এই প্রশ উঠিতে পারে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বার বার যোগ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ও যুক্তা-বস্থার বর্ণনা করিয়াছেন ; কই সাধারণ লোকে যাহাকে যোগ বলে, তাহার সঙ্গে তাহার মিল ত হয় না ; গ্রীকুষ্ণ স্থানে স্থানে সন্ধ্যাসের প্রশংসা করিয়াছেন, অনি-র্দ্দেশ্য পরব্রন্ধের উপাসনায় পরম গতিও নিদ্দিল্ট করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অতি সংক্ষেপে সাস করিয়া গীতার শ্রেষ্ঠাংশে ত্যাপের মহত্ত্ব ও বাস্দেবের উপর শ্রদ্ধায় ও আভাসমর্পণে পরমাবস্থাপ্রাণিত বিবিধ উপায়ে অর্জুনকে বুঝাইয়াছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাজ্যোগের কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে, কিন্তু গীতাকে রাজ্যোগাখ্যাপকগ্রন্থ বলা যায় না। সমতা, অনাসন্তি, কর্ম্ফলত্যাগ, শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, নিষ্কাম কম্ম, গুণাতীত্য ও স্বধ্যম্সেবাই গীতার মূলতত্ত্ব। এই শিক্ষাকেই ভগবান পরম জান ও গৃঢ়তম রহস্য বলিয়া কীওঁন করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস গীতাই জগতের ভাবীধন্মের সক্জেনসম্মত শাস্ত্র হইবে। কিন্তু গীতার প্রকৃত অর্থ সকলের হৃদয়লম হয় নাই। বড় বড় পণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠ মেধাবী তীক্ষুবুদ্ধি লেখকও ইহার গৃঢ়ার্থ গ্রহণে অক্ষম। একদিকে মোক্ষপরায়ণ ব্যাখ্যাকর্তা গীতার মধ্যে অদৈতবাদ ও সন্মাসধস্মের শ্রেষ্ঠতা দেখিয়াছেন, অপরদিকে ইংরাজ-দর্শনসিদ্ধ ব্যুক্তিমচন্দ্র গীতায় কেবলমাত্র বীরভাবে কর্তব্যপালনের উপদেশ পাইয়া সেই অর্থই তরুণমণ্ডলীর মনে ঢুকাইবার চেল্টা করিয়াছেন। সন্যাসধর্ম উৎকুল্ট ধর্ম্ম, সন্দেহ নাই, কিন্তু সে ধর্ম্ম অল্পসংখ্যক লোক আচরণ করিতে পারে। সর্বাজন-সম্মত ধ্যেম এমন আদুৰ্শ ও ততুশিক্ষা থাকা আবশ্যক যে স্বৰ্বসাধারণে তাহা য় য় জীবনে ও কম্মক্ষেত্রে উপলব্ধি করিতে পারে, অথচ সেই আদর্শ সম্পূর্ণ আচরণ করায় অল্পন্সাধ্য প্রম গতি প্রা^৯ত হইবে। বীরভাবে কর্তব্যপালন উৎকৃষ্ট ধুমুম্ বটে, তবে কওঁব্য কি. এই জটিলসমস্যা লইয়া ধুমুম্ ও নীতির যত বিদ্রাট। ভগবান বলিয়াছেন, গহনা কম্মণো গতিঃ, কি কর্ত্ব্য, কি অকর্ত্ব্য, কি কম্ম, কি অকম্ম, কি বিকম্ম, তাহা নির্ণয় করিতে জানীও বিব্রত হইয়া পড়েন, আমি কিন্তু তোমাকে এমন জান দিব যে তোমার গন্তব্যপথ নির্দারণে বেগ পাইড়ে হইবে না, কম্মজীবনের লক্ষ্য ও স্বর্ধা অনুষ্ঠেয় নিয়ম এককথায় বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইবে। এই জ্ঞানটা কি, এই লাখ কথার এক কথা কোথায় পাইব ? আমাদের বিশ্বাস গীতার শেষ অধ্যায়ে ভগবান যেখানে তাঁহার সর্ব-গুহাতম পরম বক্তব্য অর্জুনের নিকট বলিতে প্রতিশুহত হন, সেইখানেই এই দুর্লভ অমূল্য বস্তু অনুষণ করিলে পাওয়া যায়। সেই সর্ব্বভহ্যতম প্রম কথা কি?

৫৮ শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

মনানা ভব মদ্ভেল মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে॥
সক্রধম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শর্গং ব্রজ।
অহং জাং সক্রপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা ভচঃ॥

এই দুটি শ্লোকের অর্থ এক কথায় ব্যক্ত হয়, আত্মসমর্পণ । যিনি যত পরিমাণে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহার শরীরে তত পরিমাণে ভগবদ্দত শক্তি আসিয়া পরম মঙ্গলময়ের প্রসাদে পাপমুক্ত ও দেব– ভাবপ্রাপ্ত করে। সেই আত্মসমর্পণের বর্ণনা প্রথম শ্লোকার্দ্ধে করা হইয়াছে। তন্মনা তদ্ভজ তদ্যাজী হইতে হয়। তন্মনা অর্থাৎ সক্ষ্ভূতে তাঁহাকে দশন করা, সর্বাকালে তাঁহাকে সমরণ করা, সর্বাকার্য্যে সর্বাঘটনায় তাঁহার শক্তি জ্ঞান ও প্রেমের খেলা বুঝিয়া প্রমানন্দে থাকা। তদ্ভক্ত অর্থাৎ তাঁহার উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও প্রীতি স্থাপন করিয়া তাঁহার সহিত যুক্ত থাকা। তদ্যাজী অর্থাৎ ক্ষুদ্র মহৎ সর্বাকম্ম শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে অর্পণ করা এবং স্বার্থ ও কম্মাঁফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া তদর্থে কর্ত্তব্যকম্মে প্রবৃত্ত হওয়া। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ মানুষের পক্ষে কঠিন, কিন্তু অল্পমাত্র চেম্টা করিলে স্বয়ং ভগবান অভয়দানে শুরু, রক্ষক ও সুহাদ্ হইয়া যোগপথে অগ্রসর করাইয়া দেন। স্বল্পস্তার ধর্মস্তারাতে মহতো ভয়াৎ। তিনি বলিয়াছেন এই ধর্ম্ম আচরণ করা সহজ ও সুখপ্রদ। বাস্তবিকই তাহাই, অথচ সম্পূর্ণ আচরণের ফল অনিব্রচনীয় আনন্দ, গুদ্ধি ও শক্তিলাভ । মামেবৈষ্যসি অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত হইবে, আমার সহিত বাস করিবে, আমার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে। এই কথায় সাদৃশ্য, সালোক্য ও সাযুজ্য ফলপ্রাপিত ব্যস্ত হইয়াছে । যিনি গুণাতীত তিনিই ভগবানের সাদৃশ্যপ্রাপত । তাঁহার কোনও আসজি নাই, অথচ তিনি কম্ম করেন, পাপমুক্ত হইয়া মহাশক্তির আধার হন ও সেই শক্তির সর্বাকার্য্যে আনন্দিত হন। সালোক্যও কেবল দেহ-পতনান্তর ব্রহ্মলোকগতি নয়, এই শরীরেও সালোক্য হয়। দেহযুক্ত জীব যখন তাঁহার অভরে পরমেগ্রের সহিত ক্রীড়া করেন, মন তাঁহার দভ জানে পুলকিত হয়, হাদয় তাঁহার প্রেমস্পর্শে আনন্দপ্তত হয়, বুদ্ধি মুহর্মুহঃ তাঁহার বাণী শ্রবণ করে ও প্রত্যেক চিভায় তাঁহারই প্রেরণা জাত হয়, ইহাই মানবশরীরে ভগবানের সহিত সালোক্য। সাযুজ্যও এই শ্রীরে ঘটে। গীতায় তাঁহার মধ্যে নিবাস করার কথা পাওয়া যায়। যখন সৰ্ব্বজীবে তিনি, এই উপলব্ধি স্থায়ীভাবে থাকে. ইন্দ্রিয়সকল তাঁহাকেই দর্শন করে, শ্রবণ করে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, স্পর্শ করে, জীব সর্ব্বদা তাঁহার মধ্যে অংশভাবে থাকিতে অভ্যন্ত হয়, তখন এই শরীরেও সাযুজ্য হয়। এই প্রমগতি সম্পূর্ণ অনুশীলনের ফল। কিন্তু এই ধন্মের অল্প আচরণেও মহতী শক্তি, বিমল আনন্দ, পূর্ণ সুখ ও শুদ্ধতা লাভ হয় ৷ এই ধর্ম্ম বিশিপ্ট-গুণ-সম্পন্ন লোকের জন্য সূপ্ট হয় নাই। ভগবান বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পুরুষ, স্ত্রী, পাপযোনি–প্রাপ্ত–জীবসকল পর্য্যন্ত তাঁহাকে এই ধর্ম্ম দারা প্রাণ্ড হইতে পারে। ঘোর পাপীও তাঁহার শরণ লইয়া অল্লদিনের

গীতার ধম্ম

৫৯

মধ্যে বিশুদ্ধ হয়। অতএব এই ধম্ম সকলের আচরণীয়। জগল্লাথের মন্দিরে জাতিবিচার নাই। অথচ ইহার প্রমগতি কোনও ধম্মনিদ্দিস্ট প্রমাবস্থার ন্যুন্ময়।

সন্যাস ও ত্যাগ

পূবর্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, গীডোভা ধম্ম সকলের আচরণীয়, গীতোজ যোগে সকলের অধিকার আছে অথচ সেই ধম্মের প্রমাবস্থা কোনও ধম্মোজ পরমাবস্থাপেক্ষা ন্যুন নহে। গীতোক্ত ধর্ম্ম নিষ্কাম কম্মীর ধর্ম্ম। আমাদের দেশে আর্য্যধম্মের পুনরুখানের সহিত একটি সন্ন্যাসমুখী স্রোত দেশময় ব্যাণ্ড হইতেছে। রাজ্যোগ-প্রয়াসী ব্যক্তির মন সহজে গৃহকদেম বা গৃহবাসে সম্ভল্ট থাকিতে চায় না। তাঁহার যোগাভ্যাসে ধ্যান-ধারণার বহুলায়াসপূর্ণ চেল্টা আবশ্যক। অল্প মনঃক্ষোভে অথবা বাহ্যস্পর্শে ধ্যান-ধারণার স্থিরতা বিচলিত হয় বা সম্পূর্ণ বিনাশপ্রাণ্ড হয়। গৃহে এইরূপ বাধা প্রচুর পরিমাণে বর্ডমান। অতএব যাঁহারা পূর্ব্বজন্মপ্রাপ্ত যোগলিপ্সা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে তরুণ বয়সে সন্ন্যাসের দিকে আকৃষ্ট হওয়া একান্ত স্থাভাবিক। যখন এইরূপ-জন্মপ্রাণ্ড যোগলিপসুদিগের সংখ্যা অধিক হইয়া দেশময় সেই শক্তি-সংক্রামণে যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাসমুখী স্রোত প্রবল হয়, তখন দেশের কল্যাণ-পথের দ্বারও উন্মুক্ত হয়, সেই কল্যাণ-সংশ্লিপ্ট বিপদের আশঙ্কাও হয়। বলা হইয়াছে, সন্ন্যাসধর্ম উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, কিন্তু সেই ধর্ম্ম গ্রহণে অল্প লোকই অধিকারী । যাঁহারা বিনা অধিকারে সেই পথে প্রবেশ করেন, তাঁহারা শেষে অল্পুর অগ্রসর হইয়া অর্দ্ধপথে তামসিক অপ্রবৃত্তিজনক আনন্দের অধীন হইয়া নির্ভ হন। এই অবস্থায় ইহজীবন সুখে কাটে বটে, কিন্তু জগতের হিতও সাধিত হয় না, যোগের উর্দ্ধৃতম সোপানে আরোহণও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে । আমাদের যেরূপ কাল ও অবস্থা আগত, তাহাতে রজঃ ও সত্ত্ব অর্থাৎ প্রর্ত্তি ও জান জাগাইয়া তমোবর্জনপূর্বক দেশের সেবায় ও জগতের সেবায় জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি ও নৈতিক বল পুনরুজ্জীবিত করা এখন প্রধান কর্ত্তব্য। এই জীর্ণশীর্ণ তমঃ-পীড়িত স্বার্থসীমাবদ্ধ জাতির ঔরসে জানী, শক্তিমান ও উদার আর্যাজাতির পুনঃস্পিট করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থই বঙ্গদেশে এত শক্তিবিশিপ্ট যোগবলপ্রাণ্ড জীবের জন্ম হইতেছে। ইঁহারা যদি সন্ন্যাসের মোহিনী শক্তি দারা আকৃপ্ট হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ ও ঈশ্বরদত্ত কম্ম প্রত্যাখ্যান করেন, তবে ধর্মনামে জাতির ধ্বংস হইবে। তরুণসম্প্রদায় যেন মনে করেন যে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের সময়ের জন্য নিদ্দিল্ট ; এই আশ্রমের পরবর্তী অবস্থা গৃহস্থাশ্রম বিহিত আছে। যখন কুলরক্ষা ও ভাবী আর্য্যজাতি গঠন দ্বারা পূর্ব্যপুরুষদের নিকট ঋণমুক্ত হইতে পারিব, যখন সৎকশর্ম ধনসঞ্য় ছারা সমাজের ঋণ এবং জান দয়া প্রেম ও শক্তি বিতরণে জগতের ঋণ শোধ হইবে, যখন ভারতজননীর হিতার্থ উদার

ও মহৎ কশর্ম সম্পাদনে জগন্মাতা সন্তুপট হইবেন, তখন বানপ্রস্থ ও সন্ত্যাস আচরণ করা দোষাবহ হইবে না। জন্যথা ধশর্মসঙ্কর ও অধশর্মক্বিক্সি হয়। পূর্বজন্মে ঋণমুক্ত বালসন্ম্যাসীদের কথা বলিতেছি না; কিন্তু জনধিকারীর সন্ত্যাসগ্রহণ নিন্দনীয়। অযথা বৈরাগ্যবাহল্যে ও ক্ষরিয়ের স্বধশর্মত্যাগপ্রবণতায় মহান্ ও উদার বৌদ্ধধশর্ম দেশের জনেক হিত সম্পাদন করিয়াও জনিপট করিয়াছে এবং শেষে ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। নব্যুগের নবীন ধশের্মর মধ্যে যেন এই দেষে প্রবিপটনাহয়।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ অজুঁনকে সন্থ্যাস আচরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন কেন ? তিনি সন্মাসধম্মের গুণ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্ত বৈরাগ্য ও কুপাপরবশ পার্থ বার বার জিজাসা করাতেও শ্রীকৃষ্ণ কম্মগথের আদেশ প্রত্যাহার করেন নাই। অর্জুন জিজাসা করিলেন, যদি কম্ম হইতে কামনারহিত যোগযুক্ত বৃদ্ধিই শ্রেষ্ঠ হয়, তবে তুমি কেন গুরুজনহত্যারূপ অতি ভীষণ কম্মে আমাকে নিযুক্ত করিতেছে : অনেকে অর্জুনের প্রশ্ন পুনরুখাপন করিয়াছেন, এক-একজন প্রীকৃষ্ণকে নিকৃষ্ট ধশ্মোপদেষ্টা ও কুপথপ্রবর্তক বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইয়াছেন যে, সন্ন্যাস হইতে ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, স্বেচ্ছাচার হইতে ভগবানকে সমরণ করিয়া নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্মসেবাই উৎকৃষ্ট। ত্যাগের অর্থ কামনাত্যাগ, স্বার্থত্যাগ, সেই ত্যাগ শিক্ষার জন্য পর্বতে বা নির্জনস্থানে আশ্রয় লইতে হয় না, কম্মক্কেত্রেই কম্ম দারা সেই শিক্ষা হয়, কম্মই যোগপথে আরোহণের উপায় । এই বিচিত্র লীলাময় জগৎ জীবের আনন্দ-উৎপাদনের জন্য সৃষ্ট। ইহা ভগবানের উদ্দেশ্য নহে যে, এই আনন্দময় ক্রীড়া সাল হউক। তিনি জীবকে তাঁহার সখা ও খেলার সাখী করিয়া জগতে আনন্দের স্রোত চালাইতে চান। আমরা যে অভান **অল্লকা**রে আছি, ক্রীড়ার সুবিধার জন্য তিনি দূরে রহিয়াছেন বলিয়াই সে অন্ধকার ঘিরিয়া থাকে। তাঁহার নিদিপ্ট এমন অনেক উপায় আছে যাহা অবলম্বন করিলে অন্ধকার হইতে নিঞ্জি লাভ করিয়া তাঁহার সাল্লিধ্যপ্রাপ্তি হয়। যাঁহারা তাঁহার ক্রীড়ায় বিরক্ত বা বিশ্রামপ্রার্থী হন, তিনি তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহারই জন্য সেই উপায় অবলয়ন করেন, ভগবান তাঁহাদিগকেই ইহলোকে বা পরলোকে খেলার উপযুক্ত সাথী করেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সখা ও ক্রীড়ার সহচর বলিয়া গীতার গূঢ়তম শিক্ষা কি, তাহা ইতিপূর্কো বুঝাইবার চেল্টা করা হইয়াছে ৷ ভগবান অর্জুনকে বলিলেন, কর্ম্সন্ম্যাস জগতের পক্ষে অনিস্টকর এবং ত্যাগহীন সন্ম্যাস বিভূমনা মাত্র। সন্ন্যাসে যে ফললাভ হয়, ত্যাগেও সেই ফললাভ হয়, অর্থাৎ অভান হইতে মুজি, সমতা শজিলাভ, আনন্দলাভ, শ্রীকৃষ্ণলাভ। সর্বজনপূজিত ব্যক্তি যাহা করেন, লোকে তাহাই আদর্শ করিয়া আচরণ করে, অতএব তুমি যদি কশ্র্মসন্ধ্যাস কর, সকলে সেই পথের পথিক হইয়া ধন্স্মসঙ্কর ও অধন্স্প্রধান্য সৃষ্টি করিবে। তুমি কম্মফলস্থা ত্যাগ করিয়া মানুষের সাধারণ ধম্ম আচরণ কর, আদর্শ-স্বরাপ হইয়া সকলকে নিজ নিজ কম্মপথে অগ্রসর হইবার প্রেরণা দাও, তাহা

হুইলেই আমার সাধ্যম্যপ্রাণ্ড ও প্রিয়ত্ম সুহাদ হুইবে। তাহার পরে তিনি বুঝাইয়াছেন যে, কম্মদারা শ্রেয়ঃ-পথে আরচ্ হইয়া সেই পথে শেষ অবস্থায় শ্ম অর্থাৎ সর্ব্ব–আরম্ভ-ত্যাগই বিহিত। ইহাও কম্মসন্ত্রাস নহে, তাহা অহঙ্কার-বর্জন-পূর্বক বহলায়াসপূর্ণ রাজসিক চেল্টাত্যাগে ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া, গুণাতীত হইয়া তাঁহার শক্তিচালিত যন্তের ন্যায় কর্ম্ম করা। সেই অবস্থায় জীবের এই স্থায়ী জ্ঞান হয় যে আমি কর্তা নহি, আমি দ্রপ্টা, আমি ভগবানের অংশ, আমার স্বভাবরচিত এই দেহরূপ কম্মময় আধারে ভগবানের শক্তিই লীলার কার্য্য করে। জীব সাক্ষী ও ভোজা, প্রকৃতি কর্তা, প্রমেশ্বর অনুমন্তা। এই জানপ্রাণ্ড পুরুষ শক্তির কোনও কার্য্যারভে কামনারূপ সাহায্য বা বাধা দিতে ইচ্ছুক হন না। শক্তির অধীন হইয়া দেহ-মন-বুদ্ধি ঈথরাদিস্ট কম্মের প্রয়ত হয়। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ হত্যাকাণ্ডও যদি ভগবানের অনুমত হয় এবং স্বধর্ম্মপথে যদি তাহাই ঘটে, তাহাতেও অলি॰তবুদ্ধি কামনারহিত জানপ্রাণ্ড জীবের পাপ্স্পর্শ হয় না। কিন্তু ইহা অতি অল্পলোকের লভ্য ভান ও আদর্শ, ইহা সাধারণ কম্ম হইতে পারে না। তবে এই পথের সাধারণ পথিকের কর্ত্তব্য কম্ম কি ? তাহারও এই জান কতক পরিমাণে প্রাপ্য যে, তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র। সেই জানের বলে ভগবানকে সমরণ করিয়া স্বধর্মসেবাই তাহার পক্ষে আদিল্ট।

শ্রেয়ান্ স্বধন্দেমা বিগুণঃ পরধন্দমিৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বভাবনিয়তং কন্দর্ম কুর্কান্নাপ্নোতি কিল্বিষ্ম্॥

স্থধশর্ম স্বভাবনিয়ত কশর্ম। কালের গতিতে স্বভাবের অভিব্যক্তি ও পরিণতি হয়। কালের গতিতে মানুষের যে সাধারণ স্বভাব গঠিত হয়, সেই স্বভাবনিয়ত কশর্ম যুগধশর্ম। জাতির কশর্মগতিতে যে জাতীয় স্বভাব গঠিত হয়, সেই স্বভাবনিয়ত কশর্ম জাতির ধশর্ম। ব্যক্তির কশর্মগতিতে যে স্বভাব গঠিত হয়, সেই স্বভাবনিয়ত কশর্ম ব্যক্তির ধশর্ম। এই নানা সনাতন ধশের্মর সাধারণ আদর্শ দ্বারা পরস্পর-সংযুক্ত ও শৃত্থলিত হয়। সাধারণ ধাশ্মিকের পক্ষে এই ধশর্মই স্বধশর্ম। ব্রহ্মচারী অবস্থায় এই ধশর্ম সেবার জন্য ও শক্তি সঞ্চিত হয়, গৃহস্থাশ্রমে এই ধশর্ম অনুষ্ঠিত হয়, এই ধশের্মর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে বানপ্রস্থে বা সন্যাসে অধিকার-প্রাণিত হয়। ইহাই ধশের্মর সনাতন গতি।

বিশ্বরাপ দর্শন

গীতায় বিশ্বরূপ

"বন্দেমাতরম্" শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিপিনচন্দ্র পাল কথা প্রসঙ্গে অর্জুনের বিশ্বরূপদর্শনের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে গীতার একাদশ অধ্যায়ে যে বিশ্বরাপদর্শনের বর্ণনা লিখিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অসত্য, কবির কল্পনা মাত্র। আমরা এই কথার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য। বিশ্বরূপদর্শন গীতার অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অর্জুনের মনে যে দিধা ও সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণ তর্ক ও জ্ঞানগর্ভ উজি দ্বারা নিরসন করিয়াছিলেন, কিন্তু তর্ক ও উপদেশ দারা যে জান লাভ হয় তাহা অদৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, যে জানের উপলব্ধি হইয়াছে, সেই জানেরই দৃঢ়প্রতিষ্ঠা হয় । সেইজন্য অর্জুন অন্তর্য্যামীর অলক্ষিত প্রেরণায় বিশ্বরূপদর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। বিশ্বরূপদর্শনে অর্জুনের সন্দেহ চির্-কালের জন্য তিরোহিত হইল, বুদ্ধি পূত ও বিশুদ্ধ হইয়া গীতার প্রম রহস্য গ্রহণের যোগ্য হইল। বিশ্বরূপদর্শনের পূর্বের গীতায় যে জ্ঞান কথিত হইয়াছিল, তাহা সাধকের উপযোগী জানের বহিরজ ; সেই রূপদর্শনের পরে যে জান কথিত হয়, সেই জান গৃঢ় সত্য, পরম রহস্য, সনাতন শিক্ষা ৷ এই বিশ্বরাপদর্শনের বর্ণনাকে যদি কবির উপমা বলি, গীতার গাভীর্যা, সত্যতা ও গভীরতা নষ্ট হয়, যোগলব্ধ গভীরতম শিক্ষা কয়েকটি দার্শনিক মত ও কবির কল্পনার সমাবেশে পরিণত হয় ৷ বিশ্বরাপদর্শন কল্পনা নয়, উপমা নয়, সত্য , অতিপ্রাকৃত সত্য নহে.--কেননা বিশ্ব প্রকৃতির অন্তর্গত, বিশ্বরূপ অতিপ্রাকৃত হইতে পারে না। বিশ্বরাপ কারণজগতের সত্য, কারণজগতের রাপ দিব্যচক্ষুতে প্রকাশ হয় । দিব্যচক্ষুপ্রাণ্ড **অর্জুন কারণজগতের বিশ্বরূপ দেখিলেন**।

সাকার ও নিরাকার

যাঁহারা নিগুঁপ নিরাকার ব্রন্ধের উপাসক, তাঁহারা গুণ ও আকারের কথা রূপক ও উপমা বলিয়া উড়াইয়া দেন ; যাঁহারা সগুণ নিরাকার ব্রন্ধের উপাসক, তাঁহারা শান্তের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া নিগুঁণত্ব অস্বীকার করেন এবং আকারের কথা রূপক ও উপমা বলিয়া উড়াইয়া দেন। সগুণ সাকার ব্রন্ধের উপাসক এই দুইজনেরই উপর খণ্ণাহস্ত। আমরা তিন মতকেই সঙ্গীণ ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানসভূত বলি। কেননা যাঁহারা সাকার ও নিরাকার, দ্বিবিধ ব্রন্ধকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা কিরূপে এককে সত্য, অপরকে অসত্য কল্পনা বলিয়া জ্ঞানের অন্তিম প্রমাণ নপ্ট করিবেন এবং অসীম ব্রন্ধকে সীমার অধীন করিবেন ? যদি ব্রন্ধের নিগুঁণত্ব ও নিরাকারত্ব অস্বীকার করি, আমরা ভগবানকে খেলো করি, এই কথা

সত্য ; কিন্তু যদি ব্রহ্মের সণ্ডণত্ব ও সাকারত্ব অস্বীকার করি, আমরা ভগবানকে খেলো করি, এই কথাও সত্য। ভগবান রূপের কর্তা, স্রুপ্টা, অধীশ্বর, তিনি কোন রূপে আবদ্ধ নহেন ; কিন্তু যেমন সাকারত্ব দারা আবদ্ধ নহেন, সেইরূপ নিরাকারত দারাও আবদ্ধ নহেন। ভগবান সর্বাশক্তিমান, স্থলপ্রকৃতির নিয়ম বা দেশকালের নিয়মরূপ জালে তাঁহাকে ধরিবার ভান করিয়া আমরা যদি বলি, তুমি যখন অনন্ত, আমি তোমাকে সাভ হইতে দিব না, চেম্টা কর দেখি, তুমি পারিবে না, তুমি আমার অকাট্য তর্ক ও যুক্তিতে আবদ্ধ, যেমন প্রস্পেরোর ইস্তজালে ফাডিনান্দ—এ কি হাস্যকর কথা, এ কি ঘোর অহঙ্কার ও অজ্ঞান। ভগবান বন্ধনরহিত, নিরাকার ও সাকার, সাধককে সাকার হইয়া দুর্শন দেন.--সেই আকারে পূর্ণ ভগবান রহিয়াছেন অথচ সেই সময়েই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। কেননা ভগবান দেশকালাতীত অতর্কগম্য, দেশ ও কাল তাঁহার খেলার সামগ্রী, দেশ ও কাল রাপ জাল ফেলিয়া সর্ব্বভূতকে ধরিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, আমরা কিন্তু তাঁহাকে সেই জালে ধরিতে পারিব না। যতবার তর্ক ও দার্শনিক যুক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই অসাধ্য সাধন করিতে যাই, তত্বার রুস্ময় সেই জালকে সরাইয়া আমাদের অগ্রে, পিছনে, পার্ম্বে, দূরে, চারিদিকে মৃদু মৃদু হাসিয়া বিশ্বরূপ ও বিশ্বাতীত রূপ প্রসার করিয়া বুদ্ধিকে পরাস্ত করে। যে বলে আমি তাঁহাকে জানিতে পারিলাম, সে কিছুই জানে না ; যে বলে আমি জানি অথচ জানি না, সেই প্রকৃত জানী:

বিশ্বরূপ

যিনি শক্তির উপাসক, কর্মযোগী, যন্ত্রীর যন্ত্র হইয়া ভগবদ্-নিদ্দিল্ট কার্য্য করিতে আদিল্ট, তাঁহার চক্ষে বিশ্বরূপদর্শন অতি প্রয়োজনীয়। বিশ্বরূপদর্শনের পুর্বেও তিনি আদেশ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু সেই দর্শনলাভ না হওয়া পর্যান্ত আদেশ ঠিক মঞ্জুর হয় না, রুজু হইয়াছে, পাশ হয় নাই। সেই পর্যান্ত তাঁহার কর্ম্মশিক্ষার ও তৈয়ারী হইবার সময়। বিশ্বরূপদর্শনে কম্মের আরভ্ব। বিশ্বরূপদর্শন অনেক প্রকার হইতে পারে——যেমন সাধনা যেমন সাধকের স্বভাব। কালীর বিশ্বরূপদর্শনে সাধক জগৎময় অপরূপ নারীরূপ দেখেন, এক অথচ অগণন দেহযুক্ত, সর্বান্ত্র সেই নিবিড়-তিমির-প্রসারক ঘনকৃষ্ণ কুভলরাশি আকাশ ছাইয়া রহিয়াছে, সর্বান্ত্র সেই রক্তাক্ত খড় গের আভা নয়ন ঝলসিয়া নৃত্য করিতেছে, জগৎময় সেই ভীষণ অট্টহাসির স্রোত বিশ্বরক্ষান্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতেছে। এই সকল কথা কবির কল্পনা নহে, অতিপ্রাকৃত উপলম্পিকে অসম্পূর্ণ মানবভাষায় বর্ণনা করিবার বিফল চেল্টা নহে। ইহা কালীর আত্মপ্রকাশ, ইহা আমাদের মায়ের প্রকৃত রূপ,—যাহা দিব্যচক্ষুতে দেখা হইয়াছে, তাহার অনতিরঞ্জিত সরল সত্য বর্ণনা। অর্জুন কালীর বিশ্বরূপ দেখেন নাই, দেখিয়াছিলেন কালরূপ শ্রীকৃক্ষের সংহারক বিশ্বরূপ। একই কথা। দিব্যচক্ষুতে দেখিকেন, বাহ্য-

জানহীন সমাধিতে নহে—–যাহা দেখিলেন, ব্যাসদেব তাহার অবিকল অনতি-রঞ্জিতবর্ণনা করিলেন। স্থপ্ন নহে, কল্পনা নহে—–সত্য, জাগ্রত সত্য।

কারণজগতের রূপ

ভগবদ্-অধিষ্ঠিত তিন অবস্থার কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়.—প্রাক্ত-অধিষ্ঠিত সুমুণিত, তৈজস বা হিরণাগর্ভ-অধিষ্ঠিত স্বপ্ন, বিরাট-অধিষ্ঠিত জাগ্রত। প্রত্যেক অবস্থা এক এক জগণ। সুমুণিততে কারণজগণ, স্বপ্নে সূক্ষ্মজগণ, জাগ্রতে সূলজগণ। কারণে যাহা নিলীত হয় আমাদের দেশ-কালের অতীত সূক্ষ্মে তাহা প্রতিভাসিত, ও স্থূলে আংশিকভাবে স্থূলজগতের নিয়ম অনুসারে অভিনীত হয়। প্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, আমি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পূর্ক্ষেই বধ করিয়াছি, অথচ স্থূলজগতে ধার্ত্তরাক্ত্রগণ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের সম্মুখে দন্তায়্রমান, জীবিত, যুদ্ধে ব্যাপৃত। ভগ্রানের এই কথা অসত্য নহে, উপমাও নহে। কারণজগতে তিনি তাঁহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন, নচেণ ইহলোকে তাঁহাদের বধ অসম্ভব। আমাদের প্রকৃত জীবন কারণে, স্থূলে তাহার ছায়া মাত্র পড়ে। কিন্তু কারণজগতের নিয়ম, দেশ, কাল, রূপ, নাম স্বতপ্ত। বিশ্বরূপ কারণের রূপ, স্থূলে দিব্যচক্ষুতে প্রকাশিত হয়।

দিব্যচক্ষু

দিব্যচক্ষু কি ? কল্পনার চক্ষু নহে, কবির উপমা নহে। যোগলব্ধ দৃষ্টির তিন প্রকার আছে—স্কুদৃষ্টি, বিজ্ঞানচক্ষু ও দিব্যচক্ষু। সূক্ষদৃষ্টিতে আমরা সপ্রে বা জাগ্রদবস্থায় মানসিক মূত্তি দেখি, বিজ্ঞানচক্ষুতে আমরা সমাধিস্থ হইয়া সূক্ষাজগৎ ও কারণজগতের অন্তর্গত নামরূপের প্রতিমূত্তি ও সাঙ্কেতিক রূপ চিত্তাকাশে দেখি, দিব্যচক্ষুতে কারণজগতের নামরূপ উপলব্ধি করি,—সমাধিতেও উপলব্ধি করি, সূলচক্ষুর সম্মুখেও দেখিতে পাই। যাহা সূলেন্ডিয়ের অগোচর, তাহা যদি ইন্দিয়গোচর হয় ইহাকে দিব্যচক্ষুর প্রভাব বুঝিতে হয়। অর্জুন দিব্যচক্ষু প্রভাবে জাগ্রদবস্থায় ভগবানের কারণান্তর্গত বিশ্বরূপ দেখিয়া সন্দেহমুক্ত হইলেন। সেই বিশ্বরূপদর্শন স্থলজগতের ইন্দিয়গোচর সত্য না হউক, স্থল সত্য অপেক্ষা সত্য—কল্পনা, অসত্য বা উপমা নহে।

গীতার ভূমিকা

প্রস্তাবনা

গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ ধন্ম্পুস্তক। গীতায় যে জান সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই জান চরম ও গুহাতম, গীতায় যে ধন্মনীতি প্রচারিত, সকল ধন্মনীতি সেই নীতির অভনিহিত এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত, গীতায় যে কন্ম্পন্থা প্রদ্শিত, সেই কন্ম্পন্থা উন্নতিমুখী জগতের সনাতন মার্গ।

গীতা অযুতরত্বপ্রসূত্রতার সমুদ্র। সমস্ত জীবনকাল সেই সমুদ্রের নিশ্নস্তরে অবতরণ করিতে করিতেও গভীরতার অনুমান করা যায় না, তল পাওয়া যায় না। শত বৎসর খুঁজিতে খুঁজিতে সেই অনত রত্বভাগুরের সহস্রাংশ ধনও আহরণ করা দুষ্কর। অথচ দু-একটি রত্ব উদ্ধার করিতে পারিলে দরিদ্র ধনী হন, গভীর চিন্তাশীল জানী, ভগবদিদ্বেষী প্রেমিক, মহাপরাক্রমী শক্তিমান কশ্মবীর তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত ও সম্বদ্ধ হইয়া কশ্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসেন।

গীতা অক্ষয় মণির আকর। যুগে যুগে আকরছ মণি যদি সংগ্রহ করা যায়, তথাপি ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সক্রদা নূতন নূতন অমূল্য মণিমাণিক্য লাভ করিয়া হাল্ট ও বিদ্মত হইবেন।

এইরূপ গভীর ও গুণ্ডজানপূর্ণ পুস্তক অথচ ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল, রচনা সরল, বাহ্যিক অর্থ সহজবোধগম্য। গীতাসমুদ্রের অনুষ্চ তরঙ্গের উপরে উপরে বেড়াইলেও, ডুব না দিলেও, কতক শক্তি ও আনন্দ র্দ্ধি হয়। গীতারূপ আকরের রুছোদ্দীপিত অন্ধকারের ভিতর প্রবেশ না করিয়া চারিপার্থে বেড়াইলেও তৃণের মধ্যে পতিত উজ্জল মণি পাওয়া যায়, ইহজীবনের তরে তাহাই লইয়া ধনী সাজিতে পারিব।

গীতার সহস্র ব্যাখ্যা হইলেও এমন সময় কখনও আসিবে না যখন নূতন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে না। এমন জগৎশ্রেষ্ঠ মহাপণ্ডিত বা গভীর জানী গীতার ব্যাখ্যা করিতে পারেন না যে তাঁহার ব্যাখ্যা ক্ষমক্রম হইলে বলিতে পারি, হইয়াছে, ইহার পরে আর গীতার ব্যাখ্যা করা নিম্প্রয়োজন, সমস্ত অর্থ বোঝা গেল। সমস্ত বুদ্ধি খরচ করিয়া এই জানের কয়েকদিক মাত্র বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিব, বহুকাল যোগমগ্ন হইয়া বা নিক্ষাম কম্মমার্গে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে আরুত্ হইয়া এই পর্যান্ত বলিতে পারিব যে গীতোক্ত কয়েকটি গভীর সত্য উপলব্ধি করিলাম বা গীতার দু-একটি শিক্ষা ইহজীবনে কার্য্যে পরিণত করিলাম। লেখক যেটুকু উপলব্ধি করিয়াছেন, যেটুকু কম্মপথে অভ্যাস করিয়াছেন, বিচার ও বিতর্ক দ্বারা তদনুযায়ী যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা অপরের সাহায্যার্থ বির্ত করা এই প্রস্কণ্ডলির উদ্দেশ্য।

গীতার ভূমিকা

৬৭

বক্তা

গীতার উদ্দেশ্য ও অর্থ বুঝিতে হইলে পূর্বের বক্তা, পাত্র ও তখনকার অবস্থার কথা বিচার করা প্রয়োজন। বক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, পাত্র তাঁহার সখা বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, অবস্থা কুরুক্ষেত্রের ভীষণ হত্যাকাণ্ডের আরম্ভ।

অনেকে বলেন, মহাভারত রূপকমার, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, অর্জুন জীব, ধার্ত-রাজুগণ রিপু সকল, পাণ্ডবসেনা মুক্তির অনুকূল রভি। ইহাতে যেমন মহাভারতকে কাব্যজগতে হীন স্থান দেওয়া হয়, তেমনই গীতার গভীরতা, কম্মীর জীবনে উপযোগিতা ও উচ্চ মানবজাতির উন্নতিকারক শিক্ষা শব্র ও নচ্ট হয়। কুরুক্ষের যুদ্ধ কেবল গীতাচিত্রের ফ্রেম নয়, গীতোক্ত শিক্ষার মূল কারণ এবং গীতোক্ত ধর্ম্ম সম্পাদনের শ্রেষ্ঠ ক্ষের। কুরুক্ষের মহাযুদ্ধের কাল্পনিক অর্থ যদি স্বীকার করা যায়, গীতার ধর্ম্ম বীরের ধ্র্ম্ম, সংসারে আচরণীয় ধর্ম্ম না হইয়া সংসারে অনুপ্যোগী শান্ত সন্ধাস ধ্র্মের পরিণত হয়।

প্রীকৃষ্ণ বক্তা। শাস্ত্রে বলে প্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বাং। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ভগবান বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে অবতারবাদ এবং দশম অধ্যায়ে বিভূতিবাদ অবলয়ন করিয়া ভগবান সর্ব্বভূতের দেহে প্রচ্ছন্নভাবে অধিষ্ঠিত, বিশেষ বিশেষ ভূতে শক্তিবিকাশে কতক পরিমাণে ব্যক্ত এবং প্রীকৃষ্ণ-দেহে পূর্ণাংশরূপে অবতীর্ণ, ইহাই প্রচারিত হইয়াছে। অনেকে বলেন, প্রীকৃষ্ণ অর্জুন কুরুক্ষেত্র রূপকমাত্র, সেই রূপক বর্জন করিয়া গীতার আসল শিক্ষা উদ্ধার করিতে হয়, কিন্তু সেই শিক্ষার এই অংশ বাদ দিতে পারি না। অবতারবাদ যদি থাকে, প্রীকৃষ্ণকে বাদ দিব কেন? অতএব স্বয়ং ভগবান এই জ্ঞান ও শিক্ষার প্রচারক।

শ্রীকৃষ্ণ অবতার, মানবদেহে মনুষ্যের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ধন্ম গ্রহণ করিয়া তদনুসারে লীলা করিয়া গিয়াছেন। সেই লীলার প্রকাশ্য ও গূঢ় শিক্ষা যদি আয়ত করিতে পারি, এই জগদ্যাপী লীলার অর্থ উদ্দেশ্য ও প্রণালী আয়ত করিতে পারিব। এই মহতী লীলার প্রধান অঙ্গ পূর্ণজ্ঞানপ্রবৃত্তিত কন্মর্ম, সেই কন্মের মধ্যে ও সেই লীলার মূলে কি জ্ঞান নিহিত ছিল, গীতায় তাহা প্রকাশিত হইল।

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ কর্মবীর, মহাযোগী, মহাসংসারী, সাম্রাজ্যস্থাপক, রাজনীতিবিদ্ ও ষোদ্ধা, ক্ষপ্রিয়দেহে ব্রহ্মজানী। তাঁহার জীবনে মহাশজ্বির অতুলনীয় বিকাশ ওরহস্যময় ক্রীড়া দেখি। সেই রহস্যের ব্যাখ্যা গীতা।

শ্রীকৃষ্ণ জগৎপ্রভু, বিশ্বব্যাপী বাসুদেব, অথচ স্বীয় মহিমা প্রচ্ছন্ন করিয়া পিতা, পূত্র, দ্রাতা, পতি, সখা, মিত্র, শত্রু ইত্যাদি সম্বন্ধ মানবদিগের সহিত স্থাপন করিয়া লীলা করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে আর্য্যজ্ঞানের প্রেষ্ঠ রহস্য এবং ভজিন্মার্গের উত্তম শিক্ষা নিহিত আছে। ইহার তত্ত্বভলিও গীতোক্ত শিক্ষার অন্তর্গত।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কল্পে কল্পে সেই

সঞ্জিস্থলে ভগবান পূর্ণাংশরূপে অবতীর্ণ হন। কলিযুগ চতুর্যুগের মধ্যে যেমন নিকৃষ্ট তেমনই শ্রেষ্ঠ যুগ । সেই যুগ মানবোলতির প্রধান শন্তু পাপপ্রবর্ত্তক কলির রাজ্যকাল ; মানবের অত্যন্ত অবনতি ও অধোগতি কলির রাজ্যকালে হয়। কিন্তু বাধার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শক্তির্দ্ধি হয়, পুরাতনের ধ্বংসে নৃতনের স্পিট হয়, কলিযুগেও সেই নিয়ম দেখা যায়। জগতের ক্রমবিকাশে অগুভের যেই অংশ বিনাশ হইতে যাইতেছে, তাহাই কলিযুগে অতিবিকাশে নদ্ট হয়, এই দিকে নৃতনের বীজ বপিত ও অঙ্কুরিত হয়, সেই বীজই সত্যযুগে রঞ্জে পরিণত হয়। উপরস্তু যেমন জ্যোতিষ বিদ্যায় একটি গ্রহের দশায় সকল গ্রহের অন্তর্দশা ভোগ হয়, তেমনই কলির দশায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি নিজ নিজ অন্তর্দশা বারবার ভোগ করে। এইরাপ চক্রগতিতে কলিমূগে ঘোর অবনতি, আবার উন্তি, আবার ঘোরতর অবনতি, আবার উন্ততি হইয়া ভগবানের অভিসন্ধি সাধিত হয়। দাপর কলির সন্ধিস্থলে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া অশুভের অতি-বিকাশ, অওভের নাশ, ওভের বীজবপন ও অঙ্কুরপ্রকাশের অনুকূল অবস্থা করিয়া যান, তাহার পরে কলির আরম্ভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই গীতার মধ্যে সত্যযুগানয়নের উপযোগী খহা জান ও কম্মপ্রণালী রাখিয়া গিয়াছেন। কলির সত্য অন্তর্দ্দশার আগমনকালে গীতাধন্দের্মর বিশ্বব্যাপী প্রচার অবশ্যন্তাবী। সেই সময় উপস্থিত বলিয়া গীতার আদর কয়েকজন জানী ও পণ্ডিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সক্রসাধারণে এবং স্লেচ্ছদেশে প্রসারিত হইতেছে।

অতএব বক্তা শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাঁহার গীতারূপ বাক্য স্বতন্ত করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় প্রচ্ছন হইয়া রহিয়াছেন, গীতা শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময়ী মৃত্তি।

পার

গাঁতোক্ত জানের পার পাণ্ডবগ্রেষ্ঠ মহাবীর ইন্ততনয় অর্জুন। যেমন বন্তাকে বাদ দিলে গীতার উদ্দেশ্য ও নিগূঢ় অর্থ উদ্ধার করা কঠিন, তেমনই পারকে বাদ দিলে সেই অর্থের হানি হয়।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ-সখা। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক, এক কর্ম্মক্ষেত্র অবতীর্ণ, তাঁহারা মানবদেহধারী পুরুষোন্তমের সহিত স্ব স্থ অধিকার ও পূর্ব্ব-কর্মান্ডদানুসারে নানা সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, সাত্যকি তাঁহার অনুগত সহচর ও অনুচর, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার মন্ত্রণাচালিত আখ্রীয় ও বন্ধু, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জুনের ন্যায় কেহই ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে পারেন নাই। সমবয়ক্ষ পুরুষে পুরুষে যত মধুর ও নিকট সম্বন্ধ হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ- অর্জুনে সেই সকল মধুর সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের ভাই, তাঁহার প্রিয়তম সখা, তাঁহার প্রাণপ্রতিম ভগিনী সুভদ্রার স্থামী। চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান এই ঘনিষ্ঠতা অর্জুনকে গীতার পরম রহস্য শ্রবণের পার্রুপে বরণ করিবার কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

স এবায়ং ময়া তেহদা যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহসাং হোতদুভমম্॥

"এই পুরাতন লুপ্ত যোগ আমি আজ আমার ভক্ত সখা বলিয়া তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। কারণ, এই যোগ জগতের শ্রেষ্ঠ ও পরম রহস্য।" অভটাদশ অধ্যায়েও গীতার কেন্দ্রস্থারূপ কশ্মযোগের মূলমন্ত ব্যক্ত করিবার সময় এই কথার পুনরুক্তি হইয়াছে।

> সক্তিহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। ইলেটাহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥

"আবার আমার পরম ও সর্বাপেক্ষা গুহাতম কথা প্রবণ কর। তুমি আমার অতীব প্রিয়, সেই হেতু তোমার নিকট এই শ্রেয়ঃ পথের কথা প্রকাশ করিব।" এই শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য শুটির অনুকূল, যেমন কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে।

> নায়মাআ প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুধা শুহতেন। ষমেবৈষ রুণুতে তেন লভ্য-স্তস্যেষ আআ বিরুণুতে তনুং স্বাম্॥

"এই প্রমাত্মা দার্শনিকের ব্যাখ্যা দারাও লভ্য নহে, মেধাশজিদারাও লভ্য নহে, বিস্তর শাস্ত্রজান দারাও লভ্য নহে। ভগবান যাঁহাকে বরণ করেন, তাঁহারই লভ্য; তাঁহারই নিকট এই প্রমাত্মা দ্বীয় শ্রীর প্রকাশ করেন।" অতএব যিনি ভগবানের সহিত সংগ্য ইত্যাদি মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ, তিনিই গীতোজ জানের পাত্র।

ইহার মধ্যে আর এক অতি প্রয়োজনীয় কথা নিহিত। ভগবান অর্জুনকে এক শরীরে ভক্ত ও সখা বলিয়া বরণ করিলেন। ভক্ত নানাবিধ; সাধারণতঃ কাহাকেও ভক্ত বলিলে গুরুশিষ্য সম্বন্ধের কথা মনে উঠে। সেই ভক্তির মূলে প্রেম আছে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ বাধ্যতা সম্মান ও অন্ধভক্তি তাহার বিশেষ লক্ষণ। সখা কিন্তু সখাকে সম্মান করেন না; তাঁহার সহিত ক্রীড়াকৌতুক আমোদ ও স্নেহ-সভাষণ করেন; ক্রীড়ার্থ তাঁহাকে উপহাস ও তাচ্ছিল্যও করেন, গালি দেন, তাঁহার উপর দৌরাত্ম্য করেন। সখা সর্ব্বকালে সখার বাধ্য হয়েন না, তাঁহার জানগরিমা ও অকপট হিতৈমিতায় মুগ্ধ হইয়া যদিও তাঁহার উপদেশানুসারে চলেন, সে অন্ধভাবে নহে; তাঁহার সহিত তর্ক করেন, সন্দেহ সকল জাপন করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহার মতের প্রতিবাদও করেন। ভয়বিসর্জন সখ্য সম্বন্ধের প্রথম শিক্ষা; সম্মানের বাহ্য আড়ম্বর বিসর্জন তাহার দ্বিতীয় শিক্ষা; প্রেম তাহার প্রথম ও শেষ কথা। যিনি এই জগৎসংসারকে মাধুর্য্যময়, রহস্যময়, প্রেমময়, আনন্দময় ক্রীড়া বুঝিয়া ভগবানকে ক্রীড়ার সহচররূপে বরণ করিয়া সখ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ করিতে পারেন, তিনি গীতোক্ত জানের পাত্র। যিনি জগবানের মহিমা, প্রভুত্ব, জানগরিমা, ভীষণত্বও হাদয়ঙ্গম করেন, অথচ

অভিভূত না হইয়া তাঁহার সহিত নির্ভয়ে ও হাসিমুখে খেলা করিয়া থাকেন, তিনি গীতোক্ত জানের পাত্র।

সখ্য সম্বন্ধের মধ্যে ক্রীড়াচ্ছলে আর সকল সম্বন্ধ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। ভরুশিষ্য সম্বন্ধ সংখ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে অতি মধুর হয়, এইরাপ সম্বন্ধই অর্জুন গীতার প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্থাপন করিলেন। "তুমি আমার প্রম হিতৈষী বন্ধু, তোমা ভিন্ন কাহার শরণাপন্ন হইব ? আমি হতবৃদ্ধি, কর্তব্যভারে ভীত, কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, তীব্রশোকে অভিভূত। তুমি আমাকে রক্ষা কর, উপদেশ দান কর, আমার ঐহিক পারব্রিক মঙ্গলের সমস্ত ভার তোমার উপর ন্যস্ত করিলাম।" এই ভাবে অর্জুন মানবজাতির সখা ও সহায়ের নিকট জানলাভার্থ আসিয়াছিলেন। আবার মাতৃসম্বন্ধ এবং বাৎসল্যভাবও সখ্যে সন্নিবিষ্ট হয়। বয়োজ্যেষ্ঠ ও জানশ্রেষ্ঠ, কনীয়ান ও অল্পবিদ্য সখাকে মাতৃবৎ ভালবাসেন, রক্ষা করেন, যত্ন করেন, সর্বাদা কোলে রাখিয়া বিপদ ও অগুভ হইতে পরিব্রাণ করেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখ্য স্থাপন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিক্ট স্বীয় মাতৃরূপও প্রকাশ করেন। সখ্যের মধ্যে যেমন মাতৃপ্রেমের গভীরতা, তেমনই দাম্পত্যপ্রেমের তীব্রতা ও উৎকট আনন্দও আসিতে পারে । সখা সখার সান্নিধ্য সর্বাদা প্রার্থনা করেন, তাঁহার বিরহে কাতর হয়েন ; তাঁহার দেহস্পর্শে পুলকিত হয়েন তাঁহার জন্য প্রাণ পর্যান্ত বিসর্জন করিতে আনন্দভোগ করেন। দাস্য সম্বন্ধও সখ্যের ক্রীড়ার অন্তর্ভুক্ত হইলে অতি মধুর হয়। বলা হইয়াছে, যিনি যত মধুর সম্বন্ধ পুরুষোভ্তমের সহিত স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহার স্খ্যভাব তত প্রস্ফুটিত হয় এবং তত গীতোক্ত জানের পাত্রত্ব লাভ হয়।

কৃষ্ণ-সখা অজুন মহাভারতের প্রধান কম্মী, গীতায় কম্মযোগশিক্ষা প্রধান শিক্ষা । জ্ঞান, ভজ্জি, কম্ম এই তিন মার্গ পরস্পর বিরোধী নহে, কম্মমার্গে জ্ঞান-প্রবৃত্তিত কম্পের্ম ভক্তিলব্ধ শক্তি প্রয়োগ করিয়া ভগবদুদ্দেশ্যে তাঁহারই সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহারই আদিপ্ট কম্ম করা গীতোক্ত শিক্ষা। যাঁহারা সংসারের দুঃখে ভীত, বৈরাগ্য-পীড়িত, ভগবানের লীলায় জাতবিতৃষ্ণ, লীলা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তের ক্রোড়ে লুকাইয়া থাকিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের মার্গ স্বতন্ত। বীর্ত্রেষ্ঠ মহাধনুর্দ্ধর অর্জুনের সেইরাপ কোনও ইচ্ছা বা ভাব ছিল না। গ্রীকৃষ্ণ কোন শান্ত সন্ম্যাসী বা দার্শনিক জ্ঞানীর নিকট এই উত্তম রহস্য প্রকাশ করেন নাই, কোন অহিংসাপরায়ণ রাহ্মণকে এই শিক্ষার পাল বলিয়া বরণ করেন নাই. মহাপরাক্রমী তেজস্বী ক্ষরিয় যোদ্ধা এই অতুলনীয় জানলাভের উপযুক্ত আধার বলিয়া নিণীত হইয়াছিলেন ৷ যিনি সংসার-যুদ্ধে জয় বা পরাজয়ে অবিচলিত, তিনিই এই শিক্ষার গূঢ়তম ভরে প্রবেশ করিতে সমর্থ। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ৷ যিনি মুমুক্ষুত্ব অপেক্ষা ভগবান–লাভের আকা⇒ক্ষা পোষণ করেন তিনিই ভগবৎ-সানিধ্যের আস্বাদ পাইয়া আপনাকে নিত্য-মুক্তস্বভাববান বলিয়া উপলব্ধি করিতে এবং মুমুক্ষুত্ব অজানের শেষ আশ্রয় বুঝিয়া বর্জন করিতে সক্ষম। যিনি তামসিক ও রাজসিক অহঙ্কার বর্জন করিয়া সাত্তিক অহঙ্কারে বন্ধ থাকিতে

চাহেন না তিনিই গুণাতীত হইতে সক্ষম। অর্জুন ক্ষরিয়ধর্ম্ম পালনে রাজসিক রুজি চরিতার্থ করিয়াছেন, অথচ সাত্তিক আদর্শ গ্রহণে রজঃশক্তিকে সত্তমুখী করিয়াছেন। সেইরূপ পাত্রগীতোক্ত শিক্ষার উত্তম আধার।

অর্জুন সমসাময়িক মহাপুরুষদিপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ব্যাসদেব শ্রেষ্ঠ, সেই যুগের সর্ববিধ সাংসারিক জ্ঞানে পিতামহ ভীত্ম শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানতৃষ্ণায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর শ্রেষ্ঠ, সাধুতায় ও সাত্ত্বিক গুণে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শ্রেষ্ঠ, ভজিতে উদ্ধব ও অক্রুর শ্রেষ্ঠ, স্বভাবগত শৌর্য্যে ও পরাক্রমে জ্যেষ্ঠ ভাতা মহারথী কর্ণ শ্রেষ্ঠ। অথচ অর্জুনকেই জগৎপ্রভু বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই হস্তে অচলা জয়শ্রী এবং গাণ্ডীব প্রভৃতি দিব্য অন্ত সমর্পণ করিয়া তাঁহার দারা ভার**তের স**হস্র সহস্র জগদিখ্যাত যোদ্ধাকে নিপাত করিয়া যুধিষ্ঠিরের অসপত্র সাম্রাজ্য অর্জুনের প্রাক্রমলব্ধ দান্রাপে সংস্থাপন করিলেন ; উপরস্ত তাঁহাকেই গীতোক্ত পরম জানের একমাত্র উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নিণীত করিলেন। অর্জুনই মহাভারতের নায়ক ও প্রধান কম্মী, সেই কাব্যের প্রত্যেক অংশ তাঁহারই যশোকীতি ঘোষণা করে। ইহা পুরুষোত্তম বা মহাভারত-রচয়িতা ব্যাসদেবের অন্যায় পক্ষপাত নহে। এই উৎকর্ষ সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আত্মসমর্পণের ফল। যিনি পুরুষোন্তমের উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও নির্ভরপূর্ব্বক কোনও দাবী না করিয়া স্বীয় গুভ ওঅ**ওড, মঙ্গল** ও অম**ঙ্গল, পাপ** ও পুণ্যের সমস্ত ভার **তাঁহাকে** সমর্পণ করেন, নিজ প্রিয়কশ্মের্য আসক্ত না হইয়া তদাদিপট কম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়েন, নিজ প্রিয়র্তি চরিতার্থ না করিয়া তৎপ্রেরিত র্তি গ্রহণ করেন, নিজ প্রশংসিত ভণ সাগ্রহে আলিন্সন না করিয়া তদ্বত গুণ ও প্রেরণা তাঁহারই কার্য্যে প্রযুক্ত করেন ; সেই শ্রদ্ধাবান অহঙ্কাররহিত কর্ম্মধোগী পুরুষোত্তমের প্রিয়তম সখা ও শক্তির উত্তম আ**ধার, তাঁহা** দারা **জগতে**র বিরাট কার্য্য নির্দ্দোষরূপে সম্পন্ন হয়। ইসলাম-প্রণেতা মুহম্মদ এইরাপ যোগীশ্রেষ্ঠ ছিলেন। অর্জুনও সেইরাপ আঅসমর্পণ করিতে সর্ব্বদা সচেপ্ট ছিলেন ; সেই চেপ্টা শ্রীকৃঞ্বের প্রসন্নতা ও ভালবাসার কারণ। যিনি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের দৃঢ় চেম্টা করেন, তিনিই গীতোক্ত শিক্ষার উত্তম অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভরু ও সখা হইয়া তাঁহার ইহলোকের ও পরলোকের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন।

অবস্থা

মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্য ও উজির উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে কি অবস্থায় সেই কার্য্য বা সেই উজি কৃত বা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের প্রারম্ভকালে যখন শন্তপ্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে—প্রবৃত্তে শন্তসম্পাতে—সেই সময়ে ভগবান গীতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে অনেকে বিদিমত ও বিরক্ত হন, বলেন ইহা নিশ্চয় কবির অসাবধানতা বা বুদ্ধির

দোষ। প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ে সেই স্থানে সেইরূপ ভাবাপন্ন পারকে দেশকালপার বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ গীতোক্ত ভান প্রকাশ করিয়াছেন।

সময় যুদ্ধের প্রারম্ভকাল। যাঁহারা প্রবল কর্ম্মস্রোতে নিজ বীরত্ব ও শক্তি বিকাশ ও পরীক্ষা করেন নাই, তাঁহারা কখনও গীতোজ জানের অধিকারী হইতে পারেন না। উপরস্ত যাঁহারা কোন কঠিন মহাব্রত আরম্ভ করিয়াছেন, যে মহাব্রতে অনেক বাধাবিল্প, অনেক শত্রুর্দ্ধি, অনেক পরাজয়ের আশক্ষা স্থভাবতঃই হয়, সেই মহাব্রতের আচরণে যখন দিব্যশক্তি জন্মিয়াছে, তখন ব্রতের শেষ উদ্যাপনার্থে, ভগবানের কার্য্যসিদ্ধার্থ এই জ্ঞান প্রকাশ হয়। গীতা কর্ম্মযোগকে ভগবানলাভের প্রতিষ্ঠা বিহিত করে, শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ কর্ম্মেতেই জ্ঞান জন্মায়, অতএব গীতোজ মার্গের পথিক পথত্যাগ করিয়া দূরস্থ শান্তিময় আশ্রমে পর্বতে বা নিজ্জন স্থানে ভগবানের সাক্ষাৎলাভ করেন না, মধ্যপথেই কম্মের কোলাহলের মধ্যে হঠাৎ সেই স্বর্গীয় দীপ্তি জগৎ আলোকিত করে, সেই মধুর তেজোময়ী বাণী কর্ণকুহরে প্রবেশ করে।

স্থান যুদ্ধক্ষেত্র, সৈন্যদ্বয়ের মধ্যস্থল, সেখানে শন্তপাত হইতেছে। যাঁহারা এই পথে পথিক, এইরূপ কস্মে অগ্রণী, প্রায়ই কোনও গুরুতর ফলোৎপাদক সময়ে, যখন কম্মীর কম্মানুসারে অদৃপ্টের গতি এদিক না ওদিক চালিত হইবে, তখনই অকসমাৎ তাঁহাদের যোগসিদ্ধি ও পরম্ভানলাভ হয়। তাঁহার জ্ঞান কম্মরোধক নয়, কম্মের সহিত সংশ্লিপট। ইহাও সত্য যে ধ্যানে, নির্জ্জনে, স্বস্থ আত্মার মধ্যে জানোন্মীলন হয়, সেইজন্য মনীষিগণ নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসেন। কিন্তু গীতোক্ত যোগের পথিক মন-প্রাণ-দেহরূপ আধার এমনভাবে বিভক্ত করিতে পারেন যে, তিনি জনতায় নিজ্জনতা, কোলাহলে শান্তি, ঘোর কম্মপ্রর্ডিতে প্রম নির্তি অনুভব করেন। তিনি অভরকে বাহ্য দারা নিয়ন্তিত করেন না, বরং বাহ্যকে অন্তর দারা নিয়ন্তিত করেন। সাধারণ যোগী সংসারকে ভয় করেন, পলায়নপূর্বক যোগাএমে শরণ লইয়া যোগে প্রর্ত হন। সংসারই কর্ম্মযোগীর যোগাশ্রম । সাধারণ যোগী বাহ্যিক শান্তি ও নীরবতা অভিলাষ করেন, শান্তিভঙ্গে তাঁহার তপোভঙ্গ হয়। কম্মযোগী অন্তরে বিশাল শান্তি ও নীরবতা ভোগ করেন, বাহ্যিক কোলাহলে সেই অবস্থা আরও গভীর হয়, বাহ্যিক তপোভঙ্গে সেই স্থির আন্তরিক তপঃ ভগ্ন হয় না, অবিচলিত থাকে। লোকে বলে, সমরোদ্যত সৈন্যের মধ্যভাগে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদ কিরূপে সম্ভব হয় ? উত্তর, যোগপ্রভাবে সম্ভব হয়। সেই যোগবলে যুদ্ধের কোলাহলের মধ্যে একস্থানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের অন্তরে ও বাহিরে শান্তি বিরাজ করে, যুদ্ধের কোলাহল সেই দুইজনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইহাতে কম্মোপ্যোগী আর এক আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিহিত । যাঁহারা গীতোজ যোগ অনুশীলন করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ কম্মী অথচ কম্মে অনাস্কু। ক্মেম্র মধ্যেই আত্মার আভ্রিক আহান শ্বণে তাঁহারা কম্মে বিরত হইয়া যোগমগ্ল ও তপস্যারত হন। তাঁহারা জানেন কম্ম ভগবানের, ফল ভগবানের, আমরা যন্ত্র, অতএব কর্ম্মফলের জন্য উৎকণ্ঠিত হন না। ইহাও

জানেন যে, কশর্মযোগের সুবিধার জন্য, কশ্মের উন্নতির জন্য, জানর্দ্ধি ও শক্তির্দ্ধির জন্য সেই আহান হয়। অতএব কশ্মের্ম বিরত হইতে ভয় করেন না, জানেন যে তপ্স্যায় কখনও রুথা সময়ক্ষেপ হইতে পারে না।

পারের ভাব, কর্ম্মযোগীর শেষ সন্দেহের উদ্রেক। বিশ্বসমস্যা, সুখদুঃখ সমস্যা, পাপপুণ্য সমস্যায় বিব্রত হইয়া অনেকে পলায়নই শ্রেয়স্কর বলিয়া নির্ডি, বৈরাগ্য ও কম্মত্যাগের প্রশংসা ঘোষণা করেন। বুদ্ধদেব জগৎ অনিত্য ও দুঃখময় বুঝাইয়া নিব্বাণপ্রাণিতর পথ দেখাইয়াছেন ৷ যীত, টলস্টয় ইত্যাদি মানবজাতির সন্ততিস্থাপক বিবাহপদ্ধতি ও জগতের চিরন্তন নিয়ম যুদ্ধের ঘোর বিরোধী। সন্ন্যাসী বলেন, কম্মই অজ্ঞানসৃষ্ট, অজ্ঞান বৰ্জন কর, কম্ম বৰ্জন কর, শাভ নিজ্ঞিয় হও। অদৈতবাদী বলেন, জগৎ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, রক্ষে বিলীন হও। তবে এই জগৎ কেন, এই সংসার কেন ? ভগবান যদি থাকেন, কেন অর্কাচীন বালকের ন্যায় এই র্থা পণ্ডশ্রম, এই নীরস উপহাস আরম্ভ করিয়াছেন ? আত্মাই যদি থাকেন, জগৎ মায়াই হয়, এই আত্মাই বা কেন এই জঘন্য স্বপ্ন নিজ নিশর্মল অস্তিত্বে অধ্যারোপ করিয়াছেন ? নাস্তিক বলেন, ভগবানও নাই, আত্মাও নাই, আছে অন্ধশক্তির অন্ধ ক্রিয়া মাত্র। তাহাই বা কিরূপ কথা ? শক্তি কাহার ? কোথা হইতে সৃষ্ট হইল, কেনই বা অন্ধ ও উন্মন্ত ? এই সকল প্রশ্নের সভোষজনক মীমাংসা কেহই করিতে পারেন নাই, না খৃষ্টান, না বৌদ্ধ, না অদ্বৈতবাদী, না নাস্তিক, না বৈজ্ঞানিক ; সকলেই এই বিষয়ে নিরুত্তর অথচ সমস্যা এড়াইয়া ফাঁকি দিতে সচেষ্ট। এক উপনিষদ ও তাহার অনুকূল গীতা এইরূপ ফাঁকি দিতে অনিচ্ছুক। সেইজন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গীতা গীত হুইয়াছে । ঘোর সাংসারিক কর্ম্ম, গুরুহত্যা, দ্রাতৃহত্যা, আত্মীয়হত্যা তাহার উদ্দেশ্য, সেই অযুত-প্রাণী-সংহারক যুদ্ধের প্রারম্ভে, অর্জুন হতবুদ্ধি হইয়া গাড়ীব হস্ত হইতে নিক্ষেপ করিয়াছেন কাতরস্বরে বলিতেছেন—

তৎ কিং কশর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব।
"কেন আমাকে এই ঘোর কম্মে নিযুক্ত করিতেছ ?" উত্তরে সেই যুদ্ধের কোলাহলের মধ্যে বজ্রগম্ভীর শ্বরে ভগবৎ-মুখ-নিঃস্ত মহাগীত উঠিয়াছে—

কুরু কলৈম্ব তসমাৎ ত্বং পূক্রেঃ পূর্বেতরং কৃতম্।

যোগস্থঃ কুরু কম্মাণি সসং তাজা ধনঞ্য।

বুদ্ধিযুজো জহাতীহ উভে সুকৃতদুফৃতে। তসমাদ্ যোগায় যুজ্যস্থ যোগঃ কন্মসু কৌশলম্ ॥

অসভেশ হ্যাচরন্ কশ্ম পরমাপ্লোতি পুরুষঃ॥

ময়ি সর্বাণি কম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা

নিরাশীনিশর্মমো ভুত্বা যুধ্যস্ব বিগতজরঃ॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জানাবস্থিতচেতসঃ। যজায়াচরতঃ কম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥

অজানেমার্তং জানং তেন মুহ্যভি জভবঃ॥

ভোজারং যজতপ্রসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্। সুহাদং সর্বভূতানাং জাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥

ময়া হতাংস্ফং জহি মা ব্যথিষ্ঠা। যুধ্যন্ত জেতাসি রণে সপত্মান্॥

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে। হত্বাপি স ইমাঁলোঁকান্ ন হুডি ন নিবধ্যতে॥

"অতএব তুমি কম্মই করিয়া থাক, তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বে যে কম্ম করিয়া আসিতেছেন, তোমাকেও সেই কম্ম করিতে হইবে ৷ · · · · যোগস্থ অবস্থায় আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক কম্ম কর ৮০-যাঁহার বুদ্ধি যোগছ, তিনি পাপ পুণ্য এই কম্মান্ধেত্রেই অতিক্রম করেন, অতএব যোগার্থ সাধনা কর, যোগই শ্রেষ্ঠ কম্ম-সাধন ৮০ মানুষ যদি অনাসজভাবে কম্ম করেন তিনি নিশ্চয় প্রম ভগ্বানকে লাভ করিবেন ।- ভানপূর্ণ হাদয়ে আমার উপর তোমার সকল কম্ম নিক্ষেপ কর, কামনা পরিত্যাগে, অহঙ্কার পরিত্যাগে দুঃখরহিত হইয়া যুদ্ধে লাগ ৮০ যিনি মুজ, আসজিবহিত, যাঁহার চিত্ত সক্রাদা জানে নিবাস করে, যিনি যজার্থে কম্ম করেন, তাঁহার সকল কম্ম বন্ধনের কারণ না হইয়া তখনই আমার মধ্যে সম্পূর্ণ-রূপে বিলীন হয় ৷…সব্বপ্রাণীর অভনিহিত জ্ঞান অঞ্ডান দ্বারা আর্ড, সেই হেতু তাহারা সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য ইত্যাদি দ্বন্দ্ব স্থপ্টি করিয়া মোহে পতিত হয়।… আমাকে সক্রলোকের মহেশ্বর, যজ, তপস্যা প্রভৃতি সক্রবিধ কন্দের্যর ভোজা এবং সবর্বভূতের সখা ও বন্ধু বলিয়া জানিলে পরম শান্তিলাভ হয় ১০ আমিই তোমার শরুগণকে বধ করিয়াছি, তুমি যন্ত্র হইয়া তাহাদের সংহার কর্, দুঃখিত হইও না, যুদ্ধে লাগিয়া যাও, বিপক্ষকে রণে জয় করিবে।…যাঁহার অন্তঃকরণ অহংজানশূন্য, যাঁহার বুদ্ধি নিলিগ্ত, তিনি যদি সমস্ত জগৎকে সংহার করেন, তথাপি তিনি হত্যা করেন নাই, তাঁহার পাপরূপ কোন বন্ধন হয় না।"

প্রশ্ন এড়াইবার ফাঁকি দিবার কোন লক্ষণ নাই। প্রশ্নটি পরিষ্কারভাবে উত্থাপন করা হইল। ভগবান কি, জগৎ কি, সংসার কি, ধন্ম্পথ কি, গীতায় এই সকল প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। অথচ সন্ন্যাসশিক্ষা নয়, কন্ম্শিক্ষাই গীতার উদ্দেশ্য। ইহাতেই গীতার সাক্ষিজনীন উপযোগিতা।

98

প্রথম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধশর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিম্কুবর্ত সঞ্যয়॥ ১॥

ধৃতরাক্ট্র বলিলেন,---

হে সঞ্জয়, ধম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়া আমার পক্ষ ও পাণ্ডবপক্ষ কি করিলেন।

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্টা তু পাণ্ডবানীকং বৃঢ়ং দুর্য্যোধনন্তদা। আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

সঞ্জয় বলিলেন,--

তখন রাজা দুর্য্যোধন রচিতব্যুহ পাণ্ডব-অনীকিনী দেখিয়া আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন।

> পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুৱাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্। বূঢ়াং দুপদপুরেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

"দেখুন আচার্য্য, আপনার মেধাবী শিষ্য দুপদতনয় ধৃদ্টদ্যুদন দারা রচিত্ব্যুহ এই মহতী পাণ্ডবসেনা দেখুন।

অর শূরা মহেষাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
যুষ্ধানো বিরাটশ্চ দুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্ ।
পুরুজিৎ কুভিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুলবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যশ্চ বিক্রান্ত উত্যৌজাশ্চ বীর্য্যবান্ ।
সৌভদ্রো দৌপদেয়াশ্চ সবর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

এই বিরাট সৈন্যে ভীম ও অজুনের সমান মহাধনুর্দর বীরপুরুষ আছেন, —–যুষুধান, বিরাটও মহারথী দুপদ,

ধৃষ্টকেতৃ, চেকিতান ও মহাপ্রতাপী কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও নরপুলব শৈব্য,

বিক্রমশালী যুধামন্য ও প্রতাপবান উত্তমৌজা, সুভদ্রাতনয় অভিমন্য ও দ্রৌপদীর পুরগণ, সকলেই মহাযোদ্ধা।

> অসমাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোভম। নায়কা মম সৈন্যস্য সংজাৰ্থং তান্ ব্বীমি তে॥ ৭॥

৭৬ শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

আমাদের মধ্যে যাঁহারা অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, যাঁহারা আমার সৈন্যের নেতা, তাঁহাদের নাম আপনার সমরণার্থ বলিতেছি, লক্ষ্য করুন।

> ভবান্ ভীত্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ। অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদতির্জয়দ্রথঃ॥ ৮॥ অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ নানাশস্তপ্রহরণাঃ সর্বের যুদ্ধবিশারদাঃ॥ ৯॥

আপনি, ভীতম, কর্ণ ও সমরবিজয়ী কৃপ, অশ্বভামা, বিকর্ণ, সোমদত্ততনয় ভূরিশ্রবা এবং জয়দ্রথ,

এবং অন্য অনেক বীরপুরুষ আমার জন্য প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়াছেন, ইঁহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।

> অপর্য্যাপতং তদসমাকং বলং ভীপমাভিরক্ষিতম্ । পর্য্যাপতং ত্রিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥ উল্লেখ্য জাকুরিয়াক ক্রিয়াক জীপুম জাস্থাদের বজার

আমাদের এই সৈন্যবল একে অপরিমিত, তাহাতে ভীত্ম আমাদের রক্ষাকর্তা, তাঁহাদের ওই সৈন্যবল পরিমিত, ভীমই তাঁহাদের রক্ষা পাইবার আশাস্থল।

অয়নেষু চ সর্কেষু যথাভাগম্বস্থিতাঃ।

ভীত্মমেবাভিরক্ষন্ত ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি॥ ১১॥

অতএব আপনারা যুদ্ধের যত প্রবেশস্থলে স্ব স্ব নিদ্দিশ্ট সৈন্য ভাগে অবস্থান করিয়া সকলে ভীপমকেই রক্ষা করুন।"

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুর্দ্ধঃ পিতামহঃ।

সিংহনাদং বিনদ্যোক্তঃ শুভখং দধেনা প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥

দুর্য্যোধনের প্রাণে হর্ষোদ্রেক করিয়া কুরুর্দ্ধ পিতামহ ভীতম উচ্চ সিংহনাদে রণস্থলধ্বনিত করিয়া মহাপ্রতাপভরে শঙ্খনিনাদ করিলেন।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।

সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমূলোহভবৎ ॥ ১৩ ॥

তখন শঙ্খ, ভেরী, পণব, পটহ ও গোমুখ বাদ্য অকসমাৎ বাদিত হইল, রণস্থল উচ্চ—শব্দসঙ্কুল হইল।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্ভে মহতি সান্দনে স্থিতৌ।

মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙেখী প্রদ্ধনুতুঃ ॥ ১৪ ॥

অন্তর ষেতায়যুক্ত বিশাল রথে দভায়মান মাধব ও পাভুপুত্র অর্জুন দিব্য শঙ্খদয় বাজাইলেন।

পাঞ্জন্যং হাষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্যঃ।

পৌজুং দধেনা মহাশঙ্খং ভীমকম্মা রকোদরঃ ॥ ১৫ ॥

হাষীকেশ পাঞ্জন্য, ধনঞ্জয় দেবদত, ভীমকন্মা রকোদর পৌভু নামে মহাশৃঙ্খ বাজাইলেন।

> অনন্তবিজয়ংরাজা কুন্তীপুরো যুধিষ্ঠিরঃ। নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥ ১৬॥

গাঁতার ভূমিকা

୧୨

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় শঙ্খ এবং নকুল সহদেব সুঘোষ ও মণিপুত্পক শঙ্খ বাজাইলেন।

> কাশ্যক প্রমেষ্যাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ। ধৃষ্টদুঃমেয়া বিরাটক সাত্যকিশ্চাপ্রাজিতঃ ॥ ১৭ ॥ দুপদো দ্রৌপদেয়াকে স্কাশঃ পৃথিবীপতে। সৌভদ্রক মহাবাহঃ শৃংখান্ দধ্যুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥

পরম ধনুর্দ্ধর কাশিরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদাুমা, অপরাজিত যোদ্ধা সাত্যকি,

দুপদ, দৌপদীর পুরগণ, মহাবাহ সুভদ্রাতনয়, সকলেই চারিদিক হইতে স্থ স্থ শঙ্খ বাজাইলেন।

> স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হাদয়ানি ব্যদারয়ৎ। নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোহভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯॥

সেই মহাশব্দ আকাশ ও পৃথিবী তুমুলরবে প্রতিধ্বনিত করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্টা ধার্ত্রান্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রকৃত্তে শস্তসম্পাতে ধনুক্লাম্য পাশুবঃ ॥ ২০ ॥
স্বাধীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

তখন শস্ত্রনিক্ষেপ আরম্ভ হইবার পরে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন ধনু উত্তোলন করিয়া হাষীকেশকে এই কথা বলিলেন।

অৰ্জুন উবাচ

সেনয়োর ভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১ ॥ যাবদেতামিরীক্ষেহহং যোজুকামানবস্থিতান্ । কৈ ম্যা সহ যোজব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥ যোৎস্যমানানবেক্ষেহহং য এতেহর সমাগতাঃ । ধার্তরান্ত্রস্য দুবর্জের্জ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

অজুঁন বলিলেন,––

"হে নিষ্পাপ, দুই সৈন্যের মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন কর, ততক্ষণ যুদ্ধস্পৃহায় অবস্থিত এই বিপক্ষগণকে নিরীক্ষণ করি। জানিতে চাই, কাহাদের
সহিত এই রণোৎসবে যুদ্ধ করিতে হইবে।

দেখি এই যুদ্ধপ্রাথীগণ কাহারা, যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে দুক্দি ধৃতরাউুতনয় দুর্য্যোধনের প্রিয়ক্ষ্যে করিবার কামনায় এইখানে সমাগত হইয়াছেন।"

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হাষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত। সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোক্তমম্॥ ২৪॥ 96

গ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

ভীলমদ্রোণপ্রমুখতঃ সকেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্। উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরানিতি ॥ ২৫ ॥

সঞ্জয় বলিলেন,---

গুড়াকেশের এই কথা গুনিয়া হাষীকেশ দুই সৈন্যের মধ্যস্থলে সেই উৎকৃষ্ট রথস্থাপনপূর্বক

ভীতম, দ্রোণ এবং সমুদয় নৃপতির্দের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হে পার্থ, সমবেত কুরুগণকে দেখ।"

> ত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্যঃ পিতৃন্থ পিতামহান্। আচার্য্যান্ মাতুলান্ লাতৃন্ পুরান্ পৌরান্ সখীংস্থা। শ্রুরান্ সুহাদশৈচৰ সেনয়োকভয়োরপি।। ২৬॥

সেই রণস্থলে পার্থ দেখিলেন পিতা, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, দ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর, সুহাদ, যত আত্মীয় ও স্বজন, দুই পরস্পরবিরোধী সৈন্যে দ্রায়মান রহিয়াছেন।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌৱেয়ঃ সৰ্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্। কুপয়া প্রয়াবিজেটা বিষীদ্যাদ্মৱবীৎ ॥ ২৭ ॥

সেই সকল বন্ধুবান্ধবকে এইরূপ অবস্থিত দেখিয়া কুন্তীপুর তীর কৃপায় আবিপট হইয়া বিষাদগ্রস্ত হাদয়ে এই কথা বলিলেন।

অর্জুন উবাচ

দৃশেটুমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যু্যুৎসূন্ সমবস্থিতান্। সীদন্তি মম গালাণি মুখঞ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥ বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে। গাভীবং স্থংসতে হস্তাৎ তুক্ চৈব পরিদহাতে॥ ২৯॥

অর্জুন বলিলেন,---

"হে, কৃষণ, এই সকল স্বজনকে যুদ্ধার্থে অবস্থিত দেখিয়া আমার দেহের অঙ্গ সকল অবসন্থ হুইতেছে, মুখ শুকাইয়া যাইতেছে,

সমস্ত শরীরে কম্প ও রোমহর্ষ উপস্থিত, গাণ্ডীব অবশ হস্ত হইতে খসিয়া পড়িতেছে, চম্ম যেন অগ্নিতে দুগ্ধ হইতেছে।

ন চ শক্ষোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিন্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥
আমি দাঁড়াইবার শক্তিরহিত হইলাম, মন যেন ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে।
হে কেশব, অগুভ লক্ষণ সকল দেখিতেছি।

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি **হত্বা স্থজন্যাহবে** ।

ন কাঙ্কে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥ ৩১॥

যুদ্ধে স্থজন বধ করিয়া শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না ; হে কৃষ্ণ, আমি জয়ও চাহি না,রাজ্যওচাহিনা,সুখওচাহিনা। কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈজীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২ ॥
ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্যু ধনানি চ ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুরাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥
মাতুলাঃ শ্বন্তরাঃ পৌরাঃ শ্যালাঃ সম্বধিনস্তথা ।
এতার হন্তমিচ্ছামি মতোহপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥

বল, গোবিন্দ, রাজ্যে আমাদের কি লাভ ? কি লাভ ভোগে ? কি প্রয়োজন জীবনে? যাঁহাদেরেজন্যরাজ্য,ভোগ,জীবন বাশ্ছনীয়,

তাঁহারাই জীবন ও ধন ত্যাগ করিয়া এই রণক্ষেত্রে উপস্থিত,—আচার্য্য, পিতা, পুর, পিতামহ,

মাতুল, শ্বন্তর, পৌর, শ্যালক, কুটু্্মু। হে মধুসূদন, ইহারা যদি আমাকে বধ করেন, তথাপি তাঁহাদিগকে বধ করিতে চাই না।

অপি ক্লৈনোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে। নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্তঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫ ॥

ব্রিলোকরাজ্যের লোভেও চাই না, পৃথিবীর আধিপত্য তদ্রের কথা। ধার্ত্তরাষ্ট্রকে সংহার করিয়া, হে জনার্দ্দন! আমাদের কি মনের সুখ হইতে পারে?

> পাপমেবাশ্রয়েদসমান্ হজৈতানাততায়িনঃ। তসমামাহা বয়ং হস্তং ধার্ডরাষ্ট্রান্ সবাজবান্। শ্বজনং হি কথং হজা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬॥

ইহারা আততায়ী, তথাপি ইহাদের বধ করিলে পাপই আমাদের মনে আশ্রয় পাইবে । অতএব ধার্ত্ররাউন্তুগণ যখন আমাদের আত্মীয়, তখন তাঁহাদিগকে সংহার করিতে আমরা অধিকারী নহি। হে মাধব, স্বজন বধে আমরা কিরাপে সুখী হইব?

> যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ। কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রল্রোহে চ পাতকম্॥ ৩৭॥ কথং ন জেয়মসমাভিঃ পাপাদসমান্নিবভিতুম্। কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনার্দন॥ ৩৮॥

যদিও ইঁহারা লোভে বুদ্ধিল্লপট হইয়া কুলক্ষয়ের দোষ ও মিত্রের অনিপটকরণে মহাপাপ বুঝেন মা,

আমরা, জনার্দন, কুলক্ষয়জনিত দোষ বুঝি, কেন আমাদের জান হইবে না, এই পাপ হইতে আমরা কেনে নির্ভ হইব না?

> কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ। ধম্মে নম্টে কুলং কৃৎস্মমধম্মোহভিভবত্যুত॥ ৩৯॥

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্মসকল বিনাশপ্রাপ্ত হয়, ধর্ম্মনাশে অধর্ম সমস্ত কুলকে অভিভূত করে। ৮০ শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

অধর্ম্মান্ডিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্তিয়ঃ। স্ত্রীযু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥

অধন্দের্মর অভিভবে, হে কৃষ্ণ, কুলস্ত্রীগণ দুশ্চরিক্রা হয়। কুলস্ত্রীগণ দুশ্চরিক্রা হইলে বর্ণসঙ্কর হয়।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলমানাং কুলস্য চ।

পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুগ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥

বর্ণসঙ্কর কুল ও কুলনাশকগণের নরক প্রাণ্ডির হেতু, কেননা তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ পিণ্ডোদক হইতে বঞ্চিত হইয়া পিতৃলোক হইতে পতিত হন।

দোষৈরেতৈঃ কুলম্বানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।

উৎসাদ্যন্তে জাতিধন্মাঃ কুলধন্মান্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥

কুলনাশকদের এই বর্ণসঙ্করোৎপাদক দোষ সকলের ফলে সনাতন জাতি-ধর্ম্ম সকল ও কুলধর্ম্ম সকল উৎসন্ন হয়।

উৎসন্নকুলধম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনাদন।

নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুখ্রুম ॥ ৪৩ ॥

যাঁহাদের কুলধম্ম উৎসন্ন হইয়াছে, সেই মনুষ্যদের নিবাস নরকে নিদিত্ট হয়, ইহাই প্রাচীনকাল হইতে গুনিয়া আসিতেছি।

> অহো বত মহৎ পাপং কর্জুং ব্যবসিতা বয়ম্। যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥

ওহো! আমরা অতি মহৎ পাপ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলাম, যে, রাজ্য– সুখের লোভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যম করিতেছিলাম।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।

ধার্ত্তরাক্সা রণে হনু/ভব্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

যদি অশস্ত ও প্রতিকারে অনুদ্যোগী আমাকে সশস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রণে সংহার করেন, তাহাই ইহা অপেক্ষা আমার মঙ্গল।"

সঞ্জয় উবাচ

এবমুজ্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ। বিস্তুজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥ ৪৬॥

সঞ্জয় বলিলেন,--

এই বলিয়া অর্জুন শোকোদেগে কলুষিতচিত হইয়া যুদ্ধকালে আরুঢ়শর ধনুপরিত্যাগপূক্ককরথে বসিয়া পড়িলেন।

সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষুপ্রাপ্তি

গীতা মহাভারতের মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে উক্ত হয়। অতএব গীতার প্রথম শ্লোকে দেখি রাজা ধৃতরাষ্ট্র দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত সঞ্জয়ের নিকট যুদ্ধের বার্তা জিঞাসা করিতেছেন। দুই সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত, তাহাদের প্রথম চেম্টা কি, রৃদ্ধ রাজা তাহা জানিতে উৎসুক । সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষুপ্রাপিতর কথা আধুনিক ভারতের ইংরাজী-শিক্ষাপ্রাপত শিক্ষিত লোকের চোখে কবির কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি বলিতাম অমুক লোক দূরদৃষ্টি (Clairvoyance) ও দূর্প্রবণ (Clair-audience) প্রাপ্ত হইয়া দূরস্থ রণক্ষেত্রের লোমহর্ষণ দৃশ্য ও মহারথী-গণের সিংহনাদ ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইলে বোধ হয় কথাটি তত অবিশ্বাসযোগ্য না-ও হইতে পারিত। আর ব্যাসদেব যে এই শক্তি সঞ্জয়কে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আরও আষাঢ়ে গল্প বলিয়া উড়াইতে প্রর্তি হয়। যদি বলিতাম যে একজন বিখ্যাত য়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্ অমুক লোককে স্বপ্লাবস্থাপ্রাণত (Hypnotised) করিয়া তাঁহার মুখে সেই দূর ঘটনার কতক বর্ণনা অবগত হইয়াছিলেন,তাহা হইলেই যাঁহারা পাশ্চাত্য hypnotism -এর কথা মনোযোগের সহিত পড়িয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বাস করিতেও পারিতেন । অথচ hypnotism যোগশক্তির নিকৃত্ট ও বর্জনীয় অঙ্গ মার । মানুষের মধ্যে এমন অনেক শক্তি নিহিত রহিয়াছে যে পূর্বকালের সভ্যজাতি সেই সকল জানিত ও বিকাশ করিত , কিন্তু কলিসভূত অ্জানের স্লোতে সেই বিদ্যা ভাসিয়া গিয়াছে, কেবল আংশিকরূপে অল্প লোকের মধ্যে ভণ্ত ও গোপনীয় জান বলিয়া রক্ষিত হুইয়া আসিতেছে। সূক্ষ্মদৃষ্টি বলিয়া স্থূল ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মন্দ্রিয় আছে যাহা দারা আমরা স্থুল ইন্দ্রিয়ের আয়ন্তাতীত পদার্থ ও জ্ঞান আয়ন্ত করিতে পারি, সূক্ষ্য বস্তু দর্শন, সূক্ষ্য শব্দ এবণ, সূক্ষ্য গন্ধ আগ্রাণ, সূক্ষ্য পদার্থ স্পর্শ ও সূক্ষ্য আহার আস্বাদ করিতে পারি । সূক্ষাদৃষ্টির চরম পরিণামকে দিব্যচক্ষু বলে, তাহার প্রভাবে দূরস্থ, গুণ্ত বা অন্যলোকগত বিষয় সকল আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। প্রম যোগশক্তির আধার মহামুনি ব্যাস যে এই দিব্যচক্ষু সঞ্জয়কে দিতে সক্ষম ছিলেন, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখিতে পাই না । পাশ্চাত্য hypnotism এর অভুত শক্তিতে যদিও আমরা অবিশ্বাসী হই না,তবে অতুল্য ভানী ব্যাসদেবের শক্তিতে অবিশ্বাসী হইব কেন ? শক্তিমানের শক্তি পরের শরীরে সংক্রামিত হইতে পারে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ও মনুষ্য-জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে পাওয়া যায়। নেপোলিয়ন, ইতো প্রভৃতি কর্ম্মবীর উপযুক্ত পাত্রে শক্তিসংক্রামণ দ্বারা তাঁহাদের কার্যের সহকারী প্রস্তুত করিয়াছেন। অতি সামান্য যোগীও কোন সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কিছুক্ষণের জন্য বা কোনও বিশেষ কার্য্যে প্রয়োগ করিবার জন্য পরকে স্বীয় সিদ্ধি প্রদান করিতে পারেন—ব্যাসদেব ত জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও অসামান্য যোগসিদ্ধ পুরুষ । বাস্তবিক, দিব্যচক্ষুর অস্তিত আষাঢ়ে গল্প না হইয়া বৈজ্ঞানিক সত্য হইবার কথা ৷ আমরা জানি, চক্ষু দর্শন করে না, কর্ণ প্রবণ করে না, নাসিকা আঘ্রাণ করে না, তৃক্ স্পর্শ উপলব্ধি করে না, রসনা আস্থাদ করে না; মনই দর্শন করে, মনই **ত্রবণ করে, মনই আদ্রাণ করে, মনই স্পর্শ উপল**িধ করে, মনই আস্বাদ করে। দর্শন শাস্ত্রেও মনস্তত্ত্বিদ্যায় এই সত্য অনেকদিন হইতে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে,

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

৮২

hypnotism এ ইহা বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া প্রমাণিত হইয়াছে, যে চক্ষু মুদ্রিত হইলেও দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য যে কোন নাড়ী দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে চক্ষু ইত্যাদি স্থুলেন্দ্রিয় জ্ঞানপ্রাপ্তর কেবল সুবিধাজনক উপায়, স্থূল শরীরের সনাত্ম অভ্যাসে বদ্ধ হইয়া আমরা তাহাদের দাস হইয়াছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে কোন শারীরিক প্রণালী দারা সেই জান মনে পৌছাইতে পারি—–যেমন অন্ধ স্পর্শ দ্বারা পদার্থের আরুতির ও স্বভাবের নির্ভুল ধারণা করে। কিন্তু অন্ধের দৃষ্টি ও স্বপ্নাবস্থাপ্রাস্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে এই প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় যে স্বপ্নাবস্থাপ্রাপত ব্যক্তি পদার্থের প্রতিমৃত্তি মনের মধ্যে দেখে ৷ ইহাকেই দর্শন বলে ৷ প্রকৃতপক্ষে আমি সম্মুখস্থিত পুস্তক দর্শন করি না, সেই পুস্তকের যে প্রতিমৃতি আমার চক্ষুতে চিত্রিত হয়, তাহাই দেখিয়া মন বলে, পুস্তক দেখিলাম। কিন্তু স্বপ্নাবস্থাপ্রাপেতর দূরস্থ পদার্থ বা ঘটনা দর্শনে ও প্রবণে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, পদার্থজ্ঞানগ্রাপ্তির জন্য কোন শারীরিক প্রণালীর আবশ্যকতা নাই—–সূক্ষ্মদৃষ্টি দারা দর্শন করিতে পারি। লগুনে ঘরে বসিয়া সে সময় এডিনবরোতে যে ঘটনা হইতেছে, মনের মধ্যে তাহা দেখিলাম, এইরূপ দৃষ্টান্তের সংখ্যা দিন দিন ইদ্ধি পাইতেছে। ইহাকেই সূক্ষ্মদৃষ্টি বলে। স্ক্রাদৃদ্টিতে ও দিব্যচক্ষুতে এই প্রভেদ আছে যে, স্ক্রাদশী মনের মধ্যে অদৃদ্ট পদার্থের প্রতিমৃতি দশন করে, দিব্যুচক্ষু দারা আমরা মনের মধ্যে সেই দৃশ্য না দেখিয়া, শারীরিক চক্ষের সম্মুখে দেখি, চিন্তাস্তাতে সেই শব্দ না শুনিয়া শারীরিক কর্ণে শুনি। ইহার এক সামান্য দৃষ্টান্ত Crystal এ বা কালির মধ্যে সমসাময়িক ঘটনা দেখা। কিন্তু দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত যোগীর পক্ষে এইরাপ উপকরণের কোন অবিশ্যকতা নাই, তিনি এই শক্তি বিকাশে বিনা উপকরণে দেশকালের বন্ধন খুলিয়া অন্য দেশের ও অন্য কালের ঘটনা অবগত হইতে পারেন। দেশবন্ধন মোচনের প্রমাণ আমরা যথেত্ট পাইয়াছি, কালবন্ধনও যে মোচন করা যায়, মানুষ যে ত্রিকালদশী হইতে পারে, তাহার এত বহু সংখ্যক ও সভোষজনক প্রমাণ এখনও জগতের সমক্ষে উপস্থিত করা হয় নাই। তবে যদি দেশবন্ধন মোচন করা সম্ভব হয়, কালবন্ধন মোচন অসম্ভব কথা বলা যায় না। যাহা হউক, এই ব্যাসদত্ত দিবাচক্ষু দারা সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থাকিয়াও যেন কুরুক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সমবেত ধার্ত্রাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণকে চচ্চে দেখিলেন, দুর্য্যোধনেরউজি, পিতামহ ভীতেমর ভীম সিংহনাদ, পাঞ্জন্যের কুরুধ্বংসঘোষক মহাশক গীতার্থদ্যোতক কৃষ্ণার্জুন–সংবাদ কর্ণে শ্রবণ করিলেন।

আমাদের মতে মহাভারতও রূপক নহে, কৃষ্ণ ও অর্জুনও কবির কল্পনা নহে, গীতাও আধুনিক তাকিক বা দার্শনিকের সিদ্ধান্ত নহে। অতএব গীতার কোনও কথা যে অসম্ভব বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে, তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। এইজন্যই দিব্যচক্ষুপ্রাপ্তির কথার এত বিস্তৃত সমালোচনা করিলাম।

গীতার ভূমিকা

৮৩

দুর্য্যো**ধনের** বাক্কৌশল

সঞ্জয় সেই প্রথম যুদ্ধচেম্টা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্য্যোধন পাণ্ডবদৈন্য রচিত ব্যূহ দেখিয়া দ্রোণাচার্যোর নিকট উপস্থিত হইলেন। কেন দ্রোণের নিকট গেলেন তাহার ব্যাখ্যা আবশ্যক। ভীত্মই সেনাপতি, যুদ্ধের কথা তাঁহাকেই বলা উচিত ছিল, কিন্তু কূটবুদি দুর্য্যোধনের মনে ভীপেমর উপর বিশ্বাস ছিল না। ভীতম পাণ্ডবদের <mark>অনুর</mark>ক্ত, হস্তিনাপুরের শান্ত্যনুমোদক দলের (Peace party) নেতা ; যদি পাণ্ডবে ধার্ত্তরাষ্ট্রেই যুদ্ধ হইত, ভীতম কখনই অন্তর্ধারণ করিতেন না ; কিন্ত কুরুদের প্রাচীন শগ্রু ও সমকক্ষ সাম্রাজালিপসূ পাঞ্চালজাতি দারা কুরুরাজ্য আক্রান্ত দেখিয়া কুরুজাতির প্রধান পুরুষ, যোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ্--সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় বাছবলে চিররক্ষিত স্বজাতির গৌরব ও প্রাধান্যের শেষ রক্ষা করিতে কৃতসকল্প হইয়াছিলেন। দুর্য্যোধন স্বয়ং অসুরপ্রকৃতি, রাগদ্বেষই তাঁহার সকাকার্য্যের প্রমাণ ও হেতু, অতএব কর্ত্তব্যপরায়ণ মহাপুরুষের মনের ভাব বুঝিতে অক্ষম, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে প্রাণপ্রতিম পাগুবগণকেও যুদ্ধক্ষেত্রে সংহার করিবার বল এই কঠিন তপস্বীর প্রাণে আছে, তাহা কখনও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। স্বদেশহিতৈষী প্রমেশের সময়ে। স্বীয় মত প্রকাশপূর্ব্বক স্বজাতিকে অন্যায় ও অহিত হইতে নির্ভ করিতে প্রাণপণ চেম্টা করিয়াও সেই অন্যায় ও অহিত একবার লোক দারা দ্বীকৃত হইলে দ্বীয় মত উপেক্ষা করিয়া অধন্মযুদ্ধেও স্বজাতিরক্ষা ও শ্রুদমন করেন, ভীদ্মও সেই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই ভাবও দুর্য্যোধনের বোধাতীত। অতএব ভীপেমর নিকট উপস্থিত না হইয়া দ্রোণকে সমরণ করিলেন। দ্রোণ ব্যক্তিগতভাবে পাঞ্চালরাজের ঘোর শলু, পাঞ্চাল দেশের রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন গুরু দ্রোণকে বধ করিতে কৃতপ্রতিজ, অর্থাৎ দুর্য্যোধন ভাবিলেন, এই ব্যক্তিগত বৈর্ভাবের কথা সমরণ করাইলে আচার্য্য শান্তির পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ উৎসাহে যুদ্ধ করিবেন। স্পত্ট সেই কথা বলিলেন না। ধৃত্টদ্যুদ্দের নামমাত্র উল্লেখ করিলেন, তাহার পরে ভীত্মকেও সম্ভুত্ট করিবার জন্য তাঁহাকে কুরুরাজ্যের রক্ষক ও বিজয়ের আশাস্থরূপ বলিয়া নিদ্দিল্ট করিলেন। প্রথম বিপক্ষের মুখ্য মুখ্য যোদ্ধার নাম উল্লেখ করিলেন, পরে স্থাসেন্যের কয়েকজন নেতার নাম বলিলেন, সকলের নহে, দ্রোণ ও ভীঙ্মের নামই তাঁহার অভিসন্ধিসিদ্ধ্যর্থ যথেষ্ট, তবে সেই অভিসেক্সি গোপন করিবার জন্য আর চারি-পাঁচটি নোম বললেনে। তাহার পরে বলিলেন, "আমার সৈন্য অতি রুহৎ, ভীষ্ম আমার সেনাপতি, পাশুবদের সৈন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, তাহাদের অংশাস্থল ভীমের বাহবল, অতএব আমাদের জয় হইবে না কেন ? তবে ভীতমই যখন আমাদের প্রধান ভরসা, তাঁহাকে শ্রু-আক্রমণ হইতে রক্ষা করা সকলের উচিত, তিনি থাকিলে আমাদের জয় অবশ্যভাবী।" অনেকে 'অপ্য্যাণ্ড' শব্দের বিপ্রীত অর্থ করেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, দুর্য্যোধনের সৈন্য অপেক্ষাকৃত রহৎ, সেই সৈন্যের নেতাগণ

গ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

শৌর্য্যে বীর্য্যে কাহারও মূান নহেন, আত্মপ্রাঘী দুর্য্যোধন কেন শ্ববলের নিন্দা করিয়া নিরাশা উৎপাদন করিতে যাইবেন ? ভীতম দুর্য্যোধনের মনের ভাব ও কথার গৃঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সন্দেহ অপনোদনার্থ সিংহনাদ ও শত্থনাদ করিলেন। দুর্য্যোধনের হাদয়ে তাহাতে হর্ষোৎপাদন হইল। তিনি ভাবিলেন, আমার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, দ্রোণ ও ভীতম দ্বিধা দূর করিয়া যুদ্ধ করিবেন।

প্কা সূচনা

যেই ভীপেমর গগনভেদী শঙ্খনাদে রণক্ষেত্র কম্পিত হইল, তখনই সেই বিশাল কৌরব সেনার চারিদিক হইতে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল এবং রণোল্লাসে রথীগণ মাতিতে লাগিল। অপরদিকে পাশুবদের শ্রেষ্ঠ বীর ও তাঁহার সারথি শ্রীকৃষ্ণ ভীপেমর যুদ্ধাহানের উত্তরস্বরাপ শৃত্খনাদ করিলেন এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাশুবপক্ষীয় বীরগণ স্ব স্ব শঙ্খ বাজাইয়া রণচণ্ডীকে সৈন্যের হাদয়ে জাগাইলেন। সেই মহান্ শব্দ পৃথিবী ও নভঃস্থলকে ধ্বনিত করিয়া যেন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হাদয় বিদীর্ণ করিল। ইহার এই অর্থ নহে যে ভীত্ম প্রভৃতি এই শব্দে ভীত হইলেন, তাঁহারা বীরপুরুষ, রণচন্ডীর আহানে ভীত হইবেন কেন ? এই উজিতে কবি প্রথম অত্যুৎকট শব্দের শারীরিক বেগবান সঞ্চার বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন বজ্ঞনাদ অনেকবার মন্তক দিখণ্ডিত করিয়া যায় এইরাপ শ্রোতার বোধ হয়. তেমনই এই রণক্ষেত্রব্যাপী মহাশব্দের সঞ্চার হইল ; আর এই শব্দ যেন ধার্ডরাস্ট্র-গণের ভাবী নিধনের ঘোষণা, যেই হাদয়গুলি পাণ্ডবদের শস্ত্র বিদীর্ণ করিবে, পূর্কেই তাঁহাদের শঙ্খনাদ সেইগুলি বিদীর্ণ করিয়া গেল । যুদ্ধ আরম্ভ হইল, দুই দিক হইতে শস্ত্রনিক্ষেপ হইতে লাগিল, এই সময়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "তুমি আমার রথ দুই সৈন্যের মধ্যভাগে স্থাপন কর, আমি দেখিতে ইচ্ছা করি. কে কে বিপক্ষ, কাহারা যুদ্ধে দুকুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয়কস্ম করিতে সমাগত হইয়াছেন, কাহাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে।" অর্জুনের ভাব এই যে আমিই পাণ্ডবদের আশাস্থল, আমা দারাই বিপক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধা হস্তব্য, অতএব দেখি ইহারা কাহারা। এই পর্যান্ত অর্জুনের সম্পূর্ণ ক্ষব্রিয়ভাব রহিয়াছে, কৃপা কিস্বা দৌর্বল্যের কোন চিহ্ন নাই। ভারতের অনেক শ্রে<mark>ছ বী</mark>রপুরুষ বিপক্ষের সৈনো উপস্থিত, সকলকে সংহার করিয়া অর্জুন জ্যেষ্ঠভাতা যুধিষ্ঠিরকে অসপত্র সাম্রাজ্য দিবার জনা উদ্যোগী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জানেন যে অর্জুনের মনে দৌর্কল্য আছে, এখন চিত্ত পরিষ্কার না করিলে এমন কোনও সময়ে উহা অকস্মাৎ চিত্ত হইতে বুদ্ধিতে উঠিয়া অধিকার করিতে পারে যে পাণ্ডবদের বিশেষ অনিষ্ট, হয় ত সর্বানাশ হইবে। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ এমন স্থানে রথ স্থাপন করিলেন যে ভীল্ম দ্রোণ ইত্যাদি অর্জুনের প্রিয়জন তাঁহার সম্মুখে রহিলেন অথচ আর সকল কৌরবপক্ষীয় নৃপতিকে দেখিতে পান, এবং তাঁহাকে বলিলেন, দেখ, সমবেত কুরুজাতিকে দেখ। সমরণ করিতে হয় যে অর্জুন স্বয়ং কুরুজাতীয়, কুরুবংশের

₽8

গৌরব, তাঁহার সকল আঘীয়, প্রিয়জন, বালোর সহচরগণ সেই কুরুজাতীয়, তাহা হইলে প্রীকৃষ্ণের মুখে এই তিনটি সামানা কথার গভীর অর্থ ও ভাব হাদয়সম হয়। তখন অর্জুন দেখিলেন যাঁহাদের সংহার করিয়া যুধিচিরের অসপত্র রাজ্য স্থাপন করিতে হইবে, তাঁহারা আর কেহ নম, নিজ প্রিয় আঘীয়, গুরু, বন্ধু, ভুক্তি ও ভালবাসার পাত্র। দেখিলেন সমস্ত ভারতের ক্ষরিয়বংশ পরস্পরের সহিত প্রিয় সম্বন্ধ দারা আবদ্ধ অথচ পরস্পরকে সংহার করিতে এই ভীষণ রণক্ষেত্রে আগত।

বিযাদের মূল কারণ

অর্জুনের নিকের্দের মূল কি? অনেকে এই বিষাদের প্রশংসা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কুমার্গপ্রদর্শক ও অধন্মের অনুমোদক বলিয়া নিন্দা করেন। খ্রীষ্ট-ধ্যেম্র শান্তিভাব, বৌদ্ধধ্যেম্র অহিংসাভাব এবং বৈষ্ণবধ্যেম্র প্রেমভাবই উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ ধর্মা, যুদ্ধ ও নরহত্যা পাপ, ছাতৃহত্যা ও গুরুহত্যা মহাপাতক, তাঁহারা এই ধারণার বশবর্তী হইয়া এই অসঙ্গত কথা বলেন। কিন্তু এই সকল আধুনিক ধারণা দাপর যুগের মহাবীর পাভবের মনেও উঠে নাই ; অহিংসাভাব শ্রেছ, বা যুদ্ধ, নরহত্যা, ভাতৃহত্যা ও ওরুহত্যা মহাপাপ বলিয়া যুদ্ধে বিরত হওয়া উচিত, এই চিন্তার কোনও চি**হণ**ও অজুনের কথায় ব্যক্ত হয় না। বলিলেন বটে, গুরুজনকে হত্যা করা অপেক্ষা ভিক্ষার্তি অবলম্বন করা শ্রেয়ক্ষর, বলিলেন বটে যে বন্ধুবান্ধবের হত্যায় পাপ আমাদিগকে আশ্রয় করিবে, কিন্তু কম্মের শ্বভাব দেখিয়া এই কথা বলেন নাই, কম্মের ফল দেখিয়া বলিলেন ; সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিষাদ ভঙ্গনার্থ এই শিক্ষা দিয়াছেন যে কম্পের্মর ফল দেখিতে নাই, কম্মের স্বভাব দেখিয়া সেই কম্ম করা উচিত না অনুচিত স্থির করিতে হয়। অর্জুনের প্রথম ভাব এই যে ইহারা আমার আত্মীয়, গুরুজন, বরু, বাল্য-সহচর, সকলে শ্নেহ, ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র, ইঁহাদের হত্যায় অসপত্ন রাজ্যলাভ করিলে সেই রাজ্যভোগ কদাচ সুখপ্রদ হইতে পারে না, বরং যাবজ্জীবন দুঃখ ও পশ্চাতাপে দণ্ধ হইতে হয়, বঙ্গুবান্ধবশূন্য পৃথিবীর রাজ্য কাহারওবান্ছনীয় নহে। অর্জুনের দ্বিতীয় ভাব এই যে প্রিয়জনকে হত্যা করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, যাঁহারা দ্বেষের পাত্র, তাঁহাদিগকে যুদ্ধে হত্যা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। তৃতীয় ভাব এই যে স্বার্থের জন্য এইরূপ কর্ম্ম করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও ক্ষরিয়ের অনুচিত। চতুর্থ ভাব এই যে দ্রাতৃবিরোধে ও দ্রাতৃহত্যায় কুলনাশ ও জাতিধ্বংস ঘটিবে, এইরূপ কুফল স্পিট কুলরক্ষক ও জাতিরক্ষক ক্ষত্রিয়বীরের পক্ষে মহাপাপ। এই চারিটি ভাব ভিন্ন অর্জুনের বিষাদের মূলে আর কোনও ভাব নাই। ইহা না বুঝিলে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ও শিক্ষার অর্থও বুঝা যায় না। খ্রীষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, বৈষ্ণবধ্যের সহিত গীতার ধস্মের বিরোধ ও স্যমঞ্জস্যের কথা পরে বলা হইবে। অর্জুনের কথার ভাব সূক্ষাবিচারে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মনের ভাব প্রদর্শন করি।

৮৬

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

বৈষ্ণবী মায়ার আক্রমণ

অর্জুন প্রথম তাঁহার বিষাদের বর্ণনা করিলেন। স্নেহ ও কুপার অকস্মাৎ বিদ্রোহে মহাবীর অজুঁন অভিভূত ও পরাস্ত, তাঁহার শরীরের সমস্ত বল এক মুহূর্তে ওকাইয়া গিয়াছে, অস সকল অবসন্ন, দাঁড়াইবার শক্তি নাই, বলবান হস্ত গাভীব ধারণে অসমর্থ, শোকের উত্তাপে জরের লক্ষণ বাক্ত, শরীরের দৌব্রল্য হইয়াছে, তুক্ যেন অগ্নিতে দুগ্ধ হইতেছে, মুখ ভিতরে গুকাইয়া গিয়াছে, সমস্ত শরীর তীব্রভাবে কম্পমান, মন যেন সেই আক্রমণে ঘুরিতেছে। এই ভাবের বৰ্ণনা পড়িয়া প্ৰথম কৰির তেজস্থিনী কল্পনার অতিরিক্ত বিকাশ বলিয়া কেবল সেই কবিত্ব-সৌন্দর্য্য ভোগ করিয়া ক্ষান্ত হই ; কিন্তু যদি সূক্ষাবিচারে নিরীক্ষণ করি, তখন এই বর্ণনার একটি গূঢ় অর্থ মনে উদয় হয় ৷ অর্জুন পূর্বেও কুরুদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, অথচ এইরূপ ভাব কখনও হয় নাই, এখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় হঠাৎ এই আন্তরিক উৎপাত হইয়াছে। মনুষ্যজাতির অনেক অতিপ্রবল র্ত্তি ক্ষরিয় শিক্ষা ও উচ্চ আকাঙ্কা দারা পরাভূত ও আবদ্ধ হইয়া অর্জুনের হাদয়তলে **৩**°তভাবে রহিয়াছে। নিগ্রহ দারা চিত্তগুদ্ধি হয় না, বিবেক ও বিত্তদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে সংযমে চিত্তগুদ্ধি হয়। নিগৃহীত রুতি ও ভাব সকল হয় এই জন্মে, নহে পর জন্মে একদিন চিত্ত হইতে উঠিয়া বুদ্ধিকে আক্রমণ করে এবং জয় করিয়া সমস্ত কম্ম স্ববিকাশের অনুকূল পথে চালায়। এই হেতু, যে এই জন্মে দয়াবান, সে অন্য জন্মে নিষ্ঠুর হয়, যে এই জন্মে কামী ও দুশ্চরিত্র, সে অন্য জনো সাধু ও পবিএচেতা হয়। নিগ্রহ না করিয়া বিবেক ও বিওদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে র্তিওলি প্রত্যাখ্যান করিয়া চিত পরিষ্কার করিতে হয়। ইহাকেই সংযম বলে। জানের প্রভাবে ত্যোভাবের অপনোদন না হইলে সংযম অসম্ভব। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অজুনের অজ্ঞান দূর করিয়া সুপ্ত বিবেক জাগাইয়া চিত্তশোধন করিতে ইচ্ছুক ৷ কিন্তু পরিহার্যা রৃত্তি সকল চিত্ত হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থিত না করিলে বুদ্ধিও প্রত্যাখ্যান করিবার অবসর পায় না, উপরস্ত যুদ্ধেই অভঃস্থ দৈতা ও রাক্ষস বিবেক দারা হত হয়, তখন বিবেক বুদ্ধিকে মুক্ত করে। যোগের প্রথম অবস্থায় যত কুপ্রর্ডি চিডে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, প্রবল বেগে বুদ্ধি আক্রমণ করিয়া অনভাস্ত সাধককে ভীতি ও শোকে বিহুল করিয়া ফেলে, ইহাকেই পাশ্চাত্য দেশে শয়তানের প্রলোভন, ইহাই মারের আক্রমণ। কিন্তু সেই ভীতি ও শোক অজানসভূত, সেই প্রলোভন শয়তানের নহে, ভগবানের। অন্তর্য্যামী জগৎগুরুই সেই সকল প্রবৃত্তি সাধককে আক্রমণ করিবার জন্য আহান করেন, অমঙ্গলের জন্য নহে, মঙ্গলের জন্য, চিত্তশোধনের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ যেমন সশ্রীরে বাহ্যজগতে অজুনের সখা ও সার্থি, তেম্নই তাঁহার মধ্যে অশরীরী ঈশ্বর ও অভর্য্যামী পুরুষোভম, তিনিই এই ওঁপ্ত রৃত্তি ও ভাব প্রবল বেগে এক সময় বুদ্ধির উপর নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ আঘাতে বুদ্ধি ঘূর্ণ্যমান হইল এবং প্রবল মানসিক বিকার তৎক্ষণাৎ স্থূল শরীরে কবিবণিত লক্ষণ সকলে

ব্যক্ত হইল। প্রবল অপ্রত্যাশিত শোক দুঃখের এইরূপ শারীরিক বিকাশ হয়, তাহা আমরা জানি, তাহা মনুষাজাতির সাধারণ অনুভবের বহির্ভূত নহে। অর্জুনকে ভগবানের বৈষ্ণবী মায়া অখণ্ড বলে এক মুহূর্ত্তে অভিভূত করিল, সেইজনা এই প্রবল বিকার। যখন অধন্ম দয়া প্রেম ইত্যাদি কোমল ধন্মের আকার ধারণ করিয়া, অজ্ঞান জ্ঞানের বেশে ছদাবেশী হইয়া আসে, গাঢ় কৃষ্ণ তমোণ্ডণ উজ্জ্বল ও বিশদ পবিত্রতার ভাণ করিয়া বলে, আমি সাজ্বিক, আমি জ্ঞান, আমি ধন্ম্ম, আমি জগবানের প্রিয় দৃত, পুণ্যক্রপী ও পুণাপ্রবর্ত্তক, তখন বুঝিতে হইবে যে ভগবানের বৈষ্ণবী মায়া বুদ্ধির মধ্যে প্রকাশ হইয়াছে।

বৈষ্ণবী মায়ার লক্ষণ

এই বৈষ্ণবী মায়ার মুখ্য অস্ত কুপা ও স্নেহ ৷ মানবজাতির প্রেম ও ভালবাসা বিশুদ্ধ রুত্তি নহে, শারীরিক ও প্রাণকোষাগত বিকারের বশে পবিত্র প্রেম ও দয়া কলুষিত ও বিকলাস হয়। চিত্তই র্ভির বাসস্থান, প্রাণ ভোগের ক্ষেত্র, শরীর কম্মের যন্ত্র, বুদ্ধি চিন্তার রাজ্য। বিশুদ্ধ অবস্থায় এই সকলের স্থতন্ত্র অথচ পরস্পরের অবিরোধী প্রর্ত্তি হয়, চিত্তে ভাব ওঠে, শরীর দারা তদনুযায়ী কল্ম হয়, বুদ্ধিতে তৎসম্পর্কীয় চিন্তা হয়, প্রাণ সেই ভাব, কম্ম ও চিন্তার আনন্দ ভোগ করে, জীব সাক্ষী হইয়া প্রকৃতির এই আনন্দময় ক্রীড়াদর্শনে আনন্দলাভ করে। অপ্তদ্ধ অবস্থায় প্রাণ শারীরিক বা মানসিক ভোগের জন্য লালায়িত হইয়া শরীরকে। কম্ম্যন্ত না করিয়া ভোগের উপায় করে, শরীর ভোগে আসক্ত হইয়া বার বার শারীরিক ভোগের জন্য দাবী করে, চিত্ত শারীরিক ভোগের কামনায় আক্রাভ হইয়া নিশ্মল ভাব গ্রহণে অক্ষম হয়, আর কলুষিত বাসনাযুক্ত ভাব চিত্তসাগর বিক্ষুঝ্ করে, সেই বাসনার কোলাহল বুদ্ধিকে অভিভূত করিয়া বিব্রত করে, বধির করে, বুদ্ধি আর নিশ্মল, শান্ত, অম্রান্ত চিন্তা গ্রহণে সমর্থ হয় না, চঞ্চল মনের বশীভূত হইয়া ভ্রমে, চিভা-বিভাটে, অনৃতের প্রাবল্যে অন্ধ হয়। জীবও এই বুদ্ধিলংশে হাতজান হইয়া সাক্ষীভাব ও নিম্মল আনন্দভাবে বঞ্চিত হইয়া আধারের সহিত নিজ একত্ব স্বীকার করিয়া আমি দেহ, আমি প্রাণ, আমি চিন্ত, আমি বুদ্ধি এই ভ্রান্ত ধারণায় শারীরিক ও মানসিক সুখ দুঃখে সুখী ও দুঃখী হয়। অস্তদ্ধ চিস্ত এই বিভাটের মূল, অতএব চিত্তুদ্ধি উন্নতির প্রথম সোপান। এই অশুদ্ধতা কেবল তামসিক ও রাজসিক র্ত্তিকে কলুষিত করিয়া ক্ষান্ত হয় না, সাত্ত্বিক র্ত্তিকে কলুষিত করে। অমুক লোক আমার শারীরিক বা মানসিক ভোগের সামগ্রী, আমার ভাল লাগে, তাহাকেই চাই, তাহার বিরহে আমার ক্লেশ হয়, ইহা অন্তদ্ধ প্রেম, শ্রীর ও প্রাণ চিত্তকে কল্মিত করিয়া নিম্মল প্রেমকে বিকৃত করিয়াছে। বুদ্ধিও সেই অওদ্ধতার ফলে ভ্রান্ত হইয়া বলে, অমুক আমার স্ত্রী, ভাই, ভগ্নী, সখা, আত্মীয়, মিল্ল তাহাকেই ভালবাসিতে হয়, সেই প্রেম পুণ্যময়, সেই প্রেমের প্রতিকূল কার্য্য যদি কর, তাহা পাপ, ক্রুরতা, অধর্ম্ম। এইরূপ অশুদ্ধ প্রেমের ফলে এমন বলবতী কুপা হয় যে প্রিয়জনের কল্ট, প্রিয়জনের গ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

44

অনিষ্ট অপেক্ষা ধশ্মকে জ**লাজ**লি দেওয়াও শ্রেয়ক্ষর বোধ হয়, শেষে এই কুপার উপর <mark>আঘাত পড়ে বলিয়া ধশ্মকে অধশ্ম বলিয়া নিজ দৌক্লোর সমর্থন</mark> করি। এইরূপ বৈষ্ণবী মায়ার প্রমাণ অর্জুনের প্রত্যেক কথায় পাওয়া যায়।

বৈষ্ণবী মায়ার ক্ষুদ্রতা

অর্জুনের প্রথম কথা, ইঁহারা আমাদের স্বজন, আত্মীয়, ভালবাসার পাত্র, তাঁহাদিগকে যুদ্ধে হত্যা করিয়া আমাদের কি হিত সাধিত হইবে ? বিজেতার গর্কর, রাজার গৌরব, ধনীর সুখ ? আমি এই সকল শূন্য স্থার্থ চাই না। লোকের রাজ্য, ভোগ, জীবন প্রিয় হয় কেন ? স্ত্রী, পুর, কন্যা আছেন বলিয়া, আত্মীয়-স্বজনকে সুখে রাখিতে পারিব বলিয়া, বন্ধু-বান্ধবের সহিত প্রস্থর্যের সুখে ও আমোদে দিন কাটাইতে পারিব বলিয়া এই সকল সুখ ও মহত্ত্ব লোভের বিষয়। কিন্তু যাঁহাদের জন্য আমরা রাজ্য, ভোগ ও সুখ চাই, তাঁহারাই আমাদের শর্ হইয়া মুদ্ধে উপস্থিত। তাঁহারা আমাদিগকে বরং বধ করিতে প্রস্তুত তথাপি আমাদের সহিত রাজ্য ও সুখ একর ভোগ করিতে সম্মত নন। আমাকে বধ করুন, আমি কিন্তু তাঁহাদিগকৈ কখন বধ করিতে পারিব না। যদি তাঁহাদের হত্যায় রিলোকরাজ্য অধিকার করিতাম, তাহা হইলেও পারিতাম না, পৃথিবীর অসপত্র সাম্রাজ্য কি ছার! স্থলদেশী লোক——

"ন কাংকে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।"

এবং

"এতার হন্তমিচ্ছামি স্থতোহপি মধুসূদন ॥ অপি ত্রৈলোকারাজাসা হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।"

এই উজিতে মোহিত হইয়া বলেন, "অহো! অর্জুনের কি মহান্ উদার নিঃস্বার্থ প্রেমময় ভাব। রুধিরাক্ত ভোগ ও সুখ অপেক্ষা পরাজয়, মরণ, চিরদুঃখ তাঁহার বান্ছনীয়।" কিন্তু যদি অর্জুনের মনের ভাব পরীক্ষা করি, আমরা বুঝিতে পারি যে অর্জুনের ভাব অতি ক্ষুদ্র, দুর্ব্বলতা-প্রকাশক, ক্লীবোচিত। কুলের হিতার্থে বা প্রিয়জনের প্রেমে, কুপার বশে, রক্তপাতের ভয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করা অনার্যার পক্ষে মহৎ উদার ভাব হইতে পারে, আর্যাের পক্ষে তাহা মধ্যম ভাব, ধর্ম্ম ও ভগবৎপ্রীতির জন্য স্বার্থত্যাগ করাই উত্তম ভাব। অপর পক্ষে কুলের হিতার্থে, প্রিয়জনের প্রেমে, কুপার বশে, রক্তপাতের ভয়ে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা অধম ভাব। ধর্ম্ম ও ভগবৎপ্রীতির জন্য ক্ষেহ্ম, কুপা ও ভয় দমন করা প্রকৃত আর্যাভাব। এই ক্ষুদ্রভাবের সমর্থনার্থ অর্জুন স্বজনহত্যার পাপ দেখাইয়া আবার বলিলেন, "ধার্ত্বরাষ্ট্রদের বধে আমাদের কি সুখ, কি মনস্তুল্টি হইতে পারে ? তাঁহারা আমাদের বন্ধু–বান্ধব, আজীয়–স্বজন, যদিও অন্যায় করেন ও আমাদের শত্রুতা করেন, রাজ্য অপহরণ করেন, সত্যভঙ্গ করেন, তাঁহাদের বধে আমাদের পাপই হইবে, সুখ হইবে না।" অর্জুন ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি ধর্ম্মযুদ্ধ করিতেছেন, নিজ সুখের জন্য বা যুধিগ্রিরের সুখের জন্য প্রীকৃষ্ণ দ্বারা ধার্ত্বরাষ্ট্রবধে

গীতার ভূমিকা

ひる

নিযুক্ত হন নাই, ধন্মস্থাপন, অধন্মনাশ, ক্ষরিয়ধন্ম পালন, ভারতে ধন্ম-প্রতিষ্ঠিত এক মহৎ সাগ্রাজ্য স্থাপন এই যুজের উদ্দেশ্য। সমস্ত সুখকে জলাজলি দিয়া জীবনব্যাপী দুঃখ ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও এই উদ্দেশ্যসিদ্ধি অজুনের কর্ত্ব্য।

কুলনাশের কথা

কিন্তু স্বীয় দুকলৈতার সমর্থনে অর্জুন আর এক উচ্চতর যুক্তি আবিষ্কার করিলেন, এই যুদ্ধে কুলনাশ ও জাতিনাশ হইবে, অতএব এই যুদ্ধ ধশুমযুদ্ধ নহে, অধন্মযুদ্ধ ৷ এই ভাতৃহত্যায় মিএদোহ, অথাৎ যাঁহারা স্বভাবতঃ অনুকূল ও সহায়, তাঁহাদের অনিষ্ট করা হয়, উপরস্ত স্বীয় কুল অর্থাৎ যে কুরুনামক ক্ষতিয় বংশ ও জাতিতে উভয় পক্ষের জন্ম হইয়াছে, তাহার বিনাশ সাধিত হয়। প্রাচীন কালে জাতি প্রায়ই রজের সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক মহান্ কুল বিস্তার পাইয়া জাতিতে পরিণত হইত, যেমন ভোজবংশ, কুরুবংশ ইত্যাদি ভারত-জাতির অন্তর্গত কুলবিশেষ এক-একটি বলশালী জাতি হইয়াছিল। কুলের মধ্যে যে অন্তবিরোধ ও পরস্পরের অনিস্টকরণ তাহাকেই অর্জুন মিগ্রদ্রোহ নামে অভিহিত করিলেন। একে এই মিল্লচোহ নৈতিক হিসাবে মহাপাপ, তাহাতে অর্থনীতিক হিসাবে এই মহান্দোষ মিল্লোহে সন্নিবিস্ট যে কুলক্ষয় তাহার অবশ্যস্তাবী ফল। সনাতন কুলধর্মের সম্যক্ পালন কুলের উন্নতির ও অবস্থিতির কারণ, যে মহৎ আদশ ও কম্মশৃঙখলা গাহস্যজীবনে ওরাজনীতিক ক্ষেত্রে পিতৃপুরুষগণ স্থাপিত ও রক্ষিত করিয়া আসিতেছেন, সেই আদর্শের হানি বা শৃংখলার শিথিলীকরণ হইলে কুলের অধঃপতন হয়। কুল যতদিন সৌভাগ্য-বান ও বলশালী হইয়া থাকে, ততদিন এই আদর্শ ও কম্মশৃত্থলা রক্ষিত হয়, কুল ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া পড়িলে তমোডাবের প্রসারণে মহান্ ধন্েম শিথিলতা হয়, তাহার ফলে অরাজকতা, দুনীতি ইত্যাদি দোষ কুলে প্রবিষ্ট হয়, কুলের মহিলাগণ দুশ্চরিল্লা হয় এবং কুলের পবিত্রতা নঙ্ট হয়, নীচজাতীয় ও নীচচরিল্ল-বিশিশ্ট লোকের ঔরসে মহান্ কুরে পুরোৎপাদন হয়। তাহাতে পিতৃপুরুষের প্রকৃত সভতিচ্ছেদে কুলহভাদের নরকপ্রাণিত হয় এবং অধন্মের প্রসারে, বর্ণসঙ্করসভূত নৈতিক অধোগতি ও নীচ গুণের বিস্তারে এবং অরাজকতা প্রভৃতি দোষে সমস্ত কুলও বিনাশপ্রাণ্ড হয় এবং নরকপ্রাণ্ডির যোগ্য হয়। জাডিধম্ম ও কুলধন্ম উভয়ই কুলনাশে নদ্ট হয়। জাতিধন্ম অর্থাৎ সমন্ত কুলসম্পিটতে যে মহান্ জাতি হয়, সেই জাতির পুরুষপরস্পরায় আগত সনাতন আদেশ ও কম্মণ্ডখলা। তাহার পরে অজুন আবার তাঁহার প্রথম সিদ্ধান্ত ও কর্ত্বব্যক্ষম বিষয়ক নিশ্চয় জাপন করিয়া যুদ্ধের সময়েই গাঙীব পরিত্যাগ করিয়া রথে বসিয়া পড়িলেন। কবি এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ইঙ্গিত করিয়া জানাইলেন যে, শোকে তাঁহার বুদ্ধিবিভাট হইয়াছিল বলিয়া অজুঁন এইরাপ ক্ষএিয়ের অনুচিত অনার্য্য **আচ**রণে **কৃ**তসঙ্গল হেইয়াছিলেন।

o শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

বিদ্যা ও অবিদ্যা

আমরা অজুনের কুলনাশবিষয়ক কথার মধ্যে একটি অতি রহৎ ও উন্নত ভাবের ছায়া দেখিতে পাই, এই ভাবের সহিত যে গুরুতর প্রশ্ন সংশ্লিপ্ট, তাহার আলোচনা গীতার ব্যাখ্যাকর্তার পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয় । অথচ আমরা যদি কেবল গীতার আধ্যাত্মিক অর্থ অনেষণ করি, আমাদের জাতীয়, গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত সাংসারিক কম্ম ও আদর্শ হইতে গীতোক্ত ধম্মের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ করি, সেই ভাব ও সেই প্রশ্নের মহত্ত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অস্থীকার করিব এবং গীতোক্ত ধম্মের সক্রিয়াপী বিস্তার সঙ্গুচিত করিব। শঙ্কর প্রভৃতি যাঁহারা গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহারা সংসারপরাখ্যুখ দার্শনিক অধ্যাত্মবিদ্যাপরায়ণ জানী বা ভক্ত ছিলেন, গীতায় তাঁহাদের প্রয়োজনীয় জান ও ভাব খুঁজিয়া যাহা প্রয়োজনীয়, তাহাই লাভ করিয়া সম্ভুষ্ট হইলেন। যাঁহারা এক আধারে জানী, ভক্ত ও কম্মী তাঁহারাই গীতার গৃত্তম শিক্ষার অধিকারী ৷ গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ জানী ও কম্মী ছিলেন, গীতার পার অর্জুন ভক্ত ওকম্মী ছিলেন, তাঁহার জানচক্ষু উন্মীলনের জন্য কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষা প্রচার করিলেন। একটি মহৎ রাজনীতিক সংঘর্ষ গীতাপ্রচারের কারণ, সেই সংঘর্ষে অর্জুনকে মহৎ রাজনীতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির যন্ত ও নিমিত রূপে যুদ্ধে প্ররুত করা গীতার উদ্দেশ্য, যুদ্ধক্ষেত্রই শিক্ষাস্থল ৷ শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ ও যোদ্ধা, ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, অজুনও ক্ষত্রিয় রাজকুমার, রাজনীতি ও যুদ্ধ তাঁহার স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম। গীতার উদ্দেশ্য বাদ দিয়া, গীতার বক্তা, পাত্র ও প্রচারের কারণ বাদ দিয়া গীতার ব্যাখ্যা করা চলিবে কেন ?

মানব-সংসারের পাঁচটি মুখ্য প্রতিষ্ঠা চিরকাল বর্ত্তমান—ন্যক্তি, পরিবার, বংশ, জাতি, মানবসমিদিট। এই পাঁচটি প্রতিষ্ঠার উপর ধর্ম্মও প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রাণিত। ভগবৎপ্রাণিতর দুই মার্গ, বিদ্যাকে আয়ন্ত করা এবং অবিদ্যাকে আয়ন্ত করা, দুইটিই আআজ্ঞান ও ভগবদ্দানের উপায়। বিদ্যার মার্গ ব্রহ্মের অভিব্যক্তি অবিদ্যাময় প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া সিচিদানন্দ লাভ বা পরব্রহ্মে লয়। অবিদ্যার মার্গ সর্বর্ত্ত আত্মা ও ভগবানকে দর্শন করিয়া জানময় মঙ্গলময় পরিদ্যার মার্গ সর্বর্ত্ত আত্মা ও ভগবানকে দর্শন করিয়া জানময় মঙ্গলময় পরিদ্যার আর্থা ও ভগবানকে দর্শন করিয়া জানময় মঙ্গলময় পরিদ্যার পরিদ্যার উদ্দেশ্য, প্রেম অবিদ্যার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভগবানের প্রকৃতি বিদ্যাবিদ্যাময়ী। আমরা যদি কেবল বিদ্যার মার্গ অনুসরণ করি অবিদ্যাময় ব্রহ্ম লাভ করিব। বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইটিকেই যিনি আয়ন্ত করিতে পারেন, তিনিই সম্পূর্ণভাবে বাসুদেবকে লাভকরেন; তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যার অতীত। যাঁহারা বিদ্যার শেষ লক্ষ্য পর্যন্ত পৌছিয়াছেন, তাঁহারা বিদ্যার সাহায্যে অবিদ্যাকে আয়ন্ত করিয়াছেন। ঈশা উপনিষদে এই মহান্ সন্ত্য অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, যথা—

৯০

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেথবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।।
অন্যদেবাহুবিদ্যয়ান্যদেবাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুমুম ধীরাণাং যে নস্তদিচচক্ষিরে।।
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যন্তদেবাভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্জা বিদ্যয়ামৃত্যশুতে।।

"ঘাঁহারা অবিদ্যার উপাসক হন, তাঁহারা অন্ধ অঞ্চানরূপ তমঃ মধ্যে প্রবেশ করেন । যে ধীর জানিগণ আমাদিগের নিকট ব্রহ্মজান প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে বিদ্যারও ফল আছে, অবিদ্যারও ফল আছে, সেই দুই ফল স্বতন্ত্র। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই জানে আয়ন্ত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই অবিদ্যা দারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দারা অমৃত্যুর পুরুষোভ্যের আনন্দ ভোগ করেন।"

সমস্ত মানবজাতি অবিদ্যা ভোগ করিয়া বিদ্যার দিকে অগ্রসর হইতেছেন, ইহাই প্রকৃত ক্রমবিকাশ। যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, সাধক, যোগী, জানী, ভজু, কন্মযোগী, তাঁহারা এই মহৎ অভিযানের অগ্রগামী সৈন্য, দূর গস্তব্যস্থানে ক্ষিপ্রগতিতে পৌছিয়া ফিরিয়া আসেন ও মানবজাতিকে সুসংবাদ শ্রবণ করান, পথ প্রদর্শন করেন, শক্তি বিতরণ করেন। ভগবানের অবতার ও বিভূতি আসিয়া পথ সুগম করেন, অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেন, বাধা বিনাশ করেন। অবিদ্যায় বিদ্যা, ভোগে ত্যাগ, সংসারে সন্যাস আত্মার মধ্যে সক্রভূত, সক্রভূতের মধ্যে আত্মা, ভগবানে জগৎ, জগতে ভগবান, এই উপলব্ধি আসল জান, ইহাই মানবজাতির গভবাস্থানে গমনের নিদ্দিত্ট পথ। আত্মজানের সঙ্কীর্ণতা উন্নতির প্রধান অন্তরায়, দেহাত্মকবোধ, স্বার্থবোধ, সেই সঙ্কীর্ণতার মূল কারণ, অতএব পরকে আত্মবৎ দেখা উন্নতির প্রথম সোপান। মনুষ্য প্রথম ব্যক্তি লইয়া থাকে, নিজ ব্যক্তিগত শারীরিক ও মানসিক উন্নতি, ভোগ ও শক্তিবিকাশে রত থাকে। আমি দেহ, আমি মন, আমি প্রাণ, দেহের বল, সুখ, সৌন্দর্য্য, মনের ক্ষিপ্রতা, আনন্দ, স্বচ্ছতা, প্রাণের তেজ, ভোগ, প্রফুল্লতা, জীবনের উদ্দেশ্য ও উন্নতির চরমাবস্থা, মনুষোর এই প্রথম বা আসুরিক জান। ইহারও প্রয়োজন আছে ; দেহ, মন, প্রাণের বিকাশ ও পরিপূর্ণতা প্রথম সাধন করিয়া তাহার পর সেই পূর্ণবিকশিত শক্তি পরের সেবায় প্রয়োগ করা উচিত । সেইজন্য আসুরিক শক্তিবিকাশ মানবজাতির সভ্যতার প্রথম অবস্থা ; পশু, যক্ষ, রাক্ষস, অসুর, পিশাচ পর্য্যন্ত মনুষ্যের মনে, কম্মে, চরিত্রে লীলা করে, বিকাশ পায়। তাহার পর মনুষ্য আত্মজান বিস্তার করিয়া পরকে আত্মবৎ দেখিতে আরম্ভ করে, পরার্থে স্বার্থ ডুবাইতে শিখে। প্রথম পরিবারকেই আত্মবৎ দেখে, স্ত্রীসন্তানের প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করে, স্ত্রীসন্তানের সুখের জন্য নিজ সুখ জলাঞ্জলি দেয়। তাহার পরে বংশ বা কুলকে। আত্মবৎ দেখে, কুলরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করে, নিজেকে, স্ত্রীসন্তানকে বলি দেয়, কুলের সুখ, গৌরব ও রদ্ধির জন্য নিজের ও স্ত্রীসন্তানের সুখকে জলাঞ্জলি দেয়।

তাহার পরে জাতিকে আত্মবৎ দেখে, জাতিরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করে, নিজেকে, স্ত্রীসন্তানকে কুলকে বলি দেয়.—-যেমন চিতোরের রাজপুতকুল সমস্ত রাজপুত-জাতির রক্ষার্থে বার বার স্বেচ্ছায় বলি হইল,--জাতির সুখ, গৌরব রুদ্ধির জন্য নিজের, স্ত্রীসন্তানদের, কুলের সৃখ, গৌরব, রৃদ্ধিকে জলাঞ্জলি দেয়। তাহার পরে সমস্ত মানবজাতিকে আত্মবৎ দেখে, মানবজাতির উন্নতির জন্য প্রাণত্যাগ করে, নিজেকে, স্ত্রীসন্তানকে, কুলকে, জাতিকে বলি দেয়,—–মানবজাতির সুখ ও উন্নতির জন্য নিজের, স্ত্রীসভানদের, কুলের, জাতির, সুখ, গৌরব ও রৃদ্ধিকে জলাঞ্জলি দেয়। এইরাপ পরকে আত্মবৎ দেখা, পরের জন্য নিজেকে ও নিজের সুখকে বলি দেওয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মপ্রসূত খ্রীষ্ট্রধর্মের প্রধান শিক্ষা। য়ুরোপের নৈতিক উন্নতি এই পথে অগ্রসর হইয়াছে। প্রাচীন য়ুরোপীয়গণ ব্যক্তিকে পরিবারে ডুবাইতে, পরিবারকে কুলে ডুবাইতে শিখিয়াছিলেন, আধুনিক য়ুরোপীয়গণ কুলকে জাতিতে ডুবাইতে শিখিয়াছেন, জাতিকে মানবসম্পিটতে ডুবান এখন তাঁহাদের মধ্যে কঠিন আদর্শ বলিয়া প্রচারিত : টলপ্টয় ইত্যাদি মনীষিগণ এবং সোশ্যালিতট, এনাকিতট ইত্যাদি নব আদর্শের অনুমোদক দল এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। এই পর্যান্ত য়ুরোপের দৌড়। তাঁহারা অবিদ্যার উপাসক, প্রকৃত বিদ্যা অবগত নহেন। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি ষেহবিদ্যামূপাসতে।

ভারতে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই মনীষিগণ আয়ত্ত করিয়াছেন। তাঁহারা জানেন অবিদ্যার পঞ্চপ্রতিষ্ঠা ভিন্ন বিদ্যার প্রতিষ্ঠা ভগবান আছেন, তাঁহাকে না জানিতে পারিলে অবিদ্যাও জাত হয় না, আয়ন্ত হয় না। অতএব কেবল পরকে আত্মবৎ না দেখিয়া আত্মবৎ পরদেহেষ অর্থাৎ নিজের মধ্যে ও পরের মধ্যে সমানভাবে ভগবানকে দর্শন করিয়াছেন। নিজের উৎকর্ষ করিব, নিজের উৎকর্ষে পরিবারের উৎকর্ষ সাধিত হইবে; পরিবারের উৎকর্ষ করিব, পরিবারের উৎকর্ষে কুলের উৎকর্ষ সাধিত হইবে ; জাতির উৎকর্ষ করিব, জাতির উৎকর্ষে মানবজাতির উৎকর্ষ সাধিত হইবে ; এই জান আর্য্য সামাজিক ব্যবস্থার ও আর্য্য শিক্ষার মলে নিহিত। ব্যক্তিগত ত্যাগ আর্য্যের মজ্জাগত অভ্যাস, পরিবারের জন্য ত্যাগ, কুলের জন্য ত্যাগ, সমাজের জন্য ত্যাগ, মানবজাতির জন্য ত্যাগ, ভগবানের জন্য ত্যাগ। আমাদের শিক্ষায় যে দোষ বা ন্যুন্তা লক্ষিত হয়, সেই দোষ কয়েকটি ঐতিহাসিক কারণের ফল, যেমন, জাতিকে সমাজের মধ্যে দেখি, সমাজের হিতে ব্যক্তির ও পরিবারের হিত ডুবাইয়া থাকি, কিন্তু জাতির রাজ-নীতিক জীবনবিকাশ আমাদের ধন্মের অন্তর্গত মুখ্য অঙ্গ বলিয়া গৃহীত ছিল না। পাশ্চাত্য হইতে এই শিক্ষা আমদানী করিতে হইল। অথচ আমাদেরও প্রাচীন শিক্ষার মধ্যে, মহাভারতে, গীতায়, রাজপুতনার ইতিহাসে, রামদাসের দাসবোধে এই শিক্ষা আমাদের স্থদেশেই ছিল। অতিরিক্ত বিদ্যা-উপাসনায়, অবিদ্যাভয়ে আমরা সেই শিক্ষা বিকাশ করিতে পারি নাই, সেই দোষে তুমাভিভূত হইয়া জাতিধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া কঠিন দাসত্বে, দুঃখে, অজ্ঞানে পড়িলাম, অবিদ্যাও

গীতার ভূমিকা

७७

আয়েত করিতে পারি নাই, বিদ্যাও হারাইতে বসিয়াছিলাম। ততো ভুয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

গ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিক উদ্দেশ্য

কুল ও জাতি মানবসমাজের ক্রমিক বিকাশে ভিন্ন হয়, প্রাচীনকালে সেই ভিন্নতা ভারতে ও অন্য দেশেও এত পরিস্ফুট হয় নাই। কয়েকটি বড় বড় কুলের সমাবেশে একটি জাতি হইয়া দাঁড়াইত। এই ভিন্ন ভিন্ন কুল হয় এক-পূবর্বপুরুষের বংশধর, নয় ভিল্ল-বংশজাত হইলেও প্রীতিসংস্থাপনে এক বংশজাত বলিয়া গৃহীত। সমস্ত ভারত এক বড় জাতি হয় নাই, কিন্তু যে বড় বড় জাতি সমস্ত দেশ ছাইয়া বিরাজ করিত, তাহাদের মধ্যে এক সভ্যতা, এক ধর্ম্ম, এক সংস্কৃত ভাষা এবং বিবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল। তথাপি প্রাচীনকাল হইতে একজের চেণ্টা হইয়া আসিয়াছিল, কখনও কুরু, কখনও পাঞাল, কখনও কোশল, কখনও মগধ জাতি দেশের নেতা বা সাক্জিম রাজা হইয়া সায়াজ্য করিত, কিন্তু প্রাচীন কুলধম্ম ও কুলের স্বাধীনতা-প্রিয়তা একছের এমন প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করিত যে সেই চেষ্টা কখন চিরকাল টিকিতে পারে নাই। ভারতে এই একত্বের চেম্টা, অসপত্র সাম্রাজ্যের চেম্টা পুণ্যকর্ম্ম এবং রাজার কর্ত্তব্য-কম্মের মধ্যে গণ্য ছিল। এই একজের স্রোত এত প্রবল হইয়াছিল যে চেদিরাজ শিওপালের ন্যায় তেজস্বী ও দুর্ভ ক্ষত্রিয়ও যুধিচিরের সামাজ্যস্থাপনে পুণ্যকম্ম বলিয়া যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এইরূপ **একত,** সামাজ্য বা ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিক উদ্দেশ্য। মগধরাজ জরাসরূ পূর্ব্বেই এই চেম্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শক্তি অধমর্ম ও অত্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, অতএব ক্ষণস্থায়ী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভীমের হাতে বধ করাইয়া সেই চেল্টা বিফল করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যের প্রধান বাধা গব্বিত ও তেজস্বী কুরুবংশ । কুরুজাতি অনেকদিন **হইতে ভারতের নেতৃস্থানীয়** জাতি ছিল, ইংরাজিতে যাহাকে hegemony বলে অর্থাৎ অনেক সমান স্বাধীন জাতির মধ্যে প্রধানত্ব ও নেতৃত্ব, তাহাতে কুরুজাতির পুরুষপরস্পরাগত অধিকার ছিল। যতদিন এই জাতির বল ও গর্কা অক্ষুণ্ণভাবে থাকিবে, ভারতে কখন একত স্থাপিত হইবে না, শ্রীকৃষ্ণ ইহা বুঝিতে পারিলেন। অতএব তিনি কুরুজাতির ধ্বংস করিতে কৃতসক্ষর হইলেন। কিন্তু ভারতের সাদ্রাজ্যে **কুরুজা**তির পুরুষ-পরশ্পরাগত অধিকার ছিল, শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বিস্মৃত হন নাই ; যাহা ধর্মকঃ কাহারও প্রাপ্য, তাহাতে তাহাকে বঞ্চিত করা অধর্ম্ম বলিয়া কুরুজাতির যে ন্যায়তঃ রাজা ও প্রধান, সেই যুধিষ্ঠিরকে ভাবী সম্রাটপদে নিযুক্ত করিবার জন্য মনোনীত করিলেন। শ্রীফৃষ্ণ পরম ধান্মিক, সমর্থ হইয়াও স্নেহের বশে নিজের প্রিয় যাদবকুলকে কুরুজাতির ভানে ভাপন করিবার চেল্টা করেন নাই, পাণ্ডবদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অবহেলা করিয়া নিজ প্রিয়তম সখা অজুঁনকে সেই পদে নিযুক্ত করেন নাই। কিন্তু কেবল বয়স বা পূর্ব্ব অধিকার দেখিলে অনিপেটর

সম্ভাবনা হয়, গুণ ও সামর্থাও দেখিতে হয়। রাজা যুধিন্ঠির যদি অধাশিমক, অত্যাচারী বা অশক্ত হইতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ অন্য পাত্রকে জন্বেষণ করিতে বাধ্য হইতেন। যুধিন্ঠির ষেমন বংশক্রমে, ন্যায্য অধিকারে ও দেশের পূর্ক্বপ্রচলিত নিয়মে সমাট হইবার উপযুক্ত, তেমনই গুণেও সেই পদের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। তাঁহা অপেক্ষা তেজস্বী ও প্রতিভাবান অনেক বড় বড় বীর নৃপতি ছিলেন, কিন্তু কেবল বলে ও প্রতিভায় কেহ রাজ্যের অধিকারী হন না। রাজা ধর্ম্মরক্ষা করিবেন, প্রকৃতিরঞ্জন করিবেন, দেশরক্ষা করিবেন। প্রথম দুই গুণে যুধিন্ঠির অতুলনীয় ছিলেন, তিনি ধর্ম্মপুত্র, তিনি দয়াবান, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, সত্যপ্রতিক্ত, সত্যকশর্মা, প্রজার অতীব প্রিয়। শেষোক্ত আবশ্যক গুণে তাঁহার যে ন্যুনতা ছিল, তাঁহার বীর প্রাতৃদ্বয় জীম ও অর্জুন তাহা পূরণ করিতে সমর্থ ছিলেন। পঞ্চপাণ্ডবের তুল্য পরাক্রমী রাজা বা বীরপুরুষ সমকালীন ভারতে ছিল না। অতএব জরাসন্ধবধে কন্টক উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে রাজা যুধিন্ঠির দেশের প্রাচীন প্রণালী অনুসরণ করিয়া রাজসূয় যক্ত করিলেন এবং দেশের সম্মাট হুইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ধাশ্মিক ও রাজনীতিবিদ্। দেশের ধর্ম্ম, দেশের প্রণালী, দেশের সামাজিক নিয়মের ভিতরে কম্ম করিয়া যদি তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবার সভাবনা থাকে, তবে সেই ধম্মের হানি, সেই প্রণালীর বিরুদ্ধাচরণ, সেই নিয়ম ভঙ্গ করিবেন কেন? বিনা কারণে এইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব করা দেশের অহিতকর হয়। সেই হেতু প্রথমে পুরাতন প্রণালী রক্ষা করিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু দেশের প্রাচীন প্রণালীর এই দোষ ছিল যে তাহাতে চেস্টা সফল হইলেও সে ফল স্থায়ী হইবার অতি অল্প সম্ভাবনা ছিল। ঘাঁহার সামরিক বলর্দ্ধি আছে, তিনি রাজসূয় যজ করিয়া সম্রাট হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার বংশধর ক্ষীণতেজ হইবামার সেই মুকুট মন্তক হইতে আপনি খসিয়া পড়ে। যে তেজস্বী বীরজাতিসকল তাহার পিতার বা পিতামহের বশ হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিজয়ীর পুত্রের বা পৌরের অধীনতা স্বীকার করিবেন কেন ? বংশগত অধিকার নহে, রাজস্য় যজুই অর্থাৎ অসাধারণ বলবীর্য্য সেই সাম্রাজ্যের মল, যাঁহার অধিক বলবীর্য্য তিনিই যজ করিয়া সমাট হইবেন। অতএব সামাজ্যের স্থায়িত্ব পাইবার কোন আশা ছিল না, অল্পকাল প্রধানত্ব বা hegemony ই হইতে পারে। এই প্রথার আর একটি দোষ এই ছিল যে, নবসমাটের অকস্মাৎ বলর্দ্ধি ও প্রধানত্বলাভে দেশের বলদৃ>ত অসহিষ্ণু তেজন্বী ক্ষব্রিয়গণের হৃদয়ে ঈর্যাবহিং প্রজলিত হয় ; ইনি প্রধান হইবেন কেন, আমরা কেন হইব না, এই বিচার সহজে মনের মধ্যে উঠিবার সম্ভাবনা ছিল । যুধিষ্ঠিরের নিজকুলের ক্ষ্তিয়গণ এই ঈষায় তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইলেন, তাঁহার পিতৃব্যের সন্তানগণ এই ঈষার উপর নির্ভর করিয়া কৌশলে তাঁহাকে পদচ্যুত ও নির্কাসিত করিলেন। দ্বেষের প্রণালীর দোষ অম্বদিনেই ব্যক্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন ধাশ্মিক তেমনই রাজনীতিবিদ্। তিনি কখনও সদোষ,

অহিতকর বা সময়ের অনুপযোগী প্রণালী, উপায় বা নিয়ম বদলাইতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনি তাঁহার যুগের প্রধান বিপ্রবকারী। রাজা ভূরিগ্রবা শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিবার সময় সমকালীন পুরাতন মতের অনেক ভারতবাসীর আক্রোশ ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণচালিত যাদবকুল কখনও ধম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বা ধর্মকে বিকৃত করিতে কুষ্ঠিত হন না, যে কুষ্ণের পরামর্শে কার্য্য করিবে, সেই নিশ্চয় অবিলম্বে পাপে পতিত হইবে। কেন না, পুরাতন রীতিতে আসক্ত রক্ষণশীলের মতে নৃতন প্রয়াসই পাপ । শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের প্রতনে বুঝিলেন---বুঝিলেন কেন, তিনি ভগবান, পূর্কে জানিতেন,---যে, দাপর্যুগের উপযোগী প্রথা কলিতে কখনও রক্ষণীয় নহে। অতএব তিনি আর সেইরূপ চেষ্টা করিলেন না, কলির উচিত ভেদদপ্ত প্রধান রাজনীতি অনুসরণ করিয়া গব্বিত দৃপ্ত ক্ষত্তিয় জাতির বল নাশে ভাবী সাম্রাজ্যকে নিষ্কন্টক করিতে সচেষ্ট হইলেন । তিনি কুরুদের পুরাতন সমকক্ষ শরু পাঞালজাতিকে কুরুধ্বংসে প্ররুত করিলেন, যত জাতি কুরুদের বিদেষে যুধিষ্ঠিরের প্রেমে বা ধর্মরাজ্য ও একত্বের আকাঙ্ক্ষায় আকৃষ্ট হইতে পারে, সকলকে সেই পক্ষে আকর্ষণ করিলেন এবং যুদ্ধের উদ্যোগ করাইলেন। যে সন্ধির চেল্টা হইল, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের আস্থা ছিল না, তিনি জানিতেন সন্ধির সম্ভাবনা নাই, সন্ধি স্থাপিত হইলেও সে স্থায়ী হইতে পারে না, তথাপি ধন্মের খাতিরে ও রাজনীতির খাতিরে তিনি সন্ধির চেপ্টায় প্ররুত হইলেন। সন্দেহ নাই, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির ফল, কুরুধ্বংস, ক্ষত্রিয়ধ্বংস ও নিষ্ণন্টক সাম্রাজ্য ও ভারতের একত্বস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্য। ধম্মরাজ্য ভাপনের জন্য যে যুদ্ধ, সেই ধ্ম্মযুদ্ধ, সেই ধ্ম্মযুদ্ধর ঈশ্বর-নিদ্দিপ্ট বিজেতা, দিব্যশক্তিপ্রণোদিত মহারথী অর্জুন। অর্জুন অস্তুত্যাগ করিলে, শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিক পরিশ্রম পশু হইত, ভারতের একত্ব সাধিত হইত না, দেশের ভবিষ্যতে অবিলম্বে ঘোর কুফল ফলিত।

ভ্রাতৃবধ ও কুলনাশ

অর্জুনের সমস্ত যুক্তি কুলের হিত অপেক্ষা করিয়া প্রয়োজিত, জাতির হিতচিন্তা হেহবশে তাঁহার মন হইতে অপসারিত হইয়াছে। তিনি কুরু-বংশের হিত ভাবিয়া ভারতের হিত বিস্মৃত হইয়াছেন, অধশের্মর ভয়ে ধশর্মকে জলাঞ্জলি দিতে বদ্ধপরিকর হইতেছেন। স্বার্থের জন্য প্রাতৃবধ মহাপাপ, এ কথা সকলে জানে, কিন্তু প্রাতৃপ্রেমের বশে জাতীয় অনর্থ সম্পাদনে সহায় হওয়া, জাতীয় হিতসাধনে বিমুখ হওয়া, এই পাপ গুরুতর। অর্জুন যদি শস্ত্রত্যাগ করেন, অধশের্মর জয় হইবে, দুর্যোধন ভারতে প্রধান নৃপতি ও সমস্ত দেশের নেতা হইয়া জাতীয় চরিত্র ও ক্ষত্রিয়কুলের আচরণ স্বীয় কুদৃষ্টান্তে কলুষিত করিবেন, ভারতের প্রবল পরাক্রান্ত কুলসকল স্বার্থ, ঈর্ষা ও বিরোধপ্রিয়তার প্রেরণায় পরস্পরকে বিনাশ করিতে উদাত হইবে, দেশকে একত্রিত, নিয়ন্ত্রিত ও শক্তির সমাবেশে সুরক্ষিত করিবার কোন অসপত্র ধশ্র্মপ্রণেদিত রাজশক্তি থাকিবে

না, এই অবস্থায় যে বিদেশী আক্রমণ তখনও রুদ্ধ সমুদ্রের ন্যায় ভারতের উপর পড়িয়া প্লাবিত করিতে প্রস্তুত হইতেছিল, সে অসময়ে আসিয়া আর্য্য-সভ্যতা ধ্বংস করিয়া জগতে ভাবী হিতের আশা নিম্মূল করিত। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের নাশে দুই সহস্র বর্ষ পরে ভারতে যে রাজনীতিক উৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা তখনই আরম্ভ হইত।

লোকে বলে অর্জুন যে অনিলেটর ভয়ে এই আপন্তি করিয়াছিলেন, সত্য সত্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলে সেই অনিল্ট ফলিল । প্রাতৃবধ, কুলনাশ, জাতিনাশ পর্যন্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফল । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কলি প্রবৃত্তিত হইবার কারণ । এই যুদ্ধে ভীষণ প্রাতৃবধ হইল, ইহা সত্য । জিঞ্চাস্য এই, আর কি উপায়ে প্রীকৃষ্ণের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইত ? এইজনাই প্রীকৃষ্ণ সন্ধিপ্রার্থনার বিফলতা জানিয়াও সন্ধিস্থাপনের জন্য বিস্তর চেল্টা করিয়াছিলেন, এমন কি পঞ্চ গ্রামও ফিরিয়া পাইলে যুধিষ্ঠির যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতেন, সেইটুকু পদ রাখিবার হল পাইলেও শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে পারিতেন । কিন্তু দুর্য্যোধনের দৃঢ় নিশ্চয় ছিল, বিনাযুদ্ধে সূচ্যপ্র ভূমিও দিবেন না । ষখন সমস্ত দেশের ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ফলের উপর নির্ভর করে, সেই যুদ্ধে দ্রাতৃবধ হইবে বলিয়া মহৎ কম্পের ক্ষান্ত হওয়ায় অধর্ম্ম হয় । পরিবারের হিত জাতির হিতে, জগতের হিতে ভুবাইতে হয় ; প্রাতৃস্লেহে, পারিবারিক ভালবাসার মোহে কোটি কোটি লোকের সর্ব্বনাশ করা চলে না, কোটি কোটি লোকের ভাবী সুখ বা দুঃখমোচন বিন্পট করা চলে না, ভাহাতে ব্যক্তির ও কুলের নরকপ্রাণ্ডি হয়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুলনাশ হইয়াছিল তাহাও সত্য কথা: এই যুদ্ধের ফলে মহাপ্রতাপান্তি কুরুবংশ একরাপ লোপ পাইলঃ কিন্তু কুরুজাতির লোপে যদি সমস্ত ভারত রক্ষা পাইয়া থাকে, তাহা হইলে কুরুধবংসে ক্ষতি না হইয়া লাভই হইয়াছে। যেমন পারিবারিক ভালবাসার মায়া আছে, তেমনই কুলের উপর মায়া আছে। দেশভাইকে কিছু বলিব না, দেশবাসীর সঙ্গে বিরোধ করিব না, অনিস্ট করিলেও, আততায়ী হইলেও, দেশের সর্বানাশ করিলেও তিনি ভাই,স্লেহের পাল্ল, নীরবে সহ্য করিব ; আমাদের মধ্যে যে বৈষ্ণবী–মাল্লা-প্রসূত অধন্ম ধন্মের ভান করিয়া অনেকের বুদ্ধিভংশ করে, তাহা এই কুলের মায়ার মোহে উৎপন্ন। বিনা কারণে বা স্বার্থের জন্য, নিতান্ত প্রয়োজন ও আবশ্যকতার অভাবে দেশভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ ও কলহ করা অধর্মা। কিন্তু যে দেশভাই সকলের মাকে প্রাণে বধ করিতে বা তাঁহার অনিষ্ট করিতে বন্ধপরিকর, তাহার দৌরাত্ম্য নীরবে সহ্য করিয়া সেই মাতৃহত্যা বা অনিষ্টাচরণকে প্রশ্রয় দেওয়া আরও গুরুতর পাতক। শিবাজী যখন মুসলমানের পৃষ্ঠপোষক দেশভাইকে সংহার করিতে গেলেন, তখন যদি কেহ বলিতেন, আহা! কি কর, ইহারা দেশভাই, নীরবে সহ্য কর, মোগল মহারাষ্ট্রদেশকৈ অধিকার করে করুক, মারাঠায় মারাঠায় প্রেম থাকিলেই হয়,--কথাটি কি নিতান্ত হাস্যকর বোধ হইত না ? আমেরিকানরা যখন দাসভুপ্রথা উঠাইবার জন্য দেশে বিরোধস্পিট

ও অন্তঃস্থ যুদ্ধস্পিট করিয়া সহস্র সহস্র দেশভাইয়ের প্রাণসংহার করিলেন, তাঁহারা কি কুকম্ম করিয়াছিলেন ? এমন হয় যে দেশভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ, দেশভাইকে যুদ্ধে বধ, জাতির হিত ও জগতের হিতের একমাত্র উপায় হয়। ইহাতে কুলনাশের আশঞ্চা যদি হয়, তাহা হইলেও জাতির হিত ও জগতের হিতসাধনে ক্ষান্ত হুইতে পারি না। অবশ্য যদি সেই কুলের রক্ষা জাতির হিতের জন্য আবশ্যক হয়, সমস্যা জটিল হয়। মহাভারতের যুগে ভারতে জাতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সকলে কুলকেই মনুষ্যজাতির কেন্দ্র বলিয়া জানিত। সেই-জন্যই ভীপম, দ্রোণ প্রভৃতি যাঁহারা পুরাতন বিদ্যার আকর ছিলেন, পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে ধর্ম্ম পাণ্ডবদের দিকে, জানিতেন যে মহৎ সাম্রাজ্যসংস্থাপনে সমস্ত ভারতকে এক কেন্দ্রে আবদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাঁহারা ইহাও বুঝিতেন যে কুলই ধন্দের্মর প্রতিষ্ঠা ও জাতির কেন্দ্র, কুলনাশে ধশ্মরক্ষা ও জাতিসংস্থাপন অসভব । অর্জুনও সেই ল্রমে পতিত হইলেন। এই যুগে জাতিই ধম্মের প্রতিষ্ঠা, মানবসমাজের কেন্দ্র। জাতিরকা এই যুগের প্রধান ধশর্ম, জাতিনাশ এই যুগের অমার্জনীয় মহাপাতক। কিন্তু এমন যুগ আসিতেও পারে যখন এক রুহৎ মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তখন হয়ত জগতের বড় বড় জানী ও কম্মী জাতির রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিবেন, অপর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বিপ্লবকারী হইয়া নব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধাইয়া জগতের হিতসাধন করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির ফল

প্রথম কুপার আবেশে অর্জুন কুলনাশের উপর অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন, কেন না, এই বৃহৎ সৈন্যসমাবেশ দর্শনে কুলের চিন্তা, জাতির চিন্তা আপনিই মনে উঠে। বলা হইয়াছে, কুলের হিতচিন্তা সেইকালের ভারতবাসীর পক্ষে স্বাভাবিক, যেমন জাতির হিতচিতা আধুনিক মনুষ্যজাতির পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু কুলনাশে জাতির প্রতিষ্ঠা নাশ হইবে, এই আশঙ্কা কি অমূলক ছিল? অনেকে বলে, অর্জুন যাহা ভয় করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তাহাই ঘটিল, কুরুক্তের্যুদ্ধ ভারতের অবনতি ও দীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতার মূল কারণ। তেজয়ী ক্ষত্রিয়-বংশের লোপে, ক্ষাত্রতেজের হ্যুসে ভারতের বিষম অমঙ্গল হইয়াছে। একজন বিখ্যাত বিদেশী মহিলা, যাঁহার শ্রীচরণে অনেক হিন্দু এখন শিষ্যভাবে আনতশির, এই বলিতে কুষ্ঠিত হন নাই যে ক্ষত্রিয়নাশে ইংরেজ-সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ সুগম ় করাই স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইবার আসল উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের ধারণা, যাঁহারা এইরূপ অসংলগ্ন কথা বলেন, তাঁহারা বিষয়টি না তলাইয়া অতি নগণ্য রাজনীতিক তত্ত্বের বশবন্তী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির দোষ দেখাইতেছেন। এই রাজনীতিক তত্ত্ব শেলচ্ছবিদ্যা, অনার্য্য চিন্তাপ্রণালী–সভূত । অনার্য্যগণ আসুরিক বলে বলীয়ান, সেই বলকে স্বাধীনতা ও জাতীয় মহত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি বলিয়া জানেন।

৯৮

জাতীয় মহত্ব কেবল ক্ষত্রতেজের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, চতুর্বর্ণের চতুব্বিধ তেজই এই মহ**ত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। সাত্ত্বিক ব্রহ্মতেজ রাজসিক ক্ষ**ন্ততেজকে ভান, বিনয় ও পরহিতচিভার মধুর সঞ্জীবনী সুধায় জীবিত করিয়া রাখে, ক্ষত্রতেজ শান্ত ব্রহ্মতেজকে রক্ষা করে। ক্ষত্রতেজরহিত ব্রহ্মতেজ তমোভাব দারা আক্রান্ত হইয়া শুদ্রত্বের নিক্কুস্ট গুণসকলকে আশ্রয় দেয়, অতএব যে দেশে ক্ষত্রিয় নাই, সেই দেশে রান্ধণের বাস নিষিদ্ধ। যদি ক্ষত্রিয়বংশের লোপ হয়, নূতন ক্ষত্রিয়কে স্থিট করা ব্রাহ্মণের প্রথম কর্তব্য। ব্রহ্মতেজপরিত্যক্ত ক্ষত্রতেজ দুর্দ্দান্ত উদ্দাম আস্রিক বলে পরিণত হইয়া প্রথম প্রহিত বিনাশ করিতে চেপ্টিত হয়, শেষে স্বয়ং বিনষ্ট হয়। রোমান কবি যথার্থ বলিয়াছেন, অসুরগণ স্বীয় বলাতিরেকে পতিত হইয়া সমূলে বিনপ্ট হয়। সত্ত্ব জঙ্গকে সৃষ্টি করিবে, রজঃ সত্ত্বকে রক্ষা করিবে সাত্ত্বিক কার্য্যে নিযুক্ত হইবে, তাহা হইলে ব্যক্তির ও জাতির মঙ্গল সম্ভব ৷ সত্ত্ব যদি রজঃকে গ্রাস করে, রজঃ যদি সত্ত্বকে গ্রাস করে,তমঃপ্রাদুর্ভাবে বিজয়ী গুণ স্বয়ং পরাজিত হয়, তমোগুণের রাজ্য হয়। ব্রাহ্মণ কখনও রাজা হইতে পারে না, ক্ষপ্রিয় বিনপ্ট হইলে শূদ্র রাজা হইবে, ব্রাহ্মণ তামসিক হইয়া অর্থলোভে জ্ঞানকে বিকৃত করিয়া শূদ্রের দাস হইবে, আধ্যাত্মিক ভাব নিশ্চেণ্টতাকে পোষণ করিবে, স্বয়ং মলান হইয়া ধমের্মর অবন্তির কারণ হইবে। নিঃক্ষরিয় শূদ্রচালিত জাতির দাসত্ব অবশ্যস্তাবী। ভারতের এই অবস্থা ঘটিয়াছে। অপরপক্ষে আসুরিক বলের প্রভাবে ক্ষণিক উত্তেজনায় শক্তিসঞ্চার ও মহত্ত্ব হইতে পারে বটে, কিন্তু শীঘ্র হয় দুক্রলতা, গ্লানি ও শক্তিক্ষয় হইয়া দেশ অবসন্ন হইয়া পড়ে, নয় রাজসিক বিলাস, দম্ভ ও স্বার্থের র্দ্ধিতে জাতি অনুপ্যুক্ত হইয়া মহত্তরক্ষায় অসমর্থ হয়, নয় অন্তবিরোধে, দুর্নীতিতে, অত্যাচারে দেশ ছারখার হইয়া শহুর সহজ্বভা শিকার হয়। ভারতের ও মুরোপের ইতিহাসে এই সকল পরিণামের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

মহাভারতের সময়ে আসুরিক বলের ভারে পৃথিবী অস্থির হইয়াছিল। ভারতের এমন তেজস্বী পরাক্রমশালী প্রচণ্ড ক্ষরিয়তেজের বিস্তার পূর্বেও হয় নাই, পরেও হয় নাই, কিন্তু সেই ভীষণ বলের সদুপ্যোগ হইবার সপ্তাবনা অতিশয় কম ছিল। যাঁহারা এই বলের আধার ছিলেন, তাঁহারা সকলেই অসুরপ্রকৃতির—অহকার, দর্প, স্বার্থ, স্বেচ্ছাচার তাঁহাদের মজ্জাগত ছিল। যদি প্রীকৃষ্ণ এই বল বিনাশ করিয়া ধশ্মরাজ্য স্থাপন না করিতেন, তাহা হইলে যে তিন প্রকার পরিণাম বর্ণনা করিয়াছি, তাহার একটি না একটি নিশ্চয় ঘটিত। ভারত অসময়ে শেলচ্ছের হাতে পড়িত। মনে রাখা উচিত পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্বের কুরুক্ষের্রত্বদ্ধ ঘটিয়াছে, আড়াই হাজার বৎসর অতিবাহিত হইবার পরে শেলচ্ছদের প্রথম সফল আক্রমণ সিদ্ধুনদীর অপর পার পর্যান্ত পৌছিতে পারিয়াছে। অতএব অর্জুন-প্রতিষ্ঠিত ধশ্মরাজ্য এতদিন ব্রহ্মতেজ-অনুপ্রাণিত ক্ষরতেজের প্রভাবে দেশকে রক্ষা করিয়াছে। তখনও সঞ্চিত ক্ষরতেজ দেশে এত ছিল যে, তাহার ভ্রাংশই দুই সহস্র বর্ষ দেশকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে; চন্দ্রগুণ্ড, পুষ্যমিত্র,

সমৃদ্রগুণ্ড, বিক্রম, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপ, রাজসিংহ, প্রতাপাদিত্য, শিবাজী ইত্যাদি মহাপুরুষ সেই ক্ষত্রতেজের বলে দেশের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন। সেই দিনই ভজরাট্যুদ্ধে ও লক্ষীবাইয়ের চিতায় তাহার শেষ স্ফুলিস নিব্বাপিত হইল। তখন শ্রীকৃষণের রাজনীতিক কার্য্যের সুফল ও পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলে, ভারতকে, জগৎকে রক্ষা করিবার জন্য আবার পূর্ণাবতারের আবশ্যকতা হইল। সেই অবতার আবার লুণ্ড ব্রহ্মতেজ জাগাইয়া গেলেন, সেই ব্রহ্মতেজ ক্ষরতেজ স্পিট করিবে। ঐীকৃষ্ণ ভারতের ক্ষন্ততেজ কুরুক্কেত্রের রক্তসমুদ্রে নির্বাপিত করেন নাই, বরং আসুরিক বল বিনাশ করিয়া ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রতেজ উভয়কেই রক্ষা করিয়াছেন । আসুরিক বলদৃশ্ত ক্ষত্রিয়বংশের সংহারে উদ্দাম রজঃ-শক্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন, ইহা সত্য। এইরূপ মহাবিপ্লব, অভবিরোধকে উৎকট ভোগ দারা ক্ষয় করিয়া নিগৃহীত করা, উদাম ক্ষতিয়কুল সংহার সর্কাদা অনিস্টকর নয়। অন্তবিরোধে রোমান ক্ষত্রিয়কুলনাশে ও রাজতন্তস্থাপনে রোমের বিরাট সামাজ্য অকাল-বিনাশের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ইংলণ্ডে গ্রেড ও রক্ত গোলাপের অন্তবিরোধে ক্ষতিয়কুলনাশে চতুর্থ এডওয়ার্ড, অপ্টম হেন্রি ও রাণী এলিজাবেথ সুরক্ষিত পরাক্রমশালী বিশ্ববিজয়ী আধ্নিক ইংলভের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভারতও সেইরূপে রক্ষা পাইল।

কলিযুগে ভারতের অবনতি হইয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু অবনতি আনয়ন করিবার জন্য ভগবান কখন অবতীর্ণ হন নাই। ধম্মরক্ষা, বিশ্বরক্ষা, লোকরক্ষার জন্য অবতার। বিশেষতঃ কলিযুগেই ভগবান পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হন, তাহার কারণ, কলিতে মানুষের অবনতির অধিক ভয়, অধর্মর্দ্ধি স্বাভাবিক, অতএব মানবজাতির রক্ষার জন্য অধর্মনাশ ও ধর্ম-স্থাপনের জন্য, কলির গতি রুদ্ধ করিবার জন্য এই যুগে পুনঃ পুনঃ অবতার হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন, কলির রাজ্য আরম্ভ হইবার সময় হইয়াছিল, তাঁহারই আবিভাবে ভীত হইয়া কলি নিজের রাজ্যে পদস্থাপন করিতে পারেন নাই, তাঁহারই প্রসাদে পরীক্ষিত কলিকে পঞ্চ গ্রাম দান করিয়া তাঁহারই যুগে তাঁহার একাধিপত্য স্থগিত করিয়া রাখিলেন। যে কলিযুগের আদি হইতে শেষ পর্যান্ত কলির সঙ্গে মানবের ঘোর সংগ্রাম চলিতেছে ও চলিবে, সেই সংগ্রামের সহায় ও নায়করূপে ভগবানের অবতার ও বিভূতি কলিতে ঘন ঘন আসেন, সেই সংগ্রামের উপযোগী ব্রহ্মতেজ, জান, ভজ্তি, নিষ্কাম কম্মের শিক্ষা ও রক্ষা করিতে ভগবান কলির মুখে মানবশরীর ধারণ করিয়াছিলেন। ভারতের রক্ষা মানবকল্যাপের ভিত্তি ও আশাস্থল। ভগবান কুরুক্ষেত্রে ভারতের রক্ষা করিয়াছেন 🕕 সেই রক্তসমুদ্রে নূতন জগতের লীলাপদো কালরাপী বিরাটপুরুষ বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিদ্টমনুপূর্ণাকুলেক্ষণম্। বিষীদভ্মিদং বাক্যমূবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১॥

সঞ্জয় বলিলেন,--

মধুসূদন অর্জুনের কুপার আবেশ, অশুপূর্ণ চক্ষুদ্বয় ও বিষপ্ত ভাব দেখিয়া তাঁহাকে এই প্রত্যুত্তর করিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্থা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্। অনার্যাজুম্টমস্বর্গাকীতিকরমর্জুন।। ২॥

শ্রীভগবান বলিলেন,---

"হে অর্জুন । এই সঙ্কট সময়ে এই অনার্যোর আদৃত স্বর্গপথরোধক অকীভিকর মনের মলিনতা কোথা হইতে উপস্থিত ?

> ক্লৈব্যং মাসম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয়ুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হাদয়দৌবর্বল্যং ত্যজ্যেতিষ্ঠ পরস্কপ ॥ ৩ ॥

"হে পৃথাতনয়। হে শহুদমনে সমর্থ। ক্লীবড় আশ্রয় করিও না, ইহা তোমার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এই ক্ষুদ্র মনের দুর্কলিতা পরিত্যাগ কর, ওঠ।"

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর

প্রীকৃষ্ণ দেখিলেন অর্জুন কুপায় আবিষ্ট হইয়াছে, বিষাদ তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। এই তামসিক ভাব অপনােদন করিবার জন্য অন্তর্যামী তাঁহার প্রিয় সখাকে ক্ষরিয়াচিত তিরন্ধার করিলেন, তাহাতে যদি রাজসিক ভাব জাগরিত হইয়া তমঃকে দূর করে। তিনি বলিলেন, দেখ, ইহা তােমার স্থপক্ষের সঙ্কটকাল, এখন যদি তুমি অন্ত পরিত্যাপ কর, তাহাদের সম্পূর্ণ বিপদ ও বিনাশের সন্তাবনা আছে। রণক্ষেত্রে স্বপক্ষত্যাপ তােমার নাায় ক্ষরিয়ােছের মনে উঠিবার কথা নয়, কোথা হইতে হঠাৎ এই দুন্দর্যতি? তােমার ভাব দুর্ফালতাপূর্ণ, পাপপূর্ণ। অনার্যাপণ এই ভাব প্রশংসা করে, তাহার বশ হয়, কিন্তু তাহা আর্যার অনুচিত, তাহাতে পরলােকে স্বর্গপ্রাপিতর বিশ্ব হয় এবং ইহলােকে যণ ও কীন্তির লােপ হয়। তাহার পরে আরও মন্দর্যন্তেদী তিরক্ষার করিলেন। এই ভাব ক্ষীবােচিত, তুমি বীরশ্রেষ্ঠ, তুমি জেতা, তুমি কুন্তির পূর, তুমি এইরূপ কথা বল? এই প্রাণের দুর্কালতা ত্যাগ করে, ওঠ, তােমার কর্তবাকন্দর্য উদ্যোগী হও।

গীতার ভূমিকা

১০১

কুপা ও দয়া

কুপা ও দয়া অতন্ত ভাব, এমন কি কুপা দয়ার বিরোধী ভাবও হইতে পারে। আমরা দয়ার বশে জগতের কল্যাণ করি, মানুষের দুঃখ, জাতির দুঃখ, পরের দুঃখ মোচন করি। যদি নিজের দুঃখ বা ব্যক্তিবিশেষের দুঃখ সহ্য না করিতে পারিয়া সেই কল্যাণসাধনে নির্ভ হই, তাহা হইলে আমার দয়া নাই, কুপারই আবেশ হইয়াছে। সমস্ত মানবজাতির বা দেশের দুঃখমোচন করিতে উঠিলাম, সেই ভাব দয়ার। রক্তপাতের ভয়ে, য়াণীছিংসার ভয়ে সেই পুণ্যকার্য্যে বিরত হইলাম, জগতের, জাতির দুঃখর চিরস্থায়িতায় সায় দিলাম, এই ভাব কৃপার। লোকের দুঃখে দৣঃখী হইয়া দুঃখমোচনের যে প্রবল প্রবৃত্তি তাহাকে দয়া বলে। পরের দৣঃখাচিন্তায় বা দৣঃখদর্শনে কাতর হওয়া, এই ভাবকে কৃপা বলে। কাতরতা দয়া নহে, কৃপা। দয়া বলবানের ধশর্ম কৃপা দুক্রলের ধশর্ম। দয়ার আবেশে বুজদেব স্ত্রীপুয়, পিতামাতা, বজুবাদ্ধবকে দৣঃখী ও হাতসর্ব্বস্থ করিয়া জগতের দৣঃখমোচন করিতে নির্গত হইলেন। তীর দয়ার আবেশে উন্মন্ত কালী জগতময় অসুর সংহার করিয়া পৃথিবীকে রক্তপ্লাবিত করিয়া সকলের দুঃখমোচন করিলেন। অর্জুন কৃপার আবেশে শস্তু পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

এই ভাব অনার্য্য-প্রশংসিত, অনার্য্য-আচরিত। আর্য্যশিক্ষা উদার, বীরোচিত, দেবতার শিক্ষা। অনার্য্য মোহে পড়িয়া অনুদার ভাবকে ধন্দর্ম বলিয়া উদার ধন্দর্ম পরিত্যাগ করে। অনার্য্য রাজসিকভাবে ভাবান্বিত হইয়া নিজের, প্রিয়জনের, নিজ পরিবার বা কুমের হিত দেখে, বিরাট কল্যাণ দেখে না, কুপায় ধন্দর্মপরাৎমুখ হইয়া নিজেকে পুণ্যবান বলিয়া গব্দ করে, কঠোরব্রতী আর্য্যকে নির্ত্তর ও অধান্দিমক বলে। অনার্য্য তামসিক মোহে মুণ্ধ হইয়া অপ্রর্ত্তিকে নির্ত্তি বলে, সকাম পুণ্যপ্রিয়তাকে ধন্দর্মনীতির উর্দ্বৃতম আসন প্রদান করে। দয়া আর্য্যের ভাব। কুপা অনার্য্যের ভাব।

পুরুষ দয়ার বশে বীরভাবে পরের অমঙ্গল ও দুঃখকে বিনাশ করিবার জন্য অমঙ্গলের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। নারী দয়ার বশে পরের দুঃখ-লাঘবের জন্য ওপুষায়, য়ড়ে ও পরহিতচেল্টায় সমস্ত প্রাণ ও শক্তি ঢালিয়া দেয়। যে কৃপার বশে অস্ত্র পরিত্যাগ করে, ধশের্ম পরাভমুখ হয়, কাঁদিতে বসিয়া ভাবে আমার কর্ত্তব্য করিতেছি, আমি পুণ্যবান—সঙ্গলিব। এই ভাব ক্ষুদ্র, এই ভাব দুর্ব্বলতা। বিষাদ কখন ধশর্ম হইতে পারে না। যে বিষাদকে আশ্রয় দেয়, সে পাপকে আশ্রয় দেয়। এই চিত্তমলিনতা, এই অশুদ্ধ ও দুব্বলভাব পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে উদ্যোগী হইয়া কর্ত্তব্যপালনে জগতের রক্ষা, ধশের্মর রক্ষা, পৃথিবীর ভার লাঘব করাই শ্রেয়ঃ। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির মশ্রম।

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

অজুঁন উবাচ

কথং ভীত্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন। ইষ্ডিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজাহাবরিস্দন॥ ৪॥

অর্জুন বলিলেন,---

"হে মধুসূদন, হে শতুনাশকারী, আমি কিরুপে ভীতম ও দ্রোণকে যুদ্ধে প্রতিরোধ করিয়া সেই পূজনীয় শুরুজনের বিরুদ্ধে অন্তনিক্ষেপ করিব ?

<u> ওরানহতা হি মহানুভাবান্</u>

শ্রেয়ো ভোক্তং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।

হত্বার্থকামাংস্ত ওরুনিহৈব

ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিণ্ধান্ ॥ ৫ ॥

এই উদারচেতা গুরুজনকে বধ না করিয়া পৃথিবীতে ভিখারীর অবস্থা ভোগ করা গ্রেয়ঃ। গুরুজনকে যদি বধ করি, ধর্ম্ম ও মোক্ষ হারাইয়া কেবল অর্থ ও কাম ভোগ করিব, সেও রুধিরাক্ত বিষয়ভোগ এবং পৃথিবীতেই ভোগ্য, প্রাণত্যাগ পর্যান্ত থাকে।

> ন চৈতদ্বিদনঃ কতরশ্লো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি নো জয়েয়ুঃ। যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-

> > ন্তেহবন্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরান্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

সেই হেতু আমাদের জয় বা পরাজয়, কোন্টি অধিক প্রার্থনীয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাঁহাদিগকে বধ করিলে আমাদের জীবিত থাকিবার কোন ইচ্ছা থাকিবে না, তাঁহারাই বিপক্ষীয় সৈন্যের অগ্রভাগে উপস্থিত, তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রপুরগণের সৈন্যনায়ক।

কাৰ্পণ্যদোষোপ**হ**তস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূড়চেতাঃ।

যচ্ছেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং বূহি তবে

শিষ্যন্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

দীনতা দোষে আমার ক্ষব্রিয়-শ্বভাব অভিভূত হইয়াছে, ধ্রম্মাধ্রম্ম সম্বরে আমার বুদ্ধি বিমূচ, সেইজন্য তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি, তুমি আমাকে কিসে শ্রেয়ঃ হইবে নিশ্চিতভাবে তাহা বল, আমি তোমার শিষ্য, তোমার নিকট শরণ স্বইলাম, আমাকে শিক্ষা দাও।

ন হি প্রপশ্যমি মমাপনুদ্যাৎ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্। অবাপ্য ভূমাবসপ্রসৃদ্ধং

রাজ্যং সুরাণামপি চা**ধিপ**ত্যম্ ॥ ৮ ॥

কেন না, পৃথিবীতে অসপত্র রাজ্য এবং দেবগণের উপর আধিপত্য লাভ

করিলেও এই শোক আমার সকল ইন্দ্রিয়ের তেজ শোষণ করিয়া লইবে, সেই শোকাপনোদনের কোন উপায় আমি দেখি না।"

অজুনের শিক্ষাপ্রার্থনা

শ্রীকুঞ্চের উক্তির উদ্দেশ্য অর্জুন বুঝিতে পারিলেন, তিনি রাজনীতিক আপত্তি উত্থাপন করিতে বিরত হইলেন, কিন্তু আর যে যে আপত্তি ছিল, তাহার কোন উত্তর না পাইয়া শ্রীকুষ্ণের নিকট শিক্ষার্থে শরণাগত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি শ্বীকার করি আমি ক্ষত্রিয়, কুপার বশবতী হইয়া মহৎ কার্য্যে বিরত হওয়া আমার পক্ষে ক্লীবত্বসূচক, অকীভিজনক, ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কিন্তু মনও মানে না, প্রাণ্ড মানে না। মন বলে, গুরুজন হত্যা মহাপাপ, নিজ সুখের জন্য গুরুজন্কে হত্যা করিলে অধস্মে পতিত হইয়া ধর্মে, মোক্ষ, পরলোক, যাহা বান্ছনীয়, সকলই যাইবে। কামনা তৃণ্ড হইবে, অর্থস্পুহা তৃণ্ড হইবে, কিন্তু সে ক্য়দিন ? অধস্মলব্ধ ভোগ প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত স্থায়ী, তাহার পর অনিক্চিনীয় দুর্গতি হয়। আর যখন ভোগ করিবে, তখন সেই ভোগের মধ্যে ওরুজনের রক্তের আস্থাদ পাইয়া কি সুখ বা শান্তি হইবে ? প্রাণ বলে, ইহারা আমার প্রিয়জন, ইহাদের হত্যা করিলে আমি আর এই জন্মে সখভোগ করিতে পারিব না, বাঁচিতেও চাই না। তুমি যদি আমাকে সমস্ত পৃথিবীর সাম্রাজ্যভোগ দাও বা স্বর্গ জয় করিয়া ইন্দ্রের ঐশ্বর্যাভাগ দাও, আমি কিন্তু গুনিব না। যে শোক আমাকে অভিভূত করিবে, তাহা দারা সমস্ত কম্মেন্দ্রিয় ও জানেদ্রিয় অভিভূত ও অবসর হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে শিখিল ও অসমর্থ হইবে, তখন তুমি কি ভোগ করিবে ? আমার বিষম চিত্তের দীনতা উপস্থিত, মহান্ ক্ষত্রিয়-স্বভাব সেই দীনতায় ডুবিয়া গিয়াছে। আমি তোমার নিকট শরণ লইলাম। আমাকে জ্ঞান, শক্তি, শ্রদ্ধা দাও, গ্রেয়ঃপথ দেখাইয়া রক্ষা কর।"

ভগবানের নিকট সম্পূর্ণভাবে শর্ণাগত হওয়া গীতোক্ত যোগের পহা। ইহাকে আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন বলে। যিনি ভগবানকে গুরু, প্রভু, সখা, পথপ্রদর্শক বলিয়া আর সকল ধর্মাকে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত, পাপ পুণা, কর্ত্ব্য অকর্ত্ব্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সত্য অসত্য, মঙ্গল অমঙ্গল বিচার না করিয়া নিজ জ্ঞান, কর্ম্ম ও সাধনার সমস্ত ভার শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন, তিনিই গীতোক্ত যোগের অধিকারী। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকৈ বলিলেন, তুমি যদি গুরুহত্যাও করিতে বল, ইহাকে ধর্ম্ম ও কর্ত্ব্যকর্ম্ম বলিয়া বুঝাইয়া দাও, আমি তাহাই করিব। এই গভীর শ্রদ্ধার বলে অর্জুন সমসাময়িক সকল মহাপুরুষকে অতিক্রম করিয়া গীতোক্ত শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পাল্ল বলিয়া গৃহীত হইলেন।

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম অর্জুনের দুই আপত্তি খণ্ডন করিয়া তাহার পরে গুরুর ভার গ্রহণ করিয়া আসল জান দিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৮ শ্লোক পর্যান্ত আপত্তিখণ্ডন, তাহার পরে গীতোক্ত শিক্ষার আরম্ভ হয়। কিন্তু এই আপত্তি– খণ্ডনের মধ্যে কয়েকটি অমূল্য শিক্ষা পাওয়া যায়, যাহা না বুঝিলে গীতার শিক্ষা ১০৪ শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই কয়েকটি কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা । প্রয়োজন।

সঞ্জয় উবাচ

্এবমুজা হাষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ। ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুজুা তৃষ্ণীংবভূব হ ॥ ৯॥ সঞ্জয় বলিলেন,—

পরস্তপ শুড়াকেশ হাষীকেশকে এই কথা বলিয়া আবার সেই গোবিন্দকে বলিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না" এবং নীরব হইয়া রহিলেন।

> তমুবাচ হাষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত। সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদভমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ঈষদ্ হাস্য করিয়া দুই সেনার মধ্যস্থলে বিষণ্ণ অর্জুনকে এই উত্তর দিলেন।

<u> এীভগবানুবাচ</u>

অশোচ্যানন্বশোচস্তং প্রক্তাবাদাংশ্চ ভাষসে। গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন,----

"যাহাদের জন্য শোক করার কোন কারণ নাই, তুমি তাহাদের জন্য শোক কর, অথচ জানীর ন্যায় তত্ত্বথা লইয়া বাদবিবাদ করিতে চেল্টা কর, কিন্তু যাঁহারা তত্ত্তানী তাঁহারা মৃত বা জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না।

ন ছেবাহং জাতু নাসং ন ছং নেমে জনাধিপাঃ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সকেব বয়মতঃপরম্ ॥ ১২ ॥

ইহাও নহে যে আমি পূর্কে ছিলাম না বা তুমি ছিলে না বা এই নৃপতিরুদ্দ ছিল না, ইহাও নহে যে আমরা সকলে দেহত্যাগের পরে আর থাকিব না।

দেহিনোহদিমন্ যথা দেহে কৌষারং যৌবনং জরা। তথা দেহাভরপ্রাদিতধীরভ্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

যেমন এই জীব-অধিষ্ঠিত দেহে বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য কালের গতিতে হয়, তেমনই, দেহাভরপ্রাপ্তিও কালের গতিতে হয়, তাহাতে স্থিরবুদ্ধি জানী বিমূঢ় হন না।

মাত্রাম্পর্শাস্ত কৌন্তেয় শীতোক্ষসুখদুঃখদাঃ। আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ত ভারত ॥ ১৪ ॥ মরণ কিছুই নয়, যে বিষয়স্পর্শে শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি সংস্কার সৃষ্ট হয়, সেই স্পর্শ সকল অনিত্য, আসে যায়, সেই সকল অবিচলিত হইয়া গ্রহণ করিবার অভ্যাস কর।

> যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্যন্ত। সমদুঃখসুখং ধীরং সোহমৃতহায় কল্পতে॥ ১৫॥

যে স্থিরবুদ্ধি পুরুষ এই স্পশ্সকল ভোগ করিয়াও ব্যথিত হন না, তৎস্ট্র সুখ দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করেন, তিনিই মৃত্যু জয় করিতে সক্ষম হন।

> নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। উভয়োরপি দুপ্টোহন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদশিভিঃ॥ ১৬॥

যাহা অসৎ তাহার অস্তিত্ব হয় না, যাহা সৎ তাহার বিনাশ হয় না, তথাপি সৎ ও অসৎ দুইটির অন্ত হয়, ইহা তত্ত্বদশীগণ দশন করিয়াছেন।

> অবিনাশি তু তদিদ্ধি যেন সক্ৰমিদং তত্ম্। বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কৰ্ত্মহঁতি ॥ ১৭ ॥

কিন্তু যাহা এইসমস্ত দৃশ্যজগৎ নিজের মধ্যে বিস্তার করিয়াছেন, সেই আত্মার ক্ষয় হয় না, কেহ তাহার ধাংস করিতে পারে না।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোজাঃ শরীরিণঃ। অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তসমাদ্ যুধ্যস্থ ভারত ॥ ১৮ ॥

নিত্য দেহোগ্রিত আজার এই সকল দেহের অভ আছে, আত্মা অসীম ও অনশ্বর; অতএব, হে ভারত, যুদ্ধ কর।

য এনং বেতি হস্তারং যদৈচনং মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

যিনি আত্মাকৈ হস্তা বলেন, এবং যিনি দেহনাশে আত্মাকে নিহত বলিয়া বোঝেন, দুই জনই ভ্রান্ত, অজ, এই আত্মা হত্যাও করে না, হতও হয় না।

ন জায়তে মিয়তে বা কদাচিন্-

নায়ং ভূজা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০॥

এই আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তাহার কখনও উদ্ভব হয় নাই এবং কখনও লোপ হইবে না। সে জন্মরহিত, নিত্য, সনাতন, পুরাতন, দেহনাশে হত হয় না।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্। কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১ ॥ যিনি ইহাকে নিত্য, অনশ্বর ও অক্ষয় বলিয়া জানেন, সেই পুরুষ কিরুপে কাহাকে হত্যা করেন বা করান?

> বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহণতি নরোহপরাণি।

১০৬

ঐীঅরবিন্দের বাসলা রচনা

তথা শরীরাণি বিহায় জীণা-ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

যেমন মানুষ জীর্ণ বস্তু ফেলিয়া অন্য নূতন বস্তু গ্রহণ করে, সেই রূপেই জীব জীর্ণ দেহ ফেলিয়া অন্য নূতন দেহকে আশ্রয় করে।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্তাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

শস্ত্রসকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দহন করিতে পারে না, জল ভিজাইতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না।

> অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ। নিত্যঃ সর্বাগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ॥ ২৪॥

আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বাব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন।

অব্যক্তোহয়মচিন্ড্যোহয়মবিকার্য্যোহয়মুচ্যতে। তসমাদেবং বিদিজ্নৈং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫॥

আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য, বিকাররহিত। তুমি আত্মাকে এইরূপ জানিয়া শোক করা পরিত্যাগ কর।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃত্ম।
তথাপি জংমহাবাহো নৈনং শোচিতুমহঁসি॥ ২৬॥

আর তুমি যদি মনে কর জীব বার বার জনায় ও মরে, তাহা হইলেও তাহার জন্য শোক করা উচিত নয়।

> জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তুসমাদপরিহার্যোহর্থে ন জং শোচিতুমুর্হসি॥ ২৭॥

যাহার জন্ম হয়, তাহার নিশ্চয় মরণ হয়, যাহার মরণ হয়, তাহার নিশ্চয় জন্ম হয়, অতএব যখন মৃত্যু অপরিহার্য্য পরিণাম, তাহার জন্য শোক করা অনুচিত।

> অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তল্ল কা পরিবেদনা॥ ২৮॥

সকল প্রাণী প্রথমে অব্যক্ত হইয়া থাকে, মাঝে ব্যক্ত হয়, আবার অব্যক্ত হয়, এই স্থাভাবিক ক্রমে শোক করিবার কোনও কারণ নাই।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-

মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ। মাশ্চর্যারকৈ সময়ে সংখ্যকি

আশ্চর্য্যবক্তৈনমন্যঃ শ্ণোতি

শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

আত্মাকে কেহ আশ্চর্য্য কিছু বলিয়া দেখেন, কেহ আশ্চর্য্য কিছু বলিয়া তাহার কথা বলেন, কেহ আশ্চর্য্য কিছু বলিয়া তাহার কথা শুনেন, কিন্তু শুনিয়াও কেহ আত্মাকে জানিতে পারেন নাই।

গীতার ভূমিকা

১০৭

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সব্বস্থ ভারত।
তুসমাৎ সব্বানি ভূতানি ন ছং শোচিতুমইসি ॥ ৩০ ॥
আত্মা সব্বদাসকলের দেহের মধ্যে অবধ্য হইয়া থাকে, অতএব এই সকল
প্রাণীর জন্য কখন শোক করা উচিত নহে।"

মৃত্যুর অসত্যতা

অর্জুনের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখে হাসির ভাব প্রকাশ হইল, সেই হাসি রঙ্গময় অথচ প্রসন্নতাপূর্ণ,—অর্জুনের ভ্রমে মানবজাতির পুরাতন ভ্রম চিনিয়া অন্তর্য্যামী হাসিলেন—সেই ল্লম শ্রীকৃষ্ণেরই মায়াপ্রসূত, জগতে অওভ, দুঃখ ও দুর্ব্বলতা ভোগ ও সংযম দারা ক্ষয় করিবার জন্য তিনি মানবকে এই মায়ার বশীভূত করিয়াছেন। প্রাণের মমতা, মরণের ভয়, সুখ-দুঃখের অধীনত্ব, প্রিয় ও অপ্রিয় বোধ, ইত্যাদি অজ্ঞান অর্জুনের কথায় প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাই মানবের বুদ্ধি হইতে দূর করিয়া জগৎকে অগুভমুক্ত করিতে হইবে. সেই শুভ কার্য্যের অনুকূল অবস্থা প্রস্তুত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন, গীতা প্রকাশ করিতে যাইতেছেন। কিন্তু প্রথম অর্জুনের মনে যে ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ভোগ দারা ক্ষয় করিতে হইবে। অজুঁন শ্রীকৃঞ্জের সখা, মানবজাতির প্রতিনিধি, তাঁহাকেই গীতা প্রদশিত হইবে, তিনি শ্রেষ্ঠ পাত্র, কিন্তু মানবজাতি এখনও গীতার অর্থ গ্রহণের যোগ্য হয় নাই, অর্জুনও সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যে শোক, দুঃখ ও কাতরতা তাঁহার মনে উঠিয়াছিল, তাহা মানবজাতি কলিষুগে সম্পূর্ণ ভোগ করিয়া আসিতেছে, খ্রীপ্টধর্ম্ম প্রেম আনয়ন করিয়া, বৌদ্ধধর্ম্ম দয়া আনয়ন করিয়া, ইসলামধর্ম্ম শক্তি আনয়ন করিয়া সেই দুঃখ-ভোগ লাঘব করিতে আসিয়াছে। আজ কলিযুগান্তর্গত প্রথম খণ্ড সত্যযুগ আরম্ভ হইবে, ভগবান আবার ভারতকে, কুরুজাতির বংশধরগণকে গীতা প্রদান করিতেছেন, যদি গ্রহণ করিতে, ধারণ করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে ভারতের মঙ্গল, জগতের মঙ্গল সুনিশ্চিত ফল।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অর্জুন, তুমি পণ্ডিতের ন্যায় পাপপুণ্য বিচার করিতেছ, জীবন-মরণের তত্ত্ব বলিতেছ, জাতির কল্যাণ অকল্যাণ কিসে হয় তাহা প্রতিপাদন করিবার চেল্টা করিতেছ, কিন্তু প্রকৃত জানের পরিচয় তোমার কথার মধ্যে পাওয়া যায় না, বরং তোমার প্রত্যেক কথা ঘোর অক্তানপূর্ণ। স্পল্ট কথা বল, আমার হাদয় দুর্ব্বল, শোকে কাতর, বুদ্ধি কর্ত্ব্যপরাত্মুখ; জানীর ভাষায় অক্তেয় ন্যায় তর্ক করিয়া তোমার দুর্ব্বলতা সমর্থন করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। শোক মনুষ্মাত্রের হাদয়ে উৎপন্ন হয়, মনুষ্যমাত্রই মরণ ও বিচ্ছেদ অতি ভয়ঙ্কর, জীবন মহামূল্য, শোক অসহ্য, কর্ত্ব্য কঠোর, স্বার্থসিদ্ধি মধুর বুঝিয়া হর্ষ করে, দুঃখ করে, হাসে, কাঁদে, কিন্তু এই সকল র্ত্তিকে কেহ জ্ঞানপ্রসূত্বলে না। যাহাদের জন্য শোক করা অনুচিত, তাহাদের জন্য তুমি শোক করিতেছ। জ্ঞানী কাহারও জন্য শোক করেন না,—না মৃত ব্যক্তির জন্য,

শ্রী**অর**বিন্দের বা**ঙ্গলা** রচনা

506

না জীবিত ব্যক্তির জন্য। তিনি এই কথা জানেন—মরণ নাই, বিচ্ছেদ নাই, দুঃখ নাই, আমরা অমর, আমরা চিরকাল এক, আমরা আনন্দের সন্তান, অমৃতের সন্তান, জীবনের মরণের সঙ্গে, সুখ দুঃখের সঙ্গে এই পৃথিবীতে লুকোচুরি খেলা করিতে আসিয়াছি—–প্রকৃতির বিশাল নাট্যগৃহে হাসি কামার অভিনয় করিতেছি, শন্তু মিত্র সাজিয়া যুদ্ধ ও শান্তি, প্রেম ও কলহের রস আস্বাদন করিতেছি। এই যে অল্পকাল বাঁচিয়া থাকি, কাল, পরশ্ব দেহত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব জানি না, ইহা আমাদের অনভক্রীড়ার মধ্যে এক মুহূর্ত্ত মাত্র, ক্ষণিক খেলা, কয়েকক্ষণের ভাব। আমরা **ছিলাম, আমরা আছি, আমরা থাকিব—সনাতন, নি**ত্য, অনশ্বর---প্রকৃতির ঈশ্বর আমরা, জীবন-মরণের কর্তা ভগবানের অংশ, ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের অধিকারী। যেমন দেহের বাল্য, যৌবন, **জরা**, তেমনই দেহান্তরপ্রাপ্ত,--মরণ নামমাত্র, নাম শুনিয়া আমরা ভয় পাই, দুঃখিত হই, বস্তু যদি বুঝিতাম ভয়ও পাইতাম না, দুঃখিতও হইতাম না। আমরা যদি বালকের যৌবনপ্রাণ্ডিকে মরণ বলিয়া কাঁদিয়া বলিতাম, আহা আমাদের সেই প্রিয় বালক কোথায় গেল, এই যুবাপুরুষ সেই বালক নহে, আমার সোনার-চাঁদ কোথায় গিয়াছে––আমাদের ব্যবহারকে সকলে হাস্যকর ও ঘোর অভান– জনিত বলিত: কেননা, এই অবস্থান্তরপ্রাপিত প্রকৃতির নিয়ম, বালকদেহে ও যুবকদেহে একই পুরুষ বাহ্য-পরিবর্তনের অতীত হইয়া স্থিরভাবে রহিয়াছেন। জানী, সাধারণ মানুষের মরণে ভয় ও মরণে দুঃখ দেখিয়া তাহার ব্যবহার ঠিক সেইভাবে হাস্যকর ও ঘোর অভানজনিত বলিয়া দেখেন, কেননা দেহাভর-প্রাণিত প্রকৃতির নিয়ম, স্থূলদেহে ও স্ক্রাদেহে একই পুরুষ বাহ্য-পরিবর্তনের অতীত হইয়া স্থিরভাবে রহিয়াছেন। অমৃতের সন্তান আমরা, কে মরে, কে মারে? মৃত্যু আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না,—মৃত্যু ফাঁকা আওয়াজ, মৃত্যু **দ্রম, মৃত্যু নাই** ।

মাত্রা

পুরুষ অচল, প্রকৃতি চল। চল প্রকৃতির মধ্যে অচল পুরুষ অবস্থিত। প্রকৃতিত্ব পুরুষ প্রেক্ষান্তিয় দারা যাহা দেখে, শোনে, আদ্রাণ করে, আদ্রাদ করে, স্পর্শ করে, তাহাই ভাগে করিবার জন্য প্রকৃতিকে আশ্রয় করে। আমরা দেখি রাপ, শুনি শব্দ, আদ্রাণ করি গন্ধা, আদ্রাদ করি রস, অনুভব করি স্পর্শ। শব্দ, স্পর্শ, রাপ, রস, গন্ধা, এই পঞ্চ তন্মান্তই ইন্দ্রিয়ভোগের বিষয়। স্বষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনের বিশেষ বিষয় সংক্ষার। বৃদ্ধির বিষয় চিন্তা। পঞ্চ তন্মান্ত এবং সংক্ষার ও চিন্তা অনুভব ও ভোগ করিবার জন্য পুরুষ-প্রকৃতির প্রস্পর সন্তোগ ও অনন্ত ক্রীড়া। এই ভোগ দিবিধ, গুদ্ধ ও অশুদ্ধ। গুদ্ধ ভোগে সুখ-দুঃখ নাই, পুরুষের চিরন্তন স্বন্ডবেসিদ্ধ ধর্ম্ম আনন্দই আছে। অন্তদ্ধ ভোগে সুখ-দুঃখ আছে, শীতোক্ষ, ক্ষুণ্পিপাসা, হর্মশোক ইত্যাদি দ্বন্ধ অশুদ্ধ ভোগীকে বিচলিত ও বিদ্ধুব্ধ করে। কামনা অশুদ্ধতার কারণ। কামীমান্রই অশুদ্ধ, যে নিপ্রাম, সে শুদ্ধ।

কামনায় রাগ ও দেষ স্পট হয়, রাগদেষের বশে পুরুষ বিষয়ে আসক্ত হয়, আসক্তির ফল বন্ধন। পুরুষ বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ, এমন কি ব্যথিত ও যন্ত্রপাক্লিপট হুইয়াও আসক্তির অভ্যাস-দোষে তাহার ক্ষোভ, ব্যথা বা যন্ত্রণার কারণ পরিত্যাগ করিতে অক্ষম হয়।

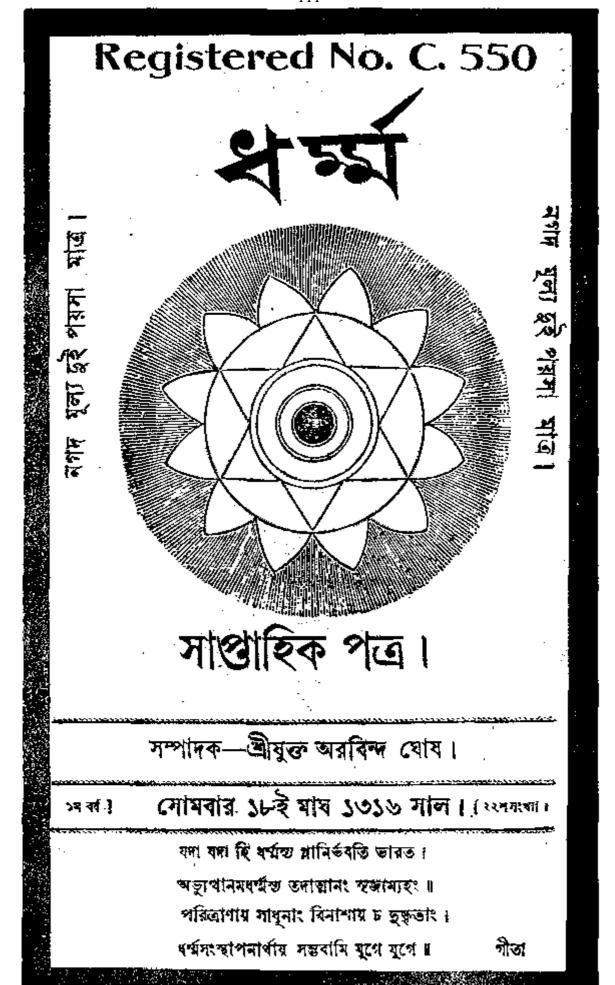
সমভাব

শ্রীকৃষ্ণ প্রথম আশ্বার নিত্যতার উল্লেখ করিয়া পরে অজ্ঞানের বন্ধন শিথিল করিবার উপায় দেখাইলেন। মারা অর্থাৎ বিষয়ের নানারাপ স্পর্ণ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের কারণ। এই স্পর্শসকল অনিত্য, তাহাদের আরম্ভও আছে, অনত্য বলিয়া আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হয়। অনিত্য বস্তুতে যদি আসক্ত হই, তাহার আগমনে হাল্ট হই, তাহার নাশে বা অভাবে দুঃখিত ও ব্যথিত হই। এই অবস্থাকে অজ্ঞান বলে। অজ্ঞানে অনগ্রর আশ্বার সনাতন ভাব ও অন্বয় আনন্দ আচ্ছন্ন হয়, কেবল ক্ষণস্থায়ী ভাব ও বস্তুতে মত্ত হইয়া থাকি, তাহার নাশের দুঃখে শোকসাগরে নিমগ্ন হই। এইরাপ অভিভূত না হইয়াযে বিষয়ের স্পর্শসকল সহ্য করিতে পারে, অর্থাৎ যে দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করিয়াও সুখ-দুঃখে, শীতোক্ষে, প্রিয়াপ্রিয়ে, মঙ্গলা-মঙ্গলে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে হর্ম ও শোক অনুভব না করিয়া সমানভাবে প্রফুল্লচিতে হাস্যমুখে গ্রহণ করিতে পারে, সে পুরুষ রাগদ্বেষ হইতে বিমুক্ত হয়, অজ্ঞানের বন্ধন কাটিয়া সনাতন ভাব ও আনন্দ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়,—অমৃতত্বায় করতে।

সমতার গুণ

এই সমতা গীতার প্রথম শিক্ষা। সমতাই গীতোক্ত সাধনের প্রতিষ্ঠা। প্রীক ন্তোয়িক সম্প্রদায় ভারত হইতে এই সমতার শিক্ষা লাভ করিয়া য়ুরোপে সমতাবাদ প্রচার করিয়াছেন। গ্রীক দার্শনিক এপিকুরস শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত শিক্ষার আর এক দিক ধরিয়া শান্তভোগের শিক্ষা, Epicureanism বা ভোগবাদ, প্রচার করিলেন। এই দুই মত, সমতাবাদ ও ভোগবাদ প্রাচীন য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ নৈতিক মত বলিয়া জাত ছিল এবং আধুনিক যুরোপেও নব আকার ধারণ করিয়া Puritanism ও Paganism –এর চির দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু গীতোক্ত সাধনে সমতা–বাদ ও শান্ত বা শুদ্ধ ভোগ একই কথা। সমতা কারণ, শুদ্ধ ভোগ কার্য্য। সমতায় আসক্তি মরে, রাগদ্বেষ প্রশমিত হয়, আসক্তি নাশে এবং রাগদ্বেষ প্রশমনে শুদ্ধতা জন্মায়। শুদ্ধ পুরুষের ভোগ কামনা ও আসক্তিরহিত, অতএব শুদ্ধ। ইহাতেই সমতার শুণ যে সমতার সহিত আসক্তি ও রাগদ্বেষ এক আধারে থাকিতে পারে না। সমতাই শুদ্ধির বীজ।

DHARMA



জগনাথের রথ

আদর্শ সমাজ মনুষ্য-সমপ্টির অন্তরাত্মা ভগবানের বাহন, জগলাথের যাত্রার রথ। ঐক্য স্থাধীনতা জ্ঞান শক্তি সেই রথের চারি চক্র।

মনুষ্যবৃদ্ধির গঠিত কিয়া প্রকৃতির অশুদ্ধ প্রাণম্পন্দনের খেলায় সৃষ্ট যে সমাজ, তাহা অন্য প্রকার। এটি সমষ্টির নিয়ন্তা ভগবানের রথ নহে, মুজ অন্তর্যামীকে আচ্ছাদিত করিয়া যে বহুরূপী দেবতা ভগবৎ-প্রেরণাকে বিকৃত করে, ইহা সমষ্টিগত সেই অহঙ্কারের বাহন। এটি চলিতেছে নানা ভোগপূর্ণ লক্ষ্যহীন কন্ম্পথে, বুদ্ধির অসিদ্ধ অপূর্ণ সঙ্কল্পের টানে, নিন্দন-প্রকৃতির পুরাতন বা নূতন অবশ প্রেরণায়। যতদিন অহঙ্কারই কর্তা, ততদিন প্রকৃত লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব,—লক্ষ্য জানা গেলেও সেদিকে সোজা রথ চালানো অসাধ্য। অহঙ্কার যে ভাগবত পূর্ণতার প্রধান বাধা, এই তথ্য যেমন ব্যক্তির, তেমনই সম্পিটর পক্ষেও সত্য।

সাধারণ মনুষাসমাজের তিনটি মুখ্য ভেদ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি নিপুণ কারিগরের স্থিট, সুঠাম চাকচিক্যময় উজ্জ্ব অমল সুখকর, তাহাকে বহিয়া লইয়াছে বলবান সুশিক্ষিত অশ্ব. সে অগ্রসর হইতেছে সুপথে স্থপে জ্বারহিত অমন্থর গতিতে। সাজ্বিক অহঙ্কার ইহার মালিক আরোহী। যে উপরিস্থ উভুঙ্গ প্রদেশে ভগবানের মন্দির, রথ তাহারই চারিদিকে ঘুরিতেছে, কিন্তু কিছু দূরে দূরে রহিয়া, সেই উচ্চভূমির খুব নিকটে সে পৌছিতে পারে না। যদি উঠিতে হয় রথ হইতে নামিয়া একা পদব্রজে উঠাই নিয়ম। বৈদিক্যুগের পরে প্রাচীন আর্য্যদের স্মাজকে এই ধরণের রথ বলা যায়।

দ্বিতীয়টি বিলাসী কর্মঠের মোটরগাড়ী। ধূলার ঝড়ের মধ্যে ভীমবেগে বছানির্ঘাষে রাজপথ চূর্ণ করিয়া অশান্ত অগ্রান্ত গতিতে সে ধাইয়াছে, ভেরীর রবে প্রবণ বধির, যাহাকে সম্মুখে পায় দলিয়া পিষিয়া চলিয়া যায়। যাত্রীর প্রাণের সঙ্কট, দুর্ঘটনা অবিরল, রথ ভাঙ্গিয়া যায়, আবার কল্টেস্পেট মেরামতের পর সদর্প চলন। নিদ্দিল্ট লক্ষ্য নাই, তবে যে নূতন দৃশ্য অনতিদূরে চোখের সম্মুখে পড়ে, "এই লক্ষ্য, এই লক্ষ্য" চীৎকার করিয়া রথের মালিক রাজসিক অহন্ধার সেই দিকে ছুটে। এই রথে চলায় যথেল্ট ভোগ সুখ আছে, বিপদও অনিবার্য্য, ভগবানের নিকট পৌছা অসন্তব। আধুনিক পাশ্চাত্যসমাজ এই ধরণেরই মোটরগাড়ী।

তৃতীয়টি মলিন পুরান কচ্ছপগতি আধভালা গরুরগাড়ী, টানে কৃশ অনশনক্লিপ্ট আধমরা বলদ, চলিতেছে সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথে, একজন ময়লা- কাপড়পরা ভুঁড়িসকরে স্থা অন্ধ র্দ্ধ ভিতরে বসিয়া মহাসুখে কাদামাখা হুঁকা টানিতে টানিতে গাড়ীর কর্কশ ঘ্যান্ ঘ্যান্ শব্দ শুনিতে শুনিতে অতীতের কত বিকৃত আধ সম্তিতে মগ্ন। এই মালিকের নাম তামসিক অহঙ্কার। গাড়োয়ানের নাম পুঁথি-পড়া জান, সে পঞ্জিকা দেখিতে দেখিতে গমনের সময় ও দিক নির্দেশ করে, মুখে এই বুলি "যাহা আছে বা ছিল, তাহাই ভাল, যাহা হইবার চেপ্টা তাহাই খারাপ"। এই রথে ভগবানের নিকট না হৌক শুন্য ব্রহ্মে পৌছিবার বেশ আশু সম্ভাবনা আছে।

তামসিক অহঙ্কারের গরুর গাড়ী যতক্ষণ গ্রামের কাঁচাপথে চলে, ততক্ষণ রক্ষা। যেদিন জগতের রাজপথে সে উঠিয়া আসিবে যেখানে ভূরি ভূরি বেগদৃপত মোটরের ছুটাছুটি, তখন তাহার কি পরিণাম হইবে, সে কথা ভাবিতেই প্রাণ শিহরিয়া উঠে। বিপদ এই যে রথ বদলানোর সময় চেনা বা স্বীকার করা তামসিক অহঙ্কারের জ্ঞান শক্তিতে কুলায় না। চিনিবার প্রবৃত্তিও নাই, তাহা হইলে তাহার ব্যবসা ও মালিকত্ব মাটি। সমস্যা যখন উপস্থিত, যাগ্রীদের মধ্যে কেহ কেহ বলে, "না থাক, ইহাই ভাল, কেননা ইহা আমাদেরই"—তাঁহারা গোঁড়া অথবা ভাবুক দেশভক্ত। কেহ কেহ বলে, "এদিকে ওদিকে মেরামত করিয়া লও না"—এই সহজ উপায়ে নাকি গরুর গাড়ী অমনি অনিন্দ্য অমূল্য মোটরে পরিণত হইবে;—ইহাদের নাম সংস্কারক। কেহ কেহ বলে, "পুরাতন কালের সুন্দর রথটি ফিরিয়া আসুক"—তাঁহারা সেই অসাধ্য-সাধনের উপায়ও খুঁজিতে মাঝে মাঝে প্রয়াসী। আশার অনুরূপ ফল যে হইবে, তাহার বিশেষ কোন লক্ষণ কোথাও কিন্তু নাই।

তিনটির মধ্যেই যদি পছন্দ করা অনিবার্য্য হয়, আরও উচ্চতর চেপ্টা যদি আমরা পরিহার করি, তবে সান্ত্বিক অহঙ্কারের নূতন রথ নিশ্মাণ করা যুক্তি-যুক্ত। কিন্তু জগরাথের রথ যতদিন স্পট না হয়, আদর্শ সমাজও ততদিন গঠিত হইবে না। সেইটিই আদর্শ, সেইটিই চরম, গভীরতম উচ্চতম সত্যের বিকাশ ও প্রতিকৃতি। মনুষ্যজাতি গুণ্ত বিশ্বপুরুষের প্রেরণায় তাহাকেই গড়িতে সচেপ্ট, কিন্তু প্রকৃতির অজ্ঞানবশে গড়িয়া বসে অন্যুরূপ প্রতিমা—হয় বিকৃত অসিদ্ধ কুৎসিত, নয় চলনসই অর্দ্ধসুন্দর বা সৌন্দর্য্য সন্ত্বেও অসম্পূর্ণ; শিবের বদলে হয় বামন, নয় রাক্ষস, নয় মধ্যম লোকের অর্দ্ধদেবতা।

জগন্নাথের রথের প্রকৃত আকৃতি বা নমুনা কেহ জানে না, কোন জীবনশিল্পী আঁকিতে পারগ নন। সেই ছবি বিশ্বপুরুষের হাদয়ে প্রস্তুত, নানা আবরণে আর্ত। দ্রুটা কর্তা অনেক ভগবদ্বিভূতির অনেক চেম্টায় আস্তে আস্তে বাহির করিয়া স্থল জগতে প্রতিষ্ঠা করা অন্তর্যামীর অভিসন্ধি।

_

জনসংঘ বা জনতা নয়; আজ্ঞানের, ভাগবতজানের ঐক্যমুখী শক্তির বলে সানন্দে গঠিত বন্ধনরহিত অচ্ছেদ্য সংহতি, ভাগবত সংঘ।

অনেক সমবেত মনুষ্যের একত্ব কম্ম করিবার উপায় যে সংহতি, তাহাই সমাজ নামে খ্যাত। শব্দের উৎপত্তি বুঝিয়া অর্থও বোঝা যায়। সম্ প্রত্যয়ের অর্থ একত্র, অজ্ ধাতুর অর্থ গমন ধাবন যুদ্ধ। সহস্ত্র সহস্ত্র মানব কম্মার্থেও কামার্থে সমবেত, এক ক্ষেত্রে নানা লক্ষ্যের দিকে ধাবিত, কে আগে যায় কে বড় হয়, তাহা লইয়া ধ্বস্তাধ্বস্তি—— competition ——যেমন অন্য সমাজের সঙ্গে তেমন প্রম্পরের সঙ্গেও যুদ্ধ ও ঝগড়া—ঝাটি——এই কোলাহলের মধ্যেই শৃত্থলার জন্য, সাহায্যের জন্য, মনোর্ত্তির চরিতার্থতার জন্য নানা সম্বন্ধ স্থাপন, নানা আদর্শের প্রতিষ্ঠা, ফলে কল্টসিদ্ধ অসম্পূর্ণ অস্থায়ী কিছু, ইহাই সমাজের, প্রাকৃত সংসারের চেহারা।

ভেদকে ভিত্তি করিয়া প্রাকৃত সমার্জ। সেই ভেদের উপর আংশিক অনিশ্চিত ও অস্থায়ী ঐক্য নিশ্মিত। আদর্শ সমাজের গড়ন ঠিক ইহার বিপরীত। ঐক্য ভিত্তি, আনন্দ-বৈচিন্ত্রের জন্য—ভেদের নয়—পার্থক্যের খেলা। সমাজে পাই শারীরিক, মানসকলিত ও কর্ম্মগত ঐক্যের আভাস, আত্মগত ঐক্য সংঘের প্রাণ।

আংশিকভাবে সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে সংঘস্থাপনের নিক্ষল চেল্টা কতবার হইয়াছে, হয় তাহা বুদ্ধিগত চিন্তার প্রেরণায়—যেমন পাশ্চান্তাদেশে, নয় নির্ব্বাণোন্যুখ কল্মবিরতির স্বচ্ছন্দ অনুশীলনার্থে—যেমন বৌদ্ধদের, নয় বা ভাগবত ভাবের আবেগে—যেমন প্রথম খুল্টীয় সংঘ। কিন্তু অল্পের মধ্যেই সমাজের যত দোষ অসম্পূর্ণতা প্রবৃত্তি ঢুকিয়া সংঘকে সমাজে পরিণত করে। চঞ্চল বুদ্ধির চিন্তা টেকে না, পুরাতন বা নূতন প্রাণ-প্রবৃত্তির অদম্য স্রোতে ভাসিয়া যায়। ভাবের আবেগে এই চেল্টার সাফল্য অসম্ভব, ভাব নিজের খরতায় পরিপ্রান্ত হইয়া পড়ে। নির্ব্বাণকে একাকী খোঁজা ভাল, নির্ব্বাণ-প্রিয়তার সংঘক্তি একটা বিপরীত কাণ্ড। সংঘ স্বভাবতঃ কল্মের সম্বন্ধের লীলাভূমি।

যেদিন জান কর্ম্ম ও ভাবের সামঞ্জস্যে ও একীকরণে আত্মগত ঐক্য দেখা দিবে, সমিল্টিগত বিরাটপুরুষের ইচ্ছাশিজির প্রেরণায়, সেদিন জগনাথের রথ জগতের রাস্তায় বাহির হইয়া দশ দিক আলোকিত করিবে। সত্যযুগ নামিবে পৃথিবীর বক্ষে, মর্জ্য মানুষের পৃথিবী হইবে দেবতার খেলার শিবির, ভগবানের মন্দির-নগরী, temple city of God——আনন্দপুরী।

মানব সমাজের তিন ক্রম

া মানুষের জান ও শক্তি ক্লমবিকাশে নানারাপ ধারণ করে। সেই বিকাশের তিনটি অবস্থা দেখি—শরীর-প্রধান প্রাণনিয়ন্তিত প্রাকৃত অবস্থা, বুদ্ধি-প্রধান উন্নত মধ্য অবস্থা, আত্মপ্রধান শ্রেষ্ঠ পরিণ্তি।

শরীর-প্রধান প্রাণ-নিয়ন্তিত মানুষ কাম ও অর্থের দাস। জানে সহজ স্থার্থ, সাধারণ ভাব ও প্রেরণা (instinct ও impulse) কামনায়-কামনায় অর্থে-অর্থে সংঘর্ষ উঠিয়া ঘটনা-পরম্পরায় স্পট যে ব্যবস্থা স্বিধাজনক বিলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাকেই পছন্দ করে, এমন অল্প বা অনেক ব্যবস্থার সংহতিকে ধর্ম্ম বলে। ক্লচি-পরম্পরাগত, কুলগত বা সামাজিক আচার এইরূপ নিম্ন প্রাকৃত অবস্থার ধর্ম্ম। প্রাকৃত মানুষের মোক্ষের কল্পনা থাকে না, আত্মার সন্ধান সে পায় নাই। তাহার অবাধ শারীরিক ও প্রাণিক প্রবৃত্তির অবাধ দীলাক্ষেত্র একটা কল্পিত স্থর্গ। ওই দিকে তাহার চিন্তা উঠিতে পারে না। দেহপাতে স্থর্গগমনই তাহার মোক্ষ।

বুদ্ধি-প্রধান মানুষ কাম ও অর্থকে চিন্তা দারা নিয়ন্ত্রিত করিতে সকাদা সচেপট। কামের শ্রেষ্ঠ চরিতার্থতা কোথায়, জীবনের অনেক ভিন্নমুখী অর্থের মধ্যে কোন অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত ও আদর্শ জীবনের স্বরূপ কি,—বুদ্ধি-চালিত কি নিয়মের সাহায্যে সে-স্বরূপ পরিস্ফুট, আদর্শ সিদ্ধ হয়, এই গবেষণায় সে ব্যাপ্ত: এই স্বরূপ, আদর্শ নিয়মের কোন একটি শৃত্থলাবদ্ধ অনুশীলনকৈ বুদ্ধিমান সমাজের ধশ্ম বলিয়া স্থাপন করিতে ইচ্ছুক। মানসভানে আলোকিত উন্নত সমাজের নিয়ন্তা এইরূপ ধশ্মবুদ্ধিই।

আঅপ্রধান মানুষ বৃদ্ধি মন প্রাণ শরীরের অতীত গৃঢ় আঝার সন্ধান পাইয়াছে, আজ্ঞানেই জীবনের গতি প্রতিষ্ঠা করে,—মোক্ষ, আত্মপ্রাণিত, ভগবানকে লাভ করা জীবনের পরিণতি বৃঝিয়া আত্মপ্রধান মানুষ সেই দিকে তাহার সমস্ত গতি পরিচালিত করিতে চায়, যে জীবন-প্রণালী ও আদর্শ অনুশীলন আত্মপ্রাণিতর উপযোগী, যাহাতে মানবীয় ক্রমবিকাশের চক্র সেই উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হবার সম্ভাবনা তাহাকেই সে ধর্ম্ম বলে। শ্রেষ্ঠ সমাজ এইরূপ আদর্শ এইরূপ ধর্ম্ম দ্বারা চালিত।

প্রাণ-প্রধান হইতে বুদ্ধিতে, বুদ্ধি হইতে বুদ্ধির অতীত আআয়, ধাপে ধাপে ভাগবত পর্বতে মনুষ্যযাত্রীর উদ্ধৃগামী নিয়মে আরোহণ।

কোনও এক সমাজে একমাত্র ধারা দৃষ্ট হয় না। প্রায় সকল সমাজেই

এই তিন প্রকার মানুষ বাস করে, সেই মনুষা-সমপিটর সমাজও মিশ্রজাতীয় হয়।

প্রাকৃত সমাজেও বৃদ্ধিমান ও আজ্বান পুরুষ থাকে। তাঁহারা যদি বিরল, সংহতিরহিত বা অসিদ্ধ (হন), (তবে) সমাজের উপর বিশেষ কিছু ফল হয় না। যদি বহুসংখ্যককে সংহতিবদ্ধ করিয়া শক্তিমান সিদ্ধ (হন), তবেই প্রাকৃত সমাজকে মুম্টিতে ধরিয়া কতকটা উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হন। তবে প্রাকৃতজনের আধিকোর দরুণ বৃদ্ধিমানের বা আজ্বানের ধন্ম প্রায়ই বিকৃত হয়, বৃদ্ধির ধন্ম convention -এ পরিণত হয়, আজ্জানের ধন্ম রুচি ও বাহ্যিক আচারের চাপে ক্লিম্ট, প্লাবিত, প্রাণহীন, স্বলক্ষ্যভ্রম্ট হয়,—এই পরিণাম সর্ব্বান দেখি।

বুদ্ধির প্রাবল্য যখন হয়, (তখন) বুদ্ধি সমাজের নেতা সাজিয়া অবাধে রুচি ও আধারকে ভাঙ্গিয়া বদলাইয়া মানসজ্ঞানে আলোকিত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার চেল্টা (করে) দেখি। পাশ্চাত্যের জ্ঞানের আলোক (enlightenment) সাম্য স্বাধীনতা মৈত্রী এই চেল্টার একটা রূপ মাত্র। সিদ্ধি অসম্ভব। আত্মজানের অভাবে বুদ্ধিমানও প্রাণ-মন-শ্রীরের টানে নিজের আদর্শ নিজে বিকৃত করে। নিম্ন-প্রকৃতির হাত এড়ান কঠিন। মধ্য অবস্থা, মধ্য অবস্থায় স্থায়িত্ব নয়—হয় নীচের দিকে পত্ন, নয় উচ্চের দিকে উঠা। এই দুই টানে বুদ্ধি দোদুল্যমান।

অহঙ্কার

আমাদের ভাষায় অহঙ্কার শব্দটির এমন বিকৃত অর্থ হইয়া গিয়াছে যে, আর্য্যধশের্মর প্রধান প্রধান তত্ত্ব বুঝাইতে অনেক সময় গোল হইয়া পড়ে। গর্কা রাজসিক অহঙ্কারের একটা বিশেষ পরিণাম মাত্র, অথচ সাধারণতঃ অহঙ্কার শব্দের এই অর্থই বোঝা যায়; অহ্ঞার-ত্যাগের ক্থা বলিতে গব্ব পরিত্যাগ বা রাজসিক অহঙ্কার বর্জনের কথা মনে উঠে। প্রকৃতপক্ষে অহংজ্ঞান মাত্রই অহকার। অহং-বুদ্ধি মানবের বিজ্ঞানময় আত্মার মধ্যে সৃস্ট হয় এবং প্রকৃতির অন্তর্গত তিনটি ছণের ক্রীড়ায় তাহার তিন প্রকার রুত্তি বিকশিত হয়, সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার । সাত্ত্বিক অহঙ্কার ভানপ্রধান ও সুখপ্রধান। আমার জান হইতেছে, আমার আনন্দ হইতেছে, এই ভাবঙলি সাত্ত্বিক অহরারের ক্রিয়া। সাধকের অহং, ভক্তের অহং, জানীর অহং, নি**দ্ধা**ম কম্মীর অহং সত্তপ্রধান, জানপ্রধান, সুখপ্রধান। রাজসিক অহঙ্কার কম্মপ্রধান। আমি কর্ম্ম করিতেছি, আমি জয় করিতেছি, পরাজিত হইতেছি, চেল্টা করি-তেছি, আমারই কার্য্যসিদ্ধি, আমারই অসিদ্ধি, আমি বলবান, আমি সিদ্ধি, আমি সুখী, আমি দুঃখী, এই সকল ভাব রজঃপ্রধান, কর্ম্মপ্রধান; প্ররুত্তিজনক। তাম-সিক অহঙ্কার অজতা ও নিশ্চেষ্টতায় পূর্ণ। আমি অধম, আমি নিরুপায়, আমি, অলস, অক্ষম, হীন আমার কোনও আশা নাই, প্রকৃতিতে লীন হইতেছি, লীন হওয়াই আমার গতি, এই সকল ভাব তমঃপ্রধান অপ্রবৃত্তি ও অপ্রকাশজনক। যাঁহারা তামসিক অহ্লারে ক্লিপ্ট, তাঁহাদের পর্ব নাই, অথচ অহ্লার পূর্ণমালায় আছে, কিন্তু সেই অহঙ্কার অধোগতি, নাশ ও শূন্যব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতু ৷ যেমন গব্বের অহকার আছে তেমনই নয়তার অহঙ্কারও আছে, যেমন বলের অহকার আছে, তেমনই দুর্বলতার অহঙ্কারও আছে। যাঁহারা তামসিকভাবে গর্বাহীন, তাঁহারা অধ্য, দুর্বল, ভয়ে ও নিরাশায় প্রপদানত। তামসিক নয়তা, তামসিক ক্ষমা, তামসিক সহিষ্ণুতার কোনও মূল্য নাই ও কোনও সুফল নাই। যিনি সব্বতি নারায়ণকো দর্শন করিয়া সকলের নিকট ময়, সহিষ্ণু ও ক্ষমাবান্ হন, তাঁহারই পুণ্য হয়। যিনি এই সকল অহঙ্কৃত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভ্রৈন্তপ্যময়ী মায়াকে অতিক্রম করেন, তাঁহার গকাঁও নাই, নয়তাও নাই, ভগবানের জগলয়ী শক্তি তাঁহার মনপ্রাণরাপ আধারে যে ভাব দেন, তিনি তাহা লইয়া সম্ভুছট, অনাসক্ত ও অটল শান্তি ও আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তামসিক অহকার সর্ব্বথা বর্জনীয়। রাজসিক অহফারকে জাগাইয়া সত্ত্ব-প্রসূত জানের সাহায্যে তাহা নিম্পূল করা উন্নতির প্রথম সোপান। রাজসিক অহঙ্কারের হস্ত হইতে মুক্তির

অহঞ্চার

উপায় জ্ঞান শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিকাশ। সত্তপ্রধান ব্যক্তি বলেন না যে, আমি সুখী ; তিনি বলেন, আমার প্রাণে সুখবিকাশ হইতেছে ; তিনি বলেন না যে, আমি জানী ; তিনি বলেন, আমার মধ্যে জানসঞার হইতেছে। তিনি জানেন যে, সেই সুখ ও জান তাঁহার নহে, জগন্মাতার। অথচ সক্রপ্রকার অনুভবের সহিত যখন আনন্দসন্তোগের জন্য লিপ্ততা থাকে তখন সেই জানী বা ভক্তের ভাব অহঙ্কৃত। "আমার হইতেছে", যখন বলা হয় তখন অহংবুদ্ধি পরিত্যাগ করা হইল না। গুণাতীত ব্যক্তিই সম্পূর্ণ অহঙ্কারজয়ী। তিনি জানেন, জীব সাক্ষী ও ভোক্তা, পুরুষোভ্য অনুমভা, প্রকৃতি কর্তা, ইহার মধ্যে "আমি" নাই, সবই একমেবা-দ্বিতীয়ং ব্রহ্মের বিদ্যাবিদ্যাময়ী শক্তির লীলা। অহংজ্ঞান জীব-অধিষ্ঠিত প্রকৃতির মধ্যে একটি মায়াপ্রসূত ভাবমার। এই অহংজ্ঞানরহিত ভাবের শেষ অবস্থা সক্রিদানন্দে লয়। কিন্তু যিনি গুণাতীত হইয়াও পুরুষোত্তমের ইচ্ছায় লীলা-মধ্যে অবস্থান করেন, তিনি পুরুষোত্তম ও জীবের শ্বতন্ত অভিত রক্ষা করিয়া আপনাকে প্রকৃতিবিশিষ্ট ভগবদংশ বুঝিয়া লীলার কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই ভাবকে অহঙ্কার বলা যায় না। এই ভাব পরমেশ্বরেরও আছে, তাঁহার মধ্যে অজ্ঞান বা লিপ্ততা নাই, কিন্তু আনন্দময় অবস্থা স্বস্থু না হইয়া জগৰুখী হয় । যাঁহার এই ভাব, তিনিই জীবনুজ। লয় রূপ মুজি দেহপাতে লাভ করা যায়। জীবনুজ্দশা দেহেই অনুভূত হয়।

পূণ্তা

পূর্ণযোগের পদ্মায় পদার্পণ করিয়াছ, পূর্ণযোগের অর্থ ও উদ্দেশ্য কি তাহাই একবার তলাইয়া দেখিয়া অগ্রসর হও। সিদ্ধির উচ্চ শিখরে আরুত হইবার মহৎ আকাঙ্কা যাহার, তাহার দুটি কথা সম্যক জানা প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ও পদ্ম। পদ্মার কথা পরে বলিব, আগে উদ্দেশ্যের পূর্ণ চিত্র তোমাদের চোখের সামনে পূর্ণভাবে দৃঢ়-রেখায় ফলান দরকার।

পূর্ণতার অর্থ কি ? পূর্ণতা ভাগবত সন্তার শ্বরূপ, ভাগবতী প্রকৃতির ধর্ম্ম। মানুষ অপূর্ণ, পূর্ণতার প্রয়াসী, পূর্ণতার দিকে ক্রমবিকাশ, আত্মার ক্রম-অভিব্যক্তির ধারায় অগ্রসর। পূর্ণতা তাহার গস্তব্যস্থান, মানুষ ভগবানের একটি অর্দ্ধবিকশিত রূপ সেই জন্য সে ভাগবত পূর্ণতার পথিক ৷ এই মানুষরূপ মুকুলে ভাগবত-পদের পূর্ণতা লুক্কায়িত, তাহা ক্রমে ক্রমে আন্তে আন্তে প্রকৃতি ফুটাইতে সচেপ্ট। যোগ-অভ্যাসে যোগশন্তিতে সে মহাবেগে **ত্বরিত**বিকাশে ফুটিতে আরম্ভ করে। লোকে যাহাকে পূর্ণ মনুষ্যত্ব বলে, মানসিক উন্নতি, নৈতিক সাধুতা, চিভর্ভির ললিত বিকাশ, চরিছের তেজ, প্রাণের বল, দৈহিক স্বাস্থ্য, সে ভাগবত পূর্ণতা নয়। সে প্রকৃতির একটি খণ্ড-ধম্মের পূর্ণতা। আত্মার পূর্ণতায়, মানসাতীত বিজ্ঞান-শক্তির পূর্ণতায় প্রকৃত অখণ্ড পূর্ণতা আসে। কারণ, অখণ্ড আত্মাই আসল পুরুষ, মানুষের মানসিক প্রাণিক ও দৈহিক পুরুষত্ব তাহার একটি খণ্ড বিকাশ মান্ত। আর মনের বিকাশ বিজ্ঞানের একটি খণ্ড বাহ্যিক বিকৃত খেলা, মনের প্রকৃত পূর্ণতা আসে যখন সে বিজ্ঞানে পরিণত হয়। অখণ্ড আত্মা জগৎকে বিজ্ঞান-শক্তিদারা স্ক্রন করিয়া নিয়ন্তিত করে, বিজ্ঞানশক্তির দারা খণ্ডকে অখণ্ডে তুলিয়া দেয়। আত্মা মানুষের মধ্যে মানসরূপ পদায় লুক্কায়িত রহিয়াছে, পর্দা সরাইয়া আত্মার স্বরূপ দেখা দেয়। আত্মশক্তি মনে খৰ্কাকৃত অৰ্দ্লপ্ৰকাশিত অৰ্দ্লশ্লায়িত রূপ ও ক্রীড়া অনুভব করে, বিজ্ঞানশক্তি যখন খোলে তখনই আত্মশক্তির পূর্ণ স্ফুরণ।

স্তবস্তোত্র

সাধক, সাধন ও সাধ্য এই তিন অঙ্গ লইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ।
সাধকের ভিন্ন ভিন্ন স্থভাব থাকায় ভিন্ন ভিন্ন সাধন আদিপ্ট হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন
সাধ্যও অনুস্ত হয়। কিন্ত স্থূলদৃপ্টিতে নানা সাধ্য থাকিলেও সূক্ষ্মদৃপ্টিতে
দেখিলে বুঝা যায় যে সকল সাধকের সাধ্য এক—সেই সাধ্য আত্মতুপ্টি।
উপনিষদে যাজ্ঞবলক্য তাঁহার সহধন্মিণীকে বুঝাইলেন যে, আত্মার জন্য সব,
আত্মার জন্য স্ত্রী, আত্মার জন্য ধন, আত্মার জন্য প্রেম, আত্মার জন্য সূত্র, আত্মার
জন্য দুঃখ, আত্মার জন্য জীবন, আত্মার জন্য মরণ। সেইজন্য আত্মা কি এই
প্রশ্নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা।

অনেক বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি বলেন আত্মজান লইয়া এত র্থা মাথাঘামান কেন ? এই সব স্কাবিচারে সময় নম্ট করা বাতুলতা, সংসারের প্রয়োজনীয় বিষয় ও মানবজাতির কল্যাণচেষ্টা লইয়া থাক। কিন্তু সংসারের কি কি বিষয় প্রয়োজনীয় এবং মানবজাতির কল্যাণ কিসে হইবে, এই প্রশ্নের মীমাংসাও আত্মজানের উপর নির্ভর করে। যেমন আমার জ্ঞান, তেমনই আমার সাধ্য। আমি যদি নিজ দেহকে আত্মা বুঝি, তাহার তুপ্টিসাধনার্থ আর-সকল বিচার ও বিবেচনাকে জলাজনি দিয়া স্বার্থপর মরপিশাচ হইয়া থাকিব ৷ যদি স্ত্রীকেই আত্মবৎ দেখি, আত্মবৎ ভালবাসি, স্ত্রৈণ হইয়া ন্যায়-অন্যায় বিচার না করিয়া তাহার মনস্তুপিট সম্পাদনের জন্য প্রাণপণ চেপ্টা করিব, পরকে কপ্ট দিয়া তাহারই সুখ করিব, পরের অনিপট করিয়া তাহারই ইপ্ট সিদ্ধ করিব। যদি দেশকেই আত্মৰৎ দেখি, আমি খুব বড় একজন দেশহিতৈষী হইব, হয়ত ইতিহাসে অমরকীতি রাখিয়া যাইব, কিন্তু অন্যান্য ধন্ম পরিত্যাগ করিয়া পরদেশের অনিষ্ট, ধনলুষ্ঠন, স্বাধীনতা-অপহরণ করিতে পারি ৷ যদি ভগবানকে আত্মা বুঝি অথবা আত্মবৎ ভালবাসি--সে একই কথা, কেননা প্রেম হইল চরমদৃপিট--আমি ভজ যোগী, নিষ্কাম কম্মী হইয়া সাধারণ মনুষ্যের অপ্রাপ্য শক্তি, জান বা আনন্দ ভোগ করিতে পারি। যদি নিগুঁণ পরব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া জানি, পরম শান্তি ও লয় প্রাণত হইতে পারি। যো যচ্ছুদ্ধঃ স এব সঃ,—–যাহার যেমন শ্রদ্ধা সে সেইরূপই হয়। মানবজাতি চিরকাল সাধন করিয়া আসিতেছে, প্রথম ক্ষুদ্র, পরে অপেক্ষাকৃত বড়, শেষে সর্ব্বোচ্চ পরাৎপর সাধ্য সাধন করিয়া গভব্যস্থান শ্রীহরির প্রমধাম প্রাপ্ত হইতে চলিতেছে। এক যুগ ছিল, মান্ব-জাতি কেবল শরীর সাধন করিত, শরীর সাধন সেই কালের যুগধশর্ম, অন্য-

ধর্শনকৈ খাট করিয়াও তখন শরীর সাধন করা শ্রেয়ঃ পথ ছিল। কারণ, তাহা না হইলে শরীর, যে শরীর ধর্শনাধনের উপায় ও প্রতিষ্ঠা, উৎকর্ষ লাভ করিত না। সেইরূপ আর-একয়ুপে স্ত্রী-পরিবার, আর-একয়ুপে কুল, আর-একয়ুপে—যেমন আধুনিক মুপে—জাতিই সাধ্য। সর্বেগাচ্চ পরাৎপর সাধ্য পরমেশ্বর, ভগবান। ভগবানই সকলের প্রকৃত ও পরম আখা, অতএব প্রকৃত ও পরম সাধ্য। সেইজন্য গীতায় বলে, সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর, আমাকেই শরণ কর। ভগবানের মধ্যে সকল ধর্মের সমন্য হয়, তাঁহাকে সাধ্য করিলে তিনিই আমাদের ভার লইয়া আমাদিগকে য়য় করিয়া স্ত্রী, পরিবার, কুল, জাতি, মানবসম্পিটর পর্ম তুপিট ও পর্ম কল্যাণ সাধ্য করিবেন।

এক সাধ্যের নানা সাধকের ভিন্ন ভিন্ন স্থভাব থাকায় নানা সাধনও হয়।
ভগবৎ-সাধনের এক প্রধান উপায় ভবস্তোর। ভবস্তোর সকলের উপযোগী
সাধন নহে। জানীর পক্ষে ধ্যান ও সমাধি; কম্মীর পক্ষে কম্মসমর্পণ শ্রেষ্ঠ
উপায়, ভবস্তোর ভক্তির অস—শ্রেষ্ঠ অস নহে বটে, কেননা অহৈতুক প্রেম
ভক্তির চরম উৎকর্ম, সেই প্রেম ভগবানের স্থরাপ ভবস্তোর দ্বারা আয়ত্ত করিয়া
তাহার পরে ভবস্তোরের প্রয়োজনীয়তা অতিক্রম করিয়া সেই স্থরাপ ভোগে
লীন হইয়া যায়; তথাপি এমন ভক্ত নাই যে ভবস্তোর না করিয়া থাকিতে পারে,
যখন আর সাধনের আবশাকতা থাকে না, তখনও ভবস্তোরে প্রাণের উচ্ছাস
উছলিয়া উঠে। কেবল সমরণ করিতে হয় যে সাধন সাধ্য নহে, আমার যে
সাধন, সে পরের সাধন না-ও হইতে পারে। অনেক ভস্তের এই ধারণা দেখা
যায় যে, যিনি ভগবানের শুবস্তোর করেন না, স্তোর শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করেন
না, তিনি ধাম্মিক নহেন। ইহা লান্তি ও সঙ্কীর্ণতার লক্ষণ। বুদ্ধ স্তবস্তোর
করিতেন না, তথাপি কে বুদ্ধকে অধাম্মিক বলিবে? ভিন্তিমার্গ সাধনের জন্য
ভবস্তোরের স্থিট।

ভজও নানাপ্রকার, ভবভোরেরও মানা প্রয়োগ হয়। আর্ত্ত ভল দুঃখের সময়ে ভগবানের নিকট কাঁদিবার জন্য, সাহায্য প্রার্থনার জন্য, উদ্ধারের আশায় ভবভোর করেন, অর্থার্থী ভক্ত কোনও অর্থসিদ্ধির আশায়, ধন মান সুখ ঐশ্বর্য জয় কল্যাণ ভুল্তি মুক্তি ইত্যাদি উদ্দেশ্য সম্বন্ধ করিয়া ভবভোর করেন। এই শ্রেণীর ভক্ত অনেকবার ভগবানকে প্রলোভন দেখাইয়া সম্ভুল্ট করিতে যান, এক-একজন অভীল্টসিদ্ধি না পাইয়া পরমেশ্বরের উপর ভারি চটিয়া উঠেন, তাঁহাকে নির্ভুর প্রবঞ্চক ইত্যাদি গালাগালি দিয়া বলেন, আর ভগবানকে পূজা করিব না, মুখ দেখিব না, কিছুতেই মানিব না। অনেকে হতাশ হইয়া নাভিক হন, এই সিদ্ধান্ত করেন যে, এই জগৎ দুঃখের রাজ্য, অন্যায়-অত্যাচারের রাজ্য, ভগবান নাই। এই দুই প্রকার ভল্তি, অক্ত ভল্তি, তাই বলিয়া উপেক্ষণীয় মহে, ক্ষুদ্র হইতেই মহতে উঠে। অবিদ্যা সাধন বিদ্যার প্রথম সোপান। বালকও অক্ত, কিন্তু বালকের অক্ততায় মাধুর্য্য আছে, বালকও মায়ের নিকট কাঁদিতে আসে, দুঃখের প্রতীকার চায়, নানারাপ সুখ ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছুটিয়া আসে,

সাধে, কান্নাকাটি করে, না পাইলে চটিয়াও উঠে, দৌরাত্মা করে। জগজ্জননীও হাস্যমুখে অঞ্জভক্তের সকল আব্দার ও দৌরাত্ম সহ্য করেন।

জিজাসু ভক্ত কোন অর্থসিদ্ধির জন্য বা ভগবানকে সন্তুপ্ট করিবার জন্য স্তবন্তোর করেন না, তাঁহার পক্ষে স্তবন্তোর সুদ্ধ ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধির এবং শ্রীয় ভাবপুপ্টির উপায়। জ্ঞানীভজ্তের পক্ষে সেই প্রয়োজনও থাকে না, কেননা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি হইয়াছে, তাঁহার ভাব সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কেবল ভাবোচ্ছাসের জন্য স্তবন্তোরের প্রয়োজন। গীতায় বলে, এই চারিশ্রেণীর ভক্ত সকলেই উদার, কেহ উপেক্ষণীয় নহে, সকলে ভগবানের প্রিয়, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ জ্ঞানী ও ভগবান একাত্ম। ভগবান ভক্তের সাধ্য, অর্থাৎ আত্মরূপে জ্ঞাতব্য ও প্রাপা, জ্ঞানীভক্তে ও ভগবানে আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধ হয়। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম —এই তিন সূত্রে আত্মা ও পরমাত্মা পরস্পরে আবদ্ধ। কর্ম্ম আছে, সেই কর্ম্ম ভগবদত্ব, তাহার মধ্যে কোন প্রয়োজন বা স্থার্থ নাই, প্রার্থনীয় কিছুই নাই; প্রেম আছে, সেই প্রেম কর্মহ ও অভিমানশূন্য—নিঃস্থার্থ, নিক্ষলর, নিন্ম্মল, জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান শুন্ধ ও জাবরহিত নহে, গজীর, তীর আনন্দ ও প্রেমে পূর্ণ। সাধ্য এক হইলেও যেমন সাধক তেমনই সাধন, তেমনই জির ভিন্ন সাধকের এক সাধনের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ।

আমাদের ধর্ম

আমাদের ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম। এই ধর্ম্ম ত্রিবিধ, ত্রিমার্গগামী, ত্রিকর্মরত। আমাদের ধর্ম্ম ত্রিবিধ। ভগবান অভরাজায়, মানসিক জগতে, স্থূল জগতে—এই ত্রিধামে প্রকৃতিস্পট মহাশজ্জিলালিত বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এই ত্রিধামে তাঁহার সহিত যুক্ত হইবার চেল্টা সনাতন ধর্মের ত্রিবিধত্ব। আমাদের ধর্ম্ম ত্রিমার্গগামী। জান, ভক্তি, কর্ম্ম—এই তিনটি স্বতন্ত্র বা মিলিত উপায়ে সেই যুক্তাবস্থা মানুষের সাধ্য। এই তিন উপায়ে আত্মন্তন্ধি করিয়া ভগবানের সহিত যোগলিপ্সা সনাতন ধর্মের ত্রিমার্গগামী গতি। আমাদের ধর্ম্ম ত্রিকর্ম্মরত। মানুষের প্রধান র্তি-সকলের মধ্যে তিনটি উর্দ্ধুগামিনী, ব্রক্ষপ্রাপ্তি-বলদায়িনী—সত্য, প্রেম ও শক্তি। এই তিন বৃত্তির বিকাশে মানব-জাতির ক্রমোরতি সাধিত হইয়া আসিতেছে। সত্য, প্রেম ও শক্তি দ্বারা ত্রিমার্গে অগ্রসর হওয়া সনাতন ধর্ম্মের ত্রিকর্ম্ম।

সনাতন ধশ্মের মধ্যে অনেক গৌণ ধশ্ম নিহিত; সনাতনকে অবলম্বন করিয়া পরিবর্ত্তনশীল মহান, ক্ষুদ্র নানাবিধ ধশ্ম স্বাস্থা কার্য্যে পর্বত্ত হয়। সর্বপ্রকার ধশ্ম কশ্ম স্বভাবস্থা। সনাতন ধশ্ম জগতের সনাতন স্বভাব আশ্রিত, এই নানাবিধ ধশ্ম নানাবিধ আধারগত স্বভাবের ফল। ব্যক্তিগত ধশ্ম, জাতিধশ্ম, বর্ণাশ্রিত ধশ্ম, যুগধশ্ম ইত্যাদি নানা ধশ্ম আছে। অনিত্য বলিয়া সেইগুলি উপেক্ষণীয় বা বর্জনীয় নয়, বরং এই অনিত্য পরিবর্ত্তনশীল ধশ্ম দ্বারাই সনাতন ধশ্ম বিকশিত ও অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত ধর্ম, জাতিধশ্ম, বর্ণাশ্রিত ধশ্ম, যুগধশ্ম পরিত্যাগ করিলে সনাতন ধশ্মের পুষ্টি না হইয়া অধশ্মই বন্ধিত হয় এবং গীতায় যাহাকে সঙ্কর বলে, অর্থাৎ সনাতন প্রণালী ভঙ্গ ও ক্রমোন্নতির বিপরীত গতি বসুন্ধরাকে পাপে ও অত্যাচারে দংধ করে। যখন সেই পাপের ও অত্যাচারের অতিরিক্ত মান্নায় মানুষের উন্নতির বিরোধিনী ধশ্মদলনী আসুরিক শক্তিসকল স্ফীত ও বলযুক্ত হইয়া স্বার্থ, কুরতা ও অহঙ্কারে দশদিক আচ্ছন্ন করে, অনীশ্বর জগতে ঈশ্বর সাজিতে আরম্ভ করে, তখন ভারার্ভ পৃথিবীর দুঃখলাঘ্যব করিবার মানসে ভগবানের অবতার কিয়া বিভূতি মানবদেহে প্রকাশ হইয়া আবার ধশ্মপথ নিক্ষণ্টক করেন।

সনাতন ধম্মের যথার্থ পালনের জন্য ব্যক্তিগত ধ্ন্ম, জাতিধ্নুম, বর্ণাশ্রিত ধন্ম ও যুগধন্মের আচরণ সক্রা রক্ষণীয়। কিন্তু এই নানাবিধ ধন্মের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মহান্ দুই রূপ আছে। মহান্ ধন্মের সঙ্গে ক্ষুদ্র ধন্ম মিলাইয়া ও সংশোধন করিয়া অনুষ্ঠান করা শ্রেয়ক্ষর। ব্যক্তিগত ধন্ম জাতিধন্মের অঙ্কাশ্রিত করিয়া আচরণ না করিলে জাতি ভারিয়া যায় এবং জাতিধম্ম লুগ্ত হইলে ব্যক্তিগত ধর্ম্মের ক্ষেত্র ও সুযোগ নম্ট হয়। ইহাও ধন্ম্মসঙ্কর—যে ধন্ম্মসঙ্করের প্রভাবে জাতি ও সঙ্করকারীগণ উভয়ে অতল নরকে নিমগ্ন হয়। জাতিকে আগে রক্ষা করিতে হয়, তবেই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও আথিক উন্নতি নিরাপদ করা যায়। বর্ণাশ্রিত ধন্ম্মকেও যুগধন্মের ছাঁচে ঢালিয়া গড়িতে না পারিলে মহান্ যুগধন্মের প্রতিকূল গতিতে বর্ণাশ্রত ধন্ম চূর্ণ ও বিনম্ট হইয়া সমাজও চূর্ণ ও বিনম্ট হয়। ক্ষুদ্র সর্ব্বান মহতের অংশ বা সহায়-স্বরূপ, এই সম্বন্ধের বিপরীত অবস্থায় ধন্ম্মসঙ্করসভূত মহান্ অনিষ্ট ঘটে। ক্ষুদ্র ধন্মের্ম ও মহান্ ধন্ম্মের বিরোধ হইলে ক্ষুদ্র ধন্ম্ম পরিত্যাগপূর্বক মহান্ ধন্ম্ম অনষ্ঠান মঙ্গলপ্রদ।

আমাদের উদ্দেশ্য সনাতন ধর্ম্ম প্রচার ও সনাতন-ধর্ম্মাশ্রিত জাতিধর্ম্ম ও যুগধম্ম অনুষ্ঠান ৷ আমরা ভারতবাসী, আর্য্যজাতির বংশধর, আর্য্যশিক্ষা ও আর্য্যনীতির অধিকারী। এই আর্য্যভাবই আমাদের কুলধর্ম ও জাতিধর্ম। জান, ভক্তি ও নিষ্কাম কম্ম আর্য্যশিক্ষার মূল; জান, উদারতা, প্রেম, সাহস, শক্তি, বিনয় আর্য্াচরিত্রের লক্ষণ। মানবজাতিকে জ্ঞান বিতরণ করা, জগতে উন্নত উদার চরিত্তের নিজ্ঞলক আদর্শ দেওয়া, দুর্ব্বলকে রক্ষা করা, প্রবল অত্যাচারীকে শাসন করা আর্যাজাতির জীবনের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সাধনে তাহার ধম্মের চরিতার্থতা। আমরা ধ্র্মেরুন্ট, লক্ষ্যরুন্ট, ধ্র্মেসক্ষর ও ল্লান্তিসঙ্কুল তামসিক মোহে পড়িয়া আর্য্য-শিক্ষাও নীতি-হারা। আমরা আর্য্য-জাতি হইয়া শূদ্রত্ব ও শূদ্রধম্ম্রাপ দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়া জগতে হেয়, প্রবল-পদদলিত ও দুঃখ-পরম্পরা-প্রপীড়িত হইয়াছি। অতএব যদি বাঁচিতে হয়, যদি অনভ নরক হইতে মুক্ত হইবার লেশমাত্র অভিলাষ থাকে, জাতির রক্ষা আমাদের প্রথম কর্ত্ব্য। জাতিরক্ষার উপায় আর্য্যচরিত্রের পুনর্গঠন। যাহাতে জননী জন্মভূমির ভাবী সভান জানী, সতানিষ্ঠ, মানব-প্রেমপূর্ণ, দ্রাতৃভাবের ভাবুক, সাহসী, শজিমান, বিনীত হয়, সমস্ত জাতিকে, বিশেষতঃ যুবক-সম্প্রদায়কে সেইরাপ উপযুক্ত শিক্ষা, উচ্চ আদর্শ ও আর্য্যভাব-উদ্দীপক কর্ম্য-প্রণালী দেওয়া আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য। এই কার্য্যে কুতার্থ না হওয়া পর্য্যন্ত সনাতন ধর্মপ্রচার উষর ক্ষেত্রে বীজবপন মার।

জাতিধন্ম অনুষ্ঠানে যুগধন্মসৈবা সহজ্ঞসাধ্য হইবে। এই যুগ শক্তি ও প্রেমের যুগ। যখন কলির আরম্ভ হয়, জ্ঞান ও কন্ম ভক্তির অধীন ও সাহায্যকারী হইয়া শ্ব শ্ব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, সত্য ও শক্তি প্রেমকে আশ্রয় করিয়া মানবজাতির মধ্যে প্রেমবিকাশ করিতে সচেপ্ট হয়। বৌদ্ধধন্মের মৈত্রী ও দয়া, খ্রীপ্টধন্মের প্রেমশিক্ষা, মুসলমান ধন্মের সাম্য ও ভ্রাতৃভাব, পৌরাণিক ধন্মের ভক্তি ও প্রেমভাব এই চেপ্টার ফলস্বরূপ। কলিযুগে সনাতন ধন্ম মৈত্রী, কন্ম্ম, ভক্তি, প্রেম, সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের সাহায্য লইয়া মানব-কল্যাণ সাধিত করে। জান, ভক্তি, প্রেম, সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের সাহায্য লইয়া মানব-কল্যাণ সাধিত করে। জান, ভক্তি ও নিষ্কাম কন্ম্ম গঠিত আর্য্যধন্মে এই শক্তি-সকল

প্রবিষ্ট ও বিকশিত হইয়া বিস্তার ও স্বপ্রর্ত্তিপূরণের পথ খুঁজিতেছে। শক্তি-স্ফুরণের লক্ষণ কঠিন তপস্যা, উচ্চাকাঙ্কা ও মহৎ কর্ম্ম। যখন এই জাতি তপস্থী, উচ্চাকাঙ্কী, মহৎ কর্মপ্রয়াসী হইবে, তখন বুঝিতে হইবে, জগতের উন্নতির আরব্ধ হইয়াছে, ধর্ম্মবিরোধিনী আসুরিক শক্তির সঙ্কোচ ও দেবশক্তির পুনরুখান অবশ্যম্ভাবী। অতএব এইরাপ শিক্ষাও বর্ত্তমান সময়ে প্রয়োজনীয়।

যুগধশর্ম ও জাতিধশর্ম সাধিত হইলে জগৎময় সনাতন ধশর্ম অবাধে প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত হইবে। প্র্কিকাল হইতে যাহা বিধাতা নিদিক্ট করিয়াছেন, যে সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ উজি শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহাও কার্য্যে অনুভূত হইবে। সমস্ত জগৎ আর্য্যদেশসভূত ব্রক্ষজানীর নিকট জান-ধশর্ম-শিক্ষাপ্রার্থী হইয়া ভারতভূমিকে তীর্থ মানিয়া অবনত মস্তকে তাহার প্রাধান্য স্থীকার করিবে। সেইদিন আন্যানের জন্য ভারতবাসীর জাগরণ, আর্য্য ভাবের ন্বোপ্থান।

মায়া

আমাদের পুরাতন দার্শনিকগণ যখন জগতের মূলতত্বগুলির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহারা এই প্রপঞ্চের মূলে একটি অনশ্বর ব্যাপক বস্তুর অভিত অবগত হইলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্গণ বহুকালের অনু– সন্ধানে বাহ্যজগতেও এই অনশ্বর সর্বব্যাপী একত্বের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। তাঁহারা আকাশকেই ভৌতিক প্রপঞ্চের মূলতত্ব বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভারতের পুরাতন দার্শনিকগণও বহু সহস্র বৎসর পূর্বের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, আকাশই ভৌতিক প্রপঞ্চের মূল, তাহা হইতে আর সকল ভৌতিক অবস্থা প্রাকৃতিক পরিণাম দ্বারা উদ্ভূত হয়। তবে তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া সন্তুল্ট হন নাই। তাঁহারা যোগবলে স্ক্রাজগতে প্রবেশ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, স্থূল ভৌতিক প্রপঞ্চের পশ্চাতে একটি সূক্ষা প্রপঞ্চ আছে, এই প্রপঞ্চের মূল ভৌতিক তত্ত্ব সূক্ষ্ম আকাশ। এই আকাশও শেষ বস্তু নহে, তাঁহারা শেষ বস্তুকে প্রধান বলিতেন। প্রকৃতি বা জগনায়ী ক্রিয়াশজ্ঞি তাঁহার সর্বব্যাপী স্পন্দনে এই প্রধান সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে কোটি কোটি অণু উৎপাদন করেন এবং এই অণুদারা সূক্ষ্যভূত গঠিত হয়। প্রকৃতি বা ক্রিয়াশক্তি আপনার জন্য কিছুই করেন না : যাঁহার শক্তি, তাঁহারই তুপ্টিসম্পাদনার্থ এই প্রপঞ্চের স্থিট ও নানাবিধ গতি। আত্মা বা পুরুষ এই প্রকৃতির ক্রীড়ায় অধ্যক্ষ ও সাক্ষী। পুরুষ ও প্রকৃতি যাহার স্বরূপ ও ক্রিয়া সেই অনিকাচনীয় পরব্রহা জগতের অনগ্রর অদিতীয় মূল সত্য। মুখ্য মুখ্য উপনিষদে আর্য্য ঋষিগণের তত্ত্ব অনুসন্ধানে যে সত্যগুলির আবিফার হইয়াছিল, তাহাদের কেন্দ্রস্বরূপ এই ব্রহ্মবাদ ও পুরুষপ্রকৃতিবাদ প্রতিষ্ঠিত আছে ৷ তত্ত্ব– দশিগণ এই মূল সত্যগুলি লইয়া নানা তক্ ও বাদ-বিবাদে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাপ্ৰণালী স্পিট করিলেন। যাঁহারা এক্সবাদী তাঁহারা বেদাভ দর্শনের প্রবর্তক; যাঁহারা প্রকৃতিবাদের পক্ষপাতী তাঁহারা সাঙ্খ্যদর্শন প্রচার করিলেন। তাহা ভিল অনেকে পরমাণুকেই ভৌতিক প্রপঞ্চের মূলতত্ব বলিয়া স্থতত্ত পথের পথিক হইলেন ৷ এইরূপ নানা পছা আবিষ্কৃত হইবার পর, শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই সকল চিভাপ্রণালীর সমন্বয় ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া ব্যাসদেবের মুখে উপনিষ্দের সত্যঙলি পুনঃপ্রবৃত্তিত করিলেন ৷ পুরাণকর্তাগণও ব্যাসদেবের রচিত পুরাণকে আধার করিয়া সেই সত্যগুলির নানা ব্যাখ্যা---উপন্যাস ও রূপকচ্ছলে সাধারণ লোকের নিকট উপস্থিত করিলেন। ইহাতে বিদ্বান-মগুলীর বাদ-বিবাদ বন্ধ হইল না, তাঁহারা য় য় মত প্রকাশপূর্বক বিশদরূপে দশ্নশাস্তের বিভিন্ন শাখার

সিদ্ধান্তসকল তর্ক দারা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। আমাদের ষড়দর্শনের আধুনিক স্থরাপ এই পরবর্তী চিন্তার ফল। শেষে শক্ষরাচার্য্য দেশময় বেদান্ত প্রচারের অপূর্ব্য ও স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া সাধারণ লোকের ফদেয়ে বেদান্তর আধিপত্য বদ্ধমূল করিলেন। তাহার পরে আর পাঁচটি দর্শন অলসংখ্যক বিদ্যানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিল বটে, কিন্তু তাহাদের আধিপত্য ও প্রভাব চিন্তা-জগৎ হইতে প্রায় তিরোহিত হইল। সক্ষান্তনসম্মত বেদান্ত দর্শনের মধ্যে মতভেদ উৎপন্ন হইয়া তিনটি মুখ্য শাখা ও অনেক গৌল শাখা স্থাপিত হইল। জানপ্রধান অদৈতবাদ এবং ভক্তিপ্রধান বিশিপ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের বিরোধ এক্ষনও হিন্দুধন্দের্মর মধ্যে বর্ত্তমান। জানমাগী, ভক্তের উদ্দাম প্রেম ও ভাবপ্রবণতাকে উন্মাদলক্ষণ বলিয়া উড়াইয়া দেন; ভক্ত, জানমাগীর তত্ত্ব-জানস্পৃহাকে গুরু তর্ক বলিয়া উপেক্ষা করেন। উভয় মতই দ্রান্ত ও সঙ্কীর্ণ। ভক্তিশূন্য তত্ত্বজানে অহকার রন্ধি হইয়া মুক্তিপথ আবরুদ্ধ থাকে, জানশূন্য ভক্তি অক্ষবিশ্বাস ও দ্রমসকুল তামসিকতা উৎপাদন করে। প্রকৃত উপনিষদদ্শিত ধর্ম্মপ্রথ জান ভক্তি ও কম্প্র্যর সামঞ্জস্য ও পরস্পর সহায়তা রক্ষিত হইয়াছে।

যদি সক্রোপী ও সক্রজনসম্মত আর্য্যধর্ম্ম প্রচার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা প্রকৃত আর্য্যজ্ঞানের উপর সংস্থাপিত করিতে হইকে। দর্শনশাস্ত্র চিরকাল এক্পক্ষ-প্রকাশক ও অসম্পূর্ণ। সমস্ত জগৎ এক সঙ্কীর্ণ মতের অনুযায়ী তর্ক দারা সীমাবদ্ধ করিতে গেলে সত্যের একদিক বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হয় বটে, কিন্তু অপরদিকের অপলাপ হয়। অদ্বৈত্বাদীদিগের মায়াবাদ এইরাপ অপলাপের দৃষ্টাত। এক সত্য, জগৎ মিখ্যা, ইহাই মায়াবাদের মূলমগ্র। এই মত্ত যে জাতির চিন্তাপ্রণালীর মূলমন্ত্রাপে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই জাতির মধ্যে জ্যনলিম্সা, বৈরাগ্য ও সন্ধ্যাসপ্রিয়তা ব্দ্ধিত হয়, রজঃশক্তি তিরোহিত হইয়া সত্ত্ব ও তমঃ প্রাবল্য-প্রাপ্ত হয় এবং একদিকে জানপ্রাপ্ত সন্ম্যাসী, সংসারে জাতবিতৃষ্ণ প্রেমিক ভক্ত ও শান্তিপ্রার্থী বৈরাগীর সংখ্যারুদ্ধি, অপরদিকে তামসিক অজ অপ্রবৃত্তি-মুগ্ধ অকম্মণ্য সাধারণ প্রজার দুর্দ্দশাই সংঘটিত হয়। ভারতে মায়াবাদের প্রচারে তাহাই ঘটিয়াছে। জগৎ যদি মিথ্যাই হয়, তবে জ্ঞানভূষণ ভিন্ন সর্ব্বচেপ্টা নির্থক ও অনিষ্টকর বলিতে হয়। কিন্তু মানুষের জীবনে জানতৃষ্ণা ভিন্ন অনেক প্রবল ও উপযোগী রুতি ক্রীড়া করিতেছে, সেই সকলের উপেক্ষায় কোনও জাতি টিকিতে পারে না। এই জনর্থের ভয়ে শক্করাচার্য্য পারমাথিক ও ব্যবহারিক বলিয়া জ্ঞানের দুইটি অঙ্গ দেখাইয়া অধিকারভেদে জান ও কম্মের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তিনি সেই যুগের ক্রিয়াসঙ্কুল কম্ম-মার্গের তীব্র প্রতিবাদ করায় বিপরীত ফল ফলিয়াছে। শঙ্করের প্রভাবে সেই কর্মমার্গ লুপ্তপ্রায় হইল, বৈদিক ব্রিয়াসকল তিরোহিত হইল, কিন্তু সাধারণ লোকের মনে জগৎ মায়াস্তট, কম্ম অভানপ্রসূত ও মুক্তির বিরোধী, অদৃত্টই সুখ-দুঃখের কারণ ইত্যাদি তমঃ-প্রবর্তক-মত এমন দৃঢ়রূপে বসিয়া গেল যে,

মায়া ১২৯

রজঃশক্তির পুনঃ-প্রকাশ অসন্তব হইয়া উঠিল। আর্যাজাতির রক্ষার্থ ভগবান পুরাণ ও তন্তপ্রচারে মায়াবাদের প্রতিরোধ করিলেন। পুরাণে উপনিষদ-প্রসূত আর্য্যধন্মের নানাদিক কতকটা রক্ষিত হইল, তন্ত্র শক্তি-উপাসনায় মুক্তি ও ভুক্তি রূপ দ্বিবিধ-ফল-প্রাপ্তার্থ লোককে কম্মের্ম প্রবন্ধ করাইলেন। প্রায়ই যাঁহারা জাতিরক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়াছেন, প্রতাপসিংহ, শিবাজী, প্রতাপাদিতা, চাঁদরায় প্রভৃতি সকলেই শক্তি-উপাসক বা তাদ্ধিক-যোগীর শিষ্য ছিলেন। তমঃ-প্রসূত অনর্থের নিষেধ করিবার জন্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কম্মসন্ধ্যাসের বিরোধী উপদেশ দিয়াছেন।

মায়াবাদ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদেও বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর পরম মায়াবী, তাঁহার মায়া দ্বারা দৃশ্য জগৎ সৃষ্ট করিয়াছেন। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, ত্রৈগুণ্যময়ী মায়াই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। একই অনিকাচনীয় ব্রহ্ম জগতের মূল সত্য, সমস্ত প্রপঞ্চ তাঁহার অভিব্যক্তি মার, স্বয়ং পরিণামশীল ও নশ্বর। যদি ব্রহ্ম একই সনাতন সত্য হয়, ভেদ ও বহুত্ব কোথা হইতে প্রসূত, কিসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, কিরূপে উৎপন্ন, এই প্রশ্ন অনিবার্য্য। ব্রহ্ম যদি একমাত্র সত্য হয়, তবে ব্রহ্ম হইতেই ভেদ ও বহুত্ব প্রসূত, ব্রহ্মের মধ্যে -প্রতিষ্ঠিত, ব্রক্ষের কোন অনিব্র্বচনীয় শক্তি দারা উৎপন্ন, ইহাই উপনিষদের উত্তর। সেই শক্তিকে কোথাও মায়াবীর মায়া, কোথাও পুরুষ-অধিষ্ঠিত প্রকৃতি, কোথাও ঈশ্বরের বিদ্যা-অবিদ্যাময়ী ইচ্ছাশক্তি বলা হইয়াছে। ইহাতে তাকিকের মন সন্তুপট হইতে পারে নাই : কিরুপে এক বহু হয়, অভেদে ভেদ উৎপন্ন হয়, তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয় নাই। শেষে একটি সহজ উত্তর মনে উদয় হইল, এক বহু হয় না, সনাতন অভেদে ভেদ উৎপন্ন হইতে পারে না, বহু মিখ্যা, ভেদ অলীক, সনাতন অদিতীয় আত্মার মধ্যে স্বপ্নের ন্যায় ভাসমান মায়া মান্ত্র, আত্মাই সত্য, আত্মাই সনাতন। ইহাতেও গোল, মায়া আবার কি, মায়া কোথা হইতে প্রসূত, কিসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, কিরূপে উৎপন্ন হয় ? শঙ্কর উত্তর করিলেন, মায়া কি তাহা বলা যায় না, মায়া অনিক্রেনীয়, মায়া প্রসূত হয় না, মায়া চিরকাল আছে অথচ নাই। গোল মিটিল না, সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল না । এই তর্কে এক অদিতীয় রক্ষের মধ্যে আর-একটি সনতিন অনিব্বচনীয় বস্তু প্রতিষ্ঠিত হইল, একত্ব রক্ষিত হইল না।

শঙ্করের যুক্তি হইতে উপনিষদের যুক্তি উৎকৃষ্ট। ভগবানের প্রকৃতি জগতের মূল, সেই প্রকৃতি শক্তি, সিচ্চদানন্দের সিচ্চদানন্দময়ী শক্তি। আজার পক্ষে ভগবান পরমাজা, জগতের পক্ষে পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের ইচ্ছা শক্তিময়ী, সেই ইচ্ছা দারাই এক হইতে বহু, অভেদে ভেদ উৎপন্ন হয়। পরমার্থের হিসাবে ব্রহ্ম সত্যা, জগৎ মিথ্যা, পরামায়াপ্রসূত, কারণ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হয়। দেশকালের মধ্যেই প্রপঞ্চের অন্তিত্ব, ব্রহ্মের দেশকালাতীত অবস্থায় তাহার অন্তিত্ব নাই। ব্রহ্মের মধ্যে প্রপঞ্চযুক্ত দেশকাল; ব্রহ্ম দেশ-কালের মধ্যে আবদ্ধ নহে। জগৎ ব্রহ্ম হইতে প্রসূত, ব্রহ্মের মধ্যে বর্ত্তমান,

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

সনাতন অনিদেশ্য রক্ষে আদ্যন্তবিশিষ্ট জগতের প্রতিষ্ঠা, তন্ত্র ব্রহ্মের বিদ্যাঅবিদ্যাময়ী শক্তি দ্বারা সৃষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছে। যেমন মানুষের মধ্যে
প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করিবার শক্তি ব্যতীত কল্পনা দ্বারা অলীক বস্তু উপলব্ধি
করিবার শক্তি বিদ্যামান, তেমনি ব্রহ্মের মধ্যেও বিদ্যা ও অবিদ্যা, সত্য ও অনৃত
আছে। তবে অনৃত দেশকালের সৃষ্টি। যেমন মানুষের কল্পনা দেশকালের
গতিতে সত্যে পরিণত হয়, তেমনই যাহাকে আমরা অনৃত বলি তাহা সর্বাথা
অনৃত নহে, সত্যের অননুভূত দিক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সর্বাং সত্যাং, দেশকালাতীত অবস্থায় জগৎ মিথ্যা, কিন্তু আমরা দেশকালাতীত নহি, আমরা
জগৎ মিথ্যা বলিবার অধিকারী নহি। দেশকালের মধ্যে জগৎ মিথ্যা নহে,
জগৎ সত্য। যখন দেশকালাতীত হইয়া ব্রহ্মে বিলীন হইবার সময় আসিবে
ও শক্তি উৎপন্ন হইবে, তখন আমরা জগৎ মিথ্যা বলিতে পারিব, অনধিকারী
বলিলে মিথ্যাচার ও ধন্মের বিপরীত গতি হয়। আমাদের পক্ষে ব্রহ্ম সত্য
জগৎ মিথ্যা বলা অপেক্ষা ব্রন্ধ সত্য, জগৎ ব্রন্ধ বলা উচিত। ইহাই উপনিষদের
উপদেশ, সর্বাং খিলবদং ব্রন্ধ, এই সত্যের উপর আর্যাধ্যম্ম প্রতিষ্ঠিত।

নির্তি

আমাদের দেশে ধম্মের কখনও সঙ্কীর্ণ ও জীবনের মহৎ কম্মের বিরোধী ব্যাখ্যা মনীষিগণের মধ্যে গৃহীত হইত না। সমস্ত জীবনই ধর্মক্ষেত্র, হিন্দুর জান ও শিক্ষার মূলে এই মহৎ ও গভীর তত্ত্ব নিহিত ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার স্পর্শে কল্মিত হইয়া আমাদের জ্ঞান ও শিক্ষার বিকৃত ও অস্বাভাবিক অবস্থা হইয়াছে। আমরা প্রায়ই এই ল্লান্ত ধারণার বশীভূত হই যে, সন্ন্যাস, ভজি ও সাত্ত্বিক ভাব ভিন্ন আর কিছু ধম্মের অঙ্গ হইতে পারে না। পাশ্চাত্যগণ এই সঙ্কীর্ণ ধারণা লইয়া ধর্ম্মালোচনা করেন। হিন্দুরা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুই ভাগে জীবনের যত কার্য্য বিভক্ত করিতেন; পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম্ম, অধ্যম ও ধম্মাধম্মের বহিভূত জীবনের অধিকাংশ ক্রিয়া ও রুত্তির অনুশীলন, এই তিন ভাগ করা হইয়াছে। ভগবানের প্রশংসা, প্রার্থনা, সংকীর্ডন, গিজায় পাদীর বজৃতা শ্ৰবণ ইত্যাদি কৰ্ম্মকে ধৰ্ম্ম বা religion বলে, morality বা সৎকার্য্য ধশ্মের অঙ্গ নহে, তাহা স্বতন্ত্র, তবে অনেকেই religion ও morality দুইটিই ধশ্মের গৌণ অঙ্গ বলিয়া দ্বীকারও করেন। গির্জায় না যাওয়া, নান্তিকবাদ বা সংশয়বাদ এবং religion -এর নিন্দা বা তৎসম্বন্ধে ঔদা-সীন্যকে অধ্যুম irreligion বলে, কুকার্য্য immorality বলে, পর্ব্বোক্ত মতান-সারে তাহাও অধন্মের অন্ত। কিন্তু অধিকাংশ কম্ম ও বৃত্তি ধম্মাধন্মের religion ও life , ধ্রুম ও কম্ম স্বতন্ত। আমাদের মধ্যে অনেকে ধর্ম শব্দের এইরাপ বিকৃত অর্থ করেন। সাধুসন্ন্যাসীর কথা, ভগৰানের কথা, দেবদেবীর কথা, সংসারবর্জনের কথাকে তাঁহারা ধর্ম্ম নামে অভিহিত করেন; কিন্তু আর কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, তাঁহারা বলেন, ইহা সংসারের কথা, ধম্মের কথা নহে। তাঁহাদের মনে পাশ্চাত্য religion –এর ভাব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ধর্ম্ম শব্দ এবণ করিবামান্ত religion -এর কথা মনে উদয় হয়, নিজের অক্তাতসারেও সেই অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু আমাদের স্বদেশী কথায় এইরূপ বিদেশী ভাব প্রবেশ করাইলে আমরা উদার ও সনাতন আর্য্যভাব ও শিক্ষা হইতে ভ্রুপ্ট হই। সমস্ত জীবন ধর্মক্ষেত্র, সংসারও ধর্ম্ম। কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোচনা ও ভক্তির ভাব ধর্ম্ম নহে, কর্মাও ধর্মা। আমাদের সমস্ত সাহিত্য ব্যাপ্ত করিয়া এই মহতী শিক্ষা সনাত্নভাবে রহিয়াছে ---এষ ধৰ্মাঃ সনাত্**নঃ**।

অনেকের ধারণা যে কম্ম ধম্মের অঙ্গ বটে, কিন্তু সর্কবিধ কম্ম নহে; কেবল যেগুলি সাত্ত্বিকভাবাপর, নির্ভির অনুকূল, সেইগুলি এই নামের যোগ্য। ইহাও ডান্ত ধারণা। যেমন সাজিক-কম্ম ধ্র্ম্ম, তেমনই রাজসিক-কম্ম্ও ধর্ম্ম। যেমন জীবের উপর দয়া করা ধর্ম্ম, তেমনই ধর্ম্মযুদ্ধে দেশের শরুকে হনন করাও ধর্ম্ম। যেমন পরোপকারার্থে নিজের সুখ, ধন ও প্রাণ পর্যান্ত জলাজালি দেওয়া ধর্ম্ম, তেমনই ধর্ম্মের সাধন শরীরকে উচিতভাবে রক্ষা করাও ধর্ম্ম। রাজনীতিও ধর্ম্ম, কাবারচনাও ধর্ম্ম, চিত্রলিখনও ধর্ম্ম, মধুর গানে পরের মনোরজন সম্পাদনও ধর্ম্ম। যাহার মধ্যে স্বার্থ নাই, তাহাই ধর্ম্ম, সেই কর্ম্ম বড় হউক, ছােন্ট হউক। ছােন্ট-বড় আমরা হিসাব করিয়া দেখি, ভগবানের নিকট ছােন্ট বড় নাই, কোন্ ভাবে মানুষ নিজ স্বভাবাচিত বা অদৃষ্টদেও কর্ম্ম আচরণ করে তিনি সেই দিকেই লক্ষ্য রাখেন। উচ্চ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এই, যে-কর্মাই করি, তাহা তাঁহারই চরণে অর্পণ করা, যক্ত বলিয়া করা, তাঁহার প্রকৃতিদারা কৃত বলিয়া সমভাবে স্বীকার করা।

ঈশা বাস্যমিদং সর্কং যৎকিঞ্জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যজেন ভূঞীথা মা গৃধঃ কসাম্বিদ্ধনম্॥ কুকানেবেহ কম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।

অর্থাৎ যাহা দেখি, যাহা করি, যাহা ভাবি, সবই তাঁহার মধ্যে দেখা, তাঁহার চিন্তায় যেন বন্তে আচ্ছাদিত করা হইল শ্রেষ্ঠ পথ, সেই আবরণকে পাপ ও অধন্ম ভেদ করিতে অসমর্থ। মনের মধ্যে সকল কন্মের্ম বাসনা ও আসন্তি ত্যাগ করিয়া কিছু না কামনা করিয়া কন্মের স্রোতে যাহা পাই, তাহা ভোগ করিব, সকল কন্ম্ম করিব, দেহ রক্ষা করিব, ইহাই ভগবানের প্রিয় আচরণ এবং শ্রেষ্ঠ ধন্মা। ইহাই প্রকৃত নির্ভি। বৃদ্ধিই নির্ভির স্থান, প্রাণে ও ইন্তিয়ে প্রবৃত্তির ক্ষেত্র। বৃদ্ধি প্রবৃত্তি দারা স্পৃষ্ট হয় বলিয়া যত গোল। বৃদ্ধি নিলিগতভাবে সাক্ষ্মী ও ভগবানের prophe। বা spokesman হইয়া থাকিবে, নিক্ষাম হইয়া তাঁহার অনুমোদিত প্রেরণা প্রাণ ও ইন্তিয়কে ভাপন করিয়া দিবে, প্রাণ ও ইন্তিয়ে তদনুসারে স্বাস্থ্য কন্মির নির্ভি নির্ভি ক্রেই, নিলিগতভাই প্রকৃত নির্ভি।

প্রাকাম্য

ծ

লোকে যখন অপ্টসিদ্ধির কথা বলে, তখন অলৌকিক যোগপ্রাপ্ত কয়েকটি তাপূর্ব্ব শক্তির কথা ভাবে। অবশ্য অপ্টসিদ্ধির পূর্ণবিকাশ যোগীরই হয়, কিন্তু এই শক্তিসকল প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত নহে, বরং আমরা যাহাকে প্রকৃতির নিয়ম বলি, তাহা অপ্টসিদ্ধির সমাবেশ।

অপ্টাসিদ্ধির নাম মহিমা, লঘিমা, অণিমা, প্রাকাম্য, ব্যাপিত, ঐশ্বর্যা, বশিতা, দিশিতা। এইগুলিই পরমেশ্বরের অপট স্বভাবসিদ্ধ শক্তি বলিয়া পরিচিত। প্রাকাম্য ধর,—প্রাকাম্যের অর্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ বিকাশ ও অবাধ ক্রিয়া। বাস্তবিক, পঞ্চজানেন্দ্রিয় ও মনের সকল ক্রিয়া প্রাকাম্যের অন্তর্গত। প্রাকাম্যের বলে চক্ষুতে দেখে, কাণে শোনে, নাকে আয়াণ লয়, তকে স্পর্শ অনুভব করে, রসনায় রসাম্বাদন করে, মনে বাহাস্পর্শসকল আদায় করে। সাধারণ লোকে ভাবে, স্থূল ইন্দ্রিয়েই জানধারণের শক্তি; তত্ত্ববিদ্ জানে চোখ দেখে না, মন দেখে, কাণ শোনে না, মন শোনে, নাক আয়াণ করে না, মন আয়াণ করে। যাঁহারা আরও তত্ত্বজানী, তাঁহারা জানেন মনও দেখে না, শোনে না, আয়াণ করে না, জীব দেখে, শোনে, আয়্রাণ করে। জীবই জাতা। জীব ঈশ্বর, ভগবানের অংশ। ভগবানের অপ্টসিদ্ধি জীবেরও অপ্টসিদ্ধি।

মমৈবাংশা জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।।
শরীরং যদবাপ্লোতি যদ্যাপুাৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীকৈতানি স যাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াও।।
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপ্সেবতে।।

আমার সনাতন অংশ জীবলোকে জীব হইয়া মন ও পঞ্চেন্তিয় প্রকৃতির মধ্যে পাইয়া আকর্ষণ করে (নিজ উপযোগে লাগায় ও ভোগের জন্য আয়ন্ত করে)। যখন জীবরাপ ঈশ্বর শরীরলাভ করেন বা শরীর হইতে নির্গমন করেন, তখন যেমন বায়ু গন্ধকে ফুল ইত্যাদি হইতে লইয়া যায়, তেমনই শরীর হইতে ইন্দ্রিয়সকল লইয়া যান। শ্রোত্র, চক্রু, স্পর্শ, আস্বাদ, দ্রাণ ও মন অধিষ্ঠান করিয়া এই ঈশ্বর বিষয় ভোগ করেন। দৃশ্টি, শ্রবণ, আদ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ, মনন এইগুলিই প্রাকাম্যের ক্রিয়া। ভগবানের সনাতন অংশ জীব এই প্রকৃতির ক্রিয়া লইয়া প্রকৃতির বিকারে পঞ্চেন্তিয় ও মন সূদ্র্মশ্রীরে বিকাশ করেন, সূত্যুকালে

এই ষড়িন্দ্রিয় নইয়া নির্গমন করেন। সূক্ষ্যদেহেই হউক, স্থূনদেহেই হউক, তিনি এই ষড়িন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করিয়া বিষয়সকল ভোগ করেন।

কারণদেহে সম্পূর্ণ প্রাকাম্য থাকে, সেই শক্তি সূদ্ধদেহে বিকাশনাভ করে, পরে স্থূলদেহে বিকশিত হয়। কিন্তু প্রথম হইতে স্থূলে সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় না, জগতের ক্রমবিকাশে ইন্দ্রিয়সকল ক্রমে বিকশিত হয়, শেষে কয়েকটি পশুর মধ্যে মানুষের উপযোগী বিকাশ ও প্রাথ্যা লাভ করে। মানুষের মধ্যে পঞ্চেন্দ্রিয় জল্প নিস্তেজ হইয়া পড়ে, কারণ আমরা মন ও বৃদ্ধির বিকাশে অধিক শক্তি প্রয়োগ করি। কিন্তু এই অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি প্রাকাম্য বিকাশের শেষ অবস্থা নয়। যোগ দ্বারা সূক্ষ্মদেহে যত প্রাকাম্য বিকাশ হইয়াছে, তাহা স্থূলদেহেও প্রকাশ পায়। ইহাকেই যোগপ্রাণ্ড প্রাকাম্য সিদ্ধি বলে।

=

পরমেগ্রর অনত ও অপরাহত-প্রাক্রম, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ শ্ভিরও ক্ষেত্র অনন্ত ও ক্রিয়া অপরাহত। জীব ঈশ্বর, ভগবানের অংশ, সূক্ষাদেহে ও স্থূলদেহে আবদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে ঐথরিক শক্তি বিকাশ করিতেছেন। স্থল শরীরের ইন্দ্রিয়সকল বিশেষতঃ সীমাবদ্ধ, মানুষ যতদিন ভূলদেহের শক্তিদারা আবদ্ধ থাকে, ততদিন বুদ্ধিবিকাশেই সে পত্তর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, নচেৎ ইন্দ্রিয়ের প্রাখর্যো এবং মনের অদ্রান্ত ক্রিয়াতে--এক কথায়, প্রাকাম্য সিদ্ধিতে--পশুই উৎকৃষ্ট। বিজ্ঞানবিদ্গণ ষাহাকে instinct বলে, তাহা এই প্রাকাম্য। পশুর মধ্যে বুদ্ধির অত্যল্প বিকাশ হইয়াছে, অথচ এই জগতে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে এমন কোন র্ডির দরকার যে পথপ্রদর্শক হইয়া সর্বকার্য্যে কি অনুষ্ঠেয়, কি বর্জনীয়, তাহা দেখাইয়া দিবে। পশুর মনই এই কার্য্য করে। মানুষের মন কিছু নির্ণয় করে না, বৃদ্ধিই নিশ্চশ্বাত্মক, বৃদ্ধিই নির্ণয় করে, মন কেবল সংস্কারস্পিটর যত। আমরা যাহা দেখি, শুনি, বােধ করি, তাহা মনে সংস্কাররাপে পরিণত হয়, বুদ্ধি সেই সংস্কারগুলি গ্রহণ করে, প্রত্যাখ্যান করে, উহা লইয়া চিন্তা স্থিট করে। পশুর বুদ্ধি এই নির্ণয়কশের্ম অপারগ; বৃদ্ধি দ্বারা নহে, মন দ্বারা পশু বুঝে চিন্তা করে। মনের এক অভুত শক্তি আছে, অন্য মনে যাহা হইতেছে, তাহা এক মুহূর্তে বুঝিতে পারে, বিচার না করিয়া যাহা প্রয়োজন, তাহা বুঝিয়া লয় এবং কম্মের উপযুক্ত প্রণালী ঠিক করে। আমরা কাহাকেও ঘরে প্রবেশ করিতে দেখি নাই, অঁথচ জানি যেন কে ঘরে লুকায়িত হইয়া রহিয়া**হে** ; কোন ভয়ের কারণ নাই, অথচ আশ্**ষিত হই**য়া থাকি, কোথা হইতে যেন গুণ্ড ভয়ের কারণ রহিয়াছে; বন্ধু এক কথাও বলে নাই, অথচ বলিবার পূর্বেও কি বলিবে, তাহা বুঝিয়া লইলাম, ইত্যাদি অনেক উদাহরণ দেওয়া হয়; এ সকলই মনের শক্তি, একাদশ ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক অবাধ **রি**য়া। কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে স**ব্র** কার্য্য করিতে আমরা এত অভ্যস্ত হইয়াছি যে, এই ক্রিয়া, এই প্রাকাম্য আমাদের মধ্যে প্রায় লোপ পাইয়াছে।

প্রকাম্য ১৩৫

পশু এই প্রাকাম্যকে আশ্রয় না করিলে দুদিনে মরিয়া যাইবে। কি পথ্য, কি অপথ্য, কে মিল্ল, কে শলু, কোথায় ভয়, কোথায় নিরাপদ, প্রাকাম্যই এই সকল জান পশুকে দেয়। এই প্রাকাম্য দারা কুকুর প্রভুর ভাষা না বুঝিয়াও তাহার কথার অর্থ বা মনের ভাব বুঝিতে পারে। এই প্রাকাম্য দারা ঘোড়া যে পথে একবার গিয়াছে, সেই পথ চিনিয়া রাখে। এই সকল প্রাকাম্যক্রিয়া মনের। কিন্তু পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তিতেও পভ মানুষকে হারাইয়া দেয়। কোন্ মানুষ কুরুরের ন্যায় শুধু গন্ধ অনুসরণ করিয়া একশত মাইল আর সকলের পথ ত্যাগ করিয়া একটি বিশিপ্ট জম্ভর পশ্চাৎ অভাতভাবে অনুসরণ ক্রিতে সমর্থ? বা পশুর ন্যায় অন্ধকারে দেখিতে পায় ? বা কেবল শ্রবণ দারা ৩°ত শব্দকারীকে বাহির করিতে পারে? Telepathy বা দূরে চিন্তাগ্রহণ সিদ্ধির কথা বলিয়া কোন এক ইংরাজী সংবাদ-পত্র বলিয়াছে, telepathy মনের প্রক্রিয়া, পশুর সেই সিদ্ধি আছে, মানুষের নাই, অতএব telepathy বিকাশে মানুষের উন্নতি না হইয়া অবনতি হইবে। স্থূলবুদ্ধি র্টনের উপযুক্ত তক বটে! অবশ্য মানুষ বুদ্ধিবিকাশের জন্য একাদশ ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ বিকাশে পরাখমুখ হইয়াছে, তাহা ভালই হইয়াছে, নচেৎ প্রয়োজনের অভাবে তাহার বুদ্ধিবিকাশ এত শীঘ্র হইত না। কিন্তু যখন সম্পূর্ণ ও নিখুঁত বুদ্ধিবিকাশ হইয়াছে, তখন একাদশ ইন্দিয়ের পুনবিকাশ করা মানবজাতির কর্ভব্য। ইহাতে বুদ্ধির বিচার্য্য জ্ঞান বিস্তারিত হইবে, মনুষ্যও মন এবং বুদ্ধির সম্পূর্ণ অনুশীলনে অভনিহিত দেবত্বপ্রকাশের উপযুক্ত পার হইবে। কোনও শক্তিবিকাশ অবনতির কারণ হইতে পারে না--কেবল শক্তির অবৈধ প্রয়োগে, মিথ্যা ব্যবহারে, অসামঞ্জস্য দোষে অবনতি সম্ভব। অনেক লক্ষণ দেখা যাইতেছে যাহাতে বোঝা যায় যে একাদশ ইন্দ্রিয়ের পুনবিকাশ, প্রাকাম্যের রৃদ্ধি আরম্ভ করিবার দিন আসিয়াছে।

NATIONALISM

পুরাতন ও নূতন

দেখিতেছি, আমরা দেশকে পুরাতনের কারাগার ভাঙ্গিয়া নূতনকে স্থাটি করিবার জন্যে ডাকিতেছি বলিয়া অনেকের মনে ক্রোধ, ভীতি ও আশঙ্কার উদ্রেক হইয়াছে। তাঁহাদের ধারণা পুরাতনই সবর্বমঙ্গল, নিখুঁত সত্য, পূর্ণ জ্ঞান ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্যের **অনিন্দনী**য় সমৃদ্ধিশালী কোষাগার, পুরাতনের বলিয়াই ভারতের ভারতীয়ত্ব। আমরা যাহারা ভগবানে ও ভাগবত শক্তির উপর অটল শ্রদ্ধা রাখিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে উদ্যত, অকুণ্ঠ সহেসে ভবিষ্যতের নৃতন আকার গড়িতে ইচ্ছুক, আমরা না কি যৌবনের মদে উন্মন্ত পাশ্চাত্য জানে পুল্ট উচ্ছৃ**খ্খল পথে**র প**থিক। পু**রাতনকে সরাইয়া নূতনের আগমন সহজ করা অতীব বিপজ্জনক, সর্ব্বনাশের পছা। পুরাতন যদি যায়, তবে ভারতের সনাতন ধর্ম্ম কোথায় রহিল ? পুরাতনকে আঁকড়িয়া থাকা শ্রেয়, সেই চিরন্তন মোক্ষপরতা, সেই অতুল্য কল্যাণকর মায়াবাদ, সেই অচল স্থিতিশীলতা, যাহা ভারতের একমাত্র সম্পদ। বলিতে পারিতাম, ভারতের, বিশেষ বঙ্গদেশের যে এখনকার অবস্থা, তাহা হইতে কি অধিক সক্রনাশ, কি অধিক শোচনীয় পরিণাম হইতে পারে, তাহা বোঝা বা কল্পনা করা দুষ্কর। পুরাতনকে আঁকড়িয়া যদি এই অবস্থাই হইল, তবে নৃতনের চেণ্টা করায় দোষ কি ? জাতির মৃত্যুর আশক্ষা উপস্থিত, পুরাতনের উপর ভর দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা ভাল না এই জাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতার জীবনের মুক্ত পথে বাহির হইবার প্রর্তিই শ্রেয়স্কর ? কিন্তু যাঁহারা আপত্তি করেন, তাঁহারা অনেকে পণ্ডিত চিভাশীল গণ্যমান্য ব্যক্তি, তাঁহাদের উজি এইক্রপে উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করি না। বরং আমাদের কথার তাৎপর্যা, আমাদের এই আহ্বানের গভীরতর তত্ত্ব্রাইবার চেপ্টা করি।

সনাতন ও পুরাতন এক নয়। সনাতন চিরকালের, যাহা ত্রিকালাতীত, যাহা অবিনশ্বর, যাহা সকল রাপান্তরের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিদ্যমান থাকে, যাহাকে দেখি বিনশ্যৎসু অবিনশ্যন্তং, তাহাই সনাতন। পুরাতন বলিয়া ভারতের ধর্ম্ম ও মূল চিন্তাকে আমরা সনাতন ধর্ম্ম সনাতন সভ্য বলি না। আআন্ভূতিলব্ধ সনাতন আত্মজান বলিয়া সেই চিন্তা, সনাতন ভানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সেই ধর্ম্ম সনাতন। পুরাতন সনাতনের একটি সময়োপযোগী রাপ মাত্র।

অতীতের সমস্যা

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় শতবর্ষ কাল পাশ্চাত্য ভাবের সম্পূর্ণ আধি-পত্যে ভারতবাসী আর্য্যজানে ও আর্য্যভাবে বঞ্চিত হইয়া শক্তিহীন, প্রাশ্রয়প্রবণ ও অনুকরণপ্রিয় হইয়া রহিয়াছিল। এই তামসিক ভাব এখন অপনোদিত হইতেছে। কেন ইহার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা একবার মীমাংস্য করা আবশ্যক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তামসিক অজ্ঞান ও ঘোর রাজসিক প্রবৃত্তি ভারতবাসীকে গ্রাস করিয়াছিল, দেশে সহস্র স্বার্থপর, কর্ত্তব্যপরাত্মুখ, দেশদ্রোহী, শক্তিমান অসুরপ্রকৃতি লোক জন্মগ্রহণ করিয়া পরাধীনতার অনুকূল অবস্থা প্রস্তুত করি-য়াছিল। সেই সময়ে ভগবানের গূঢ় অভিসন্ধি সম্পাদনার্থ ভারতে দূর দ্বীপাত্তর-বাসী ইংরাজ বণিকের আবিভাব হইয়াছিল। পাপভারার্ত্ত ভারতবর্ষ অনায়াসে বিদেশীর করতলগত হইল। এই অভুত কাণ্ড ভাবিয়া এখনও জগৎ আশ্চর্য্যান্বিত। ইহার কোনও সম্ভোষজনক মীমাংসা করিতে না পারিয়া সকলেই ইংরাজ জাতির গুণের অশেষ প্রশংসা করিতেছে। ইংরাজ জাতির অনেক ভণ আছে; না থাকিলে তাঁহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দিশ্বিজয়ী জাতি হইতে পারিতেন না। কিন্তু যাঁহারা বলেন ভারতবাসীর নিকৃষ্টতা, ইংরাজের শ্রেষ্ঠতা, ভারতবাসীর পাপ, ইংরাজের পূণা এই অভুত ঘটনার একমাত্র কারণ তাঁহারা সম্পূর্ণ দ্রান্ত না হইয়াও লোকের মনে কয়েকটি দ্রান্তধারণা উৎপাদন করিয়াছেন। অতএব এই বিষয়ের সূক্ষ অনুসন্ধানপূর্বাক নির্ভুল মীমাংসা করিবার চেল্টা করা যাউক। অতীতের সূক্ষ্ম সন্ধানের অভাবে ভবিষ্যতের গতি নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

ইংরাজের ভারত-বিজয় জগতের ইতিহাসে অতুলনীয় ঘটনা। এই রহৎ দেশ যদি অসভা, দুর্বল বা নির্বোধ ও অক্ষম জাতির বাসস্থান হইত, তাহা হইলে এইরাপ কথা বলা যাইত না। কিন্তু ভারতবর্ষ রাজপুত, মারাঠা, শিখ, পাঠান, মোগল প্রভৃতির বাসভূমি; তীক্ষুবৃদ্ধি বাসালী, চিন্তাশীল মান্দ্রাজী, রাজনীতিজ মহারাজীয় রাক্ষণ ভারতজননীর সন্তান। ইংরাজের বিজয়ের সময়ে নানা ফড়নবীসের ন্যায় বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্, মাধোজী সিধ্ধিয়ার ন্যায় যুদ্ধ-বিশারদ সেনাপতি, হায়দর আলি ও রঞ্জিত সিংহের ন্যায় তেজস্বী ও প্রতিভাশালী রাজ্য-নিশ্মাতা প্রদেশে প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অল্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবাসী তেজে, শৌর্যো, বুদ্ধিতে কোনও জাতির অপেক্ষা ন্যুন ছিলেন না। অল্টাদশ শতাব্দীর ভারত সরস্বতীর মন্দির, লক্ষ্মীর ভাতার, শক্তির ব্রীড়াস্থান ছিল। অথচ যে-দেশ প্রবল ও বর্জনশীল মুসলমান শত শত

বর্ষব্যাপী প্রয়াসে অতিকম্টে জয় করিয়া কখনও নিবিয়ে শাসন করিতে পারেন নাই, সেই দেশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে অনায়াসে মুফ্টিমেয় ইংরাজ বণিকের আধিপত্য স্বীকার করিল, শতবৎসরের মধ্যে তাঁহাদের একচ্ছন্ত সামাজ্যের ছায়ায় নিশ্চেম্টভাবে নিদ্রিত হইয়া পড়িল! বলিবে একতার অভাব এই পরি-ণামের কারণ। স্থীকার করিলাম, একতার অভাব আমাদের দুর্গতির একটি প্রধান কারণ বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে কোনও কালেও একতা ছিল না ৷ মহাভারতের সময়েও একতা ছিল না, চন্দ্রঙপত অশোকের সময়েও ছিল না, মুসলমানের ভারতবিজয়কালেও ছিল না, অল্টাদশ শতাব্দীতেও ছিল না। একতার অভাব এই অঙুত ঘটনার একমার কারণ হইতে পারে না। যদি বল, ইংরাজদিগের পুণ্য ইহার কারণ, জিজাসা করি যাঁহারা সেই সময়ের ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁহারা কি বলিতে সাহসী হইবেন যে, সেইকালের ইংরাজ বণিক সেইকালের ভারতবাসীর অপেক্ষা গুণে ও পুণ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন? যে ক্লাইভ ও ওয়ারেণ হেল্টিংস্ প্রমুখ ইংরাজ বণিক ও দস্যুগণ ভারতভূমি জয় ও লুগুন করিয়া জগতে অতুলনীয় সাহস, উদাম ও আঅভরিতা এবং জগতে অতুলনীয় দুগুঁণের দৃশ্টাভ দেখাইয়া গিয়াছেন, সেই নিষ্ঠুর, স্থার্থপর, অর্থলোলুপ, শক্তিমান অসুরগণের পুণ্যের কথা শ্রবণ করিলে হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর। সাহস, উদাম ও আত্মন্তরিতা অসুরের গুণ, অসুরের পুণা, সেই পুণা ক্লাইভ প্রভৃতি ইংরাজগণের ছিল। কিন্তু তাহাদের পাপ ভারতবাসীর পাপ অপেক্ষা কিছুমান ন্যুন ছিল না। অতএব ইংরাজের পুণ্যে এই অঘটন ঘটন হয় নাই।

ইংরাজও অসুর ছিলেন, ভারতবাসীও অসুর ছিলেন, তখন দেবে অসুরে যুদ্ধ হয় নাই, অসুরে অসুরে যুদ্ধ হইয়াছে। পাশ্চাত্য অসুরে এমন কি মহৎ ভুণ ছিল যাহার প্রভাবে তাঁহাদের তেজ, শৌর্য্য ও বুদ্ধি সফল হইল, ভারতবাসী অসুরে এমন কি সাংঘাতিক দোষ ছিল যাহার প্রভাবে তাঁহাদের তেজ শৌর্য্য ও বুদ্ধি বিফল হইল ? প্রথম উত্তর এই, ভারতবাসী আরসকল গুণে ইংরাজের সমান হইয়াও জাতীয়ভাবরহিত ছিলেন, ইংরাজের মধ্যে সেই গুণের পূর্ণ বিকাশ ছিল ; এই কথায় যেন কেহ না বুঝেন যে, ইংরাজগণ স্থদেশ-প্রেমিক ছিলেন, স্থদেশপ্রেমের প্রেরণায় ভারতে বিপুল সায়াজ্য গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্থদেশপ্রেম ও জাতীয়ভাব স্বতন্ত্র রুত্তি। স্বদেশপ্রেমিক স্বদেশের সেবাভাবে উন্মত, সর্ব্বন্ত স্বদেশকে দেখেন, সকল কার্য্য স্থদেশকে ইপ্টদেবতা বলিয়া যজ-রূপে সমর্পণ করিয়া দেশের হিতের জন্যই করেন, দেশের স্বার্থে আপনার স্বার্থ ডুবাইয়া দেন। অফ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজগণের সেই ভাব ছিল না; সেই ভাব কোন জড়বাদী পাশ্চাত্য জাতির প্রাণে স্থায়ীরূপে থাকিতে পারে না। ইংরাজগণ স্থদেশের হিতার্থে ভারতে আসেন নাই, স্থদেশের হিতার্থে ভারত-বিজয় করেন নাই, তাঁহারা বাণিজ্যার্থ, নিজ নিজ আথিক লাভার্থ আসিয়াছিলেন ; স্বদেশের হিতার্থে ভারত-বিজয় ও লু্ঠন করেন নাই, অনেকটা নিজ স্বার্থ সিদ্ধ্যর্থে জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু স্থদেশপ্রেমিক না হইয়াও তাঁহারা জাতীয়ভাবাপর ছিলেন। আমার দেশ শ্রেষ্ঠ, আমার জাতির আচার, বিচার, ধন্মর্ম, চরিত্র, নীতি, বল, বিক্রম, বুদ্ধি, মত, কম্ম উৎকৃষ্ট, অতুল্য এবং অন্য জাতির পক্ষে দুর্লভ—— এই অভিমান , আমার দেশের হিতে আমার হিত, আমার দেশের গৌরবে আমার গৌরব, আমার দেশ-ভাইয়ের র্দ্ধিতে আমি বদ্ধিত—এই বিশ্বাস ; কেবল আমার স্বার্থসাধন না করিয়া ভাহার সহিত দেশের স্বার্থ সম্পাদন করিব, দেশের মান, গৌরৰ ও রুদ্ধির জন্য যুদ্ধ করা প্রত্যেক দেশবাসীর কর্ত্ব্য, আবশ্যক হইলে সেই যদ্ধে নির্ভয়ে প্রাণবিসর্জন করা বীরের ধর্ম্ম, এই কর্ত্ব্যবুদ্ধি জাতীয় ভাবের প্রধান লক্ষণ। জাতীয় ভাব রাজসিক ভাব; স্বদেশপ্রেম সাত্ত্কি। যিনি নিজের "অহং" দেশের "অহং"-এ বিলীন করিতে পারেন, তিনি আদর্শ স্থদেশ-প্রেমিক, যিনি নিজের "অহং" সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া তাহার দারা দেশের "অহং" বদ্ধিত করেন, তিনি জাতীয়ভাবাপয়। সেই কালের ভারতবাসীরা জাতীয়– ভাবশূন্য ছিলেন। তাঁহারা যে কখনও জাতির হিত দেখিতেন না, এমন কথা বলি না, কিন্তু জাতির ও আপনার হিতের মধ্যে লেশমাত্র বিরোধ থাকিলে প্রায়ই জাতির হিত বর্জন করিয়া নিজ হিত সম্পাদন করিতেন। একতার অভাব অপেক্ষা এই জাতীয়তার অভাব আমাদের মতে মারাত্মক দোষ। পূর্ণ জাতীয় ভাব দেশময় ব্যাণত হইলে এই নানা ভেদসকুল দেশেও একতা সম্ভব; কেবল একতা চাই, একতা চাই বলিলে একতা সাধিত হয় নাঃ ইহাই ইংরাজের ভার্ত-বিজয়ের প্রধান কারণ। অসুরে অসুরে সংঘর্ষ হইল, জাতীয়ভাবাপর একতা-প্রাপ্ত অসুরগণ জাতীয়ভাবশূন্য একতাশূন্য সমানভণবিশিদ্ট অসুরগণকে পরাজিত করিলেন। বিধাতার এই নিয়ম, যিনি দক্ষ ও শক্তিমান তিনিই কুন্তিতে জয়ী হয়েন : যিনি ক্ষিপ্রগতি ও সহিষ্ণু তিনিই দৌড়ে প্রথম গভব্যস্থানে পৌছেন । সচ্চরিত্র বা পুণ্যবান বলিয়া কেহ দৌড়ে বা কুন্তিতে জয়ী হন নাই, উপযুক্ত শক্তি আবশ্যক। তেমনই জাতীয়ভাবের বিকাশে দুব্র্ত ও আসুরিক জাতিও সামাজ্য-স্থাপনে সক্ষম হয়, জাতীয়ভাবের অভাবে সচ্চরিত্র ও গুণসম্পন্ন জাতিও পরাধীন হইয়া শেষে চরিত্র ও গুণ হারাইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

রাজনীতির দিক দেখিলে ইহাই ভারত-বিজয়ের শ্রেষ্ঠ মীমাংসা; কিন্তু ইহার মধ্যে আরও গভীর সত্য নিহিত আছে। বলিয়াছি, তামসিক অজানও রাজসিক প্রবৃত্তি ভারতে অতি প্রবল হইয়াছিল। এই অবস্থা পতনের অগ্রগামী অবস্থা। রজোওণসেবায় রাজসিক শক্তির বিকাশ হয়; কিন্তু অমিশ্র রজঃ শীয় তমোমুখী হয়, উদ্ধত শৃঙখলাবিহীন রাজসিক চেপটা অতি শীয় অবসয়ও শান্ত হইয়া অপ্রবৃত্তি, শক্তিহীনতা, বিষাদ ও নিশ্চেপটতায় পরিণত হয়। সত্ত্বমুখী হইলেই রজঃশক্তি স্থায়ী হয়। সাত্ত্বিক ভাব যদিও না থাকে, সাত্ত্বিক আদর্শ আবশ্যক; সেই আদর্শ দারা রজঃশক্তি শৃঙখলিত ও স্থায়ী-বলপ্রাণত হয়। স্বাধীনতাও সুশৃঙখলতা ইংরাজের এই দুই মহান সাত্ত্বিক আদর্শ চিরকাল ছিল, তাহার বলে ইংরাজ জগতে প্রধান ও চিরজয়ী। উনবিংশ শতাব্দীতে পরোপকারলিপসাও জাতির মধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল, তাহার বলে ইংলণ্ড জাতীয়

মহজের চরমাবশ্বায় উপনীত হইয়াছিল। উপরস্ত য়ুরোপে যে ভানতৃষ্ণার প্রবল প্রেরণায় পাশ্চাত্য জাতি শত শত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়াছেন, কণামাত্র ভানলাভের জন্য শত শত লোক প্রাণ পর্যাভ দিতে সম্মত হন, সেই বলীয়সী সাত্ত্বিক জ্ঞানতৃষ্ণা ইংরাজ জাতির মধ্যে বিকশিত ছিল। এই সাত্ত্বিক শক্তিতে ইংরাজ বলবান ছিলেন, এই সান্ত্রিক শক্তি ফীণ হইতেছে বলিয়া ইংরাজের প্রাধান্য, তেজ ও বিক্রম ক্ষীণ হইয়া ভয়, বিষাদ ও আত্মশক্তির উপর অবিশ্বাস রুদ্ধি পাইতেছে। সাত্ত্বিক লক্ষ্যভ্রপট রজঃশক্তি তমোমুখী হইতেছে। অপরপক্ষে ভারতবাসীগণ মহান সাত্ত্বিক জাতি ছিলেন: সেই সাত্ত্বিক বলে জানে, শৌর্য্যে, তেজে, বলে তাঁহারা অতুলনীয় হইয়াছিলেন এবং একতাবিহীন হইয়াও সহস্র বর্ষকাল ধরিয়া বিদেশীর আক্রমণের প্রতিরোধ ও দমনে সমর্থ ছিলেন। শেষে রজোর্দ্ধি ও সভের হ্রাস হইতে লাগিল ৷ মুসলমানের আগ্মনকালে জানের বিস্তার সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তখন রজঃপ্রধান রাজপুতজাতি ভারতের সিংহাসনে অধিরাঢ়, উত্তর ভারতে যুদ্ধবিগ্রহ আত্মকলহের প্রাধান্য, বঙ্গদেশে বৌদ্ধধন্মের অবনতিতে তামসিকভাব প্রবল। অধ্যাত্মজান দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় লইয়াছিল; সেই সত্ত্বলে দক্ষিণ ভারত অনেকদিন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। জানতৃষ্ণা এবং জানের উন্নতি বন্ধ হইতে চলিল, তাহার স্থানে পাণ্ডিত্যের মান ও গৌরব বদ্ধিত হইল, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যোগশক্তি বিকাশ ও আভ্যন্তরিক উপলব্ধির স্থানে তামসিক পূজা ও সকাম রাজসিক রতোদ্যাপনের বাহল্য হইতে লাগিল, বর্ণাশ্রমধর্ম্য লুপত হইলে লোকে বাহ্যিক আচার ও ক্রিয়া অধিক মূল্যবান ভাবিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ জাতিধর্ম লোপেই গ্রীস, রোম, মিসর, আসিরিয়ার মৃত্যু হইয়াছিল ; কিন্ত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী আর্য্যজাতির মধ্যে সেই সনাতন উৎস হইতে মধ্যে মধ্যে সঞ্জীবনী সুধাধারা নির্গত হইয়া জাতির প্রাণরক্ষা করিত। শুকর, রামানুজ, চৈতন্য, নানক, রামদাস, তুকারাম সেই অমৃতসিঞ্চন করিয়া মরণাহত ভারতে প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন। অথচ রজঃ ও তমঃ স্রোতের এমন বল ছিল যে সেই টানে উত্তমও অধমে পরিণত হইল; সাধারণ লোকে শঙ্করদত জান দারা তামসিক ভাবের সমর্থন করিতে লাগিল, চৈতন্যের প্রেমধর্ম ঘোর তামসিক নিশ্চেষ্টতার আশ্রয়ে পরিণত হইল, রামদাসের শিক্ষাপ্রাণ্ড মহারাজুীয়গণ মহারাজুধেশ্ম বিস্মৃত হইয়া স্বার্থসাধনে ও আত্মকলহে শক্তির অপব্যবহার করিয়া শিবাজী ও বাজীরাওয়ের প্রতিষ্ঠিত সামাজ্য বিনপ্ট করিলেন। অপ্টাদশ শতাব্দীতে এই স্রোতের পূর্ণ বেগ দেখা গেল। সমাজ ও ধর্ম্ম তখন কয়েকজন আধুনিক বিধানকর্তার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ, বাহ্যিক আচার ও ক্রিয়ার আড়ম্বর ধর্ম নামে অভিহিত, আর্য্যক্তান লুপ্তপ্রায়, আর্য্যচরিত্র বিন্দটপ্রায়, সনাতন ধর্ম্ম সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া সম্যাসীর অরণ্যবাসে ও ভত্তের হাদয়ে লুকাইয়া রহিল। ভারত তখন ঘোর তমঃ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অথচ প্রচণ্ড রাজসিক প্রবৃত্তি বাহ্যিক ধম্মের আবরণে স্বার্থ, পাপ, দেশের অকল্যাণ, পরের অনিষ্ট পূর্ণবেগে সাধন করিতেছিল। দেশে শক্তির অভাব ছিল না, কিন্তু আর্য্যধশর্ম-লোপে, সত্ত্বলোপে সেই শক্তি আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া আত্মবিনাশ করিল। শেষে ইংরাজের আসুরিক শক্তির নিকট পরাজিত হইয়া ভারতের আসুরিক শক্তি শৃত্থলিত ও মুমূর্যু হইয়া পড়িল। ভারত পূর্ণ তমোভাবের ক্রোড়ে নির্দ্রিত হইয়া পড়িল। অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, অজ্ঞান, অকশর্মণ্যতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, আত্মসশ্মানবিসর্জন, দাসত্বপ্রিয়তা, পরধশর্মসেবা, পরের অনুকরণ, পরাশ্রয়ে আত্মোন্থতিচেপটা, বিষাদ, আত্মনিন্দা, ক্ষুদ্রাশয়তা, আলস্য ইত্যাদি সকলই তমোভাব প্রকাশক গুণ। এই সকলের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে কোনটির অভাব ছিল গৈসেই শতাব্দীর সর্ব্ব চেপ্টা এই গুণসকলের প্রাবল্যে তমঃশক্তির চিহ্নে সর্ব্বর্ত্ত চিহ্নিত।

ভুগবান যখন ভারতকে জাগাইলেন, তখন সেই জাগরণের প্রথম আবেগে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনার স্থালাময়ী শক্তি জাতির শিরায় শিরায় খরতরবেগে বহিতে লাগিল। তাহার সহিত স্বদেশপ্রেমের উন্মাদকর আবেগ যুবকর্ন্দকে অভিভূত করিল। আমরা পাশ্চাত্যজাতি নহি, আমরা এসিয়াবাসী, আমরা ভারতবাসী, আমরা আর্য্য। আমরা জাতীয়ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু তাহার মধ্যে স্থদেশপ্রেমের সঞ্চার না হইলে আমাদের জাতীয়ভাব পরিস্ফুট হয় না। সেই স্বদেশপ্রেমের ভিত্তি মাতৃপূজা। যেদিন বক্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গান বাহ্যেন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া প্রাণে আঘাত করিল, সেইদিন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগিল, মাতৃমুত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। স্থদেশ মাতা, স্বদেশ ভগবান, এই বেদান্ত-শিক্ষার অন্তর্গত মহতী শিক্ষা জাতীয় অভ্যুখানের বীজ-স্বরাপ। যেমন জীব ভগবানের অংশ, তাহার শক্তি ভগবানের শক্তির অংশ, তেমনই এই সপ্তকোটি বঙ্গবাসী, এই ভ্রিশকোটি ভারতবাসীর সম্পিট সর্কাব্যাপী বাসুদেবের অংশ, এই ত্রিশকোটির আশ্রয়, শক্তিস্বরাপিণী, বহুভুজান্বিতা, বহুবলধারিণী ভারত-জননী ভগবানের একটি শক্তি, মাতা, দেবী, জগজ্জননী কালীর দেহবিশেষ। এই মাতৃপ্রেম, মাতৃসৃত্তি জাতির মনে প্রাণে জাগরিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই কয় বর্ষের উত্তেজনা, উদ্যম, কোলাহল, অপমান, লাক্ছনা, নির্য্যাতন ভগবানের বিধানে বিহিত ছিল। সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার পরে কি?

তাহার পরে আর্য্য জাতির সনাতন শক্তির পুনরুদ্ধার। প্রথম আর্য্যচরিত্র ও শিক্ষা, দ্বিতীয় যোগশক্তির পুনবিকাশ, তৃতীয় আর্য্যাচিত জানতৃষ্ণা ও কর্ম্মশক্তির দ্বারা নব্যুগের আবশ্যক সামগ্রী সঞ্চয় এবং এই কয় বর্ষের উন্মাদিনী উত্তেজনা শৃত্থলিত ও স্থিরলক্ষ্যের অভিমুখী করিয়া মাতৃকার্য্যাদ্ধার। এখন যে-সব যুবকর্দ দেশময় পথাবেষণ ও কর্ম্মানেরষণ করিতেছেন, তাঁহারা উত্তেজনা অতিক্রম করিয়া কিছুদিন শক্তি আন্যানের পথ খুঁজিয়া লউন। যে মহৎ কার্য্য সমাধা করিতে হইবে, তাহা কেবল উত্তেজনার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, শক্তি চাই। তোমাদিগের পূর্বেপুরুষদের শিক্ষায় যে শক্তি প্রাপ্ত

অতীতের সমস্যা

586

হওয়া যায় সেই শক্তি অঘটনঘটনপটীয়সী। সেই শক্তি তোমাদের শরীরে অবতরণ করিতে উদ্যত হইতেছেন। সেই শক্তিই মা। তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবার উপায় শিখিয়া লও। মা তোমাদিগকে যন্ত্র করিয়া এত সত্বর, এমন সবলে কার্য্য সম্পাদন করিবেন যে, জগৎ স্তম্ভিত হইবে। সেই শক্তির অভাবে তোমাদের সকল চেল্টা বিফল হইবে। মাতৃমূন্তি তোমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, তোমরা মাতৃপূজা ও মাতৃসেবা করিতে শিখিয়াছ, এখন অভনিহিত মাতাকে আত্মসমর্পণ কর। কার্য্যোদ্ধারের অন্য পন্থা নাই।

দেশ ও জাতীয়তা

দেশ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা, জাতি নহে, ধর্ম্ম নহে, আর-কিছুই নহে, কেবল দেশ। আর-সকল জাতীয়তার উপকরণ গৌণ ও উপকারী, দেশই মুখ্য ও আবশ্যক। অনেক পরস্পরবিরোধী জাতি এক দেশে নিবাস করে, কখনও সন্তাব, একতা, মৈত্রী ছিল না, কিন্তু তাহাতে ভয় কি ? যখন এক দেশ, এক মা---একদিন একতা হইবেই হইবে, অনেক জাতির মিলনে এক বলবান অজেয় জাতিই হইবে। ধর্মমত এক নহে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে চির-বিরোধ, মিল নাই, মিলের আশাও নাই, তথাপি ভয় নাই, একদিন স্থদেশমতিধারিণী মায়ের প্রবল টানে ছলে বলে, সামে দণ্ডে দানে মিল হইবেই হইবে, সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা ছাতৃভাবে মাতৃপ্রেমে ডুবিয়া যাইবে। এক দেশে নানা ভাষা, ভাই ভাইয়ের কথা বুঝিতে অক্ষম, পরস্পরের ভাবে প্রবেশ করি না, হাদয়ে হাদয়ে আবদ্ধ হইবার পথে অভেদ্য প্রাচীর পড়িয়া রহিয়াছে, অতিকল্টে লখ্ঘন করিতে হয়, তথাপি ভয় নাই ; এক দেশ, এক জীবন, এক চিন্তার স্রোত সকলের মনে, প্রয়োজনের প্রেরণায় সাধারণ ভাষা স্তুট হইবেই হইবে, হয় বর্তমান একটি ভাষার আধিপত্য স্বীকৃত হইবে, নহে ত নূতন ভাষার স্পিট হইবে, মায়ের মন্দিরে সকলে সেই ভাষা ব্যবহার করিবে। এই সকল বাধায় চিরকাল আটকায় না, মায়ের প্রয়োজন, মায়ের টান, মায়ের প্রাণের বাসনা বিফল হয় না, তাহা সকল বাধা সকল বিরোধ অতিক্রম করে, বিনপ্ট করে, জয়ী হয়। এক মায়ের গর্ভে জন্ম হইয়াছে, এক মায়ের কোলে নিবাস করি, এক মায়ের পঞ্চভূতে মিশিয়া যাই, আন্তরিক সহস্র বিবাদ সত্ত্তে মায়ের ডাকে মিলিত হইব। প্রাকৃতিক নিয়ম এই, সর্ব্ব দেশের ইতিহাসের শিক্ষা এই, দেশ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা, সেই সম্বন্ধ অব্যর্থ, স্বদেশ থাকিলে জাতীয়তা অবশ্যন্তাবী। এক দেশে দুই জাতি চিরকাল থাকিতে পারে না, মিলিত হইবেই। অপর পক্ষে এক দেশ যদি না থাকে, জাতি, ধম্ম, ভাষা এক হউক, তাহাতে কোনও ফল নাই, একদিন স্বতন্ত্ৰ জাতির সৃষ্টি হইবেই। স্বতন্ত স্বতন্ত দেশ সংযুক্ত করিয়া এক রুহৎ সাম্রাজ্য করা যায়, এক র্হৎ জাতি হয় না। সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাগত হইলে আবার স্বতন্ত জাতি হয়, অনেকবার সেই অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক স্বতন্ত্রতাই সাম্রাজ্যনাশের করিণ হয়।

কিন্ত এই ফল অবশ্যভাবী হইলেও মানুষের চেপ্টায়, মানুষের বুদ্ধিতে বা বুদ্ধির অভাবে সেই অবশ্যভাবী প্রাকৃতিক ক্রিয়া সত্তরে বা বিলম্বে ফলবতী হয়। আমাদের দেশে কখনও একতা হয় নাই, কিন্তু চিরকাল একতার দিকে

টান ছিল, স্রোত ছিল, আমাদের ইতিহাসে ভারতের বিভিন্ন অঙ্গ এক করিবার জন্য আকর্ষণ করিয়াছে। এই প্রাকৃতিক চেস্টার কয়েকটি প্রধান অন্তরায় ছিল, প্রথম প্রাদেশিক বিভিন্নতা, দ্বিতীয় হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, তৃতীয় মাতৃ-দর্শনের অভাব ৷ দেশের রহৎ আকার, যাতায়াতের আয়াস ও বিলয়, ভাষার বিভিন্নতা প্রাদেশিক অনৈক্যের মুখ্য সহায়। শেষোক্ত অন্তরায় ভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সুবিধা দ্বারা আর-সকল অন্তরায় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু-মসলমান বিরোধ সত্ত্তে আকবর ভারতকে এক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ঔরংজেব নিকৃষ্ট বুদ্ধির বশ না হইলে কালের মাহায্যে, অভ্যাসের বশে, বিদেশীর আক্রমণের ভয়ে, যেমন ইংলণ্ডে কাথলিক ও প্রটেম্টান্ট, তেমনই ভারতে হিন্দু ও মুসলমান চিরকালের জন্য এক হইয়া যাইত। আঁহার বুদ্ধির দোষে বর্তমান কুটবুদ্ধি কয়েকজন ইংরাজ রাজনীতিবিদের প্ররোচনায় সেই বিরোধ প্রস্থলিত হইয়া আর নির্বাপিত হইতে চায় না। কিন্তু প্রধান অভরায় মাতৃদর্শনের অভাব। আমাদের রাজনীতিবিদ্গণ প্রায়ই মায়ের সম্পূর্ণ স্থরাপ দর্শন করিতে অসমর্থ ছিলেন। রণজিৎ সিংহ বা ভরুগোবিন্দ ভারতমাতা না দেখিয়া পঞ্চনদমাতা দেখিয়াছিলেন। শিবাজী ও বাজীরাও ভারতমাতা না দেখিয়া হিন্দুর মাতা দেখিয়াছিলেন। অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় রাজনীতিবিদ্ মহারাষ্ট্রমাতা দেখিয়াছিলেন। আমরাও বঙ্গভঙ্গের সময়ে বঙ্গমাতার দর্শনলাভ করিয়াছিলাম---সেই দর্শন অখণ্ডদর্শন, অতএব বঙ্গদেশের ভাবী একতা ও উন্নতি অবশ্যভাবী, কিন্তু ভারতমাতার অখণ্ডমূতি এখনও প্রকাশ হয় নাই। কংগ্রেসে যে ভারতমাতার পূজা নানারূপ স্তবন্ডোর করিতাম, সে কল্লিত, ইংরাজের সহচরী ও প্রিয় দাসী, স্লেচ্ছবেশভূষাসজ্জিত দানবী মায়া, সে আমাদের মা নহে, তাহার পশ্চাতে প্রকৃত মা নিবিড় অস্পদ্ট আলোকে লুক্লায়িত থাকিয়া আমাদের মনপ্রাণ আকর্ষণ করিতেন। যেদিন অখগুস্বরূপ মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিব, তাঁহার রূপলাবণ্যে মণ্ধ হইয়া তাঁহার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য উন্মন্ত হইব, সেদিন এ অন্তরায় তিরোহিত হইবে, ভারতের একতা, স্বাধীনতা ও উন্নতি সহজ্সাধ্য হইবে। ভাষার ভেদে আর বাধা হইবে না, সকলে স্ব স্থ মাতৃভাষা রক্ষা করিয়াও সাধারণ ভাষারূপে হিন্দী ভাষাকে গ্রহণ করিয়া সেই অভরায় বিনদ্ট করিব। হিন্দু-মুসলমান-ভেদের প্রকৃত মীমাংসা উভাবন করিতে পারিব। মাতৃ-দর্শনের অভাবে সেই অন্তরায়-নাশের বলবতী ইচ্ছা নাই বলিয়া উপায় উদ্ভাবিত হয় না, বিরোধ তীব্র হইতে চলিয়াছে। কিন্তু অখণ্ডস্বরাপ চাই, যদি হিন্দুর মাতা, হিন্দু জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা বলিয়া মাতৃদর্শনের আকাৎক্ষা পোষণ করি, সেই পুরাতন এমে পতিত হইয়া জাতীয়তার পূর্ণ বিকাশে বঞ্চিত হইব।

স্বাধীনতার অর্থ

ষাধীনতা আমাদের রাজনীতিক চেপ্টার উদ্দেশ্য, কিন্তু স্বাধীনতা কি, তাহা লইয়া মতভেদ বর্তুমান। আনেকে স্বায়ত্তশাসন বলেন, অনেকে ঔপনিবেশিক স্বরাজ বলেন, অনেকে সম্পূর্ণ স্বরাজ বলেন। আর্য্য ঋষিগণ সম্পূর্ণ ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা এবং তৎফলস্বরূপ অক্ষুণ্ণ আনন্দকে স্বারাজ্য বলিতেন। রাজনীতিক স্বাধীনতা স্বারাজ্যের একমাত্র অন্তল—তাহার দুইদিক আছে, বাহ্যিক স্বাধীনতা ও আন্তরিক স্বাধীনতা। বিদেশীয় শাসন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি বাহ্যিক স্বাধীনতা, প্রজাতন্ত্র আন্তরিক স্বাধীনতার চরম বিকাশ। যতদিন পরের শাসন বা রাজত্ব থাকে, ততদিন কোন জাতিকে স্বরাজপ্রাপ্ত স্বাধীন জাতি বলে না। যতদিন প্রজাতন্ত্র সংস্থাপন না হয়, ততদিন জাতির অন্তর্গত প্রজাকে স্বাধীন মনুষ্য বলে না। আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, বিদেশীর আদেশ ও বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি, স্বগৃহে প্রজার সম্পূর্ণ আধিপত্য, ইহাই আমাদের রাজনীতিক লক্ষ্য।

এই আকাঙ্ক্ষার কারণ সংক্ষেপে বলিব ৷ জাতির পক্ষে পরাধীনতা মৃত্যুর দৃত ও আঞাবাহক, স্বাধীনতায়ই জীবনরক্ষা, স্বাধীনতায়ই উন্নতির সম্ভাবনা। স্বধশর্ম অর্থাৎ স্থভাবনিয়ত জাতীয় কশর্ম ও চেপ্টা জাতীয় উল্লতির একমাত্র পত্না । বিদেশী যদি দেশ অধিকার করিয়া অতি দয়ালু ও হিতৈষীও হন, তাহা হইলেও আমাদের মস্তকে পরধম্মের ভার চাপাইতে ছাড়িবেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহাতে আমাদের অহিত ভিন্ন হিত হইবে না। পরের স্বভাবনিয়ত পথে অগ্রসর হইবার শক্তি ও প্রেরণা আমাদের নাই, সেই পথে গেলে আমরা অতি সুন্দর রূপে পরের অনুকরণ করিতে পারি, পরের উন্নতির লক্ষণ ও বেশভূষায় অতি দক্ষতার সহিত স্বীয় অবনতি আচ্ছাদন করিতে পারি, কিন্তু পরীক্ষাকালে আমাদের পর্ধশর্মসেবাসভূত দুর্ব্বলতা ও অসারতা বিকাশ পাইবে। আমরাও সেই অসারতার ফলে বিনাশপ্রা**ণ্ড হইব**। রোমের আধিপত্যভুক্ত, রোমের সভ্যতাপ্রাপ্ত প্রাচীন য়ুরোপীয় জাতিসকল অনেকদিন সুখস্থক্দদে কাটাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের শেষ অবস্থা অতি ভয়ানক হইল, মনুষ্যত্ব বিনাশে তাঁহাদের যে ঘোর দুর্দশা হইল, প্রত্যেক পরাধীনতা– পরায়ণ জাতির সেই মনুষ্যত্ব-বিনাশ ও ঘোর দুর্দ্দশা অবশ্যস্তাবী। পরাধীনতার প্রধান ভিত্তি জাতির স্থধন্মনাশ ও প্রধন্ম্সেবা, যদি প্রাধীন অবস্থায় স্থধন্ম্ রক্ষা করিতে বা পুনরুজীবিত করিতে পারি, পরাধীনতার বন্ধন আপনি খসিয়া পড়িবে, ইহা অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম। অতএব কোন জাতি যদি নিজদোষে প্রাধীনতায় পতিত হয়, অবিকল ও পূর্ণাঙ্গ স্থরাজ তাহার প্রথম উদ্দেশ্য ও রাজনীতিক আদর্শ হওয়া উচিত। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন স্বরাজ নয়, তবে যদি বিনা সর্ত্তে সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয় এবং জাতি আদর্শদ্রত্ট ও স্বধশর্মদ্রতট না হয়, স্বরাজের অনুকূল ও পূক্বিতী অবস্থা হইতে পারে বটে। এখন কথা উঠিয়াছে, রটিশ সামাজ্যের বাহিরে স্বাধীনতার আশা পোষণ করা ধ্স্টতার পরিচায়ক ও রাজ্লোহসূচক, যাঁহারা ঔপনিবেশিক স্বায়তশাসনে সম্ভুষ্ট নন, তাঁহারা নিশ্চয় রাজদ্রোহী, রাষ্ট্রবিপ্লবকারী ও সক্ষবিধ রাজনীতিক কার্য্যে বর্জনীয়। কিন্তু সেইরাপ আশা বা আদর্শের সহিত রাজদ্রোহের কোন সম্বন্ধ নাই। ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে বড় বড় ইংরাজ রাজনীতিবিদ্ বলিয়া আসিতেছেন যে, এইরাপ স্বাধীনতা ইংরাজ রাজপুরুষদেরও লক্ষ্য,এখনও ইংরাজ বিচারকগণ মুজকণ্ঠে বলিতেছেন যে, স্বাধীনতা আদর্শের প্রচার ও স্বাধীনতালাভের বৈধ চেল্টা আইনসঙ্গত ও দোষশূন্য। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা র্টিশ সাম্রাজ্যের বহির্গত বা অন্তর্গত হইবে, সেই প্রশ্নের মীমাংসা জাতীয় পক্ষ কশ্বন আবশ্যক মনে করেন না। আমরা পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ চাই। যদি র্টিশ জাতি এমন যুক্ত সামাজ্যের ৰাবস্থা করে যে, তাহার অভর্ভুক্ত হইয়া ভারতবাসীর সেইরূপ স্থরাজ সম্ভব হয় আপত্তি কি ? আমরা ইংরাজ জাতির বিদ্বেষে স্থরাজ চেল্টা করিতেছি না, দেশরক্ষার জন্য করিতেছি। কিন্তু আমরা পূর্ণাস স্বরাজ ভিন্ন অন্য আদর্শ স্থীকার করিয়া দেশবাসীকে মিখ্যা রাজনীতি ও দেশরক্ষার ভুল মার্গ প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত নহি।

সমাজের কথা

মানুষের জন্ম সমাজের জন্য নয়, সমাজ মানুষের জন্য স্লট। যাঁহারা মানুষের অভঃস্থ ভগবানকৈ ভুলিয়া সমাজকে বড় করিয়া তোলেন, তাঁহারা অপদেবতার পূজা করেন। অযথা সমাজপূজা মনুষ্য-জীবনের কৃষ্মিতার লক্ষণ, স্বধন্মের বিকৃতি।

মানুষ সমাজের নয়, মানুষ ভগবানের। যাঁহারা সমাজের দাসত্ব, সমাজের বছ বাহ্যিক শৃত্থল মানুষের আজায় মনে প্রাণে চাপাইয়া তার অভঃস্থ ভগবানকে থকা করিবার চেল্টা করেন, তাঁহারা মনুষ্যজাতির- প্রকৃত লক্ষ্য হারাইয়া বসিয়াছেন। এই অত্যাচারের দোষে অভনিহিত দেবতা জাগ্রত হয় না; শক্তিও ঘুমাইয়া পড়ে। দাসত্বই যদি করিতে হয়, সমাজের নয়, ভগবানের দাস্য স্বীকার কর। সেই দাস্যে মাধুষ্যও আছে, উন্নতিও আছে। প্রম আনন্দ, বন্ধনেও মুক্তি, অবাধ স্বাধীনতা তাহার চরম পরিণাম।

সমাজ উদ্দেশ্য হইতে পারে না, সমাজ উপায়, যন্ত। মানুষের আজ-প্রণোদিত কর্ম্মস্টুরিত ভগবংগঠিত জান ও শক্তি জীবনের প্রকৃত নিয়ন্তা, যাহার উত্তরোত্তর রিদ্ধি জীবনের আধ্যাত্মিক ক্লমবিকাশের উদ্দেশ্য। এই জান, এই শক্তি সমাজরূপ যন্তকে চালাইবে, সমাজকে গঠন করিবে, প্রয়োজনমত বদলাইয়াও দিবে, ইহাই স্থাভাবিক অবস্থা। নিশ্চল স্থগিত সমাজ মৃত মনুষ্যত্বের কবর হইয়া যায়, জীবনের স্ফুরণে জানশক্তির বিকাশে সমাজেরও রূপান্তর অবশ্যন্তাবী। সমাজযন্তের মধ্যে সহস্তবদ্ধনে বহু মানুষকে ফেলিয়া পেষণ করায় নিশ্চলতা ও অবনতি অনিবার্য্য।

আমরা মানুষকে ছোট করিয়া সমাজকে বড় করিয়াছি। সমাজ কিন্তু তাহাতে বড় হয় না, ক্ষুদ্র নিশ্চল ও নিক্ষল হয়। আমরা সমাজকে উত্রোত্তর উন্নতির উপায় নহে, নিগ্রহ ও বন্ধন করিয়া ফেলিয়াছি, ইহাই আমাদের অবনতির, নিশ্চেপ্টতার, নিরুপায় দুর্ব্বলতার কারণ। মানুষকে বড় কর, অভঃস্থ ভগবান যেখানে গুণ্তভাবে বিরাজমান সেই মন্দিরের সিংহ্ছার খুলিয়া দাও, সমাজ আপনিই মহান, সক্রাসসুন্দর, উন্মুক্ত উচ্চাশায় প্রয়াসের সফল ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইবে।

ভ্রাতৃত্ব

আধুনিক সভাতার যে তিন আদর্শ বা চরম উদ্দেশ্য ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল, আমাদের ভাষায় সাধারণতঃ এই তিন তত্ত্ব—স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু পাশ্চাতা ভাষায় যাহাকে fraternity বলে, তাহা মৈত্রী নহে। মৈত্রী মনের ভাব; যে সর্ব্বভূতের কল্যাণ ইচ্ছা করে, কাহারও অনিষ্ট করে না, সেই দয়াবান, অহিংসাপরায়ণ সর্ব্বভূতহিতরত পুরুষকে "মিত্র" বলে, মৈত্রী তাহার মনের ভাব। এইরূপ ভাব ব্যক্তির মানসিক সম্পত্তি,—ব্যক্তির জীবন ও কম্ম নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে; এই ভাব রাজনীতিক বা সামাজিক শৃত্খলার মুখ্য বন্ধন হওয়া অসম্ভব। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের তিন তত্ত্ব ব্যক্তিগত জীবনের নৈতিক নিয়ম নহে, সমাজ ও দেশের ব্যবস্থার নবগঠনোপ্যোগী সূত্রহা, সমাজের, দেশের বাহ্য অবস্থিতিতে প্রকাশোলুখ প্রাকৃতিক মূলতত্ত্ব। Fraternity—র অর্থ ভাতৃত্ব।

ফরাসী বিপ্লবকারিগণ রাজনীতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ও সাম্য লাভের জন্য লালায়িত ছিলেন, প্রাত্ত্বের উপর তাঁহাদের দৃঢ় লক্ষ্য ছিল না, প্রাত্ত্বের অভাব ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের অসম্পূর্ণতার কারণ। সেই অপূর্ব্ব উপানে রাজনীতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা মূরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়, রাজনীতিক সামাও কতক পরিমাণে কয়েক দেশে শাসনতন্ত্র ও আইনপদ্ধতিকে অধিকার করে। কিন্তু প্রাত্ত্বের অভাবে সামাজিক সাম্য অসম্ভব, প্রাত্ত্বের অভাবে মূরোপ সামাজিক সাম্যে বিশ্বত হয়। এই তিন মূলতন্ত্বের পূর্ণবিকাশ পরস্পরের বিকাশের উপর নির্ভর করে, সাম্য স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা, সাম্যের অবর্ত্তমানে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। প্রাত্ত্ব সামারের প্রতিষ্ঠা, প্রাত্ত্বের অবর্ত্তমানে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। প্রাত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, প্রাত্ত্বের অবর্ত্তমানে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। প্রাত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, প্রাত্ত্বের অবর্ত্তমানে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। প্রাত্ত্বের প্রতিষ্ঠিত, অসম্পূর্ণ—এইজন্য মূরোপে গণ্ডগোল ও বিপ্লব নিত্য অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই গণ্ডগোল ও বিপ্লবকে মূরোপ সগর্বের্ব progress বা উরতি বলে।

য়ূরোপের যেটুকু স্থাত্ভাব, তাহা দেশ লইয়া—একদেশের লোক, হিতাহিত এক, একডায় জাতীয় স্বাধীনতা নিরাপদ থাকে—এই জান য়ূরোপের একত্বের হেডু। তাহার বিরুদ্ধে আর-একটি জান দখায়মান হইয়াছে, সে এই—অামরা সকলে মানুষ, মানুষ সকলে এক হওয়া উচিত, মানুষে মানুষে ভেদ অজান-প্রসূত, অনিল্টকর; জাতীয়তা ভেদের কারণ, জাতীয়তা অজানপ্রসূত, অনিল্ট- কারক, অতএব জাতীয়তাকে বর্জন করিয়া মনুষ্যজাতির একত্ব প্রতিষ্ঠিত করি। বিশেষতঃ যে ফ্রান্সে স্বাধীনতা, সাম্য ও প্রাচ্ত্বরূপ মহান্ আদর্শ প্রথম প্রচারিত হয়, সেই ভাবপ্রবণ দেশে এই দুই পরস্পরবিরোধী জ্ঞানের সংঘর্ষ চলিতেছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এই দুই জ্ঞান ও ভাব পরস্পরবিরোধী নহে। জাতীয়তাও সত্য, মানবজাতির একতাও সত্য, দুই সত্যের সামঞ্জস্যেই মানবজাতির কল্যাণ; যদি আমাদের বৃদ্ধি এই সামঞ্জস্যে অসমর্থ হয়, অবিরোধী তত্ত্বের বিরোধে আসক্ত হয়, সেই বৃদ্ধিকে প্রান্ত রাজসিক বৃদ্ধি বলিতে হয়।

সামাশনা রাজনীতিক ওসামাজিক স্বাধীনতার উপর বিতৃষ্ণ হইয়া যুরোপ এখন সোশিয়ালিজমের দিকে ধাবিত হইয়াছে। দুই দল হইয়াছে, এনাকিস্ট ও সোশালিপ্ট। এনাকিপ্ট বলে,--এই রাজনীতিক স্বাধীনতা মায়া, গভর্ণমেন্ট বলিয়া বড় লোকের অত্যাচারের যন্ত স্থাপন করিয়া রাজনীতিক স্বাধীনতা রক্ষার অজুহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দলন করা এই মায়ার লক্ষণ, অতএব সক্রিকার গ্রুণ্মেন্ট উঠাইয়া দাও, প্রকৃত স্বাধীনতা স্থাপন কর[়]। গ্রুণ্মেন্টের অবর্ত্তমানে কে স্বাধীনতা ও সাম্য রক্ষা করিবে, বলবানের অত্যাচার নিবারণ করিবে, এই আপত্তির উত্তরে এনাকিপ্ট বলে, শিক্ষাবিস্তারে সম্পূর্ণ জ্ঞান ও ল্লাত্ভাব বিস্তার কর, জান ও ল্লাত্ভাব স্বাধীনতা ও সাম্য রক্ষা করিবে, যদি কেহ দ্রাতৃভাব উল্লখ্যন করিয়া অত্যাচার করে, তাহাকে যে-সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারে। সোশালিস্ট এই কথা বলে না; সে বলে, গভর্ণমেন্ট থাকুক, গ্রভর্ণমেন্টের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সমাজ ও শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠা করি, এখন যে সমাজের ও শাসনতন্ত্রের দোষ আছে, সেই সকল সংশোধিত হইবে, মানবজাতি সম্পূর্ণ <mark>সুখী, স্বাধীন ও ভ্রাতৃভাবাপন্ন হইবে</mark>। সেইজন্য সোশালিপ্ট সমাজকে এক করিতে চায়: ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকিয়া সমাজের সম্পত্তি যদি থাকে--যেমন একান্নবর্তী পরিবারের সম্পত্তি, কোন ব্যক্তির নহে, পরিবারের, পরিবারই দেহ, ব্যক্তি সে দেহের অঙ্গ––তাহা হইজে সমাজে ভেদ থাকিবে না, সমাজ এক হইবে।

এনাকিপেটর ভুল, দ্রাতৃভাব স্থাপিত হইবার পূর্বের গভর্গমেন্ট বিনাশের চেপ্টা। সম্পূর্ণ দ্রাতৃভাব হইবার অনেক বিলম্ব আছে, ইতিমধ্যে শাসনতন্ত উঠানর নিশ্চিত ফল ঘোর অরাজকতায় পশুভাবের আধিপত্য। রাজা সমাজের কেন্দ্র, শাসনতন্ত স্থাপনে মনুষ্য পশুভাব এড়াইতে সক্ষম। যখন সম্পূর্ণ দ্রাতৃভাব স্থাপিত হইবে, তখন ভগবান, কোনও পাথিব প্রতিনিধি নিযুক্ত না করিয়া স্বয়ং পৃথিবীতে রাজ্য করিয়া সকলের হাদয়ে সিংহাসন পাতিয়া বসিবেন, খুপ্টানদের Reign of the Saints সাধুদের রাজ্য, আমাদের সত্যযুগ স্থাপিত হইবে। মনুষাজাতি এত উন্নতি লাভ করে নাই যে, এই অবস্থা শীদ্র হইতে পারে, কেবল এই অবস্থার আংশিক উপলব্ধি সম্ভব।

সোশালিপেটর ভুল দ্রাতৃত্বের উপর সাম্য প্রতিষ্ঠিত না করিয়া সাম্যের উপর দ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেপ্টা। সাম্যহীন দ্রাতৃত্ব সম্ভবঃ দ্রাতৃত্বহীন সাম্য টিকিতে পারে না, মতভেদে, কলহে, আধিপত্যের উদ্দাম লালসায় বিনস্ট হইবে। প্রথম সম্পূর্ণ দ্রাতৃত্ব, পরে সম্পূর্ণ সামা।

দ্রাতৃত্ব বাহিরের অবস্থা—দ্রাতৃভাবে যদি থাকি, সকলের এক সম্পত্তি, এক হিত, এক চেপ্টা যদি থাকে, তাহাকেই ল্রাতৃত্ব বলে। বাহিরের অবস্থা অন্তরের ভাবে প্রতিষ্ঠিত। ল্রাতৃপ্রেমে ল্রাতৃত্ব সজীব ও সত্য হয়। সেই ল্রাতৃপ্রেমেরও প্রতিষ্ঠা চাই। আমরা এক মায়ের সন্তান, দেশভাই, এই ভাব একরাপ ল্রাতৃপ্রেমের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু সেই ভাব রাজনীতিক একতার বন্ধন হয়, তাহাতে সামাজিক একতা হয় না। আরও গভীর স্থানে প্রবেশ করিতে হয়, যেমন নিজের মাকে অতিক্রম করিয়া সকলে দেশভাইয়ের মাকে উপাসনা করি, সেইরাপ দেশকে অতিক্রম করিয়া জগজ্জননীকে উপলব্ধি করিতে হয়। খণ্ড শক্তিকে অতিক্রম করিয়া সম্পূর্ণ শক্তিতে প্রোঁছিতে হয়। কিন্তু যেমন ভারতজননীর উপাসনায় শরীরের জননীকে অতিক্রম করিয়াও বিস্মৃত হই না, তেমনই জগজ্জননীর উপাসনায় ভারতজননীকে অতিক্রম করিয়াও বিস্মৃত হইব না। তিনিও কালী, তিনিও মা।

ধর্ম্মই দ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা । সকল ধর্ম্ম এই কথা বলে যে, আমরা এক, ভেদ অজ্ঞানপ্রসূত, দ্বেষপ্রসূত। প্রেম সকল ধম্মের মূল শিক্ষা। আমাদের ধর্মাও বলে, আমরা সকলে এক, ভেদবুদ্ধি অজ্ঞানের লক্ষণ, জানী সকলকে সমান চক্ষে দেখিবেন, সকলের মধ্যে এক আত্মা, সমভাবে প্রতিষ্ঠিত এক নারায়ণ দর্শন করিবেন। এই ভজিপূর্ণ সমতা হইতে বিশ্বপ্রেমের উৎপত্তি হয়। কিন্ত এই জান মানবজাতির পরম গভব্যস্থান আমাদের শেষ অবস্থায় স্ক্রিয়াপী হইবে, ইতিমধ্যে তাহার আংশিক উপলব্ধি করিতে হয়, অন্তরে, বাহিরে, পরিবারে, সমাজে, দেশে, সর্বভূতে। মানবজাতি পরিবার, কুল, দেশ, সম্প্রদায় প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া শাস্ত্র বা নিয়মের বন্ধনে দৃঢ় করিয়া এই দ্রাতৃত্বের স্থায়ী আধার গঠন করিতে চিরকাল প্রয়াসী। এই পর্যান্ত সেই চেম্টা বিফল হই-য়াছে। প্রতিষ্ঠা আছে, আধার আছে, কিন্তু প্রাতৃত্বের প্রাণরক্ষক অক্ষয় কোন শক্তি চাই, যাহাতে সেই প্রতিষ্ঠা অকুগ্ল, সেই আধার চিরস্থায়ী বা নিত্য নূত্ন হইয়া থাকে। ভগবান এখনও সেই শক্তি প্রকাশ করেন নাই। তিনি রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণরূপে অবতীণ হইয়া মানবের কঠোর স্বার্থপূর্ণ হাদয়ে প্রেমের উপযুক্ত পাল্ল হইবার জন্য প্রস্তুত করিতেছেন। কবে সেই দিন আসিবে যখন তিনি আবার অবতীর্ণ হইয়া চিরপ্রেমানন্দ মানবহাদয়ে সঞ্চারিত ও স্থাপিত করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গতুলা করিবেন?

ভারতীয় চিত্রবিদ্যা

আমাদের এই ভারতজননী যে জানের, ধম্মের, সাহিত্যের শিশ্বের অক্ষয় আকর ছিল, তাহা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সকল জাতিই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু পূর্কে য়ূরোপের এই ধারণা ছিল যে, আমাদের যেমন উচ্চ দরের সাহিত্য ও শিল্প ছিল, ভারতীয় চিত্রবিদ্যা তেমন উৎকৃষ্ট ছিল না, বরং সে জঘন্য সৌন্দর্যাহীন ছিল। আমরাও পাশ্চাত্য জানে জানী হইয়া চোখে য়ুরোপীয় চশমা পরিয়া ভারতীয় চিত্র ও স্থাপত্য দর্শনে নাক সিট্কাইয়া নিজ মাজিত বৃদ্ধি ও নির্দেষ রুচির পরিচয় দিতাম। আমাদের ধনীদের গৃহ গ্রীক প্রতিমা ও ইংরাজী ছবির cast-এ বা নিজীব অনুকরণে ভরিয়া গেল, সাধারণ লোকের বাড়ীর দেওয়াল জঘন্য তৈলচিত্রে শোভিত হইতে লাগিল। যে ভারতজাতির রুচি ও শিল্পচাতুর্য্য জগতে অপ্রতিম ছিল, বর্ণ ও রূপ গ্রহণে যে ভারতজাতির রুচি শ্বডাবতঃ নির্ভুল ছিল, সেই জাতির চোখ অন্ধ, বৃদ্ধি ভাবগ্রহণে অক্ষম, রুচি ইতালীয় কুলী–মজুরের রুচি হইতে অধম হইলঃ রাজা রবিবস্মা ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রকার বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারিলেন। সম্প্রতি কয়েকজন রসজ্ঞ ব্যক্তির উদ্যমে ভারতবাসীর চোখ খুলিতেছে, নিজের ক্ষমতা, নিজের ঐথর্যা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত অবনীন্তনাথ ঠাকুরের অসাধারণ প্রতিভার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া কয়েকজন যুবক লুগত ভারতীয় চিল্লবিদ্যার পুনরুদার করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতিভার খণে বঙ্গদেশে নৃত্ন যুগের সূচনা হইতেছে। ইহার পরে আশা করা যায় যে, ভারত ইংরাজের চোখে না দেখিয়া নিজ চোখে দেখিবে, পাশ্চাত্যের অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া নিজ প্রাঞ্জল বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া আবার চিগ্রিত রূপ ও বর্ণে ভারতের সনাতন ভাব ব্যক্ত করিবে।

ভারতীয় চিত্রবিদ্যার উপর পাশ্চাত্যের বিভূষণার দুই কারণ আছে। তাঁহারা বলেন, ভারতীয় চিত্রকরগণ nature -এর অনুকরণ করিতে অক্ষম, ঠিক মানুষের মত মানুষ, ঘোড়ার মত ঘোড়া, গাছের মত গাছ না আঁকিয়া বিকৃত মূত্তি করেন, তাঁহাদের perspective নাই, ছবিগুলি চ্যাণ্টা ও অস্বাভাবিক বোধ হয়। দ্বিতীয় আপত্তি, এই সকল ছবিতে সুন্দর ভাব ও সুন্দর রূপের নিতান্ত অভাব। শেষোক্ত আপত্তি আর য়ুরোপীয়ের মুখে গুনা যায় না। আমাদের পুরাতন বুদ্ধমূত্তির অতুলনীয় শান্তভাব, আমাদের পুরাতন দুর্গান্মৃত্তিতে অপাথিব শক্তির প্রকাশ দেখিয়া য়ুরোপীয়গণ প্রীত ও স্থান্তিত হন। যাঁহারা বিলাতে শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলিয়া বিখ্যাত তাঁহারা স্থীকার করিয়াছেন

যে, ভারতীয় চিত্রকর মূরোপের perspective না জানুন, ভারতের যে perspective-এর নিয়ম তাহা অতি সুন্দর, সন্পূর্ণ ও সঙ্গত। ভারতীয় চিত্রকর ও অন্যান্য শিল্পী যে ঠিক বাহা জগতের অনুকরণ করেন না, ইহা সত্য। কিন্তু সামর্থোর অভাবে নহে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য বাহা দৃশ্য ও আকৃতি অতিক্রম করিয়া অভঃস্থ ভাব ও সত্য প্রকাশ করা। বাহা আকৃতি এই আভরিক সত্যের আবরণ, ছদ্মবেশ—সেই ছদ্মবেশের সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া আমরা যাহা ভিতরে লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহা গ্রহণ করিতে পারি না। অতএব ভারতীয় চিত্রকরগণ ইচ্ছা করিয়া বাহ্য আকৃতি বদলাইয়া আভরিক সত্য প্রকাশ করিবার উপযোগী করিলেন। তাঁহারা কি সুন্দরভাবে প্রত্যেক অঙ্গে এবং চতুদ্দিকের দৃশ্যে, আসনে, বেশে, মানসিক ভাব বা ঘটনার অন্তর্গত সত্য প্রকাশ করেন, তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। ইহাই ভারতীয় চিত্রের প্রধান গুণ, চরম উৎকর্ষ।

পাশ্চাত্য বাহিরের মিথ্যা অনুভব লইয়া ব্যস্ত, তাঁহারা ছায়ার ভক্ত: প্রাচ্য ভিতরের সত্য অনুসন্ধান করে, আমরা নিত্যের ভক্ত। পাশ্চাত্য শরীরের উপাসক, আমরা আত্মার উপাসক: পাশ্চাত্য নাম-রূপে অনুরক্ত, আমরা নিত্যবস্তু না পাইয়া কিছুতেই সম্ভণ্ট হইতে পারি না। এই প্রভেদ যেমন ধশ্মের, দশনে, সাহিত্যে—তেমনই চিত্রবিদ্যায় ও স্থাপত্যবিদ্যায় সক্রে প্রকাশ পায়।

হিরোবূমি ইতো

মানবজাতির মধ্যে দুই প্রকার জীব জন্মগ্রহণ করে। যাঁহারা আন্তে আন্তে ক্রমবিকাশের স্রোতে অগ্রসর হইয়া অন্তনিহিত দেবত প্রকাশ করিতেছেন. তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য। যাঁহারা সেই ক্রম-বিকাশের সাহায্যার্থে বিভূতিরূপে জনগ্রহণ করেন, তাঁহারা ঋতুর। তাঁহারা যে জাতির মধ্যে ও যে যুগে অবতরণ করেন, সেই জাতির চরিত্র ও আচার, সেই যুগের ধর্ম্ম গ্রহণপূর্কক ঐশ্বরিক শক্তি ও স্থভাবের বলে সাধারণ মানবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধন করিয়া জগতের গতি কিঞিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া ইতিহাসে অমর নাম রাখিয়া স্থলোক গমন করেন। তাঁহাদের কশর্ম ও চরিত্র মানুষের প্রশংসা ও নিন্দার অতীত। প্রশংসা করি বা নিন্দা করি, <mark>তাঁহা</mark>রা ভগবদ্-দত্ত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন ৷ মানব-জাতির ভবিষ্যৎ সেই কার্য্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া নিদ্দিষ্ট পথে খরস্রোতে বহিবে । সীজার, নেপোলিয়ান, আকবর, শিবাজী এইরূপ বিভূতি। জাপানের মহা-পুরুষ হিরোবূমি ইতোও এই শ্রেণীর ভুক্ত এবং যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলাম তাঁহাদের একজনও ভণে, প্রতিভায় বা কম্মের মহত্বে ও ভবিষ্যৎ ফলে ইতোর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। ইতোর ইতিহাসে ও জাপানের অভ্যুদয়ে, তাঁহার প্রধান স্থান সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু সকলেই না-ও জানিতে পারেন যে, ইতোই সেই অভ্যুদয়ের ক্রম, উপায় ও উদ্দেশ্য উদ্ভাবনা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত একা এই মহৎ পরিবর্তন করিয়াছেন, জাপানের আর সকল মহাপুরুষ তাঁহার হস্তের যন্ত্র মাত্র। ই**তোই** জাপানের ঐক্য, জাপানের স্বাধীনতা, জাপানের বিদ্যাবল, সৈন্যবল, নৌসেনাবল, অর্থবল, বাণিজ্য, রাজনীতি মনে কল্পনা করিয়া কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনিই ভাবী জাপানের সামাজ্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। যাহা করিয়াছেন, প্রায়ই অন্তরালে দাঁড়াইয়া করিয়াছেন। জার্ম্মাণীর কাইসার ওয়িলহেম বা বিলাতের লয়েড জর্জ যাহা করিতেছেন. যাহা ভাবিতেছেন, সমস্ত জগৎ তখনই তাহা জানিতে পারে। ইতো যাহা ভাবিতেছিলেন, যাহা করিতেছিলেন, কেহ জানিত না--যখন তাঁহার নিভূত কল্পনা ও চেল্টা ফলীভূত হইল, তখন জগৎ বিদিমত হইয়া বুঝিতে পারিল, ইহাই এতদিন প্রস্তুত হইতেছিল। অথচ কি প্রকাণ্ড কার্যা, কি অভূত প্রতিভা সেই কার্য্যে প্রকাশ পাইতেছে! যদি ইতো নিজে মনের কল্পনা করিতে অভ্যন্ত হইতেন, সমস্ত জগৎ পদে পদে তাঁহাকে উন্মত্ত অসাধ্য-সাধন-প্রয়াসী ও ব্যর্থ-স্বপ্নের অনুরক্ত idealist বলিয়া উপহাস করিত। কে বিশ্বাস করিত যে, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে জাপান দুর্লভ স্থাধীনতা রক্ষা করিয়া সমস্ত পাশ্চাত্য

সভ্যতা আয়ত্ত করিবে, ইংলণ্ড জার্ম্মাণী ফ্রান্সের সমকক্ষ প্রবল পরাক্রমশালী জাতি হইবে, চীনকে পরাভূত করিবে, রুশকে পরাভূত করিবে, দূর দেশ-বিদেশে জাপানী বাণিজা, জাপানী চিত্রকলা, জাপানী বৃদ্ধির প্রশংসা ও জাপানী সাহসের ভয় বিস্তার করিবে, কোরিয়া অধিকার করিবে, ফরমোজা অধিকার করিবে, রুহুও সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিবে, একতা, স্বাধীনতা, সামা, জাতীয় শিক্ষার চরম উন্নতি সাধিত করিবে। নেপোলিয়ন বলিতেন, আমার শব্দকোষে অসাধ্য কথা বাদ দিয়াছি। ইতো সেই কথা বলেন নাই, কিন্তু কার্য্যে তাহাই করিয়া-ছিলেন। মেপোলিয়নের কার্য্য অপেক্ষা ইতোর কার্য্য বড়। এইরূপ মহাপুরুষ হত্যাকারীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন, ইহাতে কাহারও দুঃখ করিবার নাই। যিনি জাপানের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, জাপানই যাঁহার চিন্তা, জাপানই যাঁহার উপাস্য দেবতা, তিনি জাপানের জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ইহা বড় সুশ্বের কথা, সৌভাগ্যের কথা, গৌরবের কথা। হতো বা প্রাণ্স্যাসি স্বর্গং, জিত্মা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। হিরোবুমি ইতোর ভাগ্যে এই দুইটি পরম ফল এক জীবনর্ক্ষে পাওয়া গেল।

জাতীয় উত্থান

আমাদের প্রতিপক্ষীয় ইংরাজগণ বর্তমান মহৎ ও সর্বব্যাপী আন্দোলনকে আরভাবধি বিদ্বেষজাত বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদের অনুকরণপ্রিয় কয়েকজন ভারতবাসীও এই মতের পুনরার্ডি করিতে গুটি করেন না। আমরা ধন্ম্প্রচারে প্রবৃত্ত, জাতীয় উত্থানস্বরূপ আন্দোলন ধন্ম্ম্র একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া তাহাতে শক্তিবায় করিতেছি। এই আন্দোলন যদি বিদেযজাত হয়, তাহা হইলে আমরা ইহা ধন্দের্মর অঙ্গ বলিয়া কখনও প্রচার করিতে সাহসী হইতাম না। বিরোধ, যুদ্ধ, হত্যা পর্যন্ত ধন্দের্মর অঙ্গ হইতে পারে; কিন্তু বিছেষ ও ঘূণা ধম্মের বহির্ভৃত ; বিছেষ ও ঘূণা জগতের ক্রমো-মতির বিকাশে বর্জনীয় হয়, অতএব যাঁহারা শ্বয়ং এই বুডিগুলি পোষণ করেন কিয়া জাতির মধ্যে জাগ্রত করিবার চেপ্টা করেন, তাঁহারা অঞ্জানের মোহে পতিত হইয়া পাপকে আশ্রয় দেন। এই আন্দোলনের মধ্যে কখনও যে বিদ্বেষ প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যখন এক পক্ষ বিদ্বেষ ও ঘূণা করে, তখন অপর পক্ষেও তাহার প্রতিঘাতস্বরূপ বিদেষ ও ঘূণা প্রসূত হওয়া অনিবার্য্য। এই রূপ পাপস্থিটর জন্য বঙ্গদেশের কয়েকটি ইংরাজ সংবাদ-পত্র ও উদ্ধত-স্বভাব অত্যাচারী ব্যক্তিবিশেষের আচরণ দায়ী। সংবাদ-পত্রে প্রতিদিন উপেক্ষা, ঘুণা ও বিদ্বেষসূচক তিরক্ষার এবং রেলে, রাস্তায়, হাটে, ঘাটে গালাগালি অপমান ও প্রহার পর্য্যন্ত অনেকদিন সহ্য করিয়া শেষে এই উপদ্রব-সহিষ্ণ ও ধীরপ্রকৃতি ভারতবাসীরও অসহ্য হয় এবং গালির বদলে ্গালি ও প্রহারের বদলে প্রহারের প্রতিদান আরম্ভ হয়। অনেক ইংরাজও তাঁহাদের দেশভাইদের এই দোষ ও অগুভদৃষ্টির দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উপরত্ত রাজপুরুষগণ দারুণ ভ্রমবশতঃ অনেক দিন হইতে প্রজার স্বার্থবিরোধী, অসভোষজনক ও মশর্মবেদনাদায়ক কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। মানুষের স্বভাব ক্রোধপ্রবণ, স্বার্থে আঘাত পড়ায়, অপ্রিয় আচরণে কিন্তা প্রাণের প্রিয় বস্তু বা ভাবের উপর দৌরাঅ্য করায় সেই সর্ব্বপ্রাণী-নিহিত ক্লোধবহিং জ্বলিয়া উঠে, ক্রোধের আতিশয্যে ও অন্ধর্গতিতে বিদ্বেষ ও বিদ্বেষজ্বাত আচরণও উৎপন্ন হয়। ভারতবাসীর প্রাণে বহুকাল হইতে ইংরাজ ব্যক্তিবিশেষের অন্যায় আচরণে ও উদ্ধত কথায় এবং বর্তুমান শাসনতন্তে প্রজার কোনও প্রকৃত অধিকার বা ক্ষমতা না থাকায় ভিতরে ভিতরে অসন্তোষ অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল। শেষে লর্ড কার্জনের শাসনসময়ে এই অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করিয়া বঙ্গভঙ্গজাত অসহা মর্ম্মবেদনায় অসাধারণ ক্রোধ দেশময় জ্বলিয়া উঠিয়া

রাজপুরুষদিগের নিগ্রহ-নীতির ফলে বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছিল। ইহাও স্বীকার করি যে, অনেকে ক্রোধে অধীর হইয়া সেই বিদ্বেষাগ্নিতে প্রচুর পরিমাণে ঘুতাহতি দিয়াছেন। ভগবানের লীলা অতি বিচিত্র, তাঁহার স্পিটর মধ্যে গুভ ও অশুভের দদ্ধে জগতের ক্রমোমতি পরিচালিত অথচ অশুভ প্রায়ই শুভের সহায়তা করে, ভগবানের অভীপসত মঙ্গলময় ফল উৎপাদন করে। এই পরম অশুভ যে বিদেষ সৃষ্টি, তাহারও এই শুভ ফল হইল যে, তমঃ-অভিভূত ভারতবাসীর মধ্যে রাজসিক শক্তি জাগরণের উপযোগী উৎকট রাজসিক প্রেরণা উৎপন্ন হইল ৷ তাই বলিয়া আমরা অত্তভের বা অত্তভকারীর প্রশংসা করিতে পারি না । যিনি রাজসিক অহঙ্কারের বশে অগুভ কার্য্য করেন, তাঁহার কার্য্য দারা ঈশ্বর-নিদ্দিল্ট শুভ ফলের সহায়তা হয় বলিয়া তাঁহার দায়িত্ব ও ফলভোগরাপ বন্ধন কিছুমাল ঘুচে না। যাঁহারা জাতিগত বিদেষ প্রচার করেন, তাঁহারা দ্রান্ত; বিদ্বেম-প্রচারে যে ফল হয়, নিঃস্থার্থ ধর্ম্ম-প্রচারে তাহার দৃশন্তণ ফল হয় এবং তাহাতে অধ্দৰ্ম ও অধ্দৰ্মজাত পাপফল ভোগ না হইয়া ধ্দৰ্ম র্দ্ধি ও অমিত্র পূণোর স্থিট হয়। আমরা জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘূণাজনক কথা লিখিব না, অপরকেও সেইরূপ অনর্থ-সৃষ্টি করিতে নিষেধ করিব। জাতিতে জাতিতে স্বার্থবিরোধ উৎপন্ন হইলে, বা বর্তমান অবস্থার অপরিহার্যা অঙ্গস্থরাপ হইলে, আমরা পরজাতির স্বার্থনাশে ও স্বজাতি-স্বার্থসাধনে আইনে ও ধর্ম্ম-নীতিতে অধিকারী। অত্যাচার বা অন্যায় কার্য্য ঘটিলে আমরা তাহার তীব উল্লেখে এবং জাতীয় শক্তির সংঘাত ও সর্ব্ববিধ বৈধ উপায় ও বৈধ প্রতিরোধ দারা তাহার অপনোদনে আইনে ও ধম্মনীতিতে অধিকারী ৷ কোনও ব্যক্তি-বিশেষ, তিনি রাজপুরুষই হউন বা দেশবাসীই হউন, অমঙ্গলজনক অন্যায় ও অযৌজিক কার্য্য বা মত প্রকাশ করিলে আমরা ভদ্রসমাজোচিত আচারের অবিরোধী বিদুপ ও তিরক্ষার করিয়া সেই কার্য্য বা সেই মতের প্রতিবাদ ও খণ্ডনে অধিকারী। কিন্তু কোনও জাতি বা ব্যক্তির উপর বিদ্বেষ বা ঘূণা পোষণ বা স্জনে আমরা অধিকারী নহি। অতীতে যদি এইরূপ দোষ ঘটিয়া থাকে, সে অতীতের কথা: ভবিষ্যতে যাহাতে এই দোষ না ঘটে আমরা সকলকে এবং বিশেষতঃ জাতীয় পক্ষের সংবাদপত্র ও কার্য্যক্ষম যুবকর্ন্দকে এই উপদেশ দিতেছি।

আর্যাক্তান, আর্য্যশিক্ষা, আর্য্য-আদর্শ জড়জানবাদী রাজসিক ভোগপরায়ণ পাশ্চাত্য জাতির জান, শিক্ষা ও আদর্শ হইতে স্বতন্ত। মূরোপীয়দের মতে স্বার্থ ও সুখান্বেষণের অভাবে কন্মর্ম অনাচরণীয়, বিদ্বেষের অভাবে বিরোধ ও যুদ্ধ অসম্ভব। হয় সকাম কন্মর্ম করিতে হয়, নচেৎ কামনাহীন সন্ন্যাসী হইয়া বসিতে হয়, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। জীবিকার্থ সংঘর্ষে জগৎ গঠিত, জগতের ক্রমোন্নতি সাধিত, ইহাই তাঁহাদের বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র। আর্যাগণ ষেদিন উত্তরমেক্র হইতে দক্ষিণে যাল্লা করিয়া পঞ্চনদভূমি অধিকার করিয়া-ছিলেন, সেইদিন হইতে এই সনাতন শিক্ষা লাভ করিয়া জগতে সনাতন প্রতিষ্ঠা

লাভও করিয়াছেন যে, এই বিশ্ব আনন্দধাম, প্রেম, সত্য ও শক্তি বিকাশের জন্য সক্রাপী নারায়ণ স্থাবর জন্সমে, মনুষ্য পশু কীট পতঙ্গে, সাধু পাপীতে, শন্তু মিরে, দেব অসুরে প্রকাশ হইয়া জগৎময় ক্রীড়া করিতেছেন। ক্রীড়ার জন্য সুখ, ক্রীড়ার জন্য দুঃখ, ক্রীড়ার জন্য পাপ, ক্রীড়ার জন্য পুণা, ক্রীড়ার জন্য বিষুত্ব, ক্রীড়ার জন্য শরুতা, ক্রীড়ার জন্য দেবত্ব, ক্রীড়ার জন্য অসুরত্ব। মিত্র শরু সকলই ক্রীড়ার সহচর, দুই পক্ষে বিভক্ত হইয়া স্থপক্ষ ও বিপক্ষ সৃষ্টি করিয়াছে। আর্য্য মিত্রকে রক্ষা করেন, শতুকে দমন করেন, কিন্তু তাঁহার আসক্তি নাই। তিনি সর্বান্ত, সর্বাভূতে, সর্বা বস্তুতে, সর্বা কম্মে, সর্বা ফলে নারায়ণকে দর্শন করিয়া ইল্টানিল্টে, শ্রুমিরে, সুখদুঃখে, পাপপুণ্যে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবাপর। ইহার এই অর্থ নহে যে সর্ব্ব পরিণাম তাঁহার ইষ্ট, সবর্ব জন তাঁহার মিল্ল, সবর্ব ঘটনা তাঁহার সুখদায়ক, সবর্ব কম্ম তাঁহার আচরণীয়, সবর্ব ফল তাঁহার বান্ছনীয়। সম্পূর্ণ যোগপ্রাণিত না হইলে দ্বন্দ ঘুচে না, সেই অবস্থা অল্পজনপ্রাপ্য, কিন্তু আর্য্যশিক্ষা সাধারণ আর্য্যের সম্পত্তি। আর্য্য ইল্ট-সাধনে ও অনিষ্টবর্জনে সচেষ্ট হয়েন কিন্তু ইষ্টলাভে জয়মদে মন্ত হন না, অনিপ্টসম্পাদনে ভীত হন না ৷ মিছের সাহায্য, শুরুর প্রাজয় তাঁহার চেপ্টার উদ্দেশ্য হয়, কিন্তু তিনি শ্রুকে বিদেষ ও মিব্রকে অন্যায় পক্ষপাত করেন না, কর্তব্যের অনুরোধে স্বজন-সংহারও করিতে পারেন, বিপক্ষের প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করিতে পারেন। সুখ তাঁহার প্রিয়, দুঃখ তাঁহার অপ্রিয় হয়, কিন্তু তিনি সুখে অধীর হন না, দুঃখেও তাঁহার ধৈর্য্য ও প্রীতভাব অবিচলিত হইয়া থাকে। তিনি পাপবর্জন ও পুণাসঞ্চয় করেন, কিন্তু পুণাকন্দের্ম গবিহত হয়েন না, পাপে পতিত হইলে দুর্বল বালকের ন্যায় ক্রন্দন করেন না, হাসিতে হাসিতে পক্ষ হইতে উঠিয়া কর্দমাক্ত শরীরকে মুছিয়া পরিষ্কার ও গুদ্ধ করিয়া পুনরায় আত্মোন্নতিতে সচেত্ট হয়েন। আর্য্য কর্ত্মসিদ্ধির জন্য বিপুল প্রয়াস করেন, সহস্র পরাজয়েও বিরত হন না, কিন্তু অসিদ্ধিতে দুঃখিত, বিমর্য বা বিরক্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে অধন্ম। অবশ্য যখন কেহ যোগারাঢ় হইয়া গুণাতীতভাবে কম্ম করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহার পক্ষে দ্বৰ শেষ হইয়াছে, জগন্মাতা যে কার্য্য দেন, তিনি বিনাবিচারে তাহাই করেন, যে ফল দেন, সানন্দে তাহা ভোগ করেন, স্থপক্ষ বলিয়া যাঁহাকে নিদ্দিপ্ট করেন, তাঁহাকে লইয়া মায়ের কার্য্য সাধন করেন, বিপক্ষ বলিয়া যাঁহাকে দেখান, তাঁহাকে আদেশমত দমন বা সংহার করেন। এই শিক্ষাই আর্য্যশিক্ষা। এই শিক্ষার মধ্যে বিদ্বেষ বা ঘূণার স্থান নাই। নারায়ণ সক্ষত্ত। কাহাকে বিদ্বেষ করিব, কাহাকে ঘূণা করিব ? আমরা যদি পাশ্চাতা ভাবে রাজনীতিক আন্দোলন করি, তাহা হইলে বিদ্বেষ ও ঘূণা অনিবার্য্য হয় এবং পাশ্চাত্য মতে নিন্দনীয় নহে, কেননা স্বার্থের বিরোধ আছে, একপক্ষে উত্থান, অন্যপক্ষে দমন চলিতেছে। কিন্তু আমাদের উত্থান কেবল আর্য্যজাতির উত্থান নহে। আর্য্যচরিত্র, আর্য্য শিক্ষা, আর্য্য– ধম্মের উত্থান। আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় পাশ্চাত্য রাজনীতির প্রভাব

জাতীয় উত্থান

১৬১

বড় প্রবল ছিল, তথাপি প্রথম অবস্থায়ও এই সত্য উপলম্ধ হইয়াছে, মাতৃপূজা, মাতৃপ্রেম, আর্য্য অভিমানের তাঁর অনুভবে ধন্ম-প্রধান দ্বিতীয় অবস্থা প্রস্তুত হইয়াছে। রাজনীতি ধন্মের অঙ্গ, কিন্তু তাহা আর্য্যভাবে, আর্য্যধন্মের অনুমাদিত উপায়ে আচরণ করিতে হয়। আমরা ভবিষ্যৎ আশাস্বরূপ যুবকদিগকে বলি, যদি তোমাদের প্রাণে বিদ্বেষ থাকে, তাহা অচিরে উন্মূলিত কর। বিদ্বেষের তাঁর উত্তেজনায় ক্ষণিক রজঃপূর্ণ বল সহজে জাগ্রত হয় ও শীঘ্র ভাঙ্গিয়া দুর্ব্বলতায় পরিণত হয়। যাঁহারা দেশোদ্ধারার্থে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, তাঁহাদের মধ্যে প্রবল দ্রাতৃভাব, কঠোর উদ্যুম, লৌহসম দৃঢ়তা ও জ্বলম্ভ অগ্নিতুল্য তেজ সঞ্চার কর, সেই শক্তিতে আমরা অটুটবলান্বিত ও চিরজয়ী হইব।

আমাদের আশা

আমাদের বাহবল নাই, যুদ্ধের উপকরণ নাই, শিক্ষা মাই, রাজশক্তি নাই, আমাদের কিসেতে আশা, কোথায় সেই বল যাহার ভরসায় আমরা প্রবল শিক্ষিত য়ুরোপীয় জাতির অসাধ্য কাজ সাধন করিতে প্রয়াসী হই? পণ্ডিত ও বিজ-ব্যক্তিগণ বলেন, ইহা বালকের উদ্দাম দুরাশা, উচ্চ আদর্শের মদে উন্মন্ত অবিবেকী লোকের শূন্য স্বপ্ন, যুদ্ধই স্বাধীনতালাভের একমাত্র পহা, আমরা যুদ্ধ করিতে অসমর্থ। স্বীকার করিলাম, আমরা যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, আমরাও যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিই মা: কিন্তু ইহা কি সত্যকথা যে বাহবলই শক্তির আধার, না শক্তি আরও গৃঢ়, গভীর মূল হইতে নিঃস্ত হয় ? সকলে স্বীকার করিতে বাধ্য যে কেবলমার বাহুবলে কোন বিরাট কার্য্য সাধিত হওয়া অসম্ভব। যদি দুই পরস্পরবিরোধী সমান বলশালী শক্তির সংঘর্ষ হয়, যাহার নৈতিক ও মানসিক বল অধিক,---যাহার ঐক্য, সাহস, অধ্যবসায়, উৎসাহ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, স্বার্থত্যাগ উৎকৃষ্ট,----যাহার বিদ্যা, বুদ্ধি, চতুরতা, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, দূরদশিতা, উপায়-উদ্ভাবনী-শক্তি বিকশিত, তাহারই জয় নিশ্চয় হইবে। এমন কি বাহ-বলে, সংখ্যায়, উপকরণে যে অপেক্ষাকৃত হীন, সে-ও নৈতিক ও মানসিক বলের উৎকর্মে প্রবল প্রতিদ্বন্দীকে হটাইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় লিখিত রহিয়াছে। তবে বলিতে পার যে, বাহবল অপেক্ষা নৈতিক ও মানসিক বলের গুরুত্ব আছে, কিন্তু বাহুবল না থাকিলে নৈতিক বল ও মানসিক বলকে কে রক্ষা করিবে ? যথার্থ কথা। কিন্তু ইহাও দেখা গিয়াছে যে দুই চিন্তাপ্রণালী, দুই সম্প্রদায়, দুই পরস্পরবিরোধী সভ্যতার সংঘর্ষে যে-পক্ষের দিকে বাহবল, রাজশক্তি, যুদ্ধের উপকরণ প্রভৃতি উপায় পূর্ণমাত্রায় ছিল, তাহার প্রাজ্য় হইয়াছে, যে-পক্ষের দিকে এই সকল উপায় আদ্বে ছিল না, তাহার জয় হইয়াছে। এই ফলের বৈপরীতা কেন হয়? 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ', কিন্তু ধস্মের পিছনে শক্তি চাই, নচেৎ অধস্মের অভ্যুত্থান, ধস্মের প্লানি স্থায়ী থাকিবার কৃথা। বিনা কারণে কার্য্য হয় না। জয়ের কারণ শক্তি। কোন্ শক্তিতে দুর্বল পক্ষের জিত হয়, প্রবল পক্ষের শক্তি পরাজিত বা বিনপ্ট হয় ? আমরা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তসকল পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারিব, আধ্যাত্মিক শক্তির বলে এই অঘটন ঘটিয়াছে, আধ্যাত্মিক শক্তিই বাহবলকে তুচ্ছ করিয়া মানবজাতিকে জানায় যে এই জগৎ ভগবানের রাজ্য, অস্ত্র স্থূল-প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র নহে। শুদ্ধ আত্মা শক্তির উৎস, যে আদ্যাপ্রকৃতি গগনে অযুত সুর্য্য ঘুরাইতে থাকে, অঙ্গুলিম্পর্শে পৃথিবী দোলাইয়া মানবের সুষ্ট পুর্ব-

গৌরবের চিহ্নসকল ধ্বংস করে, সেই আদ্যাপ্রকৃতি শুদ্ধ আত্মার অধীন। সেই প্রকৃতি অসম্ভবকে সম্ভব করে, মৃককে বাচাল করে, পঙ্গুকে গিরি উল্লখ্যন করিবার শক্তি দেয়। সমস্ভ জগৎ সেই শক্তির সৃষ্টি। যাহার আধ্যাত্মিক বল বিকশিত তাহার জয়ের উপকরণ আপনিই সৃষ্ট হয়, বাধাবিপত্তি আপনি সরিয়া গিয়া অনুকূল অবস্থা আনায়, কার্যা করিবার ক্ষমতা আপনিই ফুটিয়া তেজন্মিনী ও ক্ষিপ্রগতি হয়। য়ৄরোপ আজকাল এই Soul-force বা আধ্যাত্মিক শক্তিকে আবিক্ষার করিতেছে, এখনও তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই, তাহার ভরসায় কার্যা করিতে প্রর্ত্তি হয় না। কিন্তু ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা, গৌরব, বল, মহত্বের মূলে আধ্যাত্মিক শক্তি। যতবার ভারতজাতির বিনাশকাল আসম বলিয়া সকলের প্রতীতি হইবার কথা ছিল, আধ্যাত্মিক বল গুণ্ত উৎস হইতে উপ্রস্লোতে প্রবাহিত হইয়া মুমুর্ষু ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে, আর সকল উপযোগী শক্তিও স্বজন করিয়াছে। এখনও সেই উৎস গুকাইয়া যায় নাই, আজও সেই অভুত মৃত্যুঞ্জয় শক্তির ক্রীড়া হইতেছে।

কিন্তু স্থলজগতের সকল শক্তির বিকাশ সময়সাপেক্ষ, অবস্থার উপযুক্ত ক্রমে সমুদ্রের ভাটা ও জোয়ারের ন্যায় কমিয়া-বাড়িয়া শেষে সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হয়। আমাদের মধ্যেও তাহাই হইতেছে। এখন সম্পূর্ণ ভাটা, জোয়ারের মুহুর্তের অপেক্ষায় রহিয়াছি। মহাপুরুষদের তপস্যা, স্বার্থত্যাগীর কল্ট-স্থীকার, সাহসীর আত্মবিসর্জন, যোগীর যোগশক্তি, জানীর জানসঞার, সাধুর শুদ্ধতাই আধ্যাত্মিক বলের উৎস। একবার এই নানাবিধ পুণ্য ভারতকে সঞ্জীবনী সুধায় ভাসাইয়া মৃত জাতিকে জীবিত, বলিষ্ঠ, তেজস্বী করিয়া তুলিয়া– ছিল, আবার সেই তপোবল নিজের মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া অদম্য অজেয় হইয়া বাহির হইতে উদ্যত হইয়াছে। কয়েক বৎসরের নিপীড়ন, দুর্বলতা ও পরা-জয়ের ফলে ভারতবাসী নিজের মধ্যে শক্তির উৎস অন্বেষণ করিতে শিখিতেছে। বজুতার উত্তেজনা নহে, স্বেচ্ছদত্ত বিদ্যা নহে, সভাসমিতির ভাব-সঞ্চারিণী শক্তি নহে, সংবাদপত্তের ক্ষণস্থায়ী প্রেরণা নহে, নিজের মধ্যে আত্মার বিশাল নীরবতায় ভগবান ও জীবের সংযোগে যে গভীর অবিচলিত, অভাভ শুদ সুখদুঃখজয়ী পাপপুণ্যবজিত শক্তি সভূত হয়, সেই মহাস্পিটকারিণী, মহা-প্রলয়ঙ্করী, মহাস্থিতিশালিনী, জানদায়িনী মহাসরস্থতী, ঐপ্রর্যাদায়িনী মহা-লক্ষী, শক্তিদায়িনী মহাকালী, সেই সহস্ত তেজের সংযোজনে একীভূতা চণ্ডী প্রকট হইয়া ভারতের কল্যাণে ও জগতের কল্যাণে কৃতোদ্যম হইবে। ভারতের স্বাধীনতা গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র, মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতের সভ্যতার শক্তিপ্রদর্শন এবং জগৎময় সেই সভ্যতার বিস্তার ও অধিকার। আমরা যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে, সভাসমিতির বলে, বজ্জার জোরে, বাহবলে, যাধীনতা বা স্বায়ত্ব-শাসন আদায় করিতে পারিতাম, সেই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হইত না। ভারতীয় সভ্যতার বলে, আধ্যাত্মিক শক্তিতে, আধ্যাত্মিক শক্তির সৃষ্ট সৃষ্ট্য ও স্থূল উপায়ে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। সেইজন্য ভগবান আমাদের পাশ্চাত্য-

ভাবযুক্ত আন্দোলন ধ্বংস করিয়া বহিন্দু্যী শক্তিকে অন্তন্মুখী করিয়াছেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় দিব্যচক্ষুতে যাহা দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া বার বার বলিতেন, শক্তিকে অন্তন্মুখী করে, কিন্তু সময়ের দোষে তখন কেহ তাহা করিতে পারে নাই, স্বয়ং করিতে পারেন নাই, কিন্তু ভগবান আজ তাহা ঘটাইয়াছেন। ভারতের শক্তি অন্তন্মুখী হইয়াছে। যখন আবার বহিন্দু খী হইবে, আর সেই প্রোত ফিরিবে না, কেহ রোধ করিতে পারিবে না। সেই ব্রিলোকপাবনী গঙ্গা ভারত প্রাবিত করিয়া, পৃথিবী প্লাবিত করিয়া অমৃতস্পর্শে জগতের নূতন যৌবন আনয়ন করিবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

আমাদের দেশে ও য়ূরোপে মুখ্য প্রভেদ এই যে, আমাদের জীবন অন্ত-স্মুঁখী, য়ুরোপের জীবন বহিম্মুখী। আমরা ভাবকে আশ্রয় করিয়া পাপপুণ্য ইত্যাদি বিচার করি, য়ুরোপ কম্মকে আশ্রয় করিয়া পাপ পুণ্য ইত্যাদি বিচার করে। আমরা ভগবানকৈ অভুর্যামী ও আঅ্সু বুঝিয়া অভুরে তাঁহাকে অন্বেষণ করি, য়ূরোপ ভগবানকে জগতের রাজা বুঝিয়া বাহিরে তাঁহাকে দেখে ও উপাসনা করে। য়ুরোপের স্বর্গ স্থূলজগতে, পৃথিবীর ঐশ্বর্যা, সৌন্দর্য্য, ভোগ-বিলাস তাঁহাদের আদরণীয় ও মৃগ্য; যদি অন্য স্বর্গ কল্পনা করেন, তাহা এই পাথিব ঐশ্বর্যা, সৌন্দর্য্য ভোগ-বিলাসের প্রতিকৃতি, তাঁহাদের ভগবান আমাদের ইন্দ্রের সমান, পাথিব রাজার ন্যায় রুজুময় সিংহাসনে আসীন হইয়া সহস্ত বন্দনাকারী দারা স্তবস্তুতিতে স্ফীত হইয়া বিশ্বসায়াজ্য চালান। আমাদের শিব প্রমেশ্বর, অথচ ভিক্ষুক, পাগল, ভোলানাথ; আমাদের কৃষ্ণ বালক, হাস্যপ্রিয়, রঙ্গময়, প্রেমময়, ক্রীড়া করা তাঁহার ধম্ম। য়ুরোপের ভগবান কখন হাসেন না, ক্রীড়া করেন না, তাহাতে তাঁহার গৌরব নতট হয়, তাঁহার ঈশ্বরত্ব আর থাকে না। সেই বহিন্দুখী ভাব ইহার কারণ—এপ্রর্য্যের চিহ্ন তাঁহাদের ঐপ্রর্য্যের প্রতিষ্ঠা, চিহু না দেখিলে তাঁহারা জিনিষটি দেখিতে পান না, তাঁহাদের দিব্যচক্ষু নাই, স্ক্রা দৃশ্টি নাই, সবই স্থুল। আমাদের শিব ভিক্কুক, কিন্ত ত্রিলোকের সমস্ত ধন ও ঐশ্বর্য্য অল্লেতে সাধককে দান করেন--ভোলানাথ, কিন্ত জানীর অপ্রাপ্য <mark>জান তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সম্পতি। আমাদের প্রেমময় রঙ্গপ্রিয় শ্</mark>যামসুন্দর কুরুক্ষেত্রের নায়ক, জগতের পিতা, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সখা ও সুহৃদ। ভারতের বিরাট জান, তীক্ষ্ণ স্ক্রাদৃষ্টি, অপ্রতিহত দিব্যচক্ষু স্থুল আবরণ ভেদ করিয়া আত্মস্থ ভাব, আসল সত্য, অন্তনিহিত গৃঢ়তত্ব বাহির করিয়া আনে।

*

পাপপুণ্য সম্বন্ধেও সেই ক্রম লক্ষিত হয়। আমরা অন্তরের ভাব দেখি। নিন্দিত কন্মের মধ্যে পবিত্র ভাব, বাহ্যিক পুণ্যের মধ্যে পাপিছের স্বার্থ লুক্সায়িত থাকিতে পারে; পাপপুণ্য, সুখদুঃখ মনের ধন্মে, কন্মে, আবরণ মাত্র। আমরা ইহা জানি; সামাজিক সুশৃত্থলার জন্য আমরা বাহ্যিক পাপপুণ্যকে কন্মের প্রমাণ বলিয়া মান্য করি, কিন্তু অন্তরের ভাবই আমাদের আদরণীয়। যে সম্যাসী আচার-বিচার, কর্ত্ব্য-অকর্ত্ব্য, পাপপুণ্যের অতীত, জড়োনাত্ত-পিশাচবৎ আচরণ করেন, সেই স্বর্ধধন্মত্যাগী পুরুষকে আমরা শ্রেষ্ঠ বলি।

১৬৬

প্রীঅরবিন্দের বাসলা রচনা

পাশ্চাত্য বুদ্ধি এই তত্ত্বগ্রহণে অসমর্থ: যে জড়বৎ আচরণ করে, তাহাকে জড় বুঝে, যে উন্মন্তবৎ আচরণ করে, তাহাকে বিকৃতমন্তিক্ষ বুঝে, যে পিশাচবৎ আচরণ করে, তাহাকে ঘৃণ্য অনাচারী পিশাচ বুঝে; কেননা সূক্ষা দৃশ্টি নাই, তাহারা অন্তরের ভাব দেখিতে অসমর্থ।

* *

সেইরূপ বাহ্যদৃশ্টিপরবশ হইয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, ভারতে প্রজাতন্ত কোনও যুগে ছিল না। প্রজাতন্তসূচক কোনও কথা সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় না, আধুনিক পালিয়ামেন্টের ন্যায় কোন আইন-ব্যবস্থাপক সভাও ছিল না, প্রজাতন্তের বাহাচিহ্নের অভাবে প্রজাতন্তের অভাব প্রতিপন্ন হয়। আমরাও এই পাশ্চাত্য যুক্তি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। আমাদের প্রাচীন আর্য্যরাজ্যে প্রজাতত্ত্বের অভাব ছিল না; প্রজাতত্ত্বের বাহ্যিক উপকরণ অসম্পূর্ণ ছিল বটে, কিন্তু প্রজাতত্ত্বের ভাব আমাদের সমস্ত সমাজ ও শাসনতত্ত্বের অন্তরে ব্যাপ্ত হইয়া প্রজার সুখ ও দেশের উন্নতি রক্ষা করিত। প্রথমতঃ, প্রত্যেক গ্রামে সম্পূর্ণ প্রজাতভ্র ছিল, গ্রামের লোক সম্মিলিত হইয়া সর্বসাধারণের পরামশে র্জ ও নৈতৃস্থানীয় পুরুষদের অধীনে গ্রামের ব্যবস্থা, সমাজের ব্যবস্থা করিতেন; এই প্রাম্য প্রজাতত্ত মুসলমানদের আমলে অক্ষুণ্ণ রহিল, রুটিশ শাসন-তত্ত্বের নিজেষণে সেইদিন নষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যেও, যেখানে সর্বসাধারণকে সন্মিলিত করিবার সুবিধা ছিল, সেইরূপ প্রথা বিদ্যমান ছিল, বৌদ্ধ সাহিত্যে, গ্রীক ইতিহাসে, মহাভারতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, বড় বড় রাজ্যে, যেখানে এইরাপ বাহ্যিক উপকরণ থাকা অসম্ভব, প্রজাতত্ত্বের ভাব রাজতন্তকে পরিচালিত করিত। প্রজার আ**ই**ন– ব্যবস্থাপক সভা ছিল না, কিন্তু রাজারও আইন করিবার বা প্রবন্তিত আইন পরিবর্তন করিবার লেশমাত্র অধিকার ছিল না। প্রজারা যে আচারবাবহার রীতিনীতি আইনকান্ন মানিয়া আসিতেছিল, তাহার রক্ষাকর্তা রাজা। ব্রাহ্মণগণ আধুনিক উকিল ও জজদের ন্যায় সেই প্রজা-অনুষ্ঠিত নিয়মসকল রাজাকে বুঝাইতেন, সংশয়স্থলে নির্ণয় করিতেন, ক্রমে ক্রমে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেন, তাহা লিখিতশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিতেন। শাসনের ভার রাজারই ছিল, কিন্তু সেই ক্ষমতাও আইনের কঠিন নিগড়ে নিবদ্ধ; তাহা ভিন্ন রাজা প্রজার অনুমোদিত কার্য্যই করিবেন, প্রজার অসন্তোষ যাহাতে হয়, তাহা কখন করিবেন না, এই রাজনীতিক নিয়ম সকলেই মানিয়া চলিত। রাজা ভাহার ব্যতিক্রম করিলে, প্রজারা আর রাজাকে মান্য করিতে বাধ্য ছিল না।

*.

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একীকরণ এই যুগের ধর্ম্ম। কিন্তু এই একীকরণে পাশ্চাত্যকে প্রতিষ্ঠা বা মুখ্য অঙ্গ যদি করি, আমরা বিষম দ্রমে পতিত হইব। প্রাচাই প্রতিষ্ঠা, প্রাচাই মুখ্য অস। বহির্জগৎ অন্তর্জগতে প্রতিষ্ঠিত, অন্তর্জগৎ বহির্জগতে প্রতিষ্ঠিত নহে। ভাব ও শ্রদ্ধা শক্তি ও কন্দের্মর উৎস, ভাব ও শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে হয়, কিন্তু শক্তিপ্রয়োগে ও কন্দের্মর বাহ্যিক আকারে ও উপকরণ আসক্ত হইতে নাই। পাশ্চাত্যেরা প্রজাতন্ত্রের বাহ্যিক আকার ও উপকরণ লইয়া ব্যস্ত। ভাবকে পরিস্ফুট করিবার জন্য বাহ্যিক আকার করণ; ভাব আকারকে গঠন করে, শ্রদ্ধা উপকরণ স্কুন করে। কিন্তু পাশ্চাত্যেরা আকারে ও উপকরণে এমন আসক্ত যে, সেই বহিঃপ্রকাশের মধ্যে ভাব ও শ্রদ্ধা মরিয়া যাইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন না। আজকাল প্রাচ্য দেশে প্রজাতন্ত্রের ভাব ও শ্রদ্ধা প্রবাবেগে পরিস্ফুট হইয়া বাহ্য উপকরণ স্কুন করিতেছে, বাহ্য আকার গঠন করিতেছে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে সেই ভাব শ্র্দান হইতেছে, সেই শ্রদ্ধা স্কীণ হইতেছে। প্রাচ্য প্রভাতানুখ, আলোকের দিকে ধাবিত—লগাশ্চাত্য তিমিরগামী রান্ত্রির দিকে ফিরিয়া যাইতেছে।

* *

ইহার কারণ, সেই বাহ্য আকার ও উপকরণে আসক্তির ফলে প্রজাতন্তের দুষ্পরিণাম। প্রজাতন্তের সম্পূর্ণ অনুকূল শাসন্তন্ত সূজন করিয়া আমেরিকা এতদিন গর্ব্ব করিতেছিল যে আমেরিকার তুল্য স্বাধীন দেশ জগতে আর নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডেন্ট ও কম্মচারিগণ কংগ্রেসের সাহায্যে স্বেচ্ছায় শাসন করেন, ধনীর অন্যায়, অবিচার ও সর্ব্বগ্রাসী লোভকে আশ্রয় দেন, নিজেরাও ক্ষমতার অপব্যবহারে ধনী হন। একমাত্র প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের সময়ে প্রজারা স্বাধীন, তখনও ধনীরা প্রচুর অর্থব্যয়ে নিজ ক্ষমতা অক্ষুপ্প রাখেন, পরেও প্রজার প্রতিনিধিগণকে কিনিয়া স্বেচ্ছায় অর্থশোষণ করেন, আধিপত্য করেন। ফ্রান্স প্রজাতত্র ও স্বাধীনতার জন্মভূমি, কিন্তু যে কম্মঁচারিবর্গ ও পুলিশ প্রজার ইচ্ছায় প্রত্যেক শাসনকার্য্য চালাইবার যন্ত্রন্থরেপ বলিয়া স্পট হইয়াছিল, তাহারা এখন বহুসংখ্য**ক ক্ষু**দ্র স্বেচ্ছাচারী রাজা হইয়া বসিয়াছে, প্রজারা তাহাদের ভয়ে কাতর। ইংলণ্ডে এইরূপ বিম্রাট ঘটে নাই বটে, কিন্তু প্রজাতন্তের অন্যান্য বিপদ পরিস্ফুট হইতেছে। চঞ্চলমতি অর্দ্ধশিক্ষিত প্রজার প্রত্যেক মতপরিবর্ত্তনে শাসনকার্য্য ও রাজনীতি আলোড়িত হয় বলিয়া র্টিশঙ্গাতি পুরাতন রাজনীতিক কুশলতা হারাইয়া বাহিরে-অভরে বিপদগ্রস্ত হইতেছে ৷ শাসনকর্তৃগণ কর্তব্যস্তানরহিত. নিজ স্বার্থ ও প্রতিপত্তি রক্ষা করিবার জন্য নির্বাচকবর্গকে প্রলোভন দেখাইয়া, ভয় দেখাইয়া, ভুল বুঝাইয়া রাটিশজাতির বুদ্ধি বিকৃত করিতেছেন, মতির অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যবর্দ্ধন করিতেছেন। এই সকল কারণ বশতঃ একদিকে প্রজাতপ্রবাদ প্রান্ত বলিয়া একদল স্বাধীনতার বিরুদ্ধে খঙ্গহস্ত হইয়া উঠিতেছে, অপরদিকে এনাকিস্ট, সোশালিস্ট, বিপ্লবকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এই দুই পক্ষের সংঘর্ষ ইংলণ্ডে চলিতেছে—-রাজনীতিক্ষেত্রে; আমেরিকায়—-শ্রমজীবী ও লক্ষপতির বিরোধে; জাস্মানীতে—মত-সংগঠনে; ফ্রান্সে—

১৬৮

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

সৈন্য ও নৌ-সৈন্যে; রুশে—–পুলিশ ও হত্যাকারীর সংগ্রামে—–সর্বন্ত গণ্ডগোল, চঞ্চলতা, অশান্তি।

* *

বহিন্দা্থী দৃষ্টির এই পরিণাম অবশ্যভাবী। কয়েকদিন রাজসিক তেজে তেজখী হইয়া অসুর মহান্ শ্রীসম্পন্ন, অজেয় হয়, তাহার পরে অন্তনিহিত দোষ বাহির হয়, সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হয়। ভাব ও শ্রদ্ধা, সঞ্জান কর্ম্ম, অনাসক্তকর্ম যে দেশে শিক্ষার মূলমন্ত্র, সেই দেশেই অন্তর ও বাহির, প্রাচা ও পাশ্চাত্যের একীকরণে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির সকল সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা কার্য্যতঃ হইতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান ও শিক্ষার বশবন্তী হইয়া সেই মীমাংসা করিতে পারিব না। প্রাচ্যের উপর দণ্ডায়েমান হইয়া পাশ্চাত্যকে আয়ন্ত করিতে হইবে। অন্তরে প্রতিষ্ঠা, বাহিরে প্রকাশ। ভাবের পাশ্চাত্য উপকরণ অবলম্বন করিলে বিপদগ্রন্ত হইব, নিজ স্বভাব ও প্রাচ্যবৃদ্ধির উপযুক্ত সূজন করিতে হইবে।

GURU GOVINDSINGH

গুরু গোবিন্দসিংহ

গুরু গোবিন্দসিংহ

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গুরু গোবিন্দসিংহের জীবনী সম্রতি আমাদের হন্তগত হইয়াছে। এই পুন্তকে গুরু গোবিন্দসিংহের রাজ-নীতিক চেম্টা ও চরিত্র সরল ও সহজ ভাষায় অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু শিখদের দশম গুরু কেবল যোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ ছিলেন না, তিনি ধাশ্মিক মহাপুরুষ ও ভগবদাদিস্ট ধম্মোপদেস্টা ছিলেন, নানকের সাত্ত্বিক বেদাভ শিক্ষাবহল ধম্মকে মূত্ন আকার দিয়াছিলেন; অতএব তাঁহার ধর্ম্মত ও তৎকৃত শিখধর্ম ও শিখসমাজের পরিবর্তন বিশদরূপে চিত্রিত হইলে এই সুন্দর জীবনী অসম্পূর্ণতা দোষে দৃষিত হইত না। লেখক সংক্ষেপে শিখজাতির পূর্ব্যরভাভ লিখিয়া গোবিন্দসিংহের চরিত্র ও আগমনের ঐতিহাসিক বীজ ও কারণ বৃঝিবার সুবিধা করিয়ছেন। সেইরূপে পরবর্তী র্ভান্তও লিপি– বদ্ধ করিলে দশম গুরুর অসাধারণ কার্য্যের ফলাফল ও মহতী চেম্টার পরিণতি বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হইত। শিখ ইতিহাসের কেন্দ্রন্থলে শুরু গোবিন্দসিংহ। তিনি যে জাতি সংগঠনে তাঁহার সমগ্র প্রতিভা ও শক্তি নিয়োজিত করিলেন, সেই জাতির ইতিহাসই এই মহাপুরুষের প্রকৃত জীবনচরিত। যেমন শিকভূ ও ডগার অভাবে কাও শোভা পায় না, তেমনি শিখ সম্প্রদায়ের পূবর্ব ও পর র্তান্তের অভাবে গোবি**ন্স**সিংহের জীবনচরিত অসম্পূর্ণ বোধ হয়। আশা করি লেখক দিতীয় সংক্ষরণে এই অঙ্গ যোগ দিবেন এবং শিখ মহাপুরুষের ধর্মমত ও সমাজ সংক্ষারের বিশদ বর্ণনা করিয়া স্বলিখিত পুস্তক সর্বাঙ্গসূন্দর করিবেন। তাঁহার পুস্তক পাঠে খালসা-সংস্থাপক স্বদেশহিতেষী মহাবীরের উদার চরিত্র ও অভুত কার্য্যকলাপের দিকে মন প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়। যাঁহারা দেশের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন বা করিতে ইচ্ছুক হন, এই জীবনী তাঁহাদের শক্তির্দ্ধি করিবে ও ঐশ্বরিক প্রেরণা দৃঢ়ীভূত করিবে।

EDITORIAL COMMENTS

"ধম্ম্" প্রিকার সম্পাদকীয়

ধর্ম্ম ১ম সংখ্যা ৭ই ভার ১৩১৬

প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন

প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন আগত প্রায়। গতবৎসর পাবনার অধি-বেশনে বঙ্গদেশের সমবেত প্রতিনিধিগণ বাস্থে-নীতি বর্জন করিয়া বঙ্গদেশে ঐক্য রক্ষা করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস হুগলীর অধিবেশনেও সেই শুভ পথ অনুসরণ করা হুইবে। শুনিয়া সুখী হুইলাম, হুগলীর অভ্যর্থনা সমিতি পাবনার প্রস্তাব সকলের উপর লক্ষ্য রাখিয়া এই অধিবেশনের প্রস্তাব-শুলি রচনা করিতে প্রয়াসী হুইয়াছেন। বিশেষ আবশ্যক বিষয় দুইটীই আছে। আজকাল রাজনীতিক বয়কট বর্জন করিয়া নূন চিনির বয়কটই বজায় রাখিবার বিশেষ আগ্রহ অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির মনে জন্মিয়াছে। আশা করি এই বিজ্বতা বঙ্গদেশের প্রতিনিধিবর্গের প্রিয় না হুইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত হুইবে। দ্বিতীয় আবশ্যক বিষয় জাতীয় মহাসভা। পাবনায় এই সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হুইয়াছিল, সে প্রস্তাবই হুইয়া রহিল, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার লেশমান্ত চেল্টা হয় নাই। এইবার সমগ্র বঙ্গদেশের মত ও আকাশক্ষা যাহাতে উপেক্ষিত না হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করা প্রাদেশিক সমিতির প্রধান কর্ত্ব্য।

অশোক নন্দীর পরলোক প্রাণিত

আলিপুর বোমার মোকদ্মায় অভিযুক্ত যুবক অশোক নন্দী ক্ষয়রোগে দেহমুক্ত হইয়াছেন। জেলের কল্ট ক্ষয়রোগের একমাত্র কারণ। যাঁহারা এই যুবককে চিনিতেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, কোনও হত্যাকাণ্ডে বা ষ্ড্যন্তে অশোক নন্দীর পক্ষে সংলিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণ অসন্তব। তিনি অতিশয় শান্ত, নিরীহ, ধান্মিক ও প্রেমধন্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি জেলে যোগপথে অনেক অগ্রসর হইয়া মৃত্যুসময়ে যোগারাত অবস্থায়ই ভগবানের নাম সমরণ করিতে করিতে ধরাধাম পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার কতক পরিচয় বারান্তরে দেওয়া হইবে।

হেয়ার জুীটে সরলতা

আমাদের হেয়ার শুঁটি নিবাসী সহযোগীর সরলতা দেখিয়া আমরা প্রীত হইলাম। সহযোগীর মতপ্রকাশে লুকোচুরির অভ্যাস নাই। সত্যকথা বলিতে হইলে সরল বালকের ন্যায় বলিয়া ফেলে: মিথ্যাকথার যদি প্রয়োজন হয়

সত্য মিখ্যা মিগ্রিত না করিয়া বালকের মত উদারভাবে সম্পূর্ণ মিখ্যা কথা উদ্গীরণ করে। কিচেনারের সৈন্যসংস্কারের সম্বন্ধে সেইদিন পার্লামেন্টে বাদ-বিবাদ হইয়াছিল; সেই উপলক্ষো স্থনামধন্য স্যুৱ এডওয়িন কলিন এই মত ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই সৈন্যসংস্কারে যে ভারতের জাতীয় সেনা স্পট ও গঠিত হইতেছে, তাহাতে ভারতের জাতীয় দলের উদ্দেশ্যের সাহায্য ও পোষকতা করা হইয়াছে। ইংলিশম্যানও এই মতে মত দিয়াছে। এই পর্যান্ত সৈন্যগঠনে ভেদনীতি স্যক্লে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, যাহাতে পল্টনে পল্টনে সহানুভূতি ও একতা না হয়, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির হাদয়ে একপ্রাণতা না আসে, সেই চেম্টা ও লক্ষ্য কখনও পরিবজ্জিত হয় নাই। লর্ড কিচেনার এই সকল ভেদ বিনাশ করিয়া রটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ উল্টাইয়া ফেলিয়া-ছেন। ইহাতে সহযোগী স্বীকার করিয়াছেন যে, এখনকার স্বেচ্ছাতন্ত ভারতের জাতীয় একতার প্রতিকূল ও বিরোধী ছিল। একতার অভাবে ভারতের উন্নতির পথ হয় নাই। অতএব যে স্বেচ্ছাতন্ত তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষকের কথায় দেশের উন্নতির প্রতিকৃল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, সেই স্বেচ্ছাতন্তকে বৈধ উপায়ে প্রজাতত্তে পরিণত করিবার চেল্টা ভারতবাসীর পক্ষে দোষাবহ না হইয়া স্বাভাবিক, অনিবার্ষ্য এবং যেমন ভারত তেমনিই বিলাতের মঙ্গলপ্রদ প্রতিপন্ন করা হইল।

বিলাত-যাত্রায় লাভ

আমাদের প্রমপূজনীয় দেশনায়ক ও শ্রেষ্ঠ বক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতে বিশেষ সম্মানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন ৷ সেই সম্মানলাভে আমরাও প্রীত হইলাম। আমাদের একজন বক্তা ইংরাজী ভাষায় বিলাতের গ্রেষ্ঠ বাগ্মীসকলের সমান প্রতিভা, ভাষালালিত্য ও ওজস্বিতা দেখাইয়া বিপক্ষেরও প্রশংসা ও সম্মানলাভ ক্রিয়াছেন, তাহাতে দেশের গৌরবও রৃদ্ধি হইল, বাঙ্গালীর বৃদ্ধির শ্রেষ্ঠতাও প্রমাণিত হইল। তথাপি এত পরিশ্রমের ফল যদি ব্যক্তিগত সম্মানেই সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সুরেন্দ্র-বাবুর বিলাত যাত্রা ব্যক্তির পক্ষে সভোষজনক হইলেও দেশের পক্ষে বিফল চেম্টা বলিতে হয়। আমরা ইংরাজের নিকট বৃদ্ধির প্রশংসা ও বাণিমতার আদর অর্জন করিতে ব্যগ্র মহি, জাতির অধিকার সকল আদায় করিতে চাহিতেছি ৷ সুরেন্দ্রবাবুর তিন মাস প্রবাসে ও ঘন ঘন বজ্তায় ইংরাজ জাতি যে এই উদেশ্যের কিঞ্মিলাত্র অনুকূল হইয়াছে, তাহার কোনও লক্ষণ দেখিতেছি না। উহারা মধ্যপন্থী দলের রাজভক্তির সম্বন্ধে কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছেন মাত্র। ইহাতে সুরেন্দ্রবাবু মধ্যপন্থী দলের কৃতজ্ঞতাভাজন ও ধন্যবাদের যোগ্য হইয়াছেন, সন্দেহ নাই ৷ কিন্তু তিনি বিলাতে দেশের প্রভূত সেবা ও উপকার করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া যে অজুহাতে তাঁহার সম্মাননা হইতেছে তাহা

অমূলক। সুরেন্দ্রবাবু পূজার্হ ও সম্মাননীয় বলিয়া বিদেশ হইতে পুনরাগমন-কালে তাঁহাকে পূজা ও সম্মান করা স্থাভাবিক ও প্রশংসনীয়; অন্য অলীক কারণ দেখাইবার প্রয়োজন ছিল না। দেশসেবার মধ্যে তিনি বিলাতে আমাদের রাজনীতিক অধিকারের দাবী জানাইয়া আসিয়াছেন! উপকারের মধ্যে আন্দোন লনের সম্বন্ধে কয়েকজনের ব্যক্তিগত মত অল্পমান্ত সংশোধিত হইতেও পারে। আমরা এই অল্পলাভে আমাদের রাজনীতিক উদ্দেশ্যের দিকে এক পদও অগ্রসর হই নাই।

লণ্ডনে জাতীয় মহাসভা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ যৌবনকাল হইতে উনবিংশ শতাব্দীর নিবেদন-প্রধান কাতর রাজনীতিতে অভ্যন্ত, স্থানে স্থানে ইংরাজদের "জয়জয়কার" প্রবণ করিয়া আবার সেই বিফল নীতিতে বিশ্বাসস্থাপন ও নিবেদন-প্রবণতাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা তাঁহার পক্ষে এই বিদেশযাক্রার অনিবার্য্য ফল। এখন জিজাস্য এই, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ যাহাই করুন, দেশবাসী এবং বিশেষতঃ বঙ্গবাসী, তাঁহার এই রুখা চেম্টায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত কি ? কোনও ব্যক্তি--গত মত দারা এই জাতি আর পরিচালিত হইতে পারে না। উদ্দেশ্য, প্রয়োজন ও যুক্তি দেখিয়া দেশের পক্ষে যাহা কল্যাণকর, রাজনীতিক্ষেত্রে যাহা সিদ্ধিদায়ক, শক্তি ও অর্থব্যয়ের তুলনায় যাহার ফল সভোষজনক, তাহাই আমাদের অনুষ্ঠেয়। সুরেন্দ্রবাবু যে "জয়জয়কারে" ভুল বিশ্বাস করিয়া পুরাতন পথে ফিরিয়া যাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন, সে তাঁহার অসাধারণ বাণিমতার প্রশংসা: তাঁহার রাজনীতিক মতের সমর্থন অথবা রাজনীতিক দাবির অনুকূলতা-প্রকাশক নয়। যাঁহারা ভারতের উন্নতির প্রধান বিরুদ্ধাচারী, তাঁহারাও এই "জয়জয়কারে" উচ্চকণ্ঠে যোগ দিয়াছেন। ইহাতে কি বোঝা গেল যে, তাঁহারা ভবিষ্যতে আমাদের স্বায়ত-শাসন বা স্বাধীনতার অনুকূল আচরণ করিবেন। ইহা কখনও সম্ভব নয়। এই বাণিমতা-প্রভাবে তাঁহাদের মত ও আচরণ কিঞিৎমাত পরিবভিত হয় নাই। যদি সুরেন্দ্রবাবুর বজুভায় কোন বিশেষ বা স্থায়ী ফল হইল না, তবে কি গোখলে, মেহতা, মালবিয়া, কৃষ্ণস্থামীর মিলিত বজুতাস্রোতে ইংরাজের কঠিন মন এতই ভিজিবার আশা আছে যে এই ভূতপ্রাদ্ধে আমরা অজন্র টাকা ঢালিতে বাধ্য। ইংরাজ জাতি কার্য্যপটু ও বিচক্ষণ, কেবলমার বজ্তায় ভুলে না, স্থার্থ ও দেশের হিত দেখিয়া রাজনীতিক পহা নির্দ্ধারণ করে। আমরা আগে জানিতাম উহাদের নিকট ভারতের দুঃখ, কর্ম্মচারীদের অত্যাচার জ্ঞাপন করিতে পারিলে বৃটিশ প্রজাতত্তের এক কথায়ই আকাশ হইতে স্বর্গ নামিয়া আসিবে। সেই দ্রান্তি ঘুচিয়া গিয়াছে, আবার কেহ যেন সেই পুরাতন মোহ উৎপাদন করিবার প্রয়াস না পান, পাইলেও দেশ শুনিবে না। ইংরাজ জাতিকে এমন রূহৎ কি স্থার্থ দেখাইতে পারি যাহাতে তাঁহারা ১৭৮ শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

জাতীয় গব্দ, লাভ ও প্রভুত্ব পরিত্যাগ করিয়া একটি কৃষ্ণবর্ণ জাতির হস্তে বিজিত দেশের সমন্ত শাসনভার ছাড়িতে পারে এবং কোন উপায়ে সেই রহৎ স্থার্থের প্রয়োজনীয়তা তাঁহাদের হাদয়লম হইতে পারে, ইহাই বিবেচ্য। সাম্রাজ্যরক্ষা ভিন্ন এমন কোন রহৎ স্থার্থ নাই। সাম্রাজ্যরক্ষার আশায় স্থায়ত্ত-শাসন দেওয়া ইংরাজ রাজনীতিতে নূতন পন্থা নয় তবে এই উপায়ের প্রয়োজনীয়তা তাঁহাদের সম্পূর্ণ হাদয়লম না হওয়া পর্যান্ত তাঁহাদের নিকট প্রকৃত উপকারের আশা অসলত। তাঁহাদের মনে সেই জ্ঞান জন্মাইবার একই পথ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।

ধৰ্ম্ম ২য় সংখ্যা ১৪ই ভাষ ১৩১৬

জাতীয় মহাসভা

যে দিন সুরাটে জাতীয় মহাসভার বিদ্রাট ঘটিয়াছিল, জাতীয়দলের স্থিমলনীর অধিবেশনে শ্রীযুত তিলক মহাসভার জাতীয়তা রক্ষা করিয়া ঐক্য স্থাপনের উপায় উদ্ভাবন ও মহাসভার কার্য্য ও উদ্দেশ্য রক্ষার্থ কমিটী নিযুক্ত করিবার প্রভাব করিয়াছিলেন। সেই প্রভাব অনুসারে কমিটী গঠনও হুইল, কিন্তু আজ পর্যান্ত কমিটার অধিবেশন হয় নাই। শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ ও শ্রীযুত বোডাস এই কমিটীর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইগ্নাছিলেন। তাঁহারা প্রাম্শ করিয়া ইহাই নির্ণয় করিলেন যে, এই বিভাট সম্বন্ধে জাতীয়দলের দোষ-ক্ষালন করা ও প্রাদেশিক সমিতি সকলের অধিবেশনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেশবাসীর অভিমত জানা প্রথম কর্ত্তব্য, তৎপ্রের্ক কমিটী আহান করা র্থা। এই গুরুতর বিষয়ে দেশবাসীর মত উপেক্ষা করিয়া পরামর্শ করা কোনও মতে বিধেয় বা যুক্তিসঙ্গত নয়। দুইটী প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে জানা গেল যে, বসদেশের ও মহারাঝ্ট্রের মতে ঐক্য স্থাপনই গ্রেয়ক্ষর এবং মহাসভার পূর্ববর্ত্তী প্রণালী ও কলিকাতার অধিবেশনে গৃহীত চারিটি মুখ্য প্রস্তাব সর্ব্বথা রক্ষণীয়। এলাহাবাদে কনভেনসনের কমিটী এই মত অগ্রাহ্য করিয়া ঐক্য স্থাপনের পথ বন্ধ করিল । তাহার পরেই আলিপুরে বোমার মোকদমায় শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ ধৃত ও অভিযুক্ত হইলেন ৷ মহামতি তিলক রাজলোহের অভিযোগে ছয় বৎসর কারাদত্তে দণ্ডিত হইলেন, শ্রীযুত খাপার্দে ও শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল বিলাতে প্রস্থান করিলেন, বঙ্গদেশীয় জাতীয় দলের প্রধান প্রধান নেতাগণ নিকাসিত হইলেন। দেশময় প্রবল নিগ্রহনীতিরূপ ঝটিকা বহিতে লাগিল। জাতীয় দলের নেতাগণের মধ্যে নাগপুর নিবাসী ডাক্তার মুজী, কলিকাতার শ্রীযুক্ত রসুল এবং মধ্যস্থগণের মধ্যে পঞ্চাবের লালা লাজপত রায় ও বঙ্গদেশের শ্রীযুত মতিলাল ঘোষই রহিলেন। ডাক্তার মূঞ্জী প্রভূতি কলিকাতায় আসিয়া

ঐক্যস্থাপনের অনেক চেপ্টা করিলেন কিন্তু কয়েকজন সম্ভান্ত মধ্যপন্থীর প্রতিবাদে তাঁহাদের প্রস্তাব সকল প্রত্যাখ্যাত হইল। জাতীয় দলের নেতাগণ বিফলমনোরথ হইয়া নাগপুরে জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাহাও রাজপুরুষদের আজায় স্থগিত হইল। এই অনুকূল অবস্থায় কন্ভেন্সন কমিটীর নির্দারিত নিয়মাবলী অনুসারে মাল্রাজে কনভেনসন্ সম্মিলিত হইয়া জাতীয় মহাসভা নাম ধারণ পূব্বক বয়কট বঙ্জন দারা বঙ্গ-দেশের মুখে চুণকালী মাখাইল, বঙ্গদেশের মধ্যপন্থী নেতাগণও নীরবে এই লাশ্ছনা সহ্য করিয়া সহ্যশক্তির পরাকাঠা দেখাইলেন। এই বৎসর লাহোরে এই কৃত্রিম মহাসভার অধিবেশনের আয়োজন চলিতেছে। এই আয়োজনে শ্রীযুত নন্দী, লালা হরকিসনলাল ও পণ্ডিত রামভুজদত চৌধুরী ত্রিমৃতি সাজিয়া, অসৎ হইতে সৎ সৃষ্টি করিয়া ঐশী শক্তির লক্ষ্য প্রকাশ করিতেছেন। পঞ্জাবের প্রভাবশালী হিন্দুসভা সেই প্রদেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে এই কৃত্রিম মরলীর ভেদ-নীতির পক্ষপাতী জাতীয় মহাসভার জাতীয়তা অশ্বীকার করিতে আহান করিতেছেন; লালা লাজপত রায়, লালা মুরলিধর, লালা দারকাদাস প্রভৃতি সম্ভান্ত নেতাগণ এই আয়োজনের প্রতিবাদ করিয়াছেন, মুসলমান সম্প্রদায়ও এই রাজ-অনুগ্রহ-লালিত মহাসভায় যোগ দিতেছেন না। অতএব এই আয়োজনের সফলতা সম্বন্ধে আশা পোষণ করা যায় না। এই অবস্থায় ঐক্য স্থাপনের একমাত্র আশাস্থল হগলীতে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন। এই অধিবেশনে যদি ঐক্যস্থাপনের প্রকৃত প্রণালী নির্দ্ধারিত হয় এবং বলদেশের মধ্যপন্থীগণ গোখলে—মেহতার আধিপত্য পরিত্যাগ করিয়া দেশের মুখের দিকে চাহিয়া স্থপন্থা নির্দ্ধারণ করেন, তাহা হইলে জাতীয় মহাসভার সম্বন্ধে সভোষজনক উপায় উদ্ভাবন করিয়া একতার পথ নিক্ষণ্টক করা যাইবে। গোখলে মহাশয় পুণার বজ্তায় যে দেশদোহিতা করিয়াছেন, তাহার পরে তাঁহার কথায় দেশের অহিত-সাধন বঙ্গদেশীয় নেতাদিগের পক্ষে অতিশয় লজাজনক হইবে। বোম্বাইয়ের নেতাগণ যে বয়কট ও বৈধ প্রতিরোধকে. দমন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির সন্দেহ থাকিতে পারে? সুরেন্দ্রবাবু বিলাতে বয়কট সমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়া বোষাইয়ের নেতৃর্ক এত বিরক্ত হইয়াছেন যে, বিলাত হইতে পুনরা-গমনকালে শ্রীযুত ওয়াচা ভিন্ন একজন সুপ্রসিদ্ধ মধ্যপন্থীও সুরেন্দ্র বাবুকে অভ্যর্থনা করিতে খান নাই। তাঁহারা নাকি বয়কট নীতির সহিত তাঁহাদের সহান্ভূতির অভাব ঘোষণার্থ এইরাপে বঙ্গদেশের মধ্যপন্থী নেতাকে অপদস্থ করিয়াছিলেন। লাহোরের সভা জাতীয় মহাসভাও নয়, মধ্যপন্থীদলের মহা-সভাও নয়, বয়কট-বিরোধী রাজপুরুষভজের মহাসভা। যাহা হউক, জাতীয় দল হগলীর অধিবেশন পর্যান্ত অপেক্ষা করিতেছেন, তাহার পরে আপনাদের গভব্য পথ নির্দ্ধারণ করিবেন। আমরা আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিব না।

১৮০

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

হিন্দু ও মুসলমান

শাসন-সংস্কারে হিন্দু ও মুসলমানের স্বতন্ত অস্তিত অবলয়ন করিয়া বিরোধ বদ্ধমূল করিবার চেল্টায় অনিল্টের মধ্যে এই হিতও সাধিত হইয়াছে যে, নিজ্জীব মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবন-স্পন্দন হইয়াছে। তাঁহারা রাজপুরুষদের উপর দাবী করিতে এবং অসাধ্যসাধনের আশা পোষণ করিতে শিখিতেছেন। ইহাতেই দেশের পরম মঙ্গল। উহাদের আশা যে বার্থ হইবে, তাহা বলা নিল্পয়োজন। ইতিমধ্যে তাহা রাজপুরুষদের আচরণে বুঝা গেল। তাঁহারা যেমন অপর দেশবাসীদিগকে ক্ষুদ্র ও মূল্যহীন অধিকার দান করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, মুসলমান সম্প্রদায়কেও সেইরাপ ক্ষুদ্র ও মূল্যহীন অধিকার মাত্র দান করিয়া প্রকৃত শক্তিবিকাশের উপায় দিতে অসম্মত হইবেন। পৃষ্ঠপোষক ও সহানুভূতি-প্রকাশক ইংরাজ আমাদিগকে আশা দিয়া যেমন নিবেদন-নীতিপ্রিয় করিয়াছিলেন,তাঁহাদেরও সেইরূপ পৃ্চপোষক ও সহানুভূতিপ্রকাশক জুটিবেন। শেষে মুসলমান ছাতৃগণ বুঝিতে পারিবেন যে, এই নিবেদননীতি ফলপ্রসূ নয় এবং উঁহাদের প্রকৃত উপকার করিবার সামর্থ্য ইংরাজ পুঠপোষক-গণের নাই। আমরা যদি এই শাসনপ্রণালীতে যোগদান করিতে অসম্মত হই, তবেই জাগরণের দিন শীঘ্র আসিবার সম্ভাবনা থাকিবে ৷ ভেদনীতিমূলক শাসন প্রণালীতে যোগদান করিয়া মুসলমানদের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত হই, তাহা হইলে আমরা যে অনিম্টের সম্ভাবনা দেখাইলাম তাহা নিশ্চয়ই ফলিবে ৷ যদিও আমরা কাহারও প্রতিকূলতা ভয় করি না, তথাপি বিপক্ষের উদ্দেশ্যসাধনে সাহায্য করা মূর্খতা মাত্র। আমরা কখনও মুসলমান লাভুগণের তোষামোদ করি নাই, করিবও না, সরলমনে এক প্রাণ হইয়া তাঁহাদিগকে জাতি সংগঠন কার্যো ব্রতী হইতে আহান করিয়াছি। সেই আহান শ্রবণ করিয়া নিজের হিত ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা তাঁহাদের বুদ্ধি, ভাগ্য ও সাধুতার উপর নির্ভর করে। আমরা বিরোধ সৃষ্টি করিতে যাইব না ও বিপক্ষের বিরোধ সৃষ্টির চেম্টায় সাহায্য করিব না।

পুলিশ বিল

সার এডওয়ার্ড বেকার পুলিশ বিল স্থগিত করিয়াছেন। তিনি বুদ্ধিনানের কার্যাই করিয়াছেন। এই বিল আইনবদ্ধ হইলে যে অশান্তি ও অনর্থ ঘটিত, সংবাদপরে প্রতিবাদে ও বজুতায় কতক পরিমাণে ও অস্পদ্টভাবে তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। স্রোত ফিরিয়াছে। আমরা ৭ই আগদ্ট ভয় ও বিয় অতিক্রম করিয়া পরীক্ষোভীর্ণ হইয়াছি বলিয়া বুঝি ভগবান সুপ্রসন্ম হইয়াছেন। কুদিন অবসান হইতে যাইতেছে, সুদিন ফিরিয়া আসিতেছে। আশা করিতে পারি যে, ইহার পরে জাতীয় শক্তির জয় ভিয় পরাজয় হইবে

না। সেই শক্তির পুনবিকাশ, লোকমতের জয় ও চেপ্টার মঙ্গলময় পরিণামের প্রকলক্ষণ পাওয়া যাইতেছে। বঙ্গদেশের বর্তমান ছোটলাটের মত প্রজাতস্তের পক্ষেই আছে, ইহা জানা কথা, কিন্তু তাহার কার্য্য ও প্রকাশ্য কথা প্রজাতন্তের প্রতিকুল হইয়াছে ও হইবে। তিনি লর্ড মরলীর আঞ্চাবাহক ভূত্য মাত্র, কেরাণীতন্ত্রের (Bureaucracy) প্রধান কেরাণী মাত্র, স্বতন্ত মত কার্য্যে পরিণত করিবার স্থাধীনতা তাঁহার নাই। তথাপি পুলিশ বিল স্থগিত হওয়ায় তাঁহার মন হইতে একটা চিভার ভার অপনীত হইবার কথা। আমাদের বিশ্বাস, তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এই অনিষ্টকর বিল রুজু করেন নাই, স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া স্থগিতও করেন নাই। বিলটি স্বর্গরাজ ইন্দের বজ্রপাত নয়, আরও উচ্চ শৈলশিখরারাঢ় কখন সৌম্যমূভি কখন রুদ্রমূভি কোন সদা-শিবের আদেশ-প্রসূত মহাস্ত। আমাদের অনুমান যদি অমূলক না হয়, তাহা হইলে ব্ঝিতে হইবে নিগ্রহনীতির জন্মস্থানে নিগ্রহমুদ্রা শিথিল হইয়া পড়িতেছে। ইহা কি cooperation আকাঙক্ষার ফল? কেহ যেন এই দ্রান্তির বশবতী না হন যে, আমরা এত অল্লে ভুলিব ৷ রাজনীতি প্রেমের মান মিলনের খেলা নয়; রাজনীতি বাজার, ক্রয় বিক্রয়ের স্থান। সেই বাজারে cooperation এর মূল্য control । অল মূল্যে বহুমূল্য বস্তু ক্রয়ে করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে ৷

জাতীয় রিসলী সারকুলার

আমরা জাতীয় শিক্ষাপরিষদকে জানাইতেছি যে, তাঁহারা ৭ই আগস্টে পরিষদের অধীন স্কুলসকলের ছাত্রবুদকে বয়কট উৎসবে যোগদান করিতে নিষেধ করায় মফঃস্থানে অতিশয় কুফল ফলিতেছে। সাধারণ লোকের মন ক্ষুথ ও উত্তেজিত হইয়াছে, যাঁহারা জাতীয় শিক্ষার সাহায্য করিতেন, তাঁহারা অনেকে সাহায্য বন্ধ করিতেছেন, এবং এই মত প্রচারিত হইতেছে যে, জাতীয় স্কুল কলেজে ও সরকারী স্কুল কলেজে নামমাত্র প্রভেদ বর্তমান। শুনিয়াছি পরিষদের একজন বিখ্যাত সভ্য ছাত্রগণকে এই পরামর্শ দিয়াছেন যে, যাঁহারা দেশের কার্য্যে যোগদান করিতে চান, তাঁহারা সরকারী কলেজের আশ্রয় গ্রহণ করুন। পরিষদের ইহাও মত হইতে পারে যে, মফঃস্থানের স্কুল সকল বন্ধ হউক, সাধারণ লোক সাহায্য বন্ধ করুন, আমরা বড় বড় লোকের অর্থ সাহায্যে কলিকাতায় একটিমাত্র কলেজ চালাইয়া নিস্কৃতি পাইব। যদি তাহাই হয় তবে সব ল্যাঠা চুকিয়া গেল। অন্যথা এই জাতীয় রিসলী সারকুলার প্রত্যাহার করা আবশ্যক।

১৮২

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

গুপ্ত চেম্টা

বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে যাহাতে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ কোনও জেলা-সমিতি দ্বারা হগলীর অধিবেশনে প্রতিনিধি নিযুক্ত না হন কয়জন পরম দেশহিতৈষী সেজন্য গোপনে চেল্টা করিয়াছে। এই জঘন্য নীতি এখনও আমাদের রাজনীতিতে স্থান পায়, ইহা বড় দুঃখের কথা। অরবিন্দবাব্কে যদি বয়কটই করিতে হয়, করুন। তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই, তিনি দুঃখিত হইবেন না, দেশের কার্য্যে পশ্চাৎপদও হইবেন না। তিনি কখনও কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া কার্য্য করেন নাই, পুরের্ব অনেক দিন স্থপথে একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন, ভবিষ্যতেও যদি একাকী যাইতে হয়, যাইতে ভয় করিবেন না। কিন্তু যদি এই মতই গৃহীত হয় যে, হিতের জন্য বা আপনাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অরবিন্দবাবুর সংস্তব বর্জনীয়, প্রকাশ্যে দেশের সমক্ষে দভায়মান হইয়া এই মত প্রচার করিতে কুষ্ঠিত হন কেন ? এই ৩°ত ষড়যন্তের দারা আপনাদের বা দেশের কি হিত সাধিত হইবে, তাহা বুঝা যায় না ৷ ইতিমধ্যেই ডায়মণ্ড-হারবার হইতে অরবিন্দবাবু প্রতিনিধি নিব্বাচিত হইয়াছেন। তোমাদের কনভেন্সন নির্দারিত নিয়মানুসারে হগলীর অধিবেশন হইতেছে না, যে কোন সভা যে কোন প্রতিনিধি নিব্বাচন করিতে পারে। ফলতঃ ভুপ্তনীতি যেমন জঘন্য তেমনই নিফুল। কপ্টতার অভাব ইংরাজদিগের রাজনীতিক জীবনের একটা মহান ৩ণ; তাহারা যাহা করিতে হয় তাহা সাহসের সহিত সকলের সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে, আর্য্যভাবে করে। ভারতের রাজনীতিক জীবনে এই মহান গুণের অবতারণা করিতে হইবে। চাণক্যনীতি রাজতত্তে পোষায়, প্রজাতন্তে কেবল ভীক্রতা ও স্বাধীনতারক্ষণের অযোগতো আনয়ন করে।

মরলীর ভেদনীতি

শাসন-সংস্কারের ছায়ায় যে ভেদনীতিরক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, লর্ড মরলী তাহা রোপণ করিয়াছেন, দেশহিতৈষী গোখলে মহাশয় জলসিঞ্চন করিয়া সয়ত্বে পালন করিতেছেন। কলিকাতার 'ইংলিশম্যান' স্বীকার করিয়াছেন যে, ভেদনীতিই ভারতীয় সৈন্য সংগঠনের মূলতত্ব। ভেদনীতিই অনেক ইংরাজ রাজনীতিজের মতে ভারতে রটিশ সায়াজ্য রক্ষার প্রধান উপায়। লর্ড মরলীর নীতিও ভেদনীতি-প্রধান। তাঁহার প্রথম চেল্টা, মধ্যপন্থী দলকে রাজপুরুষদিগের হস্তগত করিয়া ও জাতীয় দলকে দলন করিয়া ভারতের নবোখান বিনল্ট বা স্থগিত করিবার বিফল প্রয়াস। সুরাট অধিবেশনের সময় এই বিষর্ক্ষ রোপিত হইয়াছিল। বোয়াইয়ের নেতাগণ ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ, শক্তি বা ন্যায়্য অধিকার সম্বন্ধে কখনও উদার মত বা উচ্চ আকাশ্জা পোষণ করেন নাই। তাঁহারা অতি অল্পে সম্ভুল্ট হইতেন। বঙ্গদেশের উত্থান

ও বয়কট প্রচারের প্রভাবে তাঁহাদের আশাতীত শাসন-সংস্কার হইয়াছে। তাঁহারা সেই নবোখানের ফল স্বায়ত করিয়া বয়কট ও বৈধ প্রতিরোধ বিনষ্ট করিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছেন। সুরাট অধিবেশনের প্রের্ব এই সংস্কারের সম্ভাবনা তাঁহাদের অবিদিত ছিল না, কিন্তু <mark>তাঁ</mark>হারা জানিতেন যে বয়কট-বর্জন ও চরমপন্থী দলের বহিষ্কার করিতে না পারিলে এই সুস্বাদু ফল তাঁহাদের মুখবিবরে পতিত হইবে না। এই দুই উদ্দেশ্যের উপর <mark>লক্ষ্য</mark> রাখিয়া নাগপুর হইতে সূরাটে মহাসভা আনীত হইয়াছিল এবং মহাসভার কার্যাপ্রণালীর সংশোধন প্রভাব হইয়াছিল; উদ্দেশ্য--জাতীয় দল আপনি মহা-সভা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। সভাপতি ডাভার রাসবিহারী ঘোষের বজ্তাও সেই উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল। মহামতি তিলক, শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি জাতীয় দলের নেতাগণ এই খণ্ড অভিসন্ধি অবগত হইয়া মহা-সভার কর্তৃপক্ষীয়দিপের কার্য্যে তীব্র প্রতিবাদ ও বয়কট-নীতি রক্ষার জন্যে চেল্টা করিতেছিলেন। সুরাটের তুমুল কাণ্ডে তাঁহাদের চেল্টা বার্থ হইল, সার ফেরোজ শাহ মেহতাই জয়ী হইলেন। আত্মদোষ-ক্ষালনের সময়ে জাতীয় দলের নেতাগণ বোম্বাইয়ের মধ্যপন্থীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিলেন। কিন্তু মধ্যপন্থীচালিত অসংখ্য পত্রিকায় গালাগালির এমন রোল উঠিল যে, সত্যের ক্ষীণধ্বনি সেই কোলাহলে ভাসিয়া গেল। এখন সকল দেশবাসীকে বলিতে পারি, মেহতা-গোখলের কার্য্যকলাপ দেখুন, বুঝুন আমরা প্রান্ত ছিলাম, কি মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম; না বাস্তবিক তাঁহাদের ওইরূপ উদ্দেশ্য ছিল। এই ভেদনীতি বোদ্বাইয়ের মধ্যপন্থীগণকে অনায়াসে উদ্ভাভ করিল। বঙ্গদেশের নেতাগণ সেই কুপথের পথিক হন নাই, **তাঁ**হারা বয়কট রক্ষা **ক**রিয়াছেন। ৭ই আগ**ণ্ট স্বয়ং শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বসু রা**জপুরু**ষ**দের মিনতি ও ভয় প্রদর্শন তেজের সহিত উপেক্ষা করিয়া বয়কট উৎসবের সভাপতি হইয়াছিলেন। আবার 'বেললী' পত্রিকায় বয়কট নাম প্রচার হইয়া আমাদের আনন্দ ও আশা উৎপাদন করিয়াছে। যদি ঐক্য স্থাপন কখনও সম্ভব হয়, যদি মরলীর ভেদনীতি বিফল হয়, তাহা বঙ্গবাসীর ঐক্যপ্রিয়তা ও বয়কেটে দৃঢ়তা দারাই সাধিত হইবে।

বিষরক্ষের অপর শাখা

লর্ড মরলীর দ্বিতীয় চেল্টা, রাজনীতিক্ষেত্রে মুসলমান ও হিন্দু সন্প্রদায়কে পৃথক করা। ইহাই ভেদনীতির দ্বিতীয় অঙ্গ, শাসন-সংস্কারের দ্বিতীয় বিষময় ফল। এই সম্বন্ধে লর্ড মরলী গুণত চেল্টা করেন নাই, প্রকাশ্যেই ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া মুসলমান ও হিন্দুর চিরশত্তুতার ব্যবস্থা করিতেছেন। অথচ ব্যবস্থাপক সভায় নিকাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধিতে মধ্যপত্তী নেতাগণ এমন মুগ্ধ ও প্রলুম্ধ যে সেই অল্প লাভের আশায় এই মহান অনিল্ট আলিঙ্গন

গ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

করিতে অগ্রসর হইতেছেন। গোখলে মহাশয় মুক্তকণ্ঠে এই ভেদনীতির প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার মতে লড় মরলী ভারতের পরিবাতা। তাঁহার মতে মুসলমানদিগের পৃথক প্রতিনিধি নির্কাচন ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত। ইহাতে যে মুসলমান ও হিন্দুর রাজনীতিক জীবনের শক্তি স্বতন্ত ও পরস্পর বিরোধী হইয়া জাতীয় মহাসভার মূলতত্ত্ব ও ভারতের ভাবি ঐক্য ও শাভি সম্পূর্ণ বিন্দট হইবে এই সত্য গোখলে মহাশয়ের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজনীতিবিদের বুদ্ধির অগোচর হইতে পারে না। তবে কোন্ নিগৃঢ় রহসাময় সূক্ষানীতির বশে গোখলে মহাশয় এই ভেদনীতির সমর্থন করিতে সাহসী হইয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। আমাদের পূজনীয় সুরেন্দ্রনাথ এই সম্বন্ধে বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন, অথচ দৃঢ়ভাবে এই শাসন-সংস্কার রূপ মহান অনর্থের প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। বরং বিলাতপ্রবাসে প্রথম অবস্থায় এই শাসন সংস্কারের অযথা ও অমূলক প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সংস্কারে বঙ্গবাসীর লেশমার আস্থা নাই। যদি কয়েকজন বড় লোক এই নূতন শাসন প্রণালীতে যোগদান করিবার লোভ ছাড়িতে না পারিয়া দেশের প্রকৃত হিত ভুলিয়া যান, তাহাতে দেশের কোন অকল্যাণ হইবার সভাবনা নাই। কিন্তু সুরেন্দ্রবাবুর ন্যায় সর্বাজনপূজিত নেতা এই বিষরক্ষে জলসেচন করিলে দেশের নিতাভ দুর্ভাগ্য বুঝিতে হইবে। যাঁহারা এই সংস্কারে যোগদান করিবেন, তাঁহারা মরলীর ভেদনীতির সহায়, সাম্প্রদায়িক বিরোধের স্পিটকর্তা ও ভারতভূমির ভবিষ্যুৎ একতার বাধাস্বরূপ হইয়া উঠিবেন। শ্রীযুত সুরেল্লনাথ এই লাভ নীতি অনুসরণ করিতে কখনও সম্মত হইবেন না, ইহাই আমাদের আশা।

ধর্ম্ম ওয় সংখ্যা ২১এ ভাল ১৩১৬

শাসন সংস্কার

শাসন-সংস্কার গৃহীত হইলে যে কুফল ফলিবে, তাহা গতবারে বলা হইয়াছে এবং উহা দেশবাসীরও অবিদিত নহে। এরূপস্থলে যদি কেই বলে যে, আমরা এই সংস্কারের দোষ দেখাইব কিন্তু তাহার মধ্যে যে সুবিধাটুকু দেওয়া হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিব কেন, তাহার বুদ্ধি বা রাজনীতিজ্ঞানের প্রশংসা করিতে পারি না। যে দোষ দেখাইবেন সে দোষ রাজপুরুষগণের বুদ্ধির অগোচর নহে, তাঁহারা যে না বুঝিয়া সংস্কারে এই দোষ প্রবেশ করাইয়াছেন, তাহাও নহে। তাঁহারা প্রেই জানিতেন যে, এই দোষ সকলের প্রতিবাদ হইবে, কিন্তু তাঁহারা ইহা চান যে প্রতিবাদ করিয়াও দেশের নেতাগণ এই সৈন্য-সংস্কার প্রত্যাখ্যান না করুন, তাহা হইলেই তাঁহাদের অভিসন্ধি সফল হইল। দোষ

সংস্কৃত করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই, কেন না এই দোষ তাঁহাদের যুজিতে দোষ না হইয়া সংস্কারের মুখ্য গুণ। এই সংস্কারে স্বাধীনতালু ধ দেশবাসীর শক্তি রিদ্ধি হইবে না, তাঁহারাই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধে দুটা চিরসংঘর্ষ-প্রবৃত্ত শক্তির যুদ্ধে মধ্যস্থ ও দেশের হর্তা-কর্ত্তা হইয়া বিরাজ করিবেন। তাঁহাদের এই নীতি দোষাবহ নয়, প্রশংসনীয়। তাঁহারা দেশহিতৈষী, স্বদেশের হিত, শক্তি রিদ্ধি ও সাম্রাজ্যরক্ষার উপায় দেখিতেছেন। এই নীতি উদারনীতি নয়, কিন্তু উদারনীতি যদি স্বদেশের অহিতকর বিবেচনা করি, অনুদারনীতিই অবলম্বন করা দেশহিতৈষীর যোগ্য পত্ম। আমরা দেশের কল্যাণে নিরপেক্ষ হইয়া উদারনীতি অবলম্বন করিতাম, দেশহিতৈষিতাত্যাগে জগৎহিতৈষী সাজিতাম। এখন আমরাও স্বদেশের হিত, শক্তি রিদ্ধি ও জীবনরক্ষার পথ দেখি। দেশ আগে বাঁচুক, তাহার পরে জগতের হিত ও উদারনীতি আচরণ করিবার যথেপট অবসর পাইব।

হুগলী প্রাদেশিক সমিতি

ইতিমধ্যে হগলীতে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ফলাফল নিশ্চিত ভাবে না জানা পর্যান্ত সমিতির আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে মত প্রকাশ অনাবশ্যক । এই বৎসর ভূতভবিষ্যতের সন্ধিস্থল । সমিতির কার্য্য∸ ফলের উপর বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করিতেছে। প্রবল নিগ্রহ-নীতি আরম্ভ হওয়া প্রভৃতিতে দেশ নীরব হইয়া পড়িল। বঙ্গজাতির নবোখিত শক্তি ও সাহস যুবকদের প্রাণের মধ্যে লুক্কায়িত হইল এবং ভীরুগণের পরামর্শে দেশবাসীর সমৃতিভ্রংশ ও বুদ্ধিলোপ হইতে চলিল। কোথায় নিগ্রহনীতির বৈধ অথচ সাহসপূর্ণ প্রতিরোধ করিয়া সেই নীতি বিফল করিবে, তাহা না হইয়া ভয়ে ও রাজনীতি-জানরহিত বিজ্ঞতায় নিশ্চেষ্টতা ও নীরবতা শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া প্রচারিত হইল, তাহাতে নিগ্রহনীতি সফল হইয়াছে, রাজপুরুষগণও বুঝিয়াছেন যে আমরা অমোঘ অস্তু আবিষ্কার করিলাম। এই নিশ্চেল্টতা ও নীরবতায় দেশবাসীর মনপ্রাণ অবসাদপ্রাণ্ত ও উৎসাহহীন হইয়া পড়িতেছিল, জাতীয় শিক্ষার শেষ পরিণাম অতি শোচনীয় হইতেছে, বয়কটের বল ক্ষীণ হইয়া বিলাতী পণ্যের ব্রুয়-বিব্রুয় সবেগে রুদ্ধি পাইতেছে, গত পাঁচ বৎসরের যত চেম্টা ও উদ্যম, শক্তিহীন ও বিফল হইয়া যাইতেছে। নেতাগণ হাদয়ে সাহস বাঁধিয়া দেশের প্রকৃত নেতৃত্বকার্য্য করিতে অক্ষম, কন্ভেন্সন-নীতির ম্মতা ও শাসন-সংস্কারের মোহত্যাগ করিতে চান না, মুখে প্রকৃত জাতীয় মহাসভার পক্ষপাতী, কার্য্যে তাহার পুনঃস্পিট করিবার কোনও আয়োজন করিতেছেন না, শাসন-সংস্কার গ্রহণ করিতেও ভয় করেন, প্রত্যাখ্যান করিতে হইলেও প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। এই অবস্থায় যাঁহারা দেশের জন্যে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, যাঁহারা ভয়ের পরিচয় রাখেন না, ভগবান ও বঙ্গজননী ১৮৬

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

ভিন্ন কাহাকেও জানেন না ও মানেন না, তাঁহারা অগ্রসর না হইলে বঙ্গের ভবিষ্যুৎ
অন্ধকারময় হইবে। যদি আমরা প্রাদেশিক সমিতিতে দেশের মুখ-রক্ষা ও
ভারতের ভবিষ্যুৎ আশা রক্ষা করিতে পারি, পথ অনেক পরিমাণে মুজ হইয়া
থাকিবে। সেই পর্যান্ত অপেক্ষা করিতেছি। নচেৎ নিজের পথ নিজে পরিষ্ণার
করিয়া ভয়ার্ত ও নিগ্রহনীতিবিক্ষুব্ধ দেশের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে।

দৈনিক পত্রিকার অভাব

জাতীয় দলের শক্তি অনেক দিন অন্তনিহিত হইয়া ছিল, আবার বিকাশ হইতেছে। কিন্তু সেই শক্তিবিকাশের উপযোগী উপকরণের অভাবে সম্পূর্ণ কার্য্যসিদ্ধি অসম্ভব। আমরা যথাসাধ্য আর্য্যধর্ম্ম ও ধর্ম্মসন্মত রাজনীতির প্রকাশপূর্ব্বক এই বিকাশের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কিন্তু সাপ্তাহিক পত্র দারা এই কার্য্য সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয় না। বিশেষতঃ আমাদের রাজনীতিক জীবনে দৈনিক প্রিকার অভাব গুরুতর অভাব। প্রতিদিন যাহা ঘটিতেছে, তাহা তৎক্ষণাৎ লোককে জানাইয়া সেই সম্বন্ধে জাতীয় দলের মত বা কর্ভব্য লোকের সম্মুখে স্থাপন করিতে না পারিলে আমাদের চেল্টায় তেজ তৎপরতা ও ক্ষিপ্রতা হইতে পারে না। সেদিন কলেজ ক্ষোয়ারে এক স্বদেশী সভা হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা ও বজৃতার সারাংশ একটী সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকায় দেওয়া হইয়াছিল কিন্ত পত্রিকার কর্ত্তাগণ প্রকাশ করিতে অসম্মত হন। সেই সভায় শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ অধ্যক্ষ হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং ঘন ঘন বয়কটের উল্লেখও হইয়াছিল, ইহাতে হয়ত কর্তাগণ ভীত বা বিরক্ত হইলেন, সে ভয় ও বিরক্তি শ্বাভাবিক, আজকালকার দিনে বয়কট নামেরে যত কম উল্লেখ হয়, ততই ব্যক্তিগত মঙ্গল সভাব। বয়কট প্রচারের জন্য স্বাধীন দৈনিক পত্রিকার আবশ্যকতা প্রতিদিন বোধ হইতেছে।

মেহতা মজলিসের সভাপতি

সভা হইবে কি না স্থির নাই। কিন্তু পতিত্ব লইয়া বিষম সমস্যা উপস্থিত।
মান্দ্রাজ কন্ভেন্সনের পুনরার্ত্তি এবার লাহোরে হইবার কথা। কিন্তু
লাহোরের দেশভজ্জণ দেশসেবার এই কৃত্রিম অভিনয়ের প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত
নন। দেশে মানে না, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নাই অথচ দেশের দশ পাঁচ জন মাথাধরা লোক দেশের লোকের নামে, ডিক্রি ডিসমিস করিবেন ইহা কোন বৃদ্ধিমান
ব্যক্তি অনুমোদন করিতে পারেন? সে যাক। এখন সভাপতির কথা। এ
সম্বন্ধে ভারত মিত্র বেশ বলিয়াছেনঃ——ভিন্ন কংগ্রেসের পক্ষপাতিগণ আগামী
লাহোর কন্ভেনসনে মান্দ্রাজের নবাব সৈয়দ মহম্মদকে সভাপতি করিতে
চান। কিন্তু নবাব সাহেব এ সম্মান গ্রহণে সম্মত নন। এখন পাঞ্জাবের

কংগ্রেস কমিটী সার ফিরোজ শা মেহতাকে সভাপতি করিতে চাহিতেছে—
মেহতা সম্মত না হইলে অগত্যা সুরেনবাবু। ভারত মিত্র বলিতেছেন আমরা
বলি যেরূপ করিয়াই হউক মেহতা সাহেবকেই সভাপতি করা উচিত। তিনিই
ভাঙ্গা কংগ্রেসের জন্মদাতা। সুতরাং কংগ্রেসের (?) সভাপতিত্ব তাঁহাকে
যেরূপ সাজে আর কাহাকেও সেরূপ সাজে না। লোকে এখন হইতেই ভাঙ্গা
কংগ্রেসকে মেহতা মজলিস বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ধশর্ম ৪**র্থ সংখ**ন ২৮এ ডাল ১৩১৬

অসম্ভবের অনুসন্ধান

হুগলীতে প্রাদেশিক সমিতির যে অধিবেশন হুইয়া গিয়াছে তাহাতে সভাপতি শ্রীযুত বৈকুষ্ঠনাথ সেন জাতীয় দলকে অধীর ও অসম্ভব আদর্শের সন্ধানে ব্যস্ত বলিয়া অভিহিত করিতে কুষ্ঠিত হয়েন নাই। যাঁহারা অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্থীকার করিবেন, মধ্যপন্থীরাই অধীরতার পরিচয় দিয়াছেন; জাতীয় দলের বিরুদ্ধে অধীরতার অভিযোগের কারণ নাই। ছগলীতে যে জাতীয়দলের সংখ্যাধিক্য ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; অথচ বিরোধ-বর্জনের উদ্দেশ্যে জাতীয় দলের পক্ষ হইতে শ্রীযুত অরবিদ্দ ঘোষ স্বাবলম্বন ও নিক্রিয় প্রতিরোধ সমর্থন করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। ইহাও যদি অধীরতা হয় তবে ধীরতা বোধ হয় জড়তার নামাত্তর মাত্র। অসভব আদর্শের কথায় আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, যাহারা বর্তমানের সঙ্কীর্ণ সীমার বাহিরে কিছুই দেখিতে চাহে না ও পারে না তাহারা ভবিষ্যতের ভাবনার ভাবুকদিগকে চিরদিনই অসম্ভব আদর্শের সন্ধানে ব্যস্ত বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। যে সকল কশ্মবীর সঙ্কটসময়ে বিশেষ বিচার ও বিবেচনা করিয়া ভবিষ্যতের উন্নতির ভিডিস্থাপনক্ষম তাঁহাদের ভাগোও ঐরূপ উপহাস লাভ ঘটিয়া থাকে। ফলের বিষয় না জানিয়া অপেক্ষা করা জড়ত্ব, তাহা বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। সেখানে স্থৈয় মূঢ়ের কার্যা; গতিই জীবন। ভারতে মধ্যপত্তী সম্প্রদায়ের অকারণ ভীতিই জাতীয় উন্নতির অন্তরায় হইয়াছে। সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডেযে জাগরণ, যে উন্নতির আকা৬ক্ষা, যে আবেগ আসিয়াছে জাপানে, পারস্যে, তুরস্কে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ৷ ভারতের বড়লাট লর্ড মিন্টোও স্বীকার করিয়াছেন, সে প্রবাহের গতিরোধ করা মানবের সাধ্যাতীত। অথচ মধ্যপন্থীরা একথা বুঝেন না। বা বুঝিয়াও বুঝেন না সক্রেই সংস্কারে প্রজা⊢

১৮৮

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

শক্তির সমর্থন করিয়া জীবনের সায়াহে ভারতবর্ষকে চিরকালের জন্যে জড়-জীবন যাপনের আদেশ করিয়াছেন। এ অবস্থায়—-জাতীয় দলের উন্নতি-চেল্টা উপহাসাম্পদ না মধ্যপন্থীদিগের প্রনির্ভরতা ও জড়ত্ব উপহাসাম্পদ?

যোগ্যতা বিচার

ভাবে বোধ হয়, সভাপতি মহাশয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার কথায় অযথা বিশ্বাস-বান হইয়া মনে করেন, আমরা আজও স্বায়ত-শাসনের উপযুক্ত নহি ৷ স্বায়ত-শাসন সম্বনীয় প্রস্তাবের আলোচনাকালে একজন বক্তাও এই কথাই বলিয়া– ছিলেন! আমাদিগকে অনুপযুক্ত বলা ব্যতীত আাংলো-ইভিয়ার পক্ষে স্বেচ্ছাচার সমর্থনের অন্য উপায় নাই। এ অবস্থায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার স্বার্থ-সমর্থক যক্তি স্বাভাবিক ও সঙ্গত। কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষে এই যুক্তি গ্রহণ করা অস্বাভাবিক ও অসুসত। গ্লাডুপ্টোন ব্লিয়াছিলেন, স্বাধীনতাস্ভোগই লোককে স্থাধীনতার উপযুক্ত করে। স্বায়ত-শাসন-সম্ভোগ ব্যতীত স্বায়ত-শাসনের উপযোগী হইবার উপায়াভর নাই। আমরা অবগত আছি, স্বায়ত-শাসন পাইলে প্রথম আমাদের ভ্রম প্রমাদ অনিবার্য্য। সকল দেশেই এইরূপ হইয়াছে। জাপানের ভ্রম ইইয়াছে, তুরু**ক ও পারস্যে এখনও ভ্রম ঘটিতেছে।** তাই বলিয়া স্বায়ত-শাসনের পথে অগ্রসর না হওয়া আর উল্লতির পথ চিরদিনের জন্য অর্গলবদ্ধ করা একই কথা। উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা ভ্রান্ত শিক্ষায় আপনাদিগকে অসার ও অনুপযোগী বলিয়াই বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছিলাম। আজ সে দ্রম অপগত। আজ আমরা বুঝিয়াছি, এ জাতির জীবন-স্পন্দন বন্ধ হয় নাই—–এ জাতি জীবিত । এই অনুভূতিই জাতীয় উন্নতির পক্ষে যথেপট । আর এই অনুভূতিই আমাদিগকে উন্নতির পথারাঢ় করিয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে মোক্ষলাভে সক্ষম করিবে। এ অবস্থায়—-আজ যখন উন্নতি আরুথ তখন---যোগ্যতা-বিচারের ছল করিয়া উন্নতির গতি বন্ধ করিয়া স্থির হওয়া মূঢ়ের কার্য্য। আজ জাতীয় জীবনে যে সময় উপস্থিত সে সময়ের গতি রুদ্ধ হইলে আমরা উন্নতির পথে পিছাইয়া পড়িব—–অগ্রসর হইতে পারিব না। সুতরাং আমাদিগকে অগ্রসরই হইতে হইবে; শঙ্কায় বা সন্দেহে বিচলিত না হইয়া স্থির ও ধীরপদে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হওয়াই আজ আমাদের কর্ত্তবা।

চাঞ্চল্য-চিহ্ন

আমাদের কোন কোন বিজ মধ্যপন্থী এমন কথাও বলেন যে, আজকাল কোন কোন সভায় কিছু কিছু গোলমাল হয়; ইহাতে রাজনীতিক অধিকার লাভে আমাদের অযোগ্যতাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এ কথাটাও তাঁহাদের মৌলিক নহে, কপটাচারী আংলো-ইপ্রিয়ানদিগের মতের প্রতিধ্বনি মাত্র। যে সকল আংলো-ইভিয়ান এরূপ মত প্রকাশ করেন, আমরা তাঁহাদিগকে কপটাচারী বলিলাম, কারণ তাঁহারা অবশাই অবগত আছেন যে, বিলাতে রাজনীতিক সভাসমিতিতে যেরাপ গোলমাল হয় ভারতে সভা-সমিতিতে তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। ধীর প্রকৃতি ভারতবাসীরা সেরূপ ব্যবহারে একাভ অনভ্যস্ত। আমাদের দেশে সভা-সমিতিতে গোলযোগের দুইটী প্রধান দৃষ্টান্ত দেখা যায়;—সুরাটে সুরেন্দ্রনাথের কথায় কেহ কর্ণপাত করে নাই, তিনি বজুতা বন্ধ করিয়া বসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আর সুরাটেই মধ্যপদ্বীরা শ্রীষুত বাল গঙ্গাধর তিলককে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে বিষম গোলযোগ উৎপন্ন হয়। ইংলণ্ডে এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটিয়া থাকে। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় প্রধানমন্ত্রী মিল্টার ব্যালফোর গোলমালে বক্তৃতা করিতে পারেন নাই, শেষে দুইজন ছাল্ল নারীবেশে মঞে উঠিয়া তাঁহাকে জুতার মালা উপহার দেয় ৷ তিনি হাসিতে হাসিতে সে উপহার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর একবার ছারুগণ কোন বক্তার বক্তায় অসন্তপট হইয়া মারামারি করে ও পুলিশকে বিষম প্রহার করে। বিচারে ছাত্রদিগের কোনরাপ দণ্ড হয় নাই। আমরা অবশ্য এমন কথা বলি না যে, আমাদের দেশে রাজনীতিক আন্দোলনে সভা-সমিতিতে এইরাপ চাঞ্চল্য আর™ধ হউক। আমরা এই কথা বলিতে চাহি যে, এইরাপ চাঞ্চল্যে স্বায়ত-শাসনলাভে আমাদের অযোগ্যতা প্রতিপন্ন হয় না; পরস্ত ইহা জীবনের লক্ষণ। বরং ইহাতে প্রতিপত্র হয় যে, আমরা যুগ-ব্যাপী-জড়ত্ব-শাপ-মুক্ত হইয়া নবীন উদ্যমে নবীন শজিতে নূতন কম্মক্ষেৱে প্রবেশ করিতেছি।

হুগলীর পরিণাম

হগলীতে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন দারা জাতীয় পক্ষের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। মধ্যপন্থীদের মনের ভাব তাঁহাদের আচরণে বোঝা গেল, জাতীয় পক্ষের প্রাবল্যও সকলের অনুভূত হইল। বঙ্গদেশ যে জাতীয়ভাবে পূর্ণ হইয়াছে, তাহার আর কিছুমান্ত সন্দেহ নাই। অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন হগলীতে জাতীয় পক্ষের দুর্ব্বলতা ও সংখ্যার অল্পতাই অনুভূত হইবে; কিন্তু তাহা না হইয়া বরং এই বর্ষকালব্যাপী দলন ও নিগ্রহে এই দলের কি অজুত শক্তিবৃদ্ধি এবং তরুণদলের হাদেয়ে কি গভীর জাতীয় ভাব ও দৃঢ় সাহস জন্মিয়াছে তাহা দেখিয়া প্রাণ আনন্দিত ও প্রফুল্ল হইল। কেবলমান্ত কলিকাতা বা পূর্ব্বেঙ্গ হইতে নহে, চব্বিশ প্রগণা, হগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গের জেলা সকল হইতে জাতীয় পক্ষের প্রতিনিধি সমিতিতে গিয়াছিলেন। আর একটী শুভ লক্ষণ তেজস্বী ও ভাবপ্রবণ নবীন দলের পক্ষে যাহা সহজসাধ্য নহে অথচ বিশেষ প্রয়োজনীয়, শৃঙ্খলা ও নেতাদের আজানুবর্তীতাও হগলীতে দেখা গেল। জাতীয় পক্ষের নেতারা কখনও মধ্যপন্থী নেতাগণের ন্যায় স্বেচ্ছায় কার্য্য চালাইতে ইচ্ছুক হইবেন না, দলের

সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গন্তব্যপথ নির্ণয় করিবেন, কিন্তু একবার পথ স্থির হুইলে নেতার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আবশ্যক। সেই বিশ্বাস যদি টলে, নূতন নেতা মনোনীত করা গ্রেয়স্কর, কিন্তু কার্য্যের সময়ে প্রত্যেকে নিজের বুদ্ধি না চালাইয়া একপ্রাণ হুইয়া নেতাকে সাহায্য করা উচিত। পথনির্ণয় স্বাধীন চিন্তা ও বহু জনের পরামর্শ নির্ণীতপথে সৈন্যের ন্যায় শৃত্খলা ও বাধ্যতা, ইহাই প্রজাতন্ত্রে কার্য্যসিদ্ধির প্রকৃত উপায়। অতএব হুগলী অধিবেশনে ইহাই প্রথম উপলব্ধি হয় যে, জাতীয় পক্ষ এক বৎসরের নিগ্রহ ও ভয় প্রদর্শনে অধিক বলান্বিত ও শৃত্খলাপ্রাণ্ড হুইয়াছে। ইহা এতদিনের অন্তনিহিত শক্তির বিকাশ।

দ্বিতীয় ফল মধ্যপন্থীদের মনের ভাব কার্যো প্রকাশ হইয়াছে। তাঁহারা শাসন-সংস্কার-প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন, সে সংস্কার নির্দেষি হউক বা সদোষ হউক, দেশের হিতকর হউক, বা অহিতকর হউক, তাহা সংস্কার নামে অভি-হিত, অতএব গ্রহণীয়, পুরাকালের কংগ্রেসের চিরবান্ছিত দুর্লভ স্বপ্ন, অতএব গ্রহণীয়; তাহা লর্ড মরলীর প্রসূত মানস-সভান, অতএব গ্রহণীয়; উপরন্ত মরলী-রিপণ-প্রসূত স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের চরম-অবস্থা আনয়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অতএব গ্রহণীয় ! তাহাতে জাতীয় একতার আশা লুপ্তপ্রায় হউক বা না হউক, নেতাদের স্বপ্ন ভাঙ্গিবার নহে। বয়কটকে বিষরহিত প্রেমময় স্বদেশীতে পরিণত করাও নেতাদের স্থির অভিসন্ধি। স্বয়ং সভাপতি মহাশয় শেক্ষপীরকে প্রমাণ করিয়া বয়কট নাম বয়কট করিবার পরামর্শ দিলেন; পাছে মরলী-মডারেটের মিলনমন্দিরে বিদ্বেষ বহিল প্রবেশ করিয়া সব ভুসমসাও করে। আরও বোঝা গেল যে মধ্যপন্থী নেতাগণ বৈধ প্রতিরোধ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প। বাস্তবিক মিলন যখন হইয়াছে, শাসন-সংস্কার যখন গৃহীত হইয়াছে, তখন প্রতিরোধের আর আবশ্যকতা কোথায় ? বিপক্ষে বিপক্ষে প্রতিরোধ সম্ভব, প্রেমিকে প্রেমিকে প্রার্থনা অভিমান ও ক্ষণিক মনোমালিন্যই শোভা পায় ৷ এই পুরাতন-নীতির পুনঃসংস্থাপনের ফল, নেতাগণ কন্ভেন্সনকে আরও দৃঢ় করিয়া আলিখন করিয়া রহিয়াছেন, মাশ্রাজে বয়কট বর্জন করিলে সুরেশ্রনাথ কন্ভেন্সন ত্যাগ করিবেন বলিয়া কয়েকজন যে আশা পোষণ করিয়াছিলেন, সেই আশা বিনছট হইয়াছে। কেবল একটি বিষয়ে এখনও সন্দেহ বর্তমান, জাতীয় মহাসভার পুনঃসংস্থাপন সম্ভব না অসম্ভব? একপক্ষে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে দেখা গেল যে, সভায় কোন পূর্ণ জাতীয়ভাব প্রকাশক প্রস্তাব গৃহীত হইলে আমরা সমিতি ভাঙ্গিয়া সরিয়া পড়িব, ইহাই মধ্যপন্থী-দিগের দৃঢ়সঙ্কল হইয়াছে। তাহা যদি হয়, তবে প্রকৃত ঐক্য অসভব। ইহার তাৎপর্য্য কি ? পূর্ণ রাজপুরুষ ভক্তি প্রকাশক কোনও প্রভাব উপস্থিত হইলে জাতীয় পক্ষ তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য, যত নিক্ষল প্রার্থনা, প্রতিবাদ, নিবেদন গ্রহণ করিতে বাধ্য, কিন্তু পূর্ণ জাতীয় ভাববাঞ্চক প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না। এই সর্জে কোন প্রবল ও বর্জনশীল দল সমিতিতে থাকিতে সম্মত হইবে না, বিশেষতঃ যে দলের স্থায়ীভাবে সংখ্যাধিক্য হইয়াছে। অপরপক্ষে জাতীয় পক্ষের নির্বল্জে

দুই দলের একটা কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, জাতীয় মহাসভায় ঐক্য স্থাপন তাহার উদ্দেশ্য, সভ্যদিগের চারিজন মধ্যপন্থী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বৈকুষ্ঠ নাথ সেন, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার এবং চারিজন জাতীয় পক্ষের শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রজকনাথ রায়, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃতান্তকুমার বসু। ইহারা যদি একমক হইকে পারেন, তাহা হইলে জাতীয় মহাসভার ঐক্য সংস্থাপন চেল্টাসাধ্য হইবে। চেল্টা করিলেও যে ঐক্য সাধিত হইবে, তাহাও বলা যায় না; কেন না যদি মেহতা ও গোখলে অসম্মক্ত হয়েন অথবা বর্ত্তমান ক্রীড ও কার্য্যপ্রণালী বিনা আপত্তিকে গ্রহণ করিকে বলেন, তাহা হইলে মধ্যপন্থী নেতাগণের পক্ষে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় মহাসভা সংস্থাপনে উদ্যোগী হওয়া অসম্ভব।

এই অবস্থায় একতা অসম্ভব, কিন্তু যে ক্ষীণ আশা এখনও বিদ্যমান, তাহাই জাতীয় পক্ষ ধরিয়া আছেন, সেই আশায় সংখ্যায় অধিক হইলেও তাঁহারা স্ক্রবিষয়ে মধ্যপন্থীদের নিকট ইচ্ছা করিয়া হার মানিয়াছেন। এইরূপ ত্যাগস্বীকার ও আত্মসংযম সবল পক্ষই দেখাইতে পারে। যাঁহারা স্বীয় বল অবগত আছেন, তাঁহারা সক্ষদা সেই বল প্রয়োগ করিতে ব্যস্ত হয়েন না। আমরা সুরাট অধিবেশনে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছিলাম, বোস্বাইয়ের নেতাদিগের অন্যায় অবিচার ও অপমান সহ্য করিয়াও শেষে ধৈর্য্যভঙ্গে সেই আত্মসংযমের ফললাভ করিতে পারিলাম না, সেই দোষের প্রায়শ্চিতরূপে হগলীতে প্রবল হইয়াও দুর্ব্বল মধ্যপন্থীদলের সমস্ত আবদার সহ্য করিয়া একতার সেই ক্ষীণ আশা যাহাতে আমাদের দোষে বিনষ্ট না হয়, সেই একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া প্রাদেশিক সমিতিকে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিলাম ৷ দেশের নিকট আমরা দোষযুক্ত হইলাম, ভবিষ্যৎ বংশীয়দের অভিশাপ মুক্ত হইলাম, ইহাই আমাদের আত্মসংখ্যমের যথেশ্ট পুরস্কার। মহাসভার একতা সাধিত হইবে কি চিরকালের জন্য বিন্তট হইবে, তাহা ভগবানের ইচ্ছাধীন আমাদের নহে। আমরা ক্রীড সহ্য করিব না, যে কার্য্য প্রণালী দেশের অনুমতি না লইয়া প্রচলিত করা হইয়াছে, দেশের প্রতিনিধিগণ প্রকাশ্যসভায় তাহা গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত আমরাও গ্রহণ করিব না। এই দুই বিষয়ে আমরা কৃতনিশ্চয়, কিন্তু তাহা ভিন্ন আমাদের পক্ষ হইতে কোনও বাধা হইবার সভাবনা নাই। বাধা যদি হয়. অপর পক্ষ হইতে হইবে।

কিন্তু আমরা এই ক্ষীণ আশার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেল্ট থাকিতে পারি না। কবে কোন্ অতকিত দুকিপাকে বঙ্গদেশের ঐক্য ছিন্নভিন্ন হইবে, তাহার কোনও স্থিরতা নাই। মহারাষ্ট্র, মান্দ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবের জাতীয় পক্ষ আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। বঙ্গদেশ ভারতের নেতা, বঙ্গদেশের দৃঢ়তা, সাহস ও কল্মকুশলতায় সমস্ত ভারতের উদ্ধার হইবে, নচেৎ হওয়া অসম্ভব। অতএব আমরা জাতীয় দলকে আহান করিতেছি, এখন কার্য্য ক্ষেত্রে আবার অবতরণ করি; ভয়, আলস্য, নিশ্চেল্টতা দেশের জন্য

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

১৯৪

না হইলেও কমিয়া গিয়াছে, মুসলমান ও খ্রীপ্টানের সংখ্যার্দ্ধি হইয়া হিন্দুর সংখ্যা সবেগে হ্রাস পাইতেছে, পূর্বের সময়োপযোগী, বর্তমানে অনিষ্টকারক কয়েকটি প্রথার উপর অনুচিত মমতা বশতঃ জাতির উন্নতি ও মহত্ব প্রাণ্ডি স্থগিত হইয়া রহিয়াছে। পূর্বেকালে যখন হিন্দু রাজা ছিলেন, রাজশক্তিই ব্রাহ্মণদিগের প্রামর্শে ও সাহায্যে সমাজরক্ষা ও সময়োপযোগী সমাজ-সংস্কার তবে প্রজাশক্তি বন্ধিত হইতেছে ও সংস্থাপিত হইবার চেম্টা করিতেছে। এই অবস্থায় প্রজাশক্তি প্রাতন হিন্দু রাজশক্তির স্থান অধিকার করিয়া সেই রূপেই সমাজরক্ষা ও সমাজ-সংস্কার করা উচিৎ; নচেৎ হিন্দু জাতি উৎসন্ন হইবে। শ্রীহট্টে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই প্রস্তাবের মুখ্য সমর্থক ছিলেন, প্রতিনিধিগণের মধ্যেও বোধহয় বিলাত-ফেরত কেহ ছিলেন না, গ্রামে গ্রামে নিকাচিত প্রতিনিধি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এই-স্থলে এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হওয়া আশার লক্ষণই বলিতে হইবে। ইহাতে হিন্দুসমাজেও আঘাত লাগিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। অবশ্য এইরূপ প্রস্তাব অতিশয় সতর্কতার সহিত গৃহীত হওয়া উচিত। **রাহ্মণগণ ও প্রত্যেক বর্ণের মুখ্য মুখ্য সামাজিক নেতাদিগকে প্র**স্তাব-গ্রহণে সম্মত করাইয়া তাহার পরে প্রস্তাব গ্রহণ করাই যুক্তি-সঙ্গত।

বিদেশ যাত্রা

বিদেশযাত্রার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আর মতের অনৈক্য থাকিতে পারে না। আমরা সকলে স্বদেশীর বিস্তারকে জাতির জীবন রক্ষার মুখ্য উপায় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি, বিদেশযালা নিষিদ্ধ হইলে সেই বিস্তার হওয়া দুঃসাধ্য। যাঁহারা শিল্পশিক্ষার জন্য বিদেশে যাইবেন, তাঁহারা দেশের রক্ষার্থে এবং সমাজ পুল্ট্যুর্থে বিদেশ যাত্রা করিবেন, পুণ্যকার্য্যে ধর্মকার্য্যে ব্রতী হইয়া যাইবেন। কোন মুখে সমাজ এই কার্য্যকে পাপকার্য্য বা সমাজচ্যুতির উপযুক্ত কুকন্মর্ম বলিবেন, কোন্ মুখে উৎসাহী যুবকর্ন্দকে এই মহৎ উন্নতি-চেম্টায় নিযুক্ত করিয়া সেই আজাপালনের পুরস্কার না দিয়া বিষম সামাজিক শাস্তিতে দণ্ডিত করিবেন। এতগুলি তেজয়ী ধন্মপ্রাণ স্বদেশহিতৈষী জাতীয়ভাবাপর যুবক যদি সমাজ হইতে বিতাড়িত হন, তাহাতে হিন্দু সমাজের কি কল্যাণ সাধিত হইবে--যুক্তির দিক দেখিতে গেলে বিলাত-যাত্রা নিষেধের পক্ষে কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। শাস্ত্রের দিক হইতেও বিদেশ যাত্রার কোনও অলঙঘনীয় প্রতিবন্ধক হয় না। শাস্তের দুয়েকটি শ্লোকের দোহাই দিলে চলে না, শাস্তের ভাবার্থ ও আর্য্যসমাজের পুরাতন প্রণালীও দেখিতে হয়। অতি অর্কাচীন কাল পর্য্যন্ত বিদেশ যাত্রা ও সমুদ্র যাত্রা বিনা আপত্তিতে চলিত, আর্য্য সাহিত্যে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন সমাজ-রক্ষা ও আচার-রক্ষা কঠিন হইয়া উঠে, তখন রাহ্মণদের পরামর্শে সমুদ্রযাত্রা ও আটক নদীর ওইদিকে প্রবাস করা

নিষিদ্ধ হয়। সেইরাপ কারণেই জাপানে বিদেশযালা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এইরাপ বিধান কালস্পট, কালে নপট হয়, সনাতন প্রথা হইতে পারে না। যতদিন জাতি ও সমাজ তাহা দ্বারা উপকৃত ও রক্ষিত হয়,ততদিন সময়োপযোগী বিধান থাকে, যে দিন জাতির ও সমাজের বিকাশ ও উন্নতির অন্তরায় হইয়া যায়, সে দিন হইতে তাহার বিনাশ অবশ্যস্তাবী। বিদেশকেরত ভারতবাসীর ইংরাজ অনুকরণ, সমাজের উপর উপেক্ষা ভাব এবং উদ্ধৃত আচরণ ও কথায় এই কল্যাণকর সংক্ষারের বিলম্ব হইয়াছে। সমাজ মানিয়া, সমাজে থাকিয়া সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়, তাহা সমাজ বিনাশের চেপটায় সাধিত হয় না।

তারপুরে চিনির কল

গতবারে তারপুরে যে দেশী চিনি প্রস্তুত করিবার নূতন চেম্টা চলিতেছে, তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়, নূতন সংস্থার যাঁহারা উদ্যোগী তাঁহারা আমাদের নিকট এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের কথায় বোঝা গেল যে প্রথম পারিবারিক বিপদেই এই কলে কার্য্য বন্ধ হইল, দ্বিতীয়বার রায় ধনপতসিংহের বিধবা স্ত্রী একজন সুদক্ষ ম্যানেজারের সাহায্যে চালাইতে লাগিলেন, সেই ম্যানেজারের মৃত্যুতে আবার কল বন্ধ হইল। এই অবস্থায় তাঁহার দারা এই য়হৎ চেম্টা সফল হইবার যোগ্য হইয়াও সফল হয় না দেখিয়া কলের মালিক কল বিক্রয়ের জন্য বাস্ত হওয়ায় নূতন কোম্পানী অলমুল্যে কিনিতে পারিলেন। বাজারে জাভার চিনির প্রভূত বিক্রয়ে শ্বদেশী চিনি প্রথম অবস্থায় তত লাভকর যদি না হয়, তথাপি ওড় হইতে নানা বস্তু প্রস্তুত হয় যাহাতে নিশ্চিত ও প্রচুর লাভ হয়, কোম্পানীর কর্ত্তাগন সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য দিবেন। ইহা ভিন্ন আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপত রসায়ন বিদ্যাপারগ শ্রীষুত গিরীন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই কার্য্যে যোগদান করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় এই সংস্থার বিশেষ উন্নতির আশা করা যায়। মূলধন সংগ্রহ হইলেই গিরীন্তরাবু দেশে ফিরিয়া কার্যা আরম্ভ করিবেন।

ধর্ম্ম ৬**ঠ সংখ্যা** ১১ই আমিন ১৩১৬

লালমোহন ঘোষ

গত পূর্বে শনিবার বাগমীবর লালমোহন ঘোষ মহাশয়ের লোকান্তর হইয়াছে। ইনি শেষ বয়সে বিশেষ বুঝিয়াছিলেন, জনসাধারণকে বর্জন করিয়া কেবল মুপ্টিমেয় ইংরাজী-শিক্ষিত লোককে লইয়া রাজনীতিক আন্দোলন সফল হইতে পারে নাঃ প্রাদেশিক সমিতিতে বাঙ্গালায় বজুতা করিবার প্রথা তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন।

লালমোহনের প্রথম বয়সে বাঙ্গালীর পরমুখাপেক্ষিতা দূর হয় নাই তাই তিনি বিলাত পার্লামেন্টের সভা হইবার চেম্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে চেম্টা ঘটনাচক্রে ফলবতী হয় নাই।

লালমোহন অসাধারণ বাংমী ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। বিলাতে অনেকে তাঁহার বজুতা বিদেশীর বলিয়া বুঝিতে পারিত না। ইলবার্ট বিলের আন্দোলনকালে ব্যারিস্টার বানসন যখন টাউন হলে বাঙ্গালীদিগকে গালি দেন তখন লালমোহন ঢাকায় নর্থবুক হলে যে বজুতা করিয়াছিলেন, তাহার তীব্রতার তুলনা নাই। সেই বজুতার ফলে বানসন ভারতবাসী অ্যাটনী-কর্তৃক বজ্জিত হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন।

লালমোহন শেষ বয়সে নব ভাবের ভাবুক হইতে পারেন নাই; বরং পূর্বে– সংস্কার প্রযুক্ত নব ভাবের ভাবুকদিগকে নিন্দাও করিয়াছিলেন।

কিন্তু বাঙ্গলায় 'বয়কট' প্রবর্তনের প্রস্তাব তাঁহার বিরাট কীন্তি, দিনাজপুরে তিনি বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ রূপে বিদেশী–বর্জনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

গ্রীহট্টের প্রস্তাবাবলী

সহযোগিনী 'সঞ্জীবনী' সুরুমা উপত্যকা সমিতির অধিবেশনে বয়কট প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল এবং উপনিবেশিক স্থায়তশাসন ও নির্বাসিতগণের সম্বন্ধে সন্তোমজনক কোন প্রস্তাব হইল মা বলিয়া দুঃখ-প্রকাশ করিয়াছেন। 'বেললী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রস্তাবগুলির স্রমাত্মক ইংরাজী অনুবাদ দেখিয়া সহযোগিনী দ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই অনুবাদ ছম-পূর্ণ। যে স্থানে শব্দ ব্যবহাত হইয়াছে, মূল বাঙ্গালায় সে স্থানে Self-Government স্থরাজ-শব্দ ছিল, স্থরাজে প্রত্যেক সভ্যজাতির অধিকার আছে, সমিতি দেশবাসী-গণকে সর্ব্ববিধ বৈধ উপায়ে স্বরাজ-লাভের চেল্টা করিতে আহান করিতেছেন, এই মম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের সহিত ভারতের ঔপনিবেশিক সম্বন্ধ নাই; উপরম্ভ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন ভারতের পূর্ণ জাতীয় বিকাশের ও মহত্বের উপযোগী শাসন-তন্ত মহে; এই বিশ্বাস-বলে সমিতি বিনা বিশ্লেষণে স্বরাজই আমাদের রাজনীতিক চেপ্টার লক্ষ্য বলিয়া নিণীত করিয়াছেন। বয়ুকট প্রস্তাবও পরিত্যক্ত হয় নাই; কিন্তু তাহা বঙ্গভঙ্গের সহিত জড়িত না করিয়া সমিতি শ্বরাজ লাভ ও দেশের উন্নতির জন্য বয়কটের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া সমর্থন করিয়াছেন ৷ যে বৈধ উপায়ে স্বরাজ লাভের চেল্টা সমিতির অনুমোদিত, বয়কট সেই বৈধ উপায়ের মধ্যে গণ্য ও প্রধান, ইহাই প্রীহট্টবাসী– দিগের মত। বয়কটের প্রয়োজনীয়তা বঙ্গভঙ্গ-প্রতিকারে সীমাবদ্ধ হইলে তাহার ক্ষেত্র অতি সক্ষীর্ণ হইবে। সমিতির গৃহীত প্রস্তাব রচনায় এই মূল

নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে যে, আঅশ্তি দারা যাহা লভ্য তাহারই উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্ব্য, রাজপুরুষদিগের নিক্ট আবেদন নিবেদন বর্জনীয়, এবং যে যে বিষয় তাঁহাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে অথচ উল্লেখ করা আবশ্যক, সেই সম্বন্ধে গড়র্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা বা প্রতিবাদ বর্জন পূর্বক মতপ্রকাশ মাত্র করাই যথেষ্ট। এই নিয়মানুসারে সমিতি নিকাসিতগণের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে র্থা বাগাড়য়র না করিয়া সংক্ষেপে প্রতিবাদ করা হইয়াছে। সহযোগিনী ঔপনিবেশিক স্বায়জুশাসন সকাবাদী সম্মত বলিয়াছেন দেখিয়া বিদিমত হইলাম। জাতীয় পক্ষ মধ্যপন্থীদিগের মন রাখিবার উদ্দেশ্যে সভা–সমিতিতে ঔপনিবেশিক স্থায়ন্তশাসন প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন না বটে, কিন্তু সেই রূপ স্থায়ন্তশাসনে তাঁহারা আদৌ আস্থাবান নহেন এবং তাহাকে স্বরাজ শব্দে অভিহিত করিতে সম্মত নহেন ৷ অসম্পূর্ণ স্বরাজ অধীনতা-দোষে দৃষিত বলিয়া শ্বরাজ নামের অযোগ্য; সেইরূপ স্বায়ত্শাসন ইংরাজ উপনিবেশ বাসিগণও অসম্ভদট, সেই অসভোষ হেতু যুক্ত সাম্রাজ্য (Imperial Federation) সৈন্য ও নৌ-সেনা গঠনের চেম্টা চলিতেছে। তাঁহারা অধীন হইয়া রুটিশ সামাজ্যভুক্ত থাকিতে চাহেন না, সামাজ্যের সমান অধিকার-প্রাপ্ত অংশীদার হইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। যখন নবজাত অলব্ধপ্রতিষ্ঠ অখ্যাতনামা শি**ভ**-জাতির এই মহতী আকাঙ্কা জ্মিয়াছে, তখন আমরা প্রাচীন আর্য্যজাতি যদি অসম্পূর্ণ ও জাতীয় মহত্ববিকাশের অনুপযোগী স্বায়তশাসন আমাদের এই মহান্ ও ঈশ্বরপ্রেরিত অভ্যুত্থানের চরম ও পরম লক্ষ্য বলি, তবে তাহা আমাদের হীনতা ও ভগবানের সাহায্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে অযোগ্যতা প্রকাশ করা ভিন্ন আর কি বলিব গ

জাতীয় ধনভাণ্ডার

হগলী প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে জাতীয় ধনভাণ্ডার ফেডারেশন হল নিশ্মাণে ব্যয়িত করার প্রস্তাব অবিবাদে গৃহীত হইয়াছিল। মধ্যপন্থী দেশ নায়ক শ্রীষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, জাতীয় পক্ষের নেতা শ্রীষ্ঠ অরবিন্দ ঘোষ ইহার অনুমোদন করিয়াছিলেন, বিনা বিবাদে ও উৎসাহের সহিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ইহার পর সমস্ত দেশের আকাৎক্ষা উপেক্ষা করিয়া অন্য মত সৃপিট করিবার চেপ্টা দেশহিতেষীর কার্য্য নহে। অথচ 'বেঙ্গলী' পগ্রিকায় একজন পত্ত-প্রেরক পুরাতন সংস্কারের বশীভূত হইয়া ফণ্ডের দাতাগণকে কুপরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, হগলীতে সমবেত দেশনায়ক ও প্রতিনিধিগণ বিনা বিচারে ও ক্ষণিক উত্তেজনার বশে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। বস্ত্র-বয়ন-শিল্পের সাহায্যের জন্য ধন ভাণ্ডারের সৃপ্টি হইয়াছে, অন্যথা ব্যয়িত হইলে ফণ্ডের ট্রপ্টাগণ দেশের নিকট

বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে অপরাধী হইবেন। ধনভাগুরের অর্থ ফেডারেশন হল নিম্মাণ অপেক্ষা জাতীয় বিদ্যালয় বা বেলল টেকনিক্যাল ইনপিটটিউটের সাহায্যে ব্যয়িত করিলে তাঁহার মতে দেশের উপকার ও জাতীয় অর্থের সদ্যবহার হইবে। এইগুলিই মহৎ কার্যা, ফেডারেশন হল নিম্মাণ অতিশয় ক্ষুদ্র ও নগণ্য কার্য্য, হলের অভাবে আমরা এতদিন কোন অসুবিধা বোধ করি নাই; আর কিছুদিন হল নিশ্মিত না হইলেও চলে। প্রথম কথা, বস্তুবয়ন ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যদি বিশ্বাসঘাতকতা হয়, তবে লেখক মহাশয় জাতীয় বিদ্যালয়ের বা টেকনিক্যাল ইন্পিটটিউটের কথা উত্থাপন করিয়াছেন কেন? ইহাতে কি এই বুঝা যায় না যে, অন্য উদ্দেশ্যে বায় করা তাঁহার মতে অপরাধ নয়, কিন্তু ফণ্ড তাঁহার অনভিমত উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবার সভাবনা দেখিয়া কেবল বাধা দিবার জন্য তিনি বিশ্বাস্থাতকতা বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন ? ট্রস্টীগণ কাহার নিকট অপরাধী হইকেন? দেশের মত হুগলীতে প্রকাশ হইয়াছে, দেশের প্রতিনিধিগণ এই উদ্দেশ্যই উপযুক্ত উদ্দেশ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব এইরাপ অর্থব্যয়ে টুফ্টীগণ দেশের নিকট অপরাধী হইবেন না ৷ দাতাদের কথা যদি বলেন, তাহা হইলে আমরা জিভাসা করি, দাতাগণ এই ধনভাণ্ডার নিজধন নিজ-সম্পত্তি হইয়া থাকিবে বলিয়া দিয়াছেন, না জাতীয় ধন, জাতীয় সম্পতি হইবে বলিয়া দিয়াছেন? যদি এই ধনভাণ্ডার জাতীয় সম্পত্তি হয়, তাহা হইলে অর্থ সমস্ত বঙ্গদেশের মতানুসারে ব্যয়িত হওয়া উচিত। সমস্ত বঙ্গদেশ যখন এই উদ্দেশ্য নির্ণয় করিয়াছে, তখন দাতাগণ দেশের মতের বিরুদ্ধে মত দিয়া বাধা দিবেন কেন? অতএব এইরূপ অর্থ ব্যয়ে দাতাগণের নিকটও টুল্টীগণ অপরাধী হইবেন না। তবে এই একটি আপত্তি করা যায় যে, হয়ত তাঁহারা আইনপাশে বদ্ধ, অন্য উদ্দেশ্যে ফণ্ড প্রয়োগ করিতে অসমর্থ, যখন জাতীয় ধন-ভাণ্ডার স্থাপিত হয় তখন সংগৃহীত অর্থ বস্তুবয়ন ইত্যাদি কার্যো ব্যয়িত হইবে, এইরূপ ঘোষণা হইয়াছিল। এখন বিবেচ্য, ইত্যাদি শব্দের অর্থ কি? বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি শিল্পকার্য্য, না বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি জাতীয় কার্য্য ? শেষ অর্থ যদি ধরা যায়, তাহা হইলে আইনের আপত্তিও কাটিয়া যায় ৷ যদি ট্রুল্টীগণ নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েন, তবে দাতাগণের সভা করিয়া বঙ্গদেশের প্রতিনিধিগণের মতে মত দেওয়া হউক, ট্রপ্টীগণ সেই অনুমতিতে সন্দেহ-মুক্ত হইতে পারেন। জাতীয় বিদ্যালয় বা টেকনিক্যাল ইন্স্টিটিউটে ফণ্ড ব্যয় করার সম্বন্ধে নানা কারণে মতভেদ হইবার সভাবনা। আর বস্ত-বয়ন-শিল্পে ব্যয় করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, বয়ন শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রের অবশিপ্ট কার্য্য ব্যক্তিগত চেপ্টা বা যৌথ কারবার দারাই সম্পন্ন হইতে পারে। এদিকে ফেডারেশন হল নিম্মাণ আর ক্ষুদ্র বা নিল্প্রয়োজনীয় কর্ম্ম বলা যায় না। এতদিন হল নির্মাণ না হওয়ায় সমস্ত জাতি সত্য-ভঙ্গ ও অকম্মণ্যতারূপ কলঙ্কভাজন হইয়াছে এবং তাহার অভাবে যথেপ্ট অসুবিধাও ভোগ করিতে হইয়াছে। বঙ্গদেশের জীবনকেন্দ্র কলিকাতায়

যে ধানি উঠে, সমস্ত দেশময় তাঁহার প্রতিধানি জাগে, তাহাতেই সমস্ত জাতি উৎসাহিত ও কর্ত্তব্যপালনে বলীয়ান হয়, আন্দোলনের আরম্ভ হইতে ইহা উপলব্ধি হইয়া আসিতেছে। কলিকাতায় নীরবতার ফলে দেশ নীরব ও উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছে। অতএব সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সম্মিলিত হইবার স্থানের অভাব সামান্য অভাব নহে। এরূপ স্থলে সমস্ত বঙ্গদেশের অভীপিসত উদ্দেশ্যে জাতীয় ধনভাগোরের অর্থ ব্যয় করা উচিত ও প্রশংসনীয়।

সার ফেরোজশাহ মেহতার বয়কট অনুরাগ

এতদিন আমরা এই ধারণার বশীভূত ছিলাম যে, সার ফেরোজশাহ মেহতা চিরকালই বয়কট বিরোধী ও স্বরাজে অনাস্থাবান। এই ধারণা সার ফেরোজ-শাহের আচরণে ও কথায় সূল্ট ও পুল্ট হইয়া আসিতেছে। এতদিন পরে সার ফেরোজশাহের হৃদয়ে প্রবল বয়কট-অনুরাগ-বহিং জ্বলিতেছে ও স্বরাজের উপর অজস্ত্র অকৃত্রিম-প্রেমধারা তাঁহার শিরায় শিরায় বহিতেছে এবং চিরকাল বহিয়াছে শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত ও রোমাঞ্চিত হইলাম। এই অভুত বারতা 'বেসলী' পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছে। লাহোরে সার ফেরোজশাহ মধ্যপন্থী মহাসভায় সভাপতিপদে নিৰ্কাচিত হইয়াছেন বলিয়া যত ইংরাজ দৈনিক 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া,' 'ফেটট্স্ম্যান,' 'ইংলিশ্ম্যান,' 'ডেলি নাুজ' সকলেই আনন্দে অধীর হইয়াছে; ইহা মেহতা মহাশয়ের কম গৌরবের কথা নহে। 'বেরলীর' আর সুবই সহ্য হয়, কিন্তু 'ইংলিশ ম্যানের' আনন্দে সহযোগী বিপ্রীত ভাবে অধীর হইয়া সার ফেরোজশাহ বয়কট ও স্বরাজ বিরোধী নহেন, ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেপ্টা করিতেছেন। সহযোগী বলিয়াছেন, সার ফেরোজ-শাহ কলিকাতা অধিবেশনে বয়কট প্রস্তাব উৎসাহের ও আনন্দের সহিত অনুমোদন করিয়াছিলেন, দাদাভাইয়ের মুখ হইতে স্বরাজ শব্দ নির্গত হইলে, তিনি আনন্দে প্রফুল হইয়া তাহার সমর্থন করিয়াছিলেন। আমরা ওনিয়া আহ্লাদিত হইলাম বটে, কিন্তু পোড়া মনের দোষে দুফ্ট সন্দেহ জয় করিতে পারিলাম না। মনে পড়িতেছে, মান্দ্রাজে ও আমেদাবাদে স্বদেশী প্রস্তাবে মেহতা মহাশয়ের তীব্র উপহাস। মনে পড়িতেছে, কলিকাতা অধিবেশনে শ্বদেশী প্রস্তাবে "স্বার্থত্যাগ করিয়াও" কথাগুলি সম্বিবিষ্ট করাইবার জন্য দুই-ঘণ্টা কাল ধরিয়া তিলকের উৎকট চেল্টা, মেহতার ক্রোধ ও তিরক্ষার ও গোখলে ও মালবিয়ার মধ্যস্থতা; প্রস্তাবে সেই কথার অবতারণায় মেহতার অভিমান ও মহাসভায় নীরবতা। মনে পড়িতেছে, সুরাটের সভাভঙ্গে মেহতার আনন্দ প্রকাশ। মনে পড়িতেছে, মেহতার পত্রে বঙ্গদেশের অপমান এবং মাজাজে বয়কট-বর্জন। মনে পড়িতেছে, ঔপনিবেশিক স্বরাজ দূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন-মাত্র বলিয়া মেহতার মত প্রকাশ। না, পোড়া মন 'বেঙ্গলীর' শুভ সংবাদে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে সম্মত হইতেছে না। আমরা নয়-ভাবে সহযোগীকে শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

200

তাহার কথার অলমার প্রমাণ দিতে অনুরোধ করিতেছি, নচেৎ এইরূপ সম্পূর্ণ অলীক ও অবিশ্বাসযোগ্য কথার প্রচারে মধ্যপত্মীদলের কি লাভ হইল, তাহা বুঝিলাম না।

কন্ভেন্সন্ সভাপতির নিবাচন

মেহতা মহাশয় যে লাহোরে কন্ভেন্সনের সভাপতি রাপে নিবর্বাচিত হইবেন, ইহা জানা কথা ছিল। বঙ্গদেশের বাহিরে শ্রীযুত সুরেক্তনাথ মধ্য-পত্তীগণের মধ্যে মধ্যপত্তী বলিয়া পরিগণিত নহেন, তাঁহাকে বাদ দিলে বল-দেশকে বাদ দিতে হইবে বলিয়া অগত্যা তাহারা তাঁহাকে স্থান দিতেছেন। তাঁহাদের দুর্দশা দেখিয়া দয়াও হয়, সুরেস্কনাথকে গিলিতেও পারেন না, উদ্গার করিতেও পারেন না। যাঁহাদের উদারমত, যাঁহাদের দেশের উপর প্রগাঢ় প্রেম, সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আবেগময়ী বজৃতা, তেজস্বিতা ও স্বদেশ প্রেমের গুণে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই প্রতিপত্তি নম্ট হইতে যাইতেছে. সাহসহীন বন্ধুগণের কুপরামশে সমস্ত ভারতের পূজা দেশনায়ক ক্ষুদ্র প্রাদেশিক দলের নেতায় পরিণত হইতেছেন। এই দিকে, সার ফেরোজশাহ মেহতা কন্ভেন্সনে অসঙ্গত আধিপত্য লাভ করিয়া এই জাল কংগ্রেস বয়কট-বজ্জন ও শাসনসংস্কার গ্রহণ পূক্রক রাজ-পুরুষভজির মালা রুদ্ধি ও জাতীয়তা হ্রাস করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহাতে বঙ্গদেশের মধ্যপন্থীগণ অসম্ভুষ্ট হন। তাহাতে কন্ভেন্সনের রাজার কি? বলদেশের উপর তাঁহার অবভা ও বিছেষ অতিশয় গভীর, বঙ্গদেশের প্রতিনিধিগণ কন্ভেন্সন বঙ্গন করিলেও তিনি তাঁহার নিদ্দিল্ট পথ পরিত্যাগ করিবেন। স্বরাজ, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা ও বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদের সহিত তাঁহার দলের কোনও আভরিক সহানুভূতি নাই, এই প্রস্তাবগুলি উঠিয়া গেলে তাঁহারা বাঁচেন। তাঁহারা মিল্টো স্বদেশী চান, স্বার্থত্যাগযুক্ত স্বদেশী চান না। এই অবস্থায় বঙ্গদেশের মধ্যপন্থীগণ হয় আস্তে আস্তে স্বকীয় রাজনীতিক মত সকল মেহতার শ্রীচরণে বলি দিতে বাধ্য হইবেন, নাহয় কন্ভেন্সন হইতে সরিয়া আসিতে হইবে। যুক্ত মহা-সভা তাঁহাদের আত্মরক্ষার একই উপায়, কিন্তু মেহতার কথার বিরুদ্ধে সাহসে কথা বলিয়া যুক্ত মহাসভা স্থাপনের চেল্টা করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে সেই বল কোথায় ? যাহা হৌক, এই সভাপতি নিব্বাচনে আমাদের পথ আরো পরিষ্কার হইয়াছে। মেহতা মজলিসে আমাদের স্থান নাই, যুক্ত মহাসভার আশা আরও ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে, এখন নিজের পথ দেখি। বর্ষশেষের পূর্বেই জাতীয় পক্ষের প্রামশ্ সভা ভাপন ও স্থিমলন প্রয়োজনীয়।

'ধর্ম্ম' পত্রিকার সম্পাদকীয়

২০১

ধর্ম্ম ৭ম সংখ্যা ১৮ই আহিন ১৩১৬

গীতার দোহাই

লণ্ডনে জাতীয় মহাসভার অধিবেশনের পক্ষে গীতাকে আশ্রয় করিয়া একটী অভুত ও রহস্যময় যুক্তি প্রদশিত হইতেছে। অধিকেশনের পরিপোষক**-**গণ সেইরূপ অধিবেশনে প্রকৃতফলের সম্ভাবনা দেখাইতে না পারিয়া দেশ-বাসীকে গীতোক্ত নিষ্কামধর্ম এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সম্বন্ধে সমতা অবলয়ন করিতে বলিতেছেন। লণ্ডন অধিবেশন আমাদের কর্ডব্য কম্ম, অতএব তাহার ফলাফল বিবেচনা না করিয়া কর্ত্তব্য কম্ম সমাধান করা উচিত। রাজ-নীতিতে ধম্মের দোহাই ও গীতার দোহাই দেখিয়া আমরা প্রীত হইলাম, এবং 'কম্মযোগী' ও 'ধম্মের' চেল্টার ফল হইতেছে ব্ঝিয়া আশান্বিত হইলাম। তবে গীতার এইরাপ ব্যাখ্যায় গোড়ায় গলদ হইবার সভাবনা দেখিয়া শঙ্কিতও হইলাম। কর্ত্তব্য পালনের উপায়-নিকাচনে অপরিণাম-দশিতা ও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির চেম্টায় উদাসীনতা শিক্ষা দেওয়া গীতার সমতাবাদ ও নিষ্কামকম্ম-বাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের কর্ত্তব্য কি, তাহা অগ্রে নির্ণয় করা আবশ্যক, তৎপরে ধীরভাবে অসিদ্ধিতে অবিচলিত হইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করা ধম্মানুমোদিত পছা। লভন অধিবেশন আমাদের কর্ত্তব্য কম্ম কিনা, তাহা লইয়াই বাদবিবাদ; সেই প্রশ্নের মীমাংসায় পরিণামচিন্তা বর্জুন করিতে পারি না। কর্ত্তব্য-নির্ণয়ে দুই স্বতন্ত বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক, প্রথম উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় উপায়। মুখ্য উদ্দেশ্য ধম্মানুমোদিত হইলে—-ধম্মের আবশ্যক অঙ্গ হইলে––পরিণামচিভা চলে না: তাহা আমাদের স্থধন্ম হয়, সেই ধন্মপালনে নিধনও প্রেয়ক্ষর তবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া পর্ধস্মপালন পাপ। যেমন, স্বাধীনতা অর্জনের চেল্টা, স্থাধিকার-লাভের চেল্টা, দেশহিত সম্পাদনের চেষ্টা জাতির প্রধান ধন্ম, দেশের প্রত্যেক কন্মী সভানের স্থধন্ম, সেই স্থধন্ম-পালনে প্রাণত্যাগও শ্রেয়স্কর, তথাপি স্বধন্মত্যাগ পূর্বক শ্লোচিত পরাধীনতা এবং দাস-স্বভাব-সুলভ স্বার্থপরতা আশ্রয় করা মহাপাপ ৷ কিন্তু উপায় কেবলই ধর্ম্মানুমোদিত হইলে চলে না, উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপযোগীও হওয়া প্রয়োজন। স্বধস্মের অসম্বরূপ কর্ত্ব্য কম্ম সমাধানের জন্য ধম্মানুমোদিত ও উপযুক্ত উপায় প্রয়োগ পূর্ব্বক উৎসাহের সহিত কর্ত্ব্যসিদ্ধির চেপ্টা করিয়াও যদি সিদ্ধি লাভ না ঘটে, তাহা হইলে অসিদ্ধিতে অবিচলিত হইয়া প্রাণত্যাগ পর্যান্ত পুনঃ পুনঃ সক্রবিধ উপযুক্ত ও ধন্মানুমোদিত উপায়ে কর্তব্যপালনের দৃঢ় চেল্টা, ইহাই গীতোক্ত সমতা ও নিদ্ধাম কম্ম। নচেৎ গীতার ধম্ম কম্মীর ধম্ম, বীরের ধম্ম, আর্য্যের ধম্ম না হইয়া হয় তামসিক নিশ্চেষ্টতার পরি-

পোষক শিক্ষা, নহেত অপরিণামদশী মূর্খের ধশর্ম হইত। কশর্মফলে আমাদের অধিকার নাই, কশর্মফল ভগবানের হাতে ; কশ্মেই আমাদের অধিকার আছে। সাত্ত্বিক কর্ত্তা অনহংবাদী ও ফলাশক্তিহীন—কিন্তু দক্ষ ও উৎসাহী। তিনি জানেন যে তাঁহার শক্তি ভগবদ্দত্ত ও মহাশক্তিচালিত অতএব তিনি অনহংবাদী; তিনি জানেন যে, ফল পূর্বে হইতেই ভগবানের দ্বারা নিদিশ্ট অতএব তিনি ফলাশক্তিহীন; কিন্তু দক্ষতা, উপায়-নিব্বাচন-পটুতা, উৎসাহ, দৃঢ়তা, অদমনীয় উদ্যম শক্তির সর্বোচ্চ অস. তাহাও তিনি জানেন, অতএব তিনি দক্ষ ও উৎসাহী হয়েন। সূক্ষ্মবিচারে গীতা-নিহিত গভীর চিন্তা ও শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ক্ষম হয়। নচেৎ দুয়েকটা শ্লোকের স্বতন্ত্র ও বিকৃত অর্থ গ্রহণ করিলে দ্রমাত্মক শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ধন্দের্ম ও কন্দের্ম অধ্যেগতি হয়।

লণ্ডন অধিবেশন ও যুক্তমহাসভা

দেখা গেল যে, গীতোক্ত সমতাবাদের উপর লগুন অধিবেশন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আর এক যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। তাহাতে পরিণামচিন্তা পরিবজ্জিত হয় নাই। অধিবেশনের সমর্থকগণ বলিতেছেন, আর কোনও ফল হউক বা না হউক, লণ্ডনে যুক্ত মহাসভা সংস্থাপন হইবে । লাহোরে সেই আশা করা রুথা; লণ্ডনেই সমস্ত দেশের আশা ও আকাৎক্ষা ফলীভুত হইবে। কথাটী বিশেষ গ্রবণ-সুখোৎপাদক বটে। ইহার কোন সায় থাকিলে আমরাও লণ্ডন অধিবেশনের পক্ষপাতী হইতাম। আমরাও জানি যে লাহোরে যুক্ত মহাসভা স্থাপনের কোনও আশা নাই, কখন সেই আশা পোষণও করি নাই। কিন্তু সমস্ত দেশের আশা ও আকা>ক্ষা যদি দেশেই সফল করিবার উপায় ও আশা নাই, তবে সুদূর বিদেশে সেই আশা ও আকাঙ্কা সফল হইবে, এই অভুত যুক্তির যাথার্থ্যতার সম্ভক্ষে আমরা প্রত্যয়ান্বিত হইতে পারিলাম না। সেইরূপ সফলতার কি মূল্য বা কি স্থায়িত্ব হইতে পারে? বুঝিলাম মেহতা গোখলে কৃষ্ণস্বামী তথায় অনুপস্থিত হইলে যুক্ত মহাসভার সমর্থক প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে। বুঝিলাম, তাঁহারা উপস্থিত হইলেও ছাত্রদিগের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া বঙ্গদেশের মধ্যপন্থীগণ সেইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সাহসী হইতে পারেন। কিন্তু তাহার পরে কি হইবে? দেশে ফিরিয়া তাঁহারা কোন পথ অবলম্বন করিবেন? যাঁহারা স্থদেশে মেহতার ও গোখলের সম্মুখে স্বমত প্রতিষ্ঠার চেপ্টা করিতে অক্ষম, তাঁহারা না হয় বিদেশে যাইয়া সাহস ও চরিত্রের বল দেখাইলেন; স্থদেশে ফিরিলে তাঁহাদের সেই সাহস ও বল থাকিবে কি? যদি থাকে, তাহা হইলে দূর বিদেশে না যাইয়া যুক্ত মহাসভা দেশেই স্থাপিত হওয়া অসভব কেন? মেহতা গোখলে লগুন মহাসভার প্রস্তাব কখনও গ্রহণ করিবেন না । অধিবেশনে সমস্ত দেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন না. অল্প কয়জনের পরামর্শে অনেকের মত উপেক্ষা করিয়া বঙ্গবাসীদিগের

সংখ্যাধিক্যহেতু প্রস্তাব গৃহীত হইল; আবার কন্ভেন্সনের অধিবেশনে গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত আমরা সম্মত হইব না, ইত্যাদি অনেক অজুহাত আছে। অজুহাতের কি প্রয়োজন ? কন্ভেন্সননীতির মূলতত্ব এই যে চরমপহীগণ রাজলোহী এবং সমস্ত অশান্তি ও অনর্থের মূল; তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা গভর্ণমেন্টের কর্ত্ব্যা, অতএব তাহাদের সংসর্গ রহিত না করিলে মহাসভা বিনল্ট হইবে। এই মূল তত্ব বিসম্জন করিয়া যাঁহারা চরমপন্থীদিগকে পুনর্বার মহাসভায় প্রবেশ করাইতে যাইতেছেন, তাহাদের প্রস্তাব আমরা শুনিতেও বাধ্য নহি, এই কথা কি রাসবিহারী, ফেরোজশাহ ও গোখলে বলিবেন না? সার ফেরোজশাহের মত সকলেই জানেন, রাসবিহারী বাবু সুরাটের বক্তৃতায় ও মাল্রাজের বক্তৃতায় এবং গোখলে মহাশয় পুণার বক্তৃতায় নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তখন কি আর এ আশা করা যায় যে বঙ্গন্দেশের মধ্যপন্থীগণ তাঁহাদের বর্জন করিয়া স্থাদেশে যুক্ত মহাসভার উদ্যোগ করেন না কেন? সেই দৃঢ়তা না থাকিলে লশুনে যাইয়া কৌশলে বোম্বাইয়ের নেতাগণকে পরাজিত করিবার চেল্টা বিফল হইবে।

সার জজ্জ ক্লাকের সারগর্ভ উত্তি

সার জর্জ ক্লাক সম্প্রতি পুণায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে অসার ও সারগর্ভ কথার আশ্চর্য্য মিশ্রণ হইয়াছে। প্রথম যুক্তি এই যে, ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের দুততর উন্নতি হইলে দেশের অশেষ অনিল্ট হইবার সম্ভাবনা; কেন না, শ্রমজীবীর সংখ্যা অতিশয় কম, মিলের সংখ্যা বাড়িলে আরও টানা-টানি পড়িবে, চাষীগণ শ্রমজীবী হওয়ায় কৃষির অবনতি হইবে। কৃষির অতি-মাত্র আধিক্যে, শিল্পবাণিজ্যের বিনাশে র্টিশ বাণিজ্যের যথেষ্ট উপকার হুইয়াছে। ক্লাক সেই অস্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তনে আশক্ষিত হুইয়াছেন। তাহা ইংরাজ রা<mark>জনীতি</mark>বিদের **পক্ষে স্বাভাবিক ও প্রশংসনীয়। কিন্ত** এই অবস্থায় ভারতবাসীর দারিদ্রা ও অবনতি ঘটিয়াছে; কৃষি প্রাধান্যের সক্ষোচে, বাণিজ্যের বিস্তারে শ্রমজীবীর উন্নতিতে দেশের মঙ্গল। সার জর্জ আরও বলিয়াছেন যে, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করা যদি বয়কটের উদ্দেশ্য হয়, জাভায় ও হিন্দুপ্রধান মোরিশ্যস্ দ্বীপের অধিবাসীর প্রস্তুত চিনির বর্জনে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, তাহাতে রটিশ জাতির জ্ঞানোদয় হওয়া অসভব। কার্য্যতঃ এই কথায় তিনি দেশবাসীকে বিদেশী বর্জন পরিত্যাগ করিয়া র্টিশ পণ্য বর্জন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এ কথা যুক্তিসঙ্গত ও সারগর্ভ। আমরাও বলি, ভারতবাসীর ঔপনিবেশিক ও ভারতবাসীর সাহায্যদাতা আমেরিকার পণ্য বর্জন না করিয়া বৃটিশ পণ্য বর্জন করায় বয়কট কৃতকার্য্য হইবে; ইংরাজ জাতির জানোদয় ও ভারতের উপর সম্মান ভাব হইবে, স্বদেশীরও २०८

বলর্দ্ধি হইবে। স্থদেশী বস্তু থাকিলে বিদেশী কিনিব না, স্থদেশী বস্তুর অবর্তমানে আমেরিকা বা অন্য দেশের পণ্য কিনিব, বর্তমান অবস্থায় রুটিশ পণ্য কিনিব না, ইহাই স্থদেশী ও বয়কটের প্রকৃত পত্থা। ক্লার্ক মহাশয় আরও বলিয়াছেন যে, কোন নিশ্চিত উদ্দেশ্য বা বিশেষ দোষ বা অসুবিধা উপলক্ষ না করিয়া অনিদ্দিশ্টভাবে গভর্ণমেশ্টকে তিরক্ষার করায় কোনও ফল নাই। যথার্থ কথা। আমরা বর্তমান অবস্থায় কি দোষ বা অসুবিধা দেখি, কিসে সম্ভুপ্ট হইব, তাহা রাজপুরুষদিগকে জানান হউক, তাঁহারা যদি না গুনেন তাহা হইলেও তিরক্ষার করা রুখা, আত্মশক্তি ও বৈধ প্রতিরোধ অবলম্বনীয়। ক্লার্ক মহাশয়ের কথার এই অর্থ বুঝিলাম। আশা করি, দেশবাসী বোম্বাইয়ের লাটসাহেবের এই দুই সারগর্ভ ও যুক্তিসম্বত উপদেশ হৃদয়ক্ষম করিবেন।

বসলক্ষ্মী কটন মিল

আমরা বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের আফিস হইতে একটা সুদীর্ঘ প্রতিবাদ-পত্র পাইলাম। স্থানাভাবে উহা এই সংখ্যায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না। এই বিষয়ে একটা মাত্র কথা বলা আবশ্যক! পত্রপ্রেরক এমন ইঙ্গিত করিয়া-ছেন যে আমরা বঙ্গলক্ষ্মীর কর্তাদের উদ্যোগের সহিত সহানুভূতির অভাবে কয়েকটা অপ্রিয় কথার অবতারণা করিয়াছিলাম। পাছে অন্য কোন পাঠকের সেই ধারণা হয়, এজন্য পত্রপ্রকাশের পূর্বেই সে কথার উল্লেখ করিলাম। বাস্তবিক আমাদের সেরাপ কোন ভাব বা উদ্দেশ্য নাই। হুগলীর প্রাদেশিক সমিতির সময় মিলের দূরবস্থার কথা শুনিলাম, তাহার পর তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাহা অবগত হইলাম, তাহারই উল্লেখ করিয়াছিলাম। প্রতিবাদপত্রপাঠে মিলের উন্নতি ও বর্দ্ধনশীল অবস্থার কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। বঙ্গলক্ষ্মী মিল বাঙ্গালীর প্রথম চেল্টা, তাহার উন্নতিতে বঙ্গদেশের উন্নতি।

বিলাতে আশ্বপক্ষ সমর্থন

জাতীয় পক্ষের শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল সম্প্রতি জাতীয় পক্ষের ভবিষ্যৎ পন্থা নির্দ্ধারণের সম্বন্ধে স্বমত প্রকাশ করিয়াছেন। দেখিতেছি বিলাতে আঞ্চপক্ষ সমর্থন বিষয়ে বিপিন বাবুর মত কতক পরিবন্তিত হইয়াছে। অবস্থান্তরে সেইরাপ মত পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। বিশেষতঃ উদ্দেশ্য লইয়া যেমন অটল থাকা প্রয়োজনীয়, উপায় লইয়া অটল থাকা সর্ব্বদা বিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। উপায় লইয়া আমাদেরও মত কতক পরিমাণে পরিবন্তিত হইয়াছে। তবে বিপিন বাবুর যুক্তির যাথােথ্য সম্বন্ধে মতজেদ হওয়া সম্ভব। তিনি বলিতেছেন, ইংরাজ জাতি দেবতা নন, তাঁহারা ভব স্থােৱে প্রীত হইয়া

স্বর্গ হইতে স্বরাজ হাতে লইয়া অবতরণ করিবেন না, সত্য, তথাপি তাঁহারা গুণহীন বা স্বভাবতঃ অন্যায়ের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহাদের বিবেকবুদ্ধি আছে। সম্প্রতি নিগ্রহনীতি প্রবন্তিত থাকায় ভারতবর্ষে জাতীয় পক্ষের উদ্যম ও চেল্টা অতিশয় সঙ্কট অবস্থায় পড়িয়া উত্তমরূপে চলিতেছে না, বিলাতে ভারতাগত ইংরাজের মিখ্যা সংবাদের প্রতিবাদ দ্বারা আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কার্য্য রুটিশ জাতির নিকট ভাপন করিতে পারিলে সেই বিবেক জাগরিত হইতে পারে এবং নিগ্রহনীতিও বন্ধ হইতে পারে। অতএব বিলাতে সেইরূপ প্রচারের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আমরা স্বীকার করিলাম ইংরাজগণ দেবতাও নন, পঙ্ও নন, তাঁহারা মানুষ, তাঁহাদের বিবেকবুদ্ধি আছে। কিন্তু ইংরাজ পঙ্ ও সম্পূর্ণ গুণহীন, এ কথাও কেহ কখন বলেন নাই, এইরূপ ভুল ধারণায় জাতীয় পক্ষ বিলাতে আঅপক্ষ সমর্থন ত্যাগ করেন নাই। ইংরাজ মানুষ, মানুষ নিজ স্বার্থই অনলস যুক্তি করিয়া নিজ স্বার্থকে ন্যায় ও ধম্ম বলিয়া অভিহিত করিতে অভাস্তঃ আমরা বিপিন বাবুকে জিঞাসা করি, বিলাতে সেইরূপ ব্যবস্থা হইলে সাধারণ ইংরাজ কাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবেন––আমাদের না নিজ জাত ভায়ের ? এই কারণেই আমরা সেইরাপ চে**ল্টা**য় আস্থাবান নই । আর একটী কথা সমরণ করা আবশ্যক। নির্বাসন ও নির্বাসিতগণের সম্বন্ধে সত্য ও নিভুঁল কথা বিলাতে কটন প্রভৃতি পার্লামেন্টের সভাসদগণ প্রাণপণে প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে উদারনীতিক ও রক্ষণশীল অনেক সভাসদ নিব্বা-সনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কি কখনও নিব্বাসনপ্রথা উঠাইয়া দেবেন বা রাজপুরুষগণকে নিব্বাসিতদের মুজি দিতে আদেশ করিবেন। বিপিন বাবু এখন ইংরাজদের রাজনীতিক জীবন নিকট হইতে দেখিতেছেন, কতক অভিজ্ঞতা লাভও করিয়া থাকিবেন, তিনি এ কথার উত্তর দিউন।

ধর্ম ৮ম সংখ্যা ২৫শে আমিন, ১৩১৬

বিলাতের দৃত

যেমন ভারতে, তেমনই বিলাতে বহু রাজনীতিক সম্প্রদায় ও বিভিন্ন মত ইংরাজ জাতিকে নানা দলে বিভক্ত করে এবং তাহাদের সংঘর্ষে দেশের উন্নতি ও অবনতি সংসাধিত হয়। মধ্যে মধ্যে এক এক সম্প্রদায়ের দৃত-স্বরূপ কোন বিখ্যাতনামা সংবাদপত্র লেখক বা পার্লামেন্টের সভাসদ এই দেশে আগমন পূর্বেক লোকমত ও দেশের অবস্থা কতক অবগত হইয়া স্থাদেশে প্রত্যাগমন করেন। ভারতে নব-জাগরণ ও দেশব্যাপী অশান্তির গুণে অনেক ইংরাজের

২০৬

দৃষ্টি আমাদের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, নবীন, উন্নতিশীল প্রমজীবী দলে এইরাপ জানাকা জ্ফা সুস্পতট লক্ষিত হয়। তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরাপ মিঃ কীর হাড়ি এই দেশে আগমন করিয়াছিলেন, আবার সেই দলের একজন প্রসিদ্ধ নেতা, মিঃ র্যামসী ম্যাকডনালড় সেই উদ্দেশ্যেই আসিয়াছেন। শ্রমজীবী দলের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আছে, এক দলের নেতা মিঃ ম্যাকডনালড্, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত মডারেট। একদলের নেতা মিঃ কীর হাড়ি, তাঁহারা তত নরমপন্থী নহেন। তাহা ভিন্ন চরমপন্থী ও সোসালিপ্ট আছেন, তাঁহারা কীর হাডি ও ম্যাক্ডনাল্ড প্রভৃতিকে গ্রাহ্য করেন না। মিঃ ম্যাক্ডনাল্ড্ কীর হাডির ন্যায় বজ্তা ও মত প্রচার করিতে অনিচ্ছুক, তিনি সংযতভাবে স্থীয় জ্ঞানলিপ্সা তৃপ্ত করিতে কৃত-সংকল্প। এই প্রশংসনীয় উদ্যোগে তিনি সকলের সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। তিনি এক ফরাশ সংবাদপ্রের প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন, "আমি অপেক্ষাকৃত উন্নতমতাবলম্বী হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপাত্র মিঃ অরবিন্দ ঘোষের বক্তব্য প্রবণে সম্ভুল্ট হইব না, মধ্যপন্থীদলভুক্ত মিঃ ব্যানাজী ও নরমপ্ছী মিঃ গোখলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশা পোষণ করি। রটিশ শাসনজন্তের প্রধান প্রধান কম্মচারী ও গীরসন প্রভৃতির ন্যায় প্রধান ব্যাক্ষের চালকগণের সহিতও প্রামর্শ করিব।" মিঃ ম্যাক্ডনালড় লর্ড মরলীর শাসন-সংস্কার উদার বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন এবং ভারতবাসী এইরূপ উদার সংস্কারের উপযুক্ত কিনা তাহা স্বয়ং দেখিতে চাহেন। দুই মাস বা তিনমাস ভারতে ঘুরিয়া ভারতবাসীর উপযুক্ততা সম্বন্ধে মিঃ ম্যাক– ডনালড্ স্বয়ং কিরুপে স্থির সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা আমরা ব্ঝিতে অক্ষম। মিঃ ম্যাক্ডনালড় বিলাতের একজন প্রধান প্রজাতন্ত্র-সমর্থক; রুটিশ সাম্রাজ্য প্রজাতশুবাদীর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ উদারনীতিকের মুখে মরলীর সংস্কারের উদারতা-প্রশংসা যখন শুনিতে হইল, দেশবাসী বুঝুন, বিলাতে আন্দোলন করায় আমাদের পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের উপযুক্ত ফললাভের সভাবনা কত সুদূরপরাহত।

জাতীয় ঘোষণাপত্ৰ

আমাদের রাজনীতিক কর্ডাদের গভীর, সূক্ষ ও নানাপথগামী রাজনীতিক বৃদ্ধির রহসাময় গতি সর্কাদা ক্ষুদ্র-বৃদ্ধি সাধারণ লোকের বোধগমা হয় না। ৭ই আগল্ট কলেজ ক্ষোয়ার হইতে মিছিল বাহির হইবার কথা লইয়া গোল হইয়াছিল। কলেজ ক্ষোয়ারের নামে কর্ডারা এত ভীত হইয়াছিলেন যে, সেই দিন সভাপতি সভাপতিপদ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অগত্যা মিছিল পান্তি মাঠ হইতে বাহির হইবার ব্যবস্থা হইল। তথাপি অতি অল্প সংখ্যক লোক তথায় উপস্থিত হইলেন, অধিকাংশ লোক কলেজ ক্ষোয়ারের মিছিলে

যোগদান করিতে গেলেন অথবা স্ব স্থান হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিছিল করিয়া সভা-স্থলে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে ৭ই আগতেটর মিছিলের শোভা নতট হয় এবং বিপক্ষগণ লোকের উৎসাহ ও বয়কটে তাহার ন্যুনতার কথা লিখিবার অবসর পান। এইবার কর্তারা সেই ভীতি জয় করিয়াছেন, ৩০শে আশ্বিনের বিক্তাপনে কলেজ স্কোয়ার হইতে মিছিল বাহির হইবার কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই বিজ্ঞাপনে জাতীয় ঘোষণাপত্র পাঠের কথা বজ্জিত হইয়াছে। গত বৎসরের বিজ্ঞাপনে ছিল, "সভায় স্বদেশী মহাব্রত-গ্রহণ, বিদেশী-বর্জন, বঙ্গ–ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ ও জাতীয় ঘোষণাপত্র-পাঠ হইবে।" এবার সেই কথার পরিবর্তন হইয়াছে, "সভায় বিদেশী-বর্জন পূর্বক স্থদেশী মহারত গ্রহণ ও বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ হইবে" লেখা আছে। কর্তারা "জাতীয়" কথায়, না "ঘোষণা" কথায়, না ঘোষণা পত্রের মর্মার্থে ভীত হইয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। ঐীযুত আনস্মোহন বসু ফেডারেশন হলের জমিতে প্রথম এই ঘোষণা–পত্ৰ পাঠ করিয়াছিলেনঃ—"যেহেতু সমগ্ৰ বাঙ্গালী জাতির সর্ব্যজনীন আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া গভর্ণমেন্ট বঙ্গদেশকে দিখণ্ড করাই স্থির করিলেন, অতএব আমরা বাঙ্গালী জাতি ঘোষণা করিতেছি যে, এই বিভাগ-নীতির কুফল নিবারণ করিবার জন্য এবং জাতীয় একতা সংরক্ষণকল্পে আমরা আমাদের সমগ্র-শক্তি প্রয়োগ করিব। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।"

জিজাসা করি, ইহাতে এমন কি ভীষণ রাজদ্রোহসূচক কথা সন্নিবিদ্ট আছে যে, ৩০শে আশ্বিনের ভাবসূচক ও সমস্ত বঙ্গদেশের প্রতিজ্ঞা-প্রকাশক ঘোষণা-পত্র সহসা বর্জন করিতে হইল ? না মরলী ও মিন্টোর মনস্তুদ্টির জন্য এইরূপে নবোধিত জাতীয় ভাবকে ধর্ম্ব করা আবশ্যক হইল ? আমরা বঙ্গভঙ্গের কুফল নিবারণ করিব, জাতীয় একতা সংরক্ষণ করিব, এই পবিত্র কর্ত্তব্য কম্পের্ম সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিব, এই কথাও ঘোষণা করিতে যদি সাহসে না কুলায়, তাহা হইলে ৭ই আগল্টের ও ৩০শে আশ্বিনের অনুষ্ঠান বন্ধ কর । এতটুকু তেজ ও সাহস যদি না থাকে, তাহা হইলে জাতীয় জাগরণ ও উন্নতির চেন্টা বিফল বুঝিতে হইবে, রথা তাহার বাহ্যিক আড়ম্বর করা মিথ্যাচার মান্ত্র। জনসাধারণের সহিত পরামর্শ করিয়া এই পরিবর্ত্তন করা হয় নাই, জনসাধারণ জাতীয় ঘোষণা বয়কট করিতে সম্মত হইবে না। আমরা সকলকে বলি, যদি এই জুল সংশোধিত না হয়, ৩০শে আশ্বিনে সহস্ত্র—কণ্ঠে ঘোষণা পাঠের আদেশ কর, তাহার পরে যদি নেতাগণ সম্মত না হন, তাহা হইলে দায়িত্ব তাঁহাদের।

কৃষ্ণ মিলের মিথ্যা অপবাদ

কয়েকদিন কৃষ্ণ মিলের বিরুদ্ধে এই মিখ্যা রটনা চলিতেছে যে সেই মিলের

কাপড় স্থদেশী নয়, স্থদেশী মার্কা দিয়া বিদেশী কাপড় বাজারে চালান হইতেছে। আমরা মিলের কর্তাদের চিনি, তাঁহারা সামান্য স্বার্থান্ধ ব্যবসায়ী নহেন, অতি ধাস্মিক নিষ্ঠাবান লোক। তাঁহাদের আন্তরিক স্বদেশানুরাগ ও স্বদেশের জন্য নিঃস্বার্থ পরিশ্রম অতুলনীয়। তাঁহারা স্থদেশহিতার্থে সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন, স্বদেশই তাহাদের একই চিন্তা, স্বদেশের জন্য খাটিয়াছেন, স্বদেশের জন্য লান্ছনা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যবসার লাভের অধিকাংশ খদেশ হিতকর কার্ম্যে ব্যয় করিতেছেন। এইরূপ লোকের নামে এইরূপ মিথ্যা রটনা বাঙ্গালী করিতেছেন শুনিয়া আমরা লজ্জিত ও মম্মাহত হইলাম। অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অমূলক। একজন সংবাদপলে এইরাপ রটনা করায় মিলের ম্যানেজার উত্তরে অভিযোজা**কে নিজে**র মনোমত যে কোনও পরীক্ষা করিতে আহ্বান করিলেন, তাহাতে তাঁহার জানোদয় হইয়া তিনি অভিযোগ প্রত্যাহার করিলেন। আশা করি যে সংবাদপত্রগুলি *ভ্রম বশ*তঃ এই মিখ্যা রটনা পুনরুজি করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রকৃত কথা অবগত হইয়া তাহা প্রত্যাহার করিবেন। তাহার পরে এই আপত্তি খণ্ডন হওয়ায় আর এক আপত্তি তোলা হইতেছে। কৃষ্ণ মিলের সূতো বিলাতী, বিলাতী সূতোর কাপড় বয়কট কর। জিঞ্জাসা করি, তোমরা কি কখন বলিয়াছিলে যে মোটা কাপড ভিন্ন সরু কাপড় পরিব না, বিলাতী স্তোর কাপড় ব্যবহার করিব না ৷ তোমরা সেই কথা বল নাই, বলিয়াছিলে শ্বদেশী সরু কাপড় পাওয়া যায় না, মোটা কাপড় পরিব, স্বদেশী সরু কাপড় প্রস্তুত হইলে ব্যবহার করিব। বলিয়া**হি**লে স্বদেশী সূতো প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না, বিদেশী সূতোয় প্রস্তুত তাঁতীর কাপড় বা স্থদেশী মিলের কাপড় স্থদেশী বলিয়া ব্যবহার করিব, তাঁতীরা বিদেশী সূতো ব্যবহার করিয়া ভাঁত চালাইতে লাগিল, কৃষ্ণমিল ও তাভার মিল বিদেশী সূতো ব্যবহার করিয়া সরু কাপড় করিতে লাগিল, তোমরাও কিনিতে লাগিলে। কৃষ্ণ মিলের কর্তাগণ বিলাতী সূতো বর্জন করিয়া আমেরিকা বা জাপানের সূতো আমদানী করিবার অনেক চেল্টা করিলেন, কিন্তু সেইরাপ সূতো না পাইয়া বিলাতী সূতো ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা বঙ্গদেশের মুখের দিকে চাহিয়া স্থদেশী চালাইয়াছেন, এখনও তাহা করিতে প্রস্তুত। যদি ইহাই স্থির করিলে যে বিলাতী সূতোর কাপড় ব্যবহার করিব না, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আদেশ কর, তাঁহারা মোটা কাপড়ই প্রস্তুত করিবেন, কিন্তু যাঁহারা তোমাদেরই আজা শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের সেই আঞ্চাপালনের পুরস্কার স্থরূপ শাস্তি দেওয়া ও তাঁহাদের প্রস্তুত কাপড় বয়কট করা অন্যায় ও কৃতখ্তাসূচক। আর একটি কথা বলি, এখন কেবল শ্বদেশী সতো ব্যবহার করিয়া ভারতে বস্তু বয়ন করা অসম্ভব, শ্বদেশীর এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে গেলে স্বদেশীই মারা যাইবে। এই দিকে বিলাতীর বিস্তর আম– দানি আরম্ভ হইয়াছে, বঙ্গদেশে বিলাতী বিব্রুয়ের রৃদ্ধি হইতেছে। এই সময়ে এইরূপ রব তোলা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। বিলাতীর বিক্রয় বন্ধ কর, স্থদেশীর

কাটতি বাড়াইয়া দাও, তাহার পরে স্বদেশীর হিতাহিত বিবেচনা করিয়া বিলাতী সূতো মারিবার উদ্যোগ কর।

ধদর্ম ৯ম সংখ্যা ১লা কাড়িক ১৩১৬

জাতীয় ঘোষণা পত্ৰ

জাতীয় ঘোষণা পত্র পাঠ হইয়াছে, ইহা বড় সুখের বিষয়। ইহার মধ্যে আর কোনও কথা না উঠিলে বাদ প্রতিবাদ বা মনোমালিন্যের কারণ ঘটিবার কোনও অবসর দিলেন না, সেই জন্য নেতাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া ক্ষান্ত হইতাম। কিন্তু বেঙ্গলী পত্রিকা আমাদের মিথ্যাবাদী বলায় আমরা এই বিষয়ের প্রকৃত রুভান্ত সর্বেসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। সহযোগী প্রকৃত কথা গোপন রাখিয়া এই মাল বলিয়াছেন যে'ধম্মে'প্রকাশিত কথা সম্পূর্ণ অম্লক, অর্থাৎ আমরা মিথ্যা ও কল্পনাপ্রসূত কথা প্রচার করিয়া মধ্যপত্তী নেতাদের উপর লোককে অসম্ভুষ্ট করিতে প্রয়াস করিলাম। তবে প্রকৃত ঘটনা জানিয়া বিচার করুন। আমরা পূর্কের্ব বলিয়াছি যে গত বৎসরের বিজ্ঞাপন "জাতীয় ঘোষণা পত্র পাঠ" হইবে এই কথা ছিল। এইবার যখন বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে প্রামর্শ চলিতেছে, তখন একজন সম্ভান্ত নেতা "জাতীয় ঘোষণা প্রত্র" কাটিয়া দিলেন এবং এই কথা বাদ দিয়া বিজ্ঞাপন বাহির করিবার হকুম হুইল। এই সম্বন্ধে যে প্রামর্শের সময়ে প্রতিবাদ একেবারেই হয় নাই, তাহাও নহে, কিন্তু নেতাদের কথার বিরুদ্ধে সজোরে কথা বলিবার কাহারও সাহস ছিল নাঃ স্থির হইল, ঐীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ. রসুল ও রায় ষ্তীস্ক্রনাথ চৌধুরী স্বাক্ষর করিবেন। রসুল সাহেব জাতীয় ঘোষণা-পত্র বৰ্জন হইল দেখিয়া বিদিমত হইলেন এবং তিনি এই ভুল সংশোধন না হইলে বিজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত, এই অর্থে সুরেন্দ্রবাবুকে উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত রসুলের নামযুক্ত বিজ্ঞাপন ছাপান ও বিলিও হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্ত তাঁহার উত্তর প্রাণ্ড হইবামার ছাপান ও বিলি বন্ধ হইয়া শ্রীযুত রসুলের নামের বদলে শ্রীযুত মতিলাল ঘোষের নাম বসাইয়া সেই বিজ্ঞাপনই ছাপাইয়া বিলি করা হইল। যাহা বলিয়াছি, তাহা কেবল শোনা কথা নহে, অস্বীকার করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই; প্রত্যেক কথারই অকাট্য প্রমাণ আছে। তাহার পর, শ্রীযুত রসুল ও শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ জাতীয় ঘোষণা পর বঙ্জন করিতে নেতাগণ সচেষ্ট আছেন বুবিয়ো যাঁহারা বিজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এবং সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরীর উপর নোটিশ দিলেন যে এই সম্বন্ধে আমরা প্রকাশ্য সভায় আপত্তি উত্থাপন করিব এবং জাতীয় ঘোষণা পাঠ হইবার আদেশ যাহাতে হয়, সেই চেল্টা করিব। উত্তরে শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ দেওঘর হইতে এই অর্থে টেলিগ্রাম করিলেন যে যদি গভর্ণমেন্ট নিষেধ না করিয়া থাকেন, জাতীয় ঘোষণা-পর পাঠ করিতে সুরেন্দ্রবাবু ও যতীন্দ্রবাবু কোনও উত্তর করেন নাই। সভাপতি শুক্রবারে কলিকাতায় পৌছিলেন, রাত্রিতে পত্র পাইলেন, সেই জন্য তাঁহারও কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। বুধবারে পত্র লেখা হইল, শুক্রবারে শ্রীযুক্ত গাঁম্পতি কাব্যতীর্থ কলেজ ক্ষোয়ারে জাতীয় ঘোষণা পাঠ হইবে এই শুভ সংবাদ প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করিলেন, শনিবার সকালে বেঙ্গলী পত্রিকায় আমাদের কথা অমূলক বলিয়া সেই শুভ-সংবাদ পাঠকবর্গকেও জানাইলেন। এই রুভান্ত। সক্র্যাধারণই তাহার বিচার করুন।

৩০শে আশ্বিন

৩০শে আশ্বিনের সমারভ দেখিয়া এইবার দেশবাসীর আনন্দ, বিপক্ষের মনঃক্ষোভ হইবার কথা। আন্দোলন যে নির্বাপিত হয় নাই, বাধা বিল্ল, ভয় প্রলোভন অতিক্রম করিয়া পূর্ণমান্তায় সজীব রহিয়াছে, তাহার বাহ্যিক চিহ্ন বন্ধ কর, লুপ্ত কর, হাদয়ে হাদয়ে নূতন ভাব জাগ্রত রহিয়াছে, স্বরাজলাভেই নির্বাপিত নহে, সম্ভুষ্ট হইয়া অন্য আকার ধারণ করিবে। বিজাতীয় সংবাদ-পত্র লোকের উৎসাহ অস্থীকার করিতে সচেল্ট হইবেই, কিন্তু তাহাদের লেখার মধ্যে নিজেদের উৎসাহভঙ্গ লক্ষিত হয়। পেটট্সম্যান্ অন্য উপায় না দেখিয়া শ্রীযুক্ত চৌধুরীর বজুতা হইতে সাভুনা রস চুষিতে চেপ্টা করিয়াছেন, কেন না চৌধুরী মহাশয় ছাএদের রাজনীতি বর্জন করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু ছাএগণ যে পূর্ণমাত্রায় ৩০শে আশ্বিনের সমারভে যোগ দিয়াছেন, সেই কথা সম্বন্ধে নীরব কেন? লোকে বলে যে গতবারেও সভায় এত ভিড় হয় নাই, সেই জনতার প্রান্তে বসিবার স্থানও ছিল না, দাঁড়াইতে হইল। পার্শ্ববর্তী রাস্তায়, দেওয়ালে, ছাতেও লোক ছিল। বাঙ্গালী মাএই দোকান বন্ধ করিয়াছিলেন, কেবল বড়-বাজারে মাড়োয়ারী ও হিন্দুখানী দোকানদার লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই, কিন্তু তাহাদের দোকানে কিনিবার লোক অতি অল্পই দেখিলাম, প্রায় দোকান খুলিয়া বসিয়াই আছে। লোকের উৎসাহও কম ছিল না। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষকে সভা হইতে লইয়া যাইবার সময় সেই উৎসাহের তীরতা ও গভীরতা প্রকাশ পাইল। যে অন্বরত জয়জয়কার ও বন্দে মাতরং ধ্বনি অনেকক্ষণ ধরিয়া পৃথিবী ও আকাশ বিকম্পিত করিল, সে নেতাদের প্রাপ্য নহে, এই দুদিনে তাঁহারা আন্দোলনের চিহু স্থরূপ রহিয়া

অগ্রভাগে জাতীয় ধ্বজা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সেই জন্য এই সম্মান। কাল যদি ভগ্নোৎসাহ হন বা সেই ধ্বজা ধূলায় লুটিতে দেন, জয়জয়কারের বদলে ধিক্কার ধ্বনি উঠিবে, নেতাগণ যেন সক্রদা এই কথা সমরণ করেন।

গ্রভূর্নমেন্টের গোখলে না গোখলের গ্রভূর্নমেন্ট

পুণার কাণ্ড ও গোখলে মহাশয়ের পরিণাম দর্শনে সমস্ত ভারত অবাক হইয়া রহিয়াছে। শ্রীযুত গোপালকৃষ্ণ গোখলের বৃদ্ধিতে ও চরিত্রে আমরা কখনও অন্য দেশবাসীর ন্যায় মুগ্ধ ছিলাম না। তাঁহার স্থার্থ ত্যাগের মধ্যে আমরা ব্যক্তিগত যশোলিপ্সা সম্মানপ্রিয়তা ও ঈর্ষা দেখিয়া অসভ্তপ্ট ছিলাম, তাঁহার দেশসেবার মধ্যে সাহস এবং উচ্চ আদর্শের অভাব ব্ঝিয়া তাঁহার শেষ পরিণাম সম্বন্ধে চিরকালই আশান্বিত ছিলাম। কিন্তু আমরাও স্বপ্নেও ভাবি নাই যে এতদূর অবনতি এই ভারতবাসীর সম্মাননা ও ভালবাসার পাত্রের ভাগ্যে ঘটিবে। জানিতাম, যে তাঁহার বিখ্যাত ক্ষমাপ্রার্থনার পরে গোখলে মহাশয় রাজপুরুষদের অতীব প্রিয় পাত্র ছিলেন, তিনি যখন ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের সহিত বাদ বিবাদ করিতেন, তখনও তাঁহাকে দেখিতে যেন আলালের ঘরের দুলাল, গায়ে হাত বুলাইতেন, অথবা মিষ্ট মিষ্ট গাল দিতেন। কিন্তু একদিন যে তাঁহারই খাতিরে এক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র নিগ্রহ আইনে নিগৃহীত হইবে, পুণা সহর খানাতলাসীর ধুমধামে ব্যতিব্যস্ত হইবে, একজন সম্ভান্ত উকিল পুলিশ দ্বারা ধৃত ও অভিযুক্ত হইবেন এবং অন্যান্য নগরবাসী ধৃত হইবার ভয়ে ব্যাকুলিত হইবেন, ইহা আমাদের স্থপ্নেরও অগোচর ছিল। জানিতাম গোখলে গভর্ণমেন্টের, এখন জিজাসা করিতে হইল, গভর্ণমেন্ট কি গোখলের? গোপালকৃষ্ণ গোখলে কি র্টিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভ ও ভারতীয় শাসন-তত্তের অঙ্গ হইয়াছে ? আমরা জানিতাম রাজনীতিক হত্যা বা সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রশংসা করিলে দেশবাসীর ছাপাখানা গভর্ণমেন্টের সম্পত্তি হয়, বোমা বা বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রের গন্ধ পুলিশ পুলবদের তীব্র ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে পহঁছিলে সহরময় খানাতস্লাসীর ধূমধাম আরভ হয়। একটি ব্যক্তির মানহানিতে বা তাঁহার উপর ভয় প্রদর্শনে যে এইরূপ নবযুগের কাভ হইতে পারে, তাহা আমরা জানিতাম না। এই নূতন প্রণালী গভর্ণমেন্টের যোগ্য কি না, তাহা রাজপুরুষগণ বিবেচনা করুন। কিন্তু গোখলে মহাশয়ের পরিণাম দেখিয়া আমরা দুঃখিত রহিলাম। কবি যথার্যই বলিয়াছেন, আমরা মানুষ, বিগত মহত্ত্বের ছায়ার বিনাশেও আমাদের চিক্ষে জল আসে। গোখলে মহাশয় কোন জন্মে মহৎ ছিলেনে না, তবে তিনি মহতের ছায়া বটে। তাঁহার সকল মত, বুদ্ধি বিদ্যা, চরিত্র তাঁহার নিজস্থ নহে, কৈলাসবাসী রাণাডের দান। গোখলের মধ্যে মহাআ রাণাডের ছায়া বিনষ্ট হইতে চলিল দেখিয়া আমরা দুঃখিত।

২১২ শ্রীতারবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

ধর্ম্ম ১০ম সংখ্যা ২২এ কাত্তিক, ১৩১৬

বজেট যুদ্ধ

বিলাতে বজেট লইয়া যে মহাযুদ্ধ লাগিয়াছে, সেই যুদ্ধ ইংরাজ রাজনীতির সামান্য বকাবকি নহে। উদারনীতিক দলে ও রক্ষণশীল দলে যে সংঘর্ষ হইত সে সামান্য মতভেদ লইয়া হইত। রেফর্মবিলের পরে জমীদারবর্গ ও মধ্য-শ্রেণী ইংরাজের মধ্যে যে তীব্র বিদ্বেষ ও বিরোধ রাণী এলিসাবেথ ও রাজা চার্লসের সময় হইতে ইংরাজ রাজনীতির ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় অক্ষিত রহিয়াছে, তাহা প্রশমিত হইল। মধ্যশ্রেণীর জিত হইল কিন্তু জেতা বিজিত পক্ষকে বিন্দট না করিয়া লখ্ধ অধিকারের ভাগ দিল। তাহার <mark>পরে ঘরাও</mark> বিবাদ চলিতেছে। এই বিবাদে মধ্যশ্রেণী নিম্নশ্রেণীর সাহায্যে বিদ্রোহী জমিদারবর্গকে দমন করিবার আশায় আন্তে আন্তে ইংরাজ রাজনীতিক জীবনের ভিত্তি প্রশন্ত করিতেছে, তাহার ফলে ইংলণ্ড আজকাল (Limited Democracy) অসম্পূর্ণ প্রজাতন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখন লয়ড জর্জ্জ ও ওয়িন্স্টন চাচ্চিল এই শাভ রাজনীতিক জীবনে মহাবিলাট ও রাষ্ট্রবিপ্লবের সম্ভাবনা স্থ[ি]ট করিতেছেন। আজকাল সমুদায় য়ুরোপে সোশালি<mark>ৰট</mark> দলের অতিশয় রৃদ্ধি ও প্রভাব হইতেছে। জাম্মানীতে, ইতালীতে, বেলজিয়মে তাঁহারা মন্ত্রণাসভায় প্রবল ও বহুসংখ্যক। স্পেনে জোরজবরদন্তিতে তাঁহাদের প্রচার ও দলর্দ্ধি বন্ধ করিবার চেজ্টা হইয়াছিল বলিয়া বার্সেলোনার ভীষণ দাসা, ফেররের মৃত্যু ও সমস্ত পাশ্চাত্য জগতে দাসা হাসামা হইয়াছে। ইংলভ ও ফ্রান্স এই স্রোতের বহিভূতি ছিল, কেন না সেই দুই দেশে প্রজার স্বাধীনতা ও সুখের কতক ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু এই চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে সেই দুই দেশেও সোশালিস্টদের প্রভাব ও সংখ্যার্দ্ধি হইতে চলিয়াছে ৷ লয়েড জডের্র বজেটে হঠাৎ সোশ্যালিস্ম র্টিশ রাজতন্তের মধ্যে প্রবেশ করান হইয়াছে। এই বজেটে জমিদারবর্গের সম্পত্তির উপর কর বসান হইয়াছে, তাহাতে জমিদারে ও মধ্যশ্রেণীতে যে সরি স্থাপন হইয়াছিল, তাহার মুখ্য অঙ্গ বিন্তট হইয়াছে। জমিদারদের জমিদারীর উপর একবার কর বসাইলে র্টিশ প্রজাবর্গ অতি শীঘ্র সেই কর বাড়াইয়া বাড়াইয়া শেষে অল্প মূল্যে যত জমিদারী দেশের সম্পত্তি করিয়া লইবে। জমিদারবর্গ আর থাকিবে না। সেইজন্য জমিদারদের ভীষণ ক্রোধ হইয়াছে এবং জমিদার সভা (House of Lords) বজেট প্রত্যাখ্যান বা পরিবর্ত্তন করিয়া Commons-এ ফিরাইয়া দিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে। ইহাতে র্টিশ রাজতন্তের মূল নিয়মের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে। নামে প্রজার প্রতিনিধিবর্গের সম্ববিধ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

বা পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার জমিদার সভার আছে, কিন্তু বজেট কেবল সম্মানের জন্য সেই সভায় পাঠান হয়, জমিদার সভা কখন বজেটে হস্তক্ষেপ করে না। অতএব বজেট প্রত্যাখ্যাত হইবামাত্র উদারনীতিক মন্ত্রীগণ জমিদার সভার কমনস্কৃত প্রস্তাব নিষেধ করিবার অধিকার লোপ করা হউক, এই প্রস্তাব লইয়া ইংরাজ জাতির নিকট উপস্থিত হইবেন। উদারনীতিক দলের জয় হইলে পুরাতন রাজতন্ত্র নিষেধ অধিকারের লোপে লুপত হইবে, শীঘ্র সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্র স্থাপন, জমিদার সভা ও জমিদারবর্গের বিনাশ এবং সোশ্যালিস্মের বিস্তার হইবে। লয়ড জর্জ্জ ও চাচ্চিল জানিয়া গুনিয়া এই রাষ্ট্রবিপ্লবের পোষকতা করিতেছেন, আক্ষওয়িথ মরলী ইত্যাদি রন্ধ মধ্যপন্থীগণ এই দুইজনের তেজে অভিভূত হইয়া এবং উচ্চপদের মোহে ও রাজনীতিক সংগ্রামের মন্ততায় অন্ধ হইয়া তাঁহাদের চেপ্টায় যোগদান করিতেছেন। আর Conservative England, রক্ষপশীল ইংলপ্টের রক্ষা নাই। সর্ব্বগ্রাসী কাল ইংরাজ জাতির জাতীয় চরিত্র, জাতীয় ধর্ম্ম এবং মহত্বের ভিত্তি সকল গিলিয়া ফেলিতেছে।

কি হইবে ?

জানুয়ারী মাসে বিলাতে যে প্রতিনিধি নিব্বাচন হইবে, তাহার উপর ভারতের ভাগ্য অনেকটা নির্ভর করে। আমাদের পক্ষে উদারনীতিক ও সোশ্যালিস্টদের জয় একান্ত বাল্ছনীয়। যদি কখনও বৈধ প্রতিরোধ দ্বারা ইংরাজ গভর্ণমেন্টকে স্বায়ত্ব শাসনের বিল কমন্সে উপস্থিত করিতে বাধ্য করি, জমিদার সভা যেমন আয়রিশ স্বায়ত্ব শাসনের বিল প্রত্যাখ্যান করিল, আমাদের স্বায়ত্ত্ব শাসনের বিলও প্রত্যাখ্যান করিবে। অত্এব জমিদার সভার নিষেধ অধিকার নপ্ট হওয়াই আমাদের একমাত্র কার্য্যসিদ্ধির উপায়। ভগবান সেই উপায়ের উদ্যোগ করিতেছেন। সোশ্যালিপ্ট দলের প্রাবল্যে আমাদের আর বিশেষ কোন কার্য্যসিদ্ধির না হউক, নিগ্রহনীতি শিথিল করিবার সবিধা হইতেও পারে, কেন না সোশ্যালিল্ট দল এখন অধিকার-রহিত ও অধিকার লাভের প্রয়াসী, সেইজন্য জগতের অধিকার-রহিত সর্ব্ব সম্প্রদায় ও জাতির সহিত তাঁহাদের সহানুভূতি আছে। কিন্তু এখন যে অবস্থা তাহাতে উদার-নীতিকদের জয় ও সোশ্যালিস্টদের প্রাবল্যের আশা করা যায় না। বজেটে স্বতন্ত্র সম্পত্তির প্রথা বিন্দট হইবে, সোশ্যালিস্ম্ ইংলণ্ডে সংস্থাপিত হইবে, কাহারও ধনসম্পত্তি আর নিরাপদ নহে, এই রব ডুলিয়া রক্ষণশীল দল অনেক উদারনীতিক ভদ্রলোককে স্বপক্ষে আকর্ষণ করিতেছেন। আবার টারিফ রিফস্মের ধূয়া উঠাইয়া অনেক নিম্নগ্রেণীর লোককেও তদূপ হস্তগত করিয়াছেন। অবাধ বাণিজ্যে বাণিজ্য⊸ক্ষেত্রে ইংলভের প্রধান ভান বিলুুুুুুুুুু হইয়াছে, অন্য জাতি তাঁহাকে হারাইয়া দিতেছে, সেইজন্য নিশ্নশ্রেণীর

কম্মাভাবে ও খাদ্যাভাবে হাহাকার আরম্ভ হইতেছে এই মত উচ্চৈঃম্বরে প্রচার করা হইয়াছে। যে সকল নিকাচন গত কয়েক মাসে হইয়া গিয়াছে, এই উপায় দারা রক্ষণশীল দলের রূদ্ধি করা হইয়াছে, উদারুনীতিক ভোট কমিয়া গিয়াছে, তথাপি উদারনীতিক ও সোশ্যালিস্ট যদি এক হয়, রক্ষণশীল দল পরাজিত হইবে। কিন্তু এখন বিপরীত অবস্থা। যেখানে উদারনীতিক দাঁড়ায়, সেইখানে সোশ্যালিফ্ট দাঁড়ান। দুইজনের সংযুক্ত ভোট যদিও রক্ষণশীল নির্বাচন প্রাথীর ভোটের অধিক, তথাপি তাহাদের বিরোধে দ্বর্লপক্ষের জিত হয়৷ সোশ্যালিষ্ট্রগণ ঠিক পথই ধরিয়াছেন, এইরূপ অসবিধা ভোগ না করিলে উদারনীতিক দল তাঁহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিছে বাধ্য হইবে কেন? কিন্তু মিঃ আন্ধওয়িথের যদি নির্বাচন প্রথার পক্ষে মিথ্যা কথা ও পরস্পর বিরোধী যজি ব্যবহার করিতে করিতে বন্ধিদ্রংশ না হইয়া থাকে. নির্বাচনীর প্রেই তিনি সোশ্যালিস্টদের আশী প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া আর সকল উদারনীতিক স্থানকে নিরাপদ করিবেন এবং টারিফ রিফস্মের ধুয়া উড়াইবার জন্য পালামেন্ট ভঙ্গের পূর্বেই নিষেধ অধিকার লোপের বিল কমন্সে উপস্থিত করিয়া তাহার উপরই প্রতিনিধি নির্বাচনের সময়ে নির্ভর করিবেন। তাহা হইলে সমুদয় ইংরাজ নিস্মশ্রেণীর নির্বাচক। টারিফ রিফস্মের মোহ ভুলিয়া উদারনীতিক পক্ষে ভোট দিতে ছুটিয়া আসিবে 🗔 গ্লাডপ্টোন জীবিত থাকিলে ডাহাই করিতেন, আক্ষওয়িথ সাহেবের নিকট সেই চৌকস বৃদ্ধি প্রত্যাশা করা যায় কিনা সন্দেহ।

ধর্ণমাঁ, ১১শ সংখ্যা ২৯এ কান্তিক, ১৩১৬

রিফরম্

আজ সোমবার ১৫ই নভেম্বর—এই দিনে মহামতি লর্ড মরলী ও লর্ড মিন্টোর গভীর ভারতহিতচিন্তায় রাজনীতিক তীক্ষবৃদ্ধি ও উদার মতের আসজিফলজাত শাসনসংস্কাররূপ মানসিক গর্ভ প্রসূত হইবে। লর্ড মরলী ধনা, লর্ড মিন্টো ধনা, আমরা ধনা। আজ ভারতে স্থর্গ নামিয়া আসিবে। আজ পারসা, তুকী, চীন, জাপান পর্যান্ত ভারতের দিকে ঈর্ষার চোখে চাহিয়া 'ইংলিশম্যান'-এর সুরে সুর দিয়া গাহিবে "ধন্য যাহারা পরাধীন, ধন্য ধন্য যাহারা মুরোপীয় জাতির পরাধীন, ধন্য ধন্য ধন্য যাহারা উদারনীতিক মরলী মিন্টোর পরাধীন। আমরাও যদি ভারতবাসী হইতাম, এই সুখে বঞ্চিত হইতাম না।" আশা করি, যত ভারতবাসী নব উন্মাদনায় উন্মন্ত না হইয়া থাকেন, এই গানের কোরস্ করিয়া আকাশ-মণ্ডল বিধ্বনিত করিবেন।

'ধর্মা' পত্রিকার সম্পাদকীয়

২১৫

ইংলিশম্যানের ক্রোধ

আমরা অনেকদিন পূর্বের সহকারী ইংলিশম্যানের সরলতার প্রশংসা করিয়াছিলাম। আবার আজ না করিয়া থাকিতে পারি না। অন্য অ্যাংলো-ইভিয়ান দৈনিকঙলি দিমুখ সপ্ৰিশেষ, স্বাধীনতার প্রশংসা করে, এবং ভারতের প্রাধীনতার প্রশংসা করে, এবং ভারতের প্রাধীনতার আবশ্যকতা প্রতিপ্র করিবার চেম্টা করে। সহযোগীর চক্ষু লজ্জা নাই, যাহা মনে আসে, তাহা কেবল মানহানির আইন চোখের সম্মুখে রাখিয়া বিনা আবরণে লেখেন, আবল-তাবল বকিতে হইলে আবল-তাবলেই বকেন, যুজি, সতা, সংলগ্নতার উপর তাণ্ডব নৃতা করিতে বড় ভালবাসেন। তিনি মু**জপু**রুষ ও সংবাদপ্রের মধ্যে নাগা সন্মাসী। ইংলিশম্যান স্বাধীনতার কথা গুনিয়া শিহরিয়া উঠেন, ষেমন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিরোধী, তেমনই ইংলভের স্বাধীনতার বিরোধী। এক স্বেচ্ছাচারতন্ত্র সমস্ত রুটিশ সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া বিরাজ করিবে এবং ইংলিশম্যান তাহার মুখপাত্র হইয়া থাকিবে, ইহাই সহযোগীর রাজনীতিক আদর্শ। যাহারা স্বাধীনতার অনুমোদক ও প্রচারক, তাহারা বধ্য বা নিকাসন ও জেলের যোগ্য। মিঃ ব্যালফুর অধিকারপ্রাপ্ত হইলেই লুই নাপোলিয়নের নাায় রাষ্ট্রবিপ্লব করিয়া মিঃ লয়ড জর্জ ও ওয়িনপ্টন চাচ্চিলকে জেলে এবং মিঃ কীরহাড়ি ও ভিকটর গ্রেসনকে কোর্ট মার্শ্যালে পাঠাবার পরামর্শ সহযোগী নিশ্চয়ই পাকে প্রকারে দিবেন। স্বাধীনতা অপেক্ষাও সাম্য কথা তাঁহার অপ্রিয়_া সহযোগী বলেন, সমস্ত য়ুরোপ ও আসিয়াখণ্ডময় যে সামাপ্রচার ও সামোর আকাখ্ফা আরভ হইয়াছে, তাহা প্রচারকদের রভে নিব্রাপিত না হইলে পৃথিবীর যত সিংহাসন টলিবে এবং হেয়ার উুটিট্ লুগ্ত হইবে। অতএব ভিক্টর গ্রেসন, র্দ্ধ মূর্খ টলপ্টয় ও "মাণিকতলার" অর্বিন্দ ঘোষ––কি অপুর্ব সমাবেশ।~–ইংলিশম্যান ঠিক ফেরারের ন্যায় বিনা বিচারে গুলি করিতে বলেন না, তবে সেইরূপ কোন ব্যবস্থা না করিলে আর কেহ নিরাপদ থাকিবে না। এত সরলতার মধ্যে এই অসরলতা কেন? ইংলিশম্যানের ভয় কি? হিন্দু-পঞ্চের কপালে যাহা লেখা ছিল, ইংলিশম্যান হাজার হত্যা বা বলপ্রয়োগের পরামর্শ দিলেও তাহার ভাগ্যে ইহা ঘটিবে না। প্রজাকে হত্যা করিবার প্ররুতি বন্ধ করা আইনের উদ্দেশ্য, কিন্তু রাজার মনে হত্যার প্রবৃত্তি জাগাইবার চেল্টায় কোন শস্তি নাই।

দেওঘরে জীবন্ত সমাধি

সংবাদপতে প্রকাশ যে, একজন হিন্দু সাধু হরিদাস সন্ন্যাসীকে অতিক্রম করিয়া সমাধি–নিমগ্ন না হইয়াও জীবত কবরে কয়েকদিন রহিয়াছিলেন। আমাদের দেশে পুরাতন বিদ্যা সকল লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা এইরাপ

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

প্রয়োগে আশ্চর্য্যান্বিত হই। পূর্ব্বপুরুষদের কথা আমরা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেই। অথচ যে বিদ্যার ভগ্নাংশ মাত্র আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে, ধম্মের, শাস্তে, শিক্ষায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার তুলনায় আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমস্ত বিদ্যা নবজাত শিশুর অর্থহীন প্রলাপ মাত্র। যেমন শিশু যত পদার্থ সম্মুখে দেখে, তাহা হাতে তুলিয়া হাত বুলাইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বাহাজগতের কতক জ্ঞান সঞ্য় করে, কিন্তু জগৎ কি, পদার্থের আসল স্বরূপ ও সম্বন্ধ কি, তাহা কিছুই জানে না, সেইরূপে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রকৃতির স্থূল-পদার্থ সকল হাতে তুলিয়া হাত বুলাইয়া, ভাসিয়া চুরিয়া কতক জান সঞ্য় করে। কিন্তু জগৎ কি, পদার্থের আসল স্থরূপ কি, স্থূল সূক্ষের সম্বন্ধ কি, তাহা কিছুই জানে না এবং এই বিদ্যার অভাবে পদার্থের প্রকৃত স্বভাব অবগত হইতে পারে না। মনুষ্য সম্বন্ধে শবচ্ছেদ করিয়া ও রোগের লক্ষণ ও অবান্তর কারণ নিরীক্ষণ করিয়া যতটুকু জান সঞ্য় হয়, ততটুকু জান পাশ্চাত্য বিদ্যায় পাওয়া যায়। এই জান অনেক বিষয়ে স্ত্রান্ত। বৈজ্ঞানিক বলেন, আকর্ষণ-শক্তি জগতের সক্বিয়াপী ও অলঙ্ঘা নিয়ম, কিন্তু মনুষ্য প্রাণায়াম দ্বারা আকর্ষণ-শক্তি জয় করিতে পারে এবং স্থূল জগতের বাহিরে সেই নিয়মের কোন জোর নাই। বৈজ্ঞানিক বলেন, হৃৎপিজের স্পন্দন ও শ্বাসনিঃশ্বাস রুদ্ধ হুইলে প্রাণ শরীরে থাকিতে পারে না, কিন্তু প্রমাণিত হইয়াছে যে, হাৎপিণ্ডের স্পন্দন ও শ্বাসনিঃশ্বাসের ক্রিয়া অনেকক্ষণ ও অনেকদিন পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইতে পারে অথচ সেই রুদ্ধনিঃশ্বাস ব্যক্তি পূর্কবিৎ নড়িতে পারে ও কথা বলিতে পারে, বাঁচা ত দূরের কথা। ইহাতে বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য বিদ্যা স্বক্ষেত্রে ও স্থূল পদার্থজ্ঞানেও কত সঙ্কীণ ও লঘু। আসল বিজ্ঞান আমাদেরই ছিল। সেই জ্ঞান স্থূল প্রয়োগ দারা লব্ধ না হইয়া সূক্ষ প্রয়োগ দারা লব্ধ হইয়াছিল। আমাদের পূক্র-সেই উপায় দ্বারা পুনর্লব্ধও হইতে পারে। সেই উপায় যোগ।

যুক্ত মহাসভা

সহযোগী বেঙ্গলী যুক্ত মহাসভার সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ না করিলেই ভাল হইত। সহযোগী যে সর্ভে জাতীয়পক্ষকে আহান করিতেছেন, সেইগুলি মধ্যপন্থীদের অনুকূল। গত বর্ষে জাতীয়পক্ষ কন্-ভেন্সনে প্রবেশ করিবার সুবিধা প্রার্থনা করিতেছিলেন, এবং কলিকাতা অধিবেশনে চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হইবার আশা দেখিয়া মধ্যপন্থীদের মনোনীত সর্ভে সম্মত হইলেন। এইবার তাঁহারা তত সহজে সম্মত হইতে পারেন না। ইতিমধ্যে রাজনীতিক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, পশ্চিম ভারতের মধ্যপন্থীগণের মনের ভাব পরিস্ফুট হইয়া আসিয়াছে, জাতীয়পক্ষ আর গোখলে মেহতার অধীন হইয়া মহাসভা করিতে রাজী হইবেন

না। তথাপি এখনও বিবেচনা হইতেছে, অল্পদিনের মধ্যে কোন স্থির সিদ্ধান্ত হইবার কথা, এখন এই রূপ মত প্রকাশে বাদবিবাদ হওয়ায় মিটমাটের বিঘ মানু হইবে।

ধন্ম ১২শ সংখ্যা, ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৬

হিন্দু সম্প্রদায় ও শাসন সংস্কার

আমরা যখন হিন্দু সভার কথা লিখিয়াছিলাম, তখন এই অর্থে মত-প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, যদিও গভণমেন্টের প্রাসাদান্বেষী ও স্বতন্ততা অনুমোদক মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর বিরক্ত হইয়া স্বতন্ত রাজনীতিক চেল্টা করা হিন্দুদের পক্ষে স্বাভাবিক, তথাপি সেইরূপ চেপ্টায় দেশের অনিষ্ট ভিন্ন হিত সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। এখনও আমরা সেই মত পরিবর্ডন করিবার কোন কারণ অবগত নহি। শাসনসংস্কারে বা নৃতন ব্যবস্থাপক সভায় আমাদের কোনও কালে আস্থা ছিল না, হিন্দু-মুসলমানকে বিনা পক্ষপাতে সেই সভায় সমান প্রবেশাধিকার দিলেও আমরা সেই কৃত্তিম সভার অনুমোদন করিতাম না। আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদেরই হাতে, এই সত্য যখন সম্পূর্ণ ভাবে এবং দৃঢ় হাদয়ে গ্রহণ করিবার শক্তিলাভ করিব, তখন অতি শীঘ্রই প্রকৃত প্রজাত্ত বিকাশের অনুকূল ব্যবস্থাপক সভার সৃষ্টি হইবে। অতএব এই কৃত্রিম স্বর্ণ-ভূষিত ক্রীড়ার পুতুল লইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করা আমাদের মতে বালকোচিত মূর্খতা মাত । তথাপি ইহা স্থীকার করি যে, এই নূতন সংস্কারে হিন্দু সম্প্রদায়ের অপমান ও বহিষ্কারের চেম্টায় হিন্দু সম্প্রদায় অসম্ভূম্ট ও বিরক্ত হইবার যথে**গ্ট কারণ আছে। মুসলমানদের স**ক্রি স্বতন্ত প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে, যে প্রদেশে তাহাদের সংখ্যা কম সে প্রদেশে অল্পসংখ্যক বলিয়া স্থতন্ত্র নিব্রাচকবর্গের নিব্রাচিত স্থতন্ত্র প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে, এবং যে প্রদেশে তাঁহাদের সংখ্যা অধিক, সে প্রদেশে বহু-সংখ্যক বলিয়া স্বতন্ত নিব্বাচক-বর্গের নির্বাচিত স্থতন্ত্র প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে। হিন্দুদের কোথাও সেই সুবিধা দেওয়া হয় নাই। যেস্থানে তাঁহারা অল্প সংখ্যক, সে স্থানে দেওয়া যায় না, দিলে সভায় তাঁহাদের প্রাবল্য হইবে। যে স্থানে তাঁহারা অৱসংখ্যক, সেই-স্থানে দেওয়া হয় নাই, দিলে সভায় মুসলমানদের সম্পূর্ণ প্রাবল্য খবর্ব হইবে। মুসলমান নিকাচকবর্গ যে নিয়মানুসারে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে নিদিস্ট তত্ত্ব বা উদার মত লক্ষিত হয় না, অনেক শিক্ষিত সম্ভান্ত মুসলমান বাদ পড়িয়া গেলেন, অনেক অশিক্ষিত গভর্ণমেন্টের খয়ের খাঁ নিকাচকবর্গের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তথাপি সেই নূতন স্পিটতে প্রজাতত্তের অস্পপট দূরবর্তী ছায়ার ছায়া পড়িয়াছে, হিন্দুদের উপর সেই এক রতি পরিমাণেও অনুগ্রহ হয় নাই। এইরূপে ভারতবর্ষের প্রধান সম্প্রদায়কে অপমানিত ও অসম্ভূপ্ট করিয়া রাখার
কৌশল কোন জগদ্বিখ্যাত রাজনীতিবিদের কল্পনায় প্রথম উদয় হইল, তাহা
জানিবার জন্য মনে কৌতুহল হইল। কর্ক ও ভল্টরের ভক্তজন মরলীর না
কানাডা-শাসক লর্ড মিন্টোর ? না কোন গুণ্ত রক্ষের ?

মুসলমানদের অসভোষ

শাসন সংস্থারে দুইজন মুসলমান অসন্তুপ্ট হইয়াছেন, ইংলগুবাসী আমীর আলী সাহেব এবং কলিকাতার ডাজার সুহরাওয়াদি, কিন্তু তাঁহাদের অসন্তোষের কারণ এক ধরণের নহে। আমীর আলী রুণ্ট, কেননা এই শাসন সংস্কারে মুসলমানদের যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত্র, জর্জ সাহেবের বিশ্বপ্রাসী লোভ তাহাতে তৃগ্ত হয় না। পুর্বের্ও বুঝিয়োছিলাম যে সারাসেন জাতির ইতিহাস লিখিবার ফলে আমীর আলী সাহেবের মনে অতি উচ্চ ও প্রশংসনীয় মহতুলোভ জনিয়াছে, তাঁহার মনে মধ্যযুগের মুসলমান সামাজ্যের পুনরাবির্ভাবের স্বপ্ন ঘুরিতেছে। বিদূপ করিলাম কিন্তু ইহা বিদূপ করিবার কথা, নহে। মহৎ মন, মহতী আকাঙ্কা, বিশাল আদর্শ রাজনীতিক ক্ষেৱে অতিশয় উপকারী ও প্রশংসনীয়, তাহাতে শক্তি হয়, উদার ক্ষরিয় ভাব হয়, জীবনের তীব্র স্পদ্দন হয়, যে অল্লাশী, সে জীবন্যুত। কিন্তু বিদূপের কথা, হাস্যকর স্বপ্ন এই যে, রুটিশ কম্মচারীবর্গের অধীনে মুসলমানদের লুণ্ড মহত্ত্ব উদ্ধার হইবে। আমীর আলী কি মনে করেন যে ইংরাজ মুসলমানকে ভারতের "দেওয়ান" করিবার মানসে এই পক্ষপাত করিতেছেন? ডাভার সুহরা-ওয়াদির অসভোষের কারণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র । তাহার নালিশ এই যে, বিলাত ফেরৎ অনেক শিক্ষিত মুসলমানকে নিব্বাচন অধিকারে বঞ্চিত করিয়া যত গভর্ণমেন্টের খয়ের খাঁ অশিক্ষিত ওস্তাগর দফতরী বিবাহের রেজিন্টার খাঁ বাহাদুর খাঁ সাহেবকে নির্বাচক করা হইল। তিনি কি ইহাও বুঝিতে পারেন না যে বিলাতে স্বাধীনতা-বিষ আছে, যাঁহারা বিলাত ফেরৎ, তাঁহারা হয়ত সেই বিষে অল্লাধিক পরিমাণে বিষময় হইয়া আসিয়াছেন, সেইরূপ লোক ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলে মহা বিদ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। আর এইরাপ সংস্কারে শিক্ষিত লোক উপযুক্ত নির্বাচক, না খয়ের খাঁ ওস্তাগর দফতরী খাঁন সাহেব খাঁ বাহাদুর বিবাহের রেজিস্ট্রার উপযুক্ত নির্ফাচক? এই প্রশ্নের উত্তর ভাক্তার সাহেব বিবেচনা করিয়া দিউন, তাঁহার অসতোষ অজ্ঞানসভূত বলিয়া **শ্বীকার করিতে বাধা হইবেন**।

'ধর্ম্ম' পত্রিকার সম্পাদকীয়

২১৯

মূল ও গৌণ

আমাদের রাজনীতিক চিভার প্রধান দোষ ও রাজনীতিক কম্মে দৌকাল্যের কারণ এই যে আমরা মূল ও গৌণের প্রভেদ বুঝিতে অক্ষম। যাহা মূল, তাহাই ধরিতে হয়, যাহা গৌণ, তাহা মূলের অনুকূল যদি হয় মূলকে বজায় রাখিয়া গ্রহণ করিব, কিন্তু গৌণকে গ্রহণ করিতে গেলে যদি মূলকে পাইবার পথে বিঘ বা বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা হয়, তবে কোনও রাজনীতিবিদ গৌণকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না। আমরা কিন্তু সম্মত হই, পদে পদে মূলকে ফেলিয়া গৌণকে আগ্রহের সহিত ধরিতে যাই। আমাদের ধুব বিশ্বাস যে গৌণকে লাভ করিলে শেষে মূল আপনিই হাতে আসিবে ৷ বিপরীত কথাই সত্য, মূলকে লাভ করিলে তাহার সহিত যত গৌপ সুবিধা ও অধিকার জুটিয়া আসে। রিফস্মের সম্বন্ধে অনেকের এইরূপ মজাগত লম ও বৃদ্ধি-দৌক্রল্য দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক, কিছু লাভ করিলাম, কোন সময়ে আরও লাভ করিব, শেষে অল্প অল্প অধিকার লাভ করিতে করিতে স্বর্গে পহঁছিব, যাঁহাদের এইরূপ ভাব তাঁহারা এই কৃত্তিম ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি হইবার উপযুক্ত রাজনীতিক বটেন। শিশু ভিন্ন খেলনার কদর কে বোঝে? কিন্তু শিশুপ্রকৃতি ত্যাগ করিয়া স্বপ্পরাজ্য হইতে অবতরণ করিয়া যদি একবার কঠিন ও অপ্রিয় সত্য দেখি, এইরূপ চিন্তাপ্রণালী কি ভ্রান্ত ও অমূলক তাহা সহজে বোধগম্য হয়। বিজ্ঞ শিশুগণ আমাদের সম্মুখে ইংলভের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া স্বমত সমর্থন করেন। কিন্তু এই কাল মধ্যযুগও নহে, রাণী এলিজাবেথের সময়ও নহে, প্রজাতন্তের চরম বিকাশের কাল বিংশ শতাব্দী, আমরাও স্বজাতির অধীন ইংরাজ প্রজা নই, শ্বেতবর্ণ পাশ্চাত্য রাজকম্মচারীবর্গের কৃষ্ণবর্ণ আসিয়াবাসী প্রজা, অতএব এই অবস্থায় ও সেই অবস্থায় স্বর্গ-পাতালের তফাৎ। ইংলণ্ডেও গৌণকে উপেক্ষা করিয়া মূলকে আদায় করিবার সুবিধা বা যন্ত না থাকিলে ইংলগু হয় আজও স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের অধীন দেশ হইয়া থাকিত, নহে ত রক্তপাতে ও রাজুবিপ্লবে স্বাধীন হইত। সেই সুবিধা বা যন্ত্র the purse, রাজা আমাদের কথা প্রত্যাখ্যান করিলেন, আমরাও রাজার বজেট ভোট করিব না এই অদ্রান্ত ব্রহ্মান্ত। আইন সংগঠন বা বজেট প্রণয়নে অধিকার প্রজার প্রতিনিধিবর্গের হাতে থাকিলে আমরাও আর রিফর্ম বয়কট করিতে বলিতাম না। তবে কি না, রিফর্ম প্রত্যাখ্যান করা বিজের কশ্ম নহে, গভর্ণমেন্ট ত গভর্ণমেন্ট, তাঁহারা যাহা দেন, তাহা গ্রহণ করিতে হয়, ইহার পরে আরও দিতে পারেন। গভর্ণমেন্ট কেন এই খেলনা ভারতের পকুকেশ শিশুগণকে দিয়াছেন, তাহা কি একবার ভাবিয়াছ? দেশময় অসভোষ ও অশাভি এবং দৃঢ়ভাবে বজ্জন অস্ত্র প্রয়োগের ফলে তোমাদের এই লাভ হইয়াছে। তাঁহারা দেখিতেছেন, এই লাভে তোমরা সম্ভুপ্ট হইবে, কি আরও দিতে হইবে। তোমরা যদি ইহা গ্রহণ কর, তাহা হইলে আর একবার সেইরূপ তীব্র আন্দোলন ও

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

২২০

বয়কটনীতির প্রয়োগ না হইলে আর কিছুই পাইবে না, না আকাশের চাঁদ, না চাঁদের কৃত্রিম স্বর্ণমাখা প্রতিকৃতি। যদি দেখেন যে ইহাতে হইল না—প্রকৃত অধিকার দিতে হইবে, তাহা হইলে প্রকৃত অধিকার দিবেন, অধিক না হউক, অল্প কিছু দিবেন। অতএব রিফর্ম প্রত্যাখ্যান করিয়া দৃঢ্ভাবে বয়কট প্রয়োগই বুদ্দিমানের কম্ম। কিন্তু তোমাদের এই সব কথা বলা বৃথা, শিশুমহলে যে সন্দেশ রসগোল্লা প্রচলিত, সেইগুলিই তোমাদের মুখরোচক। আবার তোমরাই না কি ছেলেদের বল রাজনীতিতে মিশিতে নাই, তোমরা এখনও অপকৃবৃদ্ধি, রাজনীতি বুঝিতে পার না। স্বয়ং ছেলেমানুষী বুদ্ধি ত্যাগ করিলে তাহার পরে এই কথা বলা উচিত ছিল।

একটি খাঁটি কথা

আমাদের রাজনীতিকগণকে দোষ দিব কেন, এই দেশে রুটিশ আমলে অনেকদিন প্রকৃত রাজনীতিক জীবন লু॰ত হইয়াছে, সেই অনুভবের অভাবে আমাদের নেতারা রাজনীতিতত্ব বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু এত দীর্ঘকাল পরাধীন দেশের শাসনে কৃতবিদ্য ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াও ইংরাজ রাজনীতিকগণ এই কয়েক বৎসর ধরিয়া যে বিষম স্রম করিয়া আসিতেছেন, তাহা দেখিয়া বিদিমত হইতে হয়। বঙ্গভঙ্গের পরে এই রিফর্মই তাঁহাদের প্রধান ও মারাত্মক ভুল। এই রিফর্মের ফলে মধ্যপ্**ছীর প্রভাব দেশে বিন্**ষট হইবে, জাতীয় পক্ষের দ্বিগুণ বলহৃদ্ধি হইবে, কর্ম্মচারীবর্গের পক্ষে ইহা যথেষ্ট ক্ষতি। কিন্তু সমস্ত হিন্দু-সম্প্রদায়কে অপদস্থ ও অপমানিত করিয়া যে বিষ-বীজ বপন করা হইয়াছে তাহাতে আরও গুরুতর ক্ষতি হইল। মিঃ রাম্সী ম্যাক্ডনালড্ এম্পায়রের প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন, এই হিন্দু-মুসলমান ভেদ রাজনীতিক্ষেত্রে স্থাপিত করিয়া কর্ম্মচারীবর্গ নিজের অনিপ্টই করিয়াছেন। কাঁচা রাজনীতিক আন্দোলন অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক ও ধর্মাভেদ মূলক অসভোষ ও আক্রমণ অতি গুরুতর ও গভর্ণমেন্টের ভীতির কারপ। অতি খাঁটি কথা। আমরা যদি ইংরাজ জাতির বিদ্বেষে গ্রভ্ণমেন্টের অকল্যাণ্ই লক্ষ্য করিয়া দেশের কার্য্য করিতাম,––আমাদের শঙ্গুগণ সেই কথা রাতদিন প্রচার করেন–– তাহা হইলে আমরা ইহাতে আনন্দিত হইতাম। কিন্তু আমরা গভর্নমেন্টের অকল্যাণ চাই না দেশের কল্যাণ ও স্বাধীনতা চাই। হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষে যেমন গভর্ণমেন্টের তেমন দেশের ভীষ্ণ অকল্যাণ-হইবে বলিয়া এই ভেদ্-নীতির তীর প্রতিবাদ করি এবং হিন্দুসম্প্রদায়কে মূসলমানের সংঘর্ষ ত্যাগ করিয়া রিফর্ম বয়কট করিতে বলি।

ধন্দর্ম, ১৩শ সংখ্যা, ১৩ই অপ্রহায়ণ, ১৩১৬

রামসী ম্যাক্ডনালড্

আমরা রামসী ম্যাক্ডনাল্ডের ভারতে আগমনের সময় এই ভাবে লিখিয়াছিলাম যে, তিনি আসিয়াই বা কি করিবেন, অল্পদিনে ভারতে ফিরিয়া বা কি জানিয়া লইবেন, এবং মরলীর শাসন-সংস্কারে যখন এত আস্থাবান তাহার নিকট আমরাও বা কি সহানুভূতি বা লাভের প্রত্যাশা করিব ? তাহার পরে ম্যাক্ডনাল্ডের সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে। তিনি ভারতে অতি অঙ্গদিন ঘূরিয়া আগামী প্রতিনিধি নিব্বাচনের সংবাদ পাইয়া বিলাতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, সেই অল্পদিনও প্রায়ই ইংরাজ কম্মচারীদের সহিত বাস করিয়াছেন। অথচ দেখিলাম যে তিনি ভারতের অবস্থা বৃঝিতে চেল্টা করিতেছেন এবং কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। কিন্তু মিঃ ম্যাক-ডনালড্ রাজনীতিবিদ ও সতর্ক। তিনি কীর হার্ডির মত তেজস্বী ও স্প_{ত্ট}– বজুণ নহেন, নিজ মত অনেকটা গোপন করিয়া রাখেন, যাহা মনে ভাবেন তাহার অল্লাংশই বাক্যে ব্যক্ত করেন। হটিশ রাজনীতিক জীবনে তিনি শ্রমজীবী-দলের নরমপন্থী নেতা। শ্রমজীবীরা সকলেই সোস্যালিল্ট, সকলেই এক উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, বর্তুমান সমাজ ও রাজ্তন্ত ভালিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িতে চান। কিন্তু কয়েক-জন চরমপত্নী, প্রকাশ্যভাবে এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া উদারনীতিক ও রক্ষণশীল উভয় দলকে পরাভূত করিয়া প্রকৃত সাম্যপূর্ণ প্রজাতত্ত্বে ব্যক্তিকে ডুবাইয়া সম্পিটকে দেশের সর্ব্ববিধ সম্পত্তি ও আধিপত্যের অধিকারী করিতে কৃতসঙ্কল্প। মধ্যপন্থী শ্রমজীবী কীর হাডির দল, উদারনীতিক দলের সহিত যখন সুবিধা যোগদান করেন, যখন সুবিধা সেই দলের বিরুদ্ধাচরণ করেন, আমাদের ভূপেনবাবু ও সুরেন-বাবুর ন্যায় Association cum Opposition নীতি অবলম্বন করিয়া এক হস্তে যুদ্ধ করেন, এক হস্তে আলিসন করেন। নরমপন্থীগণ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া উদারনীতিকদের পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করিয়া অতি সম্ভর্পণে অগ্রসর হইতে চান। উদ্দেশ্য কিন্তু একই। মিঃ ম্যাক্ডনালড্ অতিশয় বুদ্ধিমান, চিভাশীল ও চতুর রাজনীতিবিদ, বিলাতের ভাবী মহাযুদ্ধে তিনি বোধ হয় একজন প্রধান মহারথী হইবেন। ভারতের সহিত তাঁহার আভরিক সহানু-ভূতি আছে, কিন্তু এই অবস্থায় ভারতের কোন হিতসাধন করা তাঁহার সাধ্যাতীত।

রিফর্ম ও মধ্যপন্থী দল

মধ্যপদ্দীদল তাঁহাদের চিরবান্ছিত শাসন সংস্কার পাইয়াছেন কিন্তু সেই

লাভে হর্ষপ্রফুল না হইয়া শোক-সভুঞ্চ হইতেছেন। তাঁহাদের ক্রন্দন ও তীব্র অভিমানের যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁহাদের চতুরচূড়ামণি শ্বেত-শ্যামরায় মধ্যপত্নী রাধার সহিত তাঁহার যভাবসুলভ ধূর্ততা অবলয়ন করিয়া চন্দ্রাবলীকে কৌন্সিল অভিসারে ডাকিয়া প্রবেশ করাইয়াছেন। মধ্যপন্থীগণ বলিতেছেন, আমরাই শাসনসংক্ষার করাইলাম, অথচ আমরাই সেই সংক্ষারে বহিত্রুত হইলাম, যাঁহারা শাসন-সংক্ষারের বিরোধী ছিলেন, তাঁহারাই গৃহীত হইয়াছেন, একি বিদুপ, একি অন্যায়। এই করুণ অভিমানপূর্ণ নিবেদন চারিদিকে শুনিতেছি, তবে প্রভেদ আছে। বোমাইবাসিনী রাধা চির অভ্যাস রক্ষা করিয়া শ্যামের সহিত প্রেমে মাখা মধুর কলহ করিতেছেন, বসবাসিনী রাধার বিষম মান, আর শ্যামের মুখ দেখিব না, সেই কথা বলিবার সাহস নাই, শ্যামকে একেবারে চটাইতে চান না, অথচ মনে মনে সেই ভাবই রহিয়াছে। মধ্য-পছীদের বিপ্রলম্ধ দশা দেখিয়া হাসিও পায় দয়াও হয়। কিন্তু রাধার মনে রাখা উচিত ছিল যে কেবলই কলহ কেবলই আবদার করিলে প্রেম টেকে না, মানের ভয়ে রাধার শ্রীচরণে পড়িয়া নিজ সবর্বস্থ তাঁহাকে দেয়, শ্বেতবর্ণ শ্যামসুন্দর সেইরূপ ছেলে নহে। দুঃখের কথা, যে বেল্ডিড়ীর নিবাসী শ্যাম-সুন্দর বেশী প্রেম দেখাইয়াছিলেন, তিনিই বেশী ধূর্ত্তা করিয়াছেন, এখন মান-ভঞ্জন করিবে কে? রদ্ধ মরলী আবার কি নূতন বংশীরব করিয়া ইহাদের আহত হাদয়কে শীতল করিবেন?

গোখলের মানহানি

রটিশ সামাজ্যের প্রধান স্বস্তু মাননীয় গোখলে মহাশয়ের বিরুদ্ধে কয়েকজন অপকৃবৃদ্ধি লোক অযথা তিরন্ধার ও বিদূপ করিয়া মহারাল্ট্রীয় প্রজাকে উত্তেজিত করিয়াছিল, ইহা বড় দুঃখের কথা। গোখলে মহাশয় মন্মাহত হইয়া রাটিশ বিচারকদের আশ্রয় লইয়াছেন এবং তাঁহাদের সাহায্যে তাঁহার মানহানির পহা বন্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রধান শত্রু ও নিন্দুক হিন্দু পঞ্চকে বিনাশ করিয়াছেন। ভালই হইয়াছে। মিথ্যা কথা বলিতে নাই, বিশ্বাস করিলেও যে কথা তুমি বিচারালয়ে প্রমাণ করিতে অক্ষম, সেই কথা লিখিতে নাই। হিন্দু পঞ্চের সম্পাদক এবং পুণার উকীল শ্রীযুত ভীডে এই কথা বিস্ফৃত হইয়া দণ্ডের পাত্র হইয়াছেন। ভাল কথা। কিন্তু রাজনীতিক ক্ষেব্রে নালিশ করিয়া লোক-প্রিয়তা আদায় করা যায় না। অপর লোকে গোখলে মহাশয়ের মানহানি করিলে তাহার উপায় আছে, তিনিও সেই উপায় অবলম্বন করিয়া জয়ী হইয়াছেন, কিন্তু নিজে নিজ মানহানি করিলে তাহার কি উপায় হইতে পারে। গোখলে মহাশয় যাহা প্রশংসা করিতেন, এখন তাহার নিন্দা করিতেছেন, যাহার নিন্দা করিতেন তাহার প্রশংসা করিতেছেন, ইহা দেখিয়া লোকে তাঁহার উপর সহজেই বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে। আগে কন্দর্মচারীদের প্রিয় হইয়াও প্রজার প্রীতি আকর্ষণ

করা কঠিন হইলেও অসাধ্য ছিল না, কিন্তু নৃতন প্রলয়ের পরে সেই জলস্থলবাসী জানোয়ার বিলুপ্ত হইয়াছে।

নূতন কৌন্সিলর

যখন বনের বড় বড় রক্ষ সকল কাটে, তখন সহস্ত অলক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ-পালা চক্ষু আকর্ষণ করে। আগে ভূপেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, দ্বারভাঙ্গা, রাসবিহারী ইত্যাদি বড় বড় রাজনীতিক নেতা, বিখ্যাত জমিদার ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বিদ্বান ব্যবস্থাপক সভার সভা হইতেন, নুতন সংস্কারের প্রভাবে এই-রূপ লোককে সরাইয়া সাগরের উপরে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য উঠিয়া সহর্ষে নবসূর্য্য কিরণে লম্ফ করিতেছে। প্রতিদিন নূতন নূতন নির্বাচন প্রাথির নাম পড়িয়া বিদ্মত হইলাম। এতগুলি অজানা মহার্য্য রত্ন এতদিন অক্ষকারে লুকাইয়া ছিল? আমরা লর্ড মরলীকে ধন্যবাদ দিই, দেশ এত ধনী ছিল, নিজের ঐশ্বর্য্য বুঝিতে পারে নাই, মরলীর প্রভাবে রুদ্ধ ধনভাভারের দ্বার খুলিয়াছে—সকল রত্ন সূর্য্যকিরণে প্রদীপত হইয়া নয়ন ঝলসিয়া দিতেছে।

ধন্ম, ১৪শ সংখ্যা, ২০শে অগ্রহারণ, ১৩১৬

ট্রান্সভালে ভারতবাসী 🤺

ট্রান্সভালবাসী ভারতসন্তান যে দৃত্তা ও স্বার্থত্যাপের দৃশ্টান্ত দেখাইয়াছেন ও দেখাইতেছেন, তাহা জগতে অতুলনীয়। প্রাচীন আর্য্যা শিক্ষা ও আর্য্যাচরির এই দূর দেশে এই নিঃসহায় পদদলিত কুলীমজুর দোকানদারের প্রাণে যেমন তীরভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে, ভারতে বঙ্গদেশেও সেই ভাবে, সেই পরিমাণে এখনও জাগে নাই। বঙ্গদেশে আমরা বৈধ প্রতিরোধ মুখে সমর্থন করিয়াছি মার, ট্রান্সভালে তাঁহারা কার্য্যে সেই প্রতিরোধের চরম দৃশ্টান্ত দেখাইতেছেন। অথচ ভারতে যে সকল সুবিধা ও সহজ ফলসিদ্ধির সন্তাবনা রহিয়াছে, ট্রান্সভালে তাহার লেশ মার নাই। এক একবার মনে হয়, ইহা রথা চেল্টা, কোন্ আশায় ইহারা এত যাতনা, এত ধননাশ, এত অপমান ও লান্ছনা স্বীকার করিতেছেন? ভারতে আমরা ত্রিশ-কোটী ভারত সন্তান, রাজপুরুষগণ ও তাহাদের স্বজাতীয় সহায় মুল্টিমেয় লোক, এই ব্লিশ-কোটী লোক দশদিন বৈধ প্রতিরোধ করিলে বিনা রক্তপাতে স্বেচ্ছাচারতন্ত আপনি বিনাশপ্রাণ্ঠ হইবে, এক কোটী লোকও সেই পথ দৃত্তার সহিত অবলম্বন করিলে এক বৎসরের মধ্যে শান্ত অনিন্দা আইন-সন্তাত উপায়ে রান্ত্রবিপ্রবের ফল সুসম্পন্ন হইবে। ট্রান্সভালে মুল্টিমেয়

ভারতবাসী দেশের লোকের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত, কোনও বল নাই, কোনও leverage নাই, তাঁহারা সকলে জেলে পচিলে দেশচ্যুত হইলে, নিম্মল হইলে গরীব ট্রান্সভালবাসীর অল্পদিন আর্থিক ক্ষতি ও কল্ট হইবে বটে কিন্তু সেই দেশের সেই গভর্ণমেন্টের কোন গুরুত্র বা স্থায়ী অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই, বরং তাঁহাদের শন্তুগণ এই পরিণামই চান। আখিমীদীস বলিতেন, উত্তোলন যন্ত রাখিবার স্থান যদি পাই, পৃথিবী শুন্যে উত্তোলন করিতে পারি। ইঁহাদের উত্তোলন-যন্তও নাই, রাখিবার স্থানও নাই, অথচ পৃথিবী শন্যে উত্যোলন করিতে উদ্যত। তথাপি তাঁহাদের পরিশ্রম কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। মিঃ গান্ধী বলিয়াছেন, আমরা ভারতবাসী, আমরা আধ্যাথিক বলে আস্থাবান, আধ্যাত্মিক বলে সমন্ত বাধা অতিক্রম করিব। ভারতবাসী ভিন্ন এই ভান, এই শ্রদ্ধা, এই নিষ্ঠা কোন জাতির আছে বা থাকিতে পারে ? ইহাই ভারতের মহত্ত যে এই নিষ্ঠার বলে শিক্ষিত অশিক্ষিত সহস্র সহস্র সংসারী সৃখ দুঃখকে তুচ্ছ করিয়া সরল প্রাণে দৃঢ় সাহসে এইরাপ দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। হয় ত যে ফলের আকা**ং**ক্ষায় তাঁহারা যন্তণা ভোগ করিতেছেন সেই ফল হস্তগত হইবে না, কিন্তু এই মহৎ চেল্টার মহৎ পরিণাম হইবে, ইহাতে ভারতবাসীর ভবিষাৎ উন্নতি সাধিত হইবে, তাহার লেশমাত্র সন্দেহ নাই।

টাউন হলের সভা

মিঃ পোলক ট্রান্সভালবাসী ভারত সন্তানদের প্রতিনিধিরূপে এই দেশে আসিয়া ভারতবাসীর সহানুভূতি ও সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন। আমাদের সহানুভূতির অভাব নাই, ক্ষমতার অভাবে আমরা নিরুপায় ও নিশ্চেপ্ট হইয়া রহিয়াছি। আমাদের তিনটি পন্থা আছে। গ্রভর্ণমেন্টের নিকট নিবেদন করিতে পারি, ইহাতে কোন ফলের আশা নাই, গভর্ণমেন্টও ট্রান্সভাল গভর্ণ-মেন্টের এইরূপ বর্করোচিত ব্যবহারে অসম্ভণ্ট, কিন্তু আমাদের রাজপরুষগণ আমাদের অপেক্ষাও নিরুপায়। যে বিষয়ে ভারতের হিত ইংলণ্ডের হিতের বিরোধী, সেই বিষয়ে ভারতীয় রাজপরুষগণ ইচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের হিতসাধনে অক্ষম। ভারতবাসীর ঔপনিবেশিক গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ করা ইংলভের অহিতের, ঔপনিবেশিকগণের ক্রোধ বিফল মনের ভাব নহে, সেই ক্রোধ কার্য্যকর। ভারতবাসীর হিতে আঘাত পড়িলে পরাধীন ভারতবাসী কাঁদিবে, আর কি করিবে ? আমরা নাটালে কুলী পাঠাইবার পথ বন্ধ করিতে বলিতেছি. ইহাতে নাটালবাসী যদি অসন্তোষ প্রকাশ করেন, আমাদের গভর্মেন্ট কখনও এই উপায় অবলম্বন করিতে সাহসী হইবে না। দ্বিতীয় পন্থা, ট্রান্সভালের ভারতবাসীদিগকে অধিক সাহায্যে পুষ্ট করা, বিশেষতঃ তাঁহাদের বালকদের শিক্ষাদানে এইরূপ সাহায্য করিলে তাঁহাদের এক গুরুতর অসুবিধা দূরীভূত হইবে। এইরূপ সাহায্য দেওয়া সহজ নহে। ভারতেরও অর্থের অশেষ

প্রয়োজন, অর্থের অভাবে কোন চেল্টা ফলবতী হয় না। তবে এই বিষয়ে গভর্ণমেন্টের সহানুভূতি আছে, গোখলেও দূরবতী বৈধ প্রতিরোধের প্রশংসা করিয়াছেন, ভারতের রাজদ্রোহভয়ক্লিল্ট ধনী সন্তান কেন এই নির্দ্দোষ যুদ্ধে অর্থ সাহায্য করিতে পরাত্মুখ হন? তৃতীয় পন্থা, সমস্ত ভারতময় প্রতিবাদের সভা করিয়া গ্রামে গ্রামে ট্রান্সভালবাসী ভারতসন্তানদের অপ্যান, লান্ছনা, যন্ত্রণা, দৃঢ়তা, স্বার্থত্যাগ জানাইয়া ভারতের সেই আধ্যাত্মিক বল জাগান। কিন্তু সেই কার্য্যের উপযোগী ব্যবস্থা ও কল্মশৃত্খলা কোথায়। যে দিন বঙ্গন্দে বোস্বাইয়ের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজের একতা ও বলর্দ্ধি করিতে শিখিবে, সেইদিন সেই ব্যবস্থা ও কল্মশৃত্খলা হইতে পারে, আমাদের দৃল্টান্ত দেখিয়া অন্যান্য প্রদেশের লোকও সেই পথে ধাবিত হইবে। সেই পর্যন্ত এই নিজ্জীব ও অকল্মগ্য অবস্থা থাকিবে।

নিৰ্বাসিত বঙ্গসন্তান

এক বৎসর গতপ্রায়, নিক্লিসিত বঙ্গসন্তান এখনও নিক্লাসনে, কারাগারে। গভর্ণমেন্টের অনুগ্রহপ্রত্যাশীগণ এক বর্ষাকাল কেবলই বলিতেছেন, এই হইল, কারামুক্তি হইল, মরলী একপ্রকার সম্মত হইলেন, কাল হইবে, অমুক অবসরে হইবে, রাজার জন্মদিনে হইবে, রিফারম্ প্রচার হইলেই হইবে, প্রতিবাদ সভা কর না, গোল কর না, গোল করিলে আমাদের সমস্ত পরিশ্রম পশু হইবে। অথচ সেইদিন ম্যাকডনাল্ড সাহেবের মুখে শুনিলাম ভারতবাসূীর নিশ্চেল্টতায় পালামেন্টে কটন প্রভৃতির আন্দোলন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, কেন না বিলাতের লোক বলিতেছে, কই ইঁহারা গোল করিতেছেন, ভারতে সাড়া শব্দ নাই, তাহাতে বোঝা গেল নিকাসনে ভারতবাসী সস্তুত্ট, নিকাসিতদের কয়েকজন আত্মীয়, বঞ্জু-বান্ধব প্রভৃতিই আপত্তি করিতেছেন, নিব্র্বাসনে লোকমত ক্ষুব্ধ নহে। বিলাতের প্রজার পক্ষে এইরাপ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য। সমস্ত দেশ নিবর্বাসনে দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ রহিয়াছে, অথচ সকলে নীরব শান্তভাবে গভর্ণমেন্টের নিগ্রহ-নীতি শিরোধার্য্য করিলেন, ইহা রটিশ জাতির ন্যায় তেজস্বী ও রাজনীতি-কুশল জাতির বোধগম্য নহে। তাহার উপর মান্দ্রাজ কংগ্রেস নামে অভিহিত রাজ– পুরুষ-ভক্তদের মজলিসে বড় বড় নেতাগণ মরলী-মিন্টোর স্তব-স্তোত্র করিয়া বয়কট বৰ্জন পূৰ্বক গান করিয়াছেন, "আহা, আজ ভারতের কি সুখের সময়।" বঙ্গদেশের সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সেই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং ভারতবাসীর আদরের গোখলে পুণায় গভর্ণমেন্টের "কঠোর ও নিদ্রয় নিগ্রহ নীতির" আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া ভারতবাসীর নেতা ও প্রতিনিধি-রূপে তাহার সমর্থন করিয়াছেন। এইরূপ রাজনীতিতে কোনকালে কোন্ও দেশে কোনও রাজনীতিক সুফল ল³ধ হয় নাই, হইবেও না।

২২৬

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

যুক্ত মহাসভা

সহযোগী বেপলী সেইদিন আবার অসময়ে যুক্ত মহাসভার কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন, যিনি ক্রীডে সহি করিবেন না র্টিশ সামাজ্যের অন্তর্গত স্বায়ত-শাসনে সন্তুপ্ট না হইয়া স্বাধীনতাকেই আদুশ করেন, তাঁহার "কংগ্রেসে" প্রবেশ অধিকার নাই, তিনি মেহতা গোখলে মজলিসের উপযুক্ত নহেন। এই প্রবন্ধ লইয়া অমৃত বাজার পত্রিকার সহিত সহযোগীর বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছে, বেললী বলিয়াছেন, এখন বাদ-বিবাদ করা অনুচিত, মিলনের যে অল্প সম্ভাবনা আছে, তাহা নষ্ট হইতে পারে। উভম কথা। আমরা পূর্বেই বেললীকে সেই বিষয়ে সতর্ক করিয়াছিলাম এবং মৌনাবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। আশা করি যতদিন এই বিষয়ের মীমাংসা না হয়, সহযোগী আবার বাক্সংযম করিবেন। কিন্তু যখন বেঙ্গলী এইরাপ স্বাধীনতা আদর্শ বর্জন করিতে আদেশ প্রচার করিয়াছেন, আমরা তাহার উত্তরে বলিতে বাধ্য যে, আমরা সত্য ও উচ্চ আদুর্শ পরিত্যাগ করিয়া মেহতা মজলিসে প্রবেশ করিবার জন্য লালায়িত নহি, আমরা উপযুক্ত মহাসভা চাই, মেহতা মজলিস চাই না। স্বাধীনচেতা ও উচ্চাকাঙক্ষী ভারত সন্তানদের প্রবেশের বিরুদ্ধে সেই মজলিসের দার রুদ্ধ তাহা জানি। কনপিটটিউশনরূপ অর্গল ও ক্রীড নামক তালা দিয়া স্যত্তে বন্ধ করা হইয়াছে, তাহা জানি ৷ যখন ভারতের অধিকাংশ ধনী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজনীতিবিদ স্বাধীনতা আদর্শ প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে ভীত হন, তখন আমারও মহাসভার সেই বিষয়ে জেদ করিতে রাজী নহি, কলিকাতায়ও জেদ করি নাই, সুরাটেও করি নাই। যতদিন সকলে একমত না হই, ততদিন স্বায়ত্বশাসনই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী আছি। কিন্তু আমাদিগকে সেই উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে মত দিতে সত্য-এপট হইতে, মিথ্যা আদর্শ প্রচার করিতে আদেশ করিবার তোমাদের কোনও অধিকার নাই। স্বাধীনতাই আমাদের আদর্শ, তাহা রটিশ সামাজ্যের অন্তর্গত হউক বা বহির্ভূত হউক, কিন্তু আইন সঙ্গত উপায়ে সেই আদুর্শসিদ্ধি বান্ছনীয়। যদি মেহতা-মজলিস মহাসভায় পরিণত করিবার আকাঙ্কা থাকে, তাহা হইলে সেই রুদ্ধ দারের তালা ভারিয়া দিতে হইবে ৷ কনপিটটিউসন ও দারের অর্গল না হইয়া কম্মের প্রতিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক। নচেৎ অন্য প্রতিষ্ঠার উপর মহাসভা সংগঠন করা উচিত। অবশ্যই ইহা আমাদেরই মত, যে কমিটি হুগলীতে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার প্রামর্শের পরিণাম অবগত নহি. শেষ ফলের অপেক্ষায় রহিয়াছি।

রমেশচন্দ্র দত্ত

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের পরলোক গমনে বঙ্গদেশের একজন উদ্যমশীল, বুদ্ধিমান ও কৃতী সন্তান কম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়াছেন। রমেশচন্দ্র অনেক ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। রাজনীতিতে, রাজ্যশাসনে, বিদ্যাদ্র্যালয়, সাহিত্যে তিনি যশ ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি পুস্তকদারা ভারতবাসীর মন বয়কটগ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, যদি রমেশ্চন্দ্রের আর সকল কম্ম, পুস্তক ইত্যাদি বিস্মৃতি-সাগরে নিমগ্র হয়, এই একমার অতি মহৎ কার্য্যে তাঁহার নাম ভারতের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। কাহারও মৃত্যুতে আমরা দুঃখ প্রকাশ করিতে সম্মত নহি, কারণ আমরা মৃত্যুকে মানি না, মৃত্যু মায়া, মৃত্যু গ্রম। রমেশচন্দ্র মৃত নহেন, এই শরীর ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন মাত্র এবং সেই স্থান হইতেও তাঁহার পরলোকগত আত্মা প্রিয় স্থদেশের অভ্যুত্থানের সাহায্য করিতে নিষিদ্ধ নহে।

বুদ্ধ গয়া

গত ৩রা ডিসেম্বর প্রত্যুষে, পশ্চিমবঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর সদলে মটর-কারে করিয়া, বোধ গয়াস্থ প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির দেখিতে গিয়াছিলেন। ঐ প্রাচীন মন্দিরটি গয়া হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ প্রাচীন স্থপতি-বিদ্যার কৌতুহলোদ্দীপক আদর্শখানি হিন্দু এবং বৌদ্ধগণের ঘোরতর মনো-মালিন্যের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। মোহন্ত ছোটলাট বাহাদুরকে বাড়ীটির সব্ব্র ঘুরিয়া যাবতীয় প্রধান প্রধান দুল্টব্য বিষয় দেখাইয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস এই যে, যেখানে রাজকুমার সিদ্ধার্থ সক্রপ্রথমে বুদ্ধত্ব প্রাণ্ড হইয়াছিলেন, মন্দিরটি ঠিক সেই স্থানের উপরে অবস্থিত। যে র্ক্ষতলে বসিয়া তিনি তাঁহার নূতন ধশর্ম আবিফার করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়, সেটি এখন বর্ডমান নাই। মন্দিরের ভিতরে বুদ্ধদেবের একটি প্রকাণ্ড প্রতিমৃত্তি আছে। এখানে প্রাচীন অশোক রেলিংএর ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। ইহার অনেক-খানি আজিও দাঁড়াইয়া আছে। ইহা নিঃসন্দেহে অশোকের সমকালীন এবং অন্যুন দুই সহস্র বৎসারের পুরাত্তম। রেলিংএর অনেকগুলি প্রস্তরখণ্ড পার্শ্ববর্তী বাড়ীগুলির দেওয়াল চাপা পড়িয়াছিল। সেগুলি যথাস্থানে আবার বসান হইয়াছে। দ্বিসহস্রাধিক বর্ষকাল ধরিয়া এই মন্দিরটি সমগ্র প্রাচ্য-ভূখণ্ডের বৌদ্ধগণের একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে। খৃঃ পৃঃ প্রথম শতাব্দীতে ইহা নিশিমত হইয়াছিল।

ধন্ম, ১৫শ সংখ্যা, ২৭এ অগ্রহায়ণ, ১৩১৬

ফেরৌজশাহের চাল

কুচক্রীর চক্র বোঝা দায়। ফেরোজশাহ মেহতা কুচক্রীর শিরোমণি, যখন

জোরে পারেন না, হঠাৎ কোন অপ্রত্যাশিত চাল চালিয়া অভীপ্টসিদ্ধি আদায় করা তাঁহার অভ্যাস। কিন্তু লাহোর কন্ভেম্নের পনের দিন পূর্বের যে অপুর্ব চাল চালিয়াছেন, তাহাতে কাহার কি লাভ হইবে, তাহা বলা কঠিন। লোকে অনেক অনুমান করিতেছে, কেহ কেহ বলে, ফেরোজশাহ বঙ্গদেশের ও পঞাবের অসভোষে ভীত হইয়া রণে ভঙ্গ দিতেছেন। স্বীকার করি, বোমাইয়ের এই একমাত্র সিংহ কলিকাতায় লোকমতের ভয়ে পেটে ল্যাজ গুটাইয়া রাখিয়া-ছিলেন, পাছে কেহ মাড়ায়,––কিন্ত লাহোর কন্ভেন্সন সিংহ মহাশয়ের নিজের গর্ত্ত, সেইখানে কোনও ভজিহীন জন্তুর প্রবেশ কঠিন আইনে নিষিদ্ধ। তাহার উপর অভ্যর্থনা সমিতি নিয়ম করিয়াছে যে, স্বেচ্ছাসেবক বল, দর্শক বল, কেহ পাণ্ডালে উচ্চ শব্দ করিতে পারিবে না, না hiss না বন্দেমাতরং ধ্বনি, না 'shame, shame' না জয়জয়কার! যে করিবে, তাহাকে গলাধারা দিয়া সভা হইতে বাহির করা হইবে। সিংহ কিসেতে ভীত ? ল্যাজ মাড়ান দুরের কথা, প্রভুর কাণে কোন বিরভিন্সচক শব্দও পৌছিতে পারে না, চারিদিক নিরাপদ। আবার কেহ কেহ বলে, সার ফেরোজশাহ ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের সভা হইতে আহূত হইয়াছেন, তাঁহার রাজভজির চরম বিকাশের চরম পুরস্কার হাতে পড়িতেছে, সেইহেতু আর কনভেনসনের সভাপতি হইতে তিনি অক্ষম। কিন্তু পনের দিন বিলম্ন মালু, সার ফেরোজশাহ কি এত নিগুর পিতা, যে তাঁহার আদরের কন্যার শেষ রক্ষা করিয়া স্বর্গে যাইতে অসম্মত হইবেন, গভর্ণমেন্টও কি কনভেনসনের মূল্য বোঝেন না ? এই আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য ফেরোজ-শাহকে পনের দিনের ছুটী দিবেন না? আমরাও একটি অনুমান করিয়া বসিয়াছি। শাসন সংস্কারে সমস্ত হিন্দুসম্প্রদায় অসম্ভণ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়াছে, সেই কথা ফেরোজশাহের অঞাত নহে অথচ শাসন সংকার ও গভণ্মেন্টের অনুগ্রহের লোভ দেখাইয়াই তিনি সুরাটে মহাসভা দিখণ্ড করিয়াছিলেন। তাহার পরে বঙ্গদেশের প্রতিনিধিগণকে এত রুত্ভাবে অবমাননা করিয়াছেন যে, তাঁহারা লাহোরে গিয়া আবার অপমানিত হইতে অনিচ্ছুক। ফেরোজশাহ স্বয়ং বলেন যে, শুরুতর রাজনীতিক কারণে তিনি সভাপতি পদ ত্যাগ করিয়া-ছেন। ইহাই কি সেই রাজনীতিক কারণ নহে? পদত্যাগের ফলে যদি সুরেন বাবুরা কনভেন্সনে যোগ দিতে রাজী হন, শাসনসংস্কার গ্রহণের দোষ মেহতার ভাগে না পড়িয়া সমস্ত মধ্যপন্থীদলে সমভাবে বিভক্ত হয়, এই আশা। বঙ্গদেশের মধ্যপন্থীগণের অনুপস্থিতিতে মেহতার সভাপতিত্বে অল্পসংখ্যক প্রতিনিধি দারা শাসনসংস্কার যদি গৃহীত হয়, সংস্কারের দশা ও কনভেনসনের দশাও অতি শোচনীয় হইবে। ফেরোজশাহের ইচ্ছা, বঙ্গদেশের প্রতিনিধি-গণকে লাহোরে হাজির করাইয়া তাঁহাদের দারা নিজের কার্য্য হাসিল করিবেন, স্বয়ং বঙ্গদেশীয় শিখণ্ডীর পশ্চাৎ গুণ্ডভাবে যুদ্ধ করিবেন। **নচেৎ কুচর**ীর শিরোমণি উদ্দেশ্যহীন চাল চালিকেন কেন?

'ধর্ম্ম' পত্রিকার সম্পাদকীয়

২২৯

পূৰ্ববৈঙ্গে নিৰ্ব্বাচন

পূর্ববঙ্গ প্রথম হইতে যে তেজ, সত্যপ্রিয়তা ও রাজনীতিক তীক্ষদৃষ্টি দেখাইয়া আসিতেছে, শাসনসংস্কারের পরীক্ষায় বোঝা গেল সেই সকল খণ নিগ্রহে ও প্রলোভনে নিভেজ হয় নাই, যেমন ছিল তেমনই রহিয়াছে ৷ ফরিদ-পুরে একজন হিন্দুও নিবর্গাচনপ্রাথী হন নাই, ঢাকায় একজন মাত্র মরলীর মোহে মুগ্ধ হইয়াছেন, ময়মনসিংহে যে চারিজন এই রাজভোগের আশায় ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুইজন আবার চৈতন্য লাভ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছেনে, আর দুইজনে, আশা করি, শ্রেয়ঃপথ অবলস্থন করিবেন। অতি আশ্চর্য্যের কথা, ভনিতেছি অধিনীকুমারের বরিশাল সংস্কার-মদে মাতাল হুইয়া লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া মরলীর মনের মত নৃত্য করিতেছে। এই দুর্ব্জি কেন ? নিব্রাসিত অশ্বিনীকুমারের এই অপমান কেন ? বরিশালের দেবতা রুটিশ কারাগারে নিবদ্ধ, কঠিন রোগে আক্রান্ত অথচ বিনা কারণে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়ের সেবা-ওএুষায় বঞিত, তাঁহার বরিশাল তাঁহাকে ভুলিয়া রাজপুরুষ-দের প্রেমের বাজারে নিজেকে বিক্রী করিতে ছুটিল। ছি! শীঘ্র এই দুম্মতি ত্যাগ কর, পাছে বঙ্গদেশ বরিশালকে উপহাস করিয়া বলে, র্থা অখিনীকুমার সমস্ত জীবন বরিশালবাসীকে মনুষ্যত্ব কি তাহা শিক্ষায় ও দৃষ্টান্তে দেখাইতে খাটিয়াছেন রুথা শেষে স্বয়ং দেশের হিতার্থে বলি হইয়া পড়িয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা

পশ্চিমবন্ধ কখন মাঝামাঝি ধরণের ভাবপোষণ করে না, যে পথে যায় ছুটিয়া যায়, যে ভাব অবলম্বন করে. তাহার চরম দৃশ্টান্ত দেখায়। পশ্চিমবন্ধে যেমন সর্ব্যক্রেই তেজন্ত্রী পুরুষসিংহ আছেন, তেমনি নির্লজ্ঞ ধামাধরার পালও আছে। যাহারা কোমর বাঁধিয়া নির্বাচন দৌড়ে প্রথম স্থান পাইতে লালায়িত, তাহারা প্রায়ই দেশের অক্তাত অপূজ্য স্থার্থান্বেষী ধামাধরার পাল। তাহারা বাবস্থাপক সভায় ভীড় করিলে দেশের লাভও নাই, ক্ষতিও নাই,— সভা অযোগ্য তোষামোদকারীর চিড়িয়াখানা বিশেষে পরিণত হইবে, আর কোন কুফল হইবে না। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দুয়েকজন দেশপূজ্য লোকের নাম দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। বঙ্গদেশে শ্রীযুক্ত বৈকুষ্ঠনাথ সেনের কি এত অল্প আদর যে শেষে এই ভীড়ের মধ্যে কৌন্সিলে চুকিবার জন্যে ঠেলাঠেলি করিতে হইল ? রদ্ধ বয়সে বৈকুষ্ঠ বাবুর এই অপমানপ্রিয়তা কেন? চিড়িয়াখানায় প্রবেশ কি এত লোভনীয়?

মরলীনীতির ফল

মোটের উপর মরলীনীতির ফল দেশের উপকারী বলিতে হইল। ভারতের

প্রধান বন্ধু ও হিতকর্তা লর্ড কর্জন বঙ্গভঙ্গ করিয়া সুপত জাতিকে জাগাইয়া-ছিলেন, নিবিড় মোহ দূর করিয়াছিলেন। যাহা অবশিশ্ট ছিল, মোহের পুন-বিজ্ঞার, নিদ্রার নবপ্রভাবের আশক্ষা আমাদের হিতৈয়ী লর্ড মরলী শাসন সংস্কার করিয়া অপনোদন করিয়াছেন। যাঁহাদের উপর বঙ্গভঙ্গের আঘাত পড়ে নাই, তাঁহারাও এই প্রহারে মম্মাহত হইয়া জাগিতেছেন, সমস্ত হিন্দুসম্প্রদায় পরমুখাপেক্ষায় অসারতা বুঝিয়া জাতীয়তার ধ্বজার তলে অচিরে সমবেত হইবে। রাজপুরুষদের সঙ্গে জমিদার ও মুসলমান রহিয়াছেন। দেখি তাঁহারাও কদিন টিকিতে পারিবেন। ভগবানকে প্রার্থনা করি, আমাদের তৃতীয় কোন হিতৈষী ইংরাজের মনে কোন নূতন যুক্তি ঢুকাইয়া দাও যাহার সুফলে জমিদার ও মুসলমানদেরও সম্পূর্ণ জানোদয় হইবে। জাতীয় পক্ষের আছা রথা কল্পনা নহে। যখন ভগবান সুপ্রসন্ধ, বিপক্ষের চেম্টায় বিপরীত ফল হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সাহায্য করে।

মিন্টোর উপদেশ

এই প্রীক্ষা**খ্নে ছোট ব**ড় অনেক ইংরাজ ভারতবাসীকে সংস্কার বিষয়ক সদুপদেশ দিতে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমাদের অতি লোকপ্রিয় সদাশয় বড়লাটও নিজ পূজনীয় মুখবিবর হইতে উপদেশ-সুধা ঢালিয়া আমাদের কর্ণতৃপ্তি করিয়াছেন। সকলের একই কথা—আহা এমন সুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তোমরা এইরূপে তাহার অপরূপ রূপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খুঁত বাহির না করিয়া cooperation সুধায় আমাদের সোনারচাঁদকে হাল্টপুল্ট কর, দোষগুলি আপনিই যাইবে। শিশুর বাপ মা যে এইক্লপ প্রশংসা করিবে, দোষ চাকিয়া দিবে তাহা স্বাভাবিক ও মার্জনীয় । কিন্তু সত্য কথা এই, ছেলেটীর এক বা দুই বা তিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ থাকিলে ক্ষতি হইত না, কিন্তু তাহার সমস্ত শরীর পচা, হাৎরোগ, যকুতের রোগ ক্ষয়রোগ লইয়া জাত, এই সোনারচাঁদ বাঁচিবার নহে, বাঁচিবার যোগ্যও নহে, র্থা বাঁচাইয়া কপ্ট দেওয়া অপেক্ষা বয়কট বালিসে স্থাসরোধ করিয়া যন্ত্রণামুক্ত করা দয়াবানের কার্য্য। তাহাতে যদি শিশুহত্যা ও নৃশংসতা দোষে অপ্রাধী হই, না হয় নরকভোগ করিব। আমাদের কিন্ত এক কৌতূহলের কারণ রহিল, সোনারচাঁদের বাপ মিন্টোর উক্তি শুনিলাম,—— মাননীয় মিঃ গোখলে যিনি সোনারচাঁদের মাতৃষ্করপ, তিনি কেন নীরবে সভানের নিন্দা সহ্য করিতেছেন ? না আমাদের গোপালকৃষ্ণ হিন্দু পঞ্চ ধ্বংস করিয়া বিজয়ানন্দের অতিরেকে সমাধিস্থ হইয়াছেন? বোধ হয় সূতিকা অশৌচ কয়েকদিন রক্ষা করিতেছেন, সময়ে আবার সভ্যসমাজে মুখ দেখাইতে আসিবেন।

'ধুমুম' পুরিকার সম্পাদকীয়

২৩১

লাহোর কন্ভেন্সন

লাহোর কন্ভেন্সনের অদৃষ্ট নিবিড় মেঘাচ্ছল হইয়াছে। বঙ্গদেশ অপ্রসর, পাঞ্জাব অসন্তুষ্ট, দেশের অধিকাংশ লোক হয় বহিষ্কৃত, নহে যোগদান করিতে অনিচ্ছুক, ফেরোজশাহ-প্রসূত, হরকিসনলাল-পালিত, গভর্ণমেন্ট লালিত কনভেনসন অতি কম্টে নিজ প্রাণরক্ষা করিতেছিল। শেষে এই কি বজ্ঞাঘাত! যে প্রিয় পিতার প্রেমে বঙ্গদেশের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া নিজেকে বিপদাপর করিয়াছিল, সেই পিতা ও ইষ্টদেবতা ফেরোজশাহ বিমুখ হইয়া সকল প্রার্থনা ঠেলিয়া নিজ গুণ্ত বিচারের অভেদ্য তিমিরে ইন্দ্রজিতের ন্যায় অতর্কা মায়াযুদ্ধে প্রর্ভ হইলেন। বোদ্ধাইয়ের সাঝ বর্তমানের টেলিগ্রামের উত্তরে হর্কিসন লাল দুঃখের সহিত জানাইয়াছেন যে, ফেরোজশাহ তাঁহার পদত্যাগের কারণ জানাইতে অসম্মত। অগত্যা ভক্ত তাঁহার রহস্যময় অনির্দেশ্য অতক্য দেবতার মুখের দিকে করুণ শূন্যদৃষ্টিতে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিয়াছেন। নূতন সভাপতিকে অল ইণ্ডিয়া "কংগ্রেস" কমিটি ভিন্ন কে নিকাচন করিবে? সেই কমিটির সভাস্থল ফেরোজশাহের শোবার ঘর। অতএব কমিটির অধিবেশনে প্রভুর ইচ্ছা ব্যক্ত হইতেও পারে। কাহার শিরে ফেরোজশাহের স্পর্শে পুণ্যময় পরিত্যক্ত মালা সেই পবিত্র করকমল হইতে নিক্ষিণ্ড হইবে? ওয়াচার না মালবিয়ার, না গোখলের ? আমাদের সুরেজ-নাথের নামও করা হইয়াছে, কিন্তু তিনি ফেরোজশাহের উচ্ছিল্ট সভাপতিত্ব তাঁহার কুপার দানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বঙ্গবাসীর অপ্রীতিভাজন হইবেন, সেই আশা পোষণ করা অন্যায়। গোখলে ফেরোজশাহের দিতীয় আত্মা, ওয়াচা তাঁহার আজাবাহক ভূত্য, মালবিয়াকে এই মহৎ পদে নিযুক্ত করিয়া কমিটি স্বাধীনতার ঢং করুক।

ধর্ম্ম, ১৬শ সংখ্যা, ৫ই পৌষ, ১৩১৬

বেঙ্গলীর উক্তি

আমাদের সহযোগী "বেল্পলী" যুক্তমহাসভা কমিটির বিফল পরিণাম দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, জাতীয় পক্ষের প্রতিনিধি ক্রীডে সম্মত হইলেন না, ক্রীডে সহি না করিলে কেহ মহাসভায় প্রবেশ করিতে পারিবে না, অথচ এই উল্টিমেটম দিয়াও সহযোগী আশা করিতেছেন যে আবার মিলনের চেল্টা হইতে পারে, আবার দুই দল যুক্ত হইয়া এক সঙ্গে দেশের কার্যো প্রবৃত্ত হইতে পারে। এই দ্রান্ত ধারণা যতদিন মধ্যপন্থী নেতাদের মন হইতে বিদ্রিত

না হয়, ততদিন মিলনের আশা রখা। যতদিন তাঁহারা এই জেদ ছাড়িতে নারাজ হইয়া থাকিবেন, ততদিন জাতীয় পক্ষ মিলনের আর কোনও চেল্টায় যোগদান করিবেন না। কেন না, তাঁহারা জানিবেন যে অপর পক্ষে প্রকৃত মিলনের ইচ্ছা নাই। দেশকে রখা আশা দেখান অনুচিত। জাতীয় পক্ষ অবিলম্বে তাঁহাদের বক্তব্য সক্র্যাধারণের জাপনার্থে প্রকাশ করিবেন, তাহাতে তাঁহারা কি সর্ত্তে মধ্যপন্থীদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে সম্মত, তাহা স্পশ্ট—ভাবে নিরূপিত হইবে। যে দিন মধ্যপন্থীগণ মেহতা ও মরলীর সফল রাজননীতিতে বিরক্ত হইয়া এই সর্ত্ত মানিয়া আমাদের নিকট সন্ধিস্থাপনার্থে আসিবেন, সেইদিন আমরা আবার যুক্ত মহাসভা স্থাপনে সচেল্ট হইব।

মজলিসের সভাপতি

মেহতার পদত্যাগে বঙ্গদেশীয় মধ্যপন্থীগণ এই প্রবল আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিলেন যে, এইবার বুঝি সুরেনবাবুর পালা, এই বঙ্গদেশের মধ্যপন্থী নেতা কনভেনসনের সভাপতি হইবেন, বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হইবে, বঙ্গদেশের জিত হইবে। আশাই মধ্যপত্নীর সম্বল, সহিষ্ণুতা তাঁহাদের প্রধান গুণ ! মাঁহারা সহস্রবার খেতাঙ্গের আনন্দময় পদ-প্রহার ভোগ করিয়া আবার প্রেম করিতে ছুটিয়া যান, সহস্তবার আশায় প্রতারিত হইয়া সগকোঁ বলেন, আমরা এখনও নিরাশ নহি, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী স্বদেশবাসীর ঘনঘন অপমানে লঝসংজ হইবেন অথবা মেহতা মজলিসের বঙ্গবিদ্বেষে জর্জরিত হইয়াও শিখিবেন এবং আত্মসম্মান বজায় রাখিবার চেম্টা করিবেন, এই আশা করা রুথা। মেহতার মজলিস কংগ্রেসও নহে, কনভেনসনও নহে, যাহারা মেহতার সুরে গান করিবেন, মেহতার পদপল্লবে স্বাধীন মত ও আত্মসম্মান বিক্রয় করিবেন, তাঁহাদেরই জন্য এই মজলিস। যাঁহারা এই মেহতা-পূজার "ক্রীড" স্বীকার না করিয়া প্রবেশ করিবেন, অনাহূত অতিথির ন্যায় তাঁহারা অপুমানিত হইবেন এবং যদি অপমানেও বশ না হন, শেষে গলাধাকা খাইয়া সেই সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। তাঁহারা কি ভাবিয়াছেন যে পদত্যাগ করিয়াও মজলিসের কর্ণধার হাল ছাড়িয়াছেন? আমরা তখনই বুঝিতে পারিয়াছি, মদনমোহনই সভাপতি হইবেন। মজলিসের পরমেশ্বর সেই আভা দিয়াছেন, তাঁহার বোসাইবাসী আজাবহমগুলী দেশকে এই আজা জানাইয়াছেন, অল ইভিয়া কংগ্রেস কমিটিও মাথা পাতিয়াছে। বঙ্গদেশের অল্পজন প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন--কলিকাতায় ও ঢাকায়, কিন্তু অন্যন্ত সাড়া শব্দ নাই। কয়-জন যাইবেন জানি না। খাঁহারা যাইবেন, তাঁহারা ইহা জানিয়া যাইবেন, যে আমরা রটিশ ইভিয়ান আাসোসিয়েসনের প্রতিনিধি হইয়া যাইতেছি। তাঁহারা বঙ্গদেশের প্রতিনিধি নহেন।

'ধর্মা' পত্রিকার সম্পাদকীয়

২৩৩

বিলাতের রাষ্ট্রবিপ্পব

বিলাতের পুরাতন রটিশ রাজতভ লইয়া যে মহান সংঘ্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহার পূব্বলক্ষণও উগ্ল ও ভীতি-সঞ্চারক। ইংলণ্ডের লোকমত কিরাপে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইতেছে, তাহা রয়টরের সংবাদে দিন দিন **প্রকাশ পাইতে**ছে। অনেক দিন পরে সেই দেশে প্রকৃত রাজনীতিক উত্তেজনা ও দলে দলে বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে। প্রথম সাধারণতঃ যাহা হয় তাহা হইল,––উদারনীতিক মন্ত্রী মিঃ উরের বক্তৃতার সময়ে চীৎকার ও বিরোধকারীদের গণ্ডগোল বাধা, পরে বলপ্রয়োগে সভাভঙ্গের চেল্টা। রক্ষণশীল দলের বক্তাগণও, বিশেষতঃ জমিদারবর্গ, প্রজার অসভোষে সেইরূপ বাধা পাইতে লাগিলেন, এখন মুখ্য মুখ্য মন্ত্রী ও বিখ্যাত বভা ভিন্ন কোন রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ অবাধে স্বমত-প্রকাশের অবসর পাইতেছেন না, অনেক সভায় এক কথাও বলিতে দেওয়া হয় নাই। কয়েক স্থানে সুরাট মহাসভার অভিনয় বিলাতে অভিনীত হইতেছে। এখন দেখিতেছি বড় বড় রক্ষণশীল রাজনীতিবিদও বাধা পাইতেছেন ে আরও উগ্র লক্ষণ দেখা দিয়াছে, প্রাণহানির চেল্টা। উরের একটি সভায় সেই ঘরের কাচের দরজা একপ্রকার battering ram দারা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে, অনেক লোক আহত হইয়াছেন। আর একটি রক্ষণশীল সভায় বলে সভাভঙ্গ করা হইয়াছে, সেই দলের স্থানিক কম্মকর্তাকে নির্দ্ধয় প্রহারে অচেতন করা হইয়াছে, নিব্বাচন-প্রাথী পলায়ন পূব্বক বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এই সকল লক্ষণ রাষ্ট্র বিপ্লবের—–দিন দিন যে উগ্র স্বরূপ ধারণ করিতেছে, সন্দেহ হয়, নিব্বাচনের সময়ে রক্ষণশীল নিব্বাচকবর্গকে ভোট দিতে দেওয়া হইবে কি না।

গোখলের মুখদশ্ন

গোখলে মহাশয়ের সূতিকা অশৌচ ঘুটিয়া গিয়াছে, আবার মুখ দেখাইয়া-ছেন, তাঁহার অমূল্য বাণীও শোনা গিয়াছে। জাতীয় পক্ষের নৃসিংহ চিন্তামণি কেলকর দুস্টা-সরস্থতীর আবেশে নব ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচনপ্রার্থী হইয়াছিলেন, বোয়াইয়ের লাট কেলকরকে অযোগ্য ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার নির্বাচন-লালসা নিষেধ করিয়াছেন, ইহাতে কেলকরও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া লাট সাহেবকে সাধিতে গিয়াছিলেন, লাট সাহেবও এই আবদারের উপযুক্ত উত্তর দিয়াছেন। আমাদের গোপালকৃষ্ণ ভাবিলেন, বেশ হইয়াছে, গভর্ণমেন্ট ইহাদিগকে কঠোর ও নির্দ্ধয়ভাবে নিগ্রহ করুক, আমি সেই অবসরে তাঁহাদের সহিত একটু প্রেম করি, আমার উপর লোকের যে ঘূণা ও ক্রোধ হইয়াছে তাহা কমিয়া যাইতেও পারে। অতএব তাঁহার "দক্ষিণ সভার" অধিবেশনে গোখলে কেলকরের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহার বন্ধু কার্ককে মধুর ভর্ৎসনা শুনাইয়া-

২৩৪

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

ছেন। বলিয়াছেন, কেলকর অযোগ্য নহেন, যোগ্য ব্যক্তি, গোখলে তাঁহাকে যৌবনকাল হইতে চিনিতেছেন, উত্তম সিফারস দিতে পারেন, কেলকর রাজদ্রোহী নহেন, বিকৃতমভিদ্ধ নহেন, লাট সাহেব আবার বিবেচনা করিলে ভাল হয়।

গোখনের স্বসন্তান সমর্থন

গোখলে মহাশয় নিজের সংস্কাররাপ সন্তানের কথাও বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, আমার প্রিয় সন্তান খুব সুন্দর ছেলে, শান্ত শিল্ট ছেলে, সমন্ত দেশের আদরের যোগা, তবে গন্তর্গমেন্ট তাহাকে যে রেণ্ডলেশনরাপ বন্ত পরিধান করাইয়াছেন, তাহাতেই গোল, সোনার চাঁদের রাপ প্রকাশ পায় না। ক্ষতি নাই, সোনার চাঁদকে আদর কর, পোষণ কর, বন্তু কদিন থাকিবে, শীঘ্র পরিপাটী বেশভূষা পরাইয়া তাহার নিদোষ সৌন্দর্যা সকলকে দেখাইব! বোদ্বাইয়ের লাটও এই উপদেশ দিয়াছেন, দেশ কি এতই অন্তন্ন ও রাজদোহী হইয়াছে যে লাটের অনুরোধ অমান্য করিবে? গোখলের উপযুক্ত কথা বটে।

ধন্দৰ্য ১৭শ সংখ্যা ১২ই পৌষ ১৩১৬

প্রস্থান

লাহোরের ধনীপুঙ্গব হরকিসনলালের নিমন্তণ রক্ষা করিতে যাঁহারা প্রস্থান করিয়াছেন, কনভেনসন যজে মরলীর শ্রীচরণে স্থদেশকে বলি দিতে. শাসনসংস্কার পেষণযত্তে জন্মভূমির ভাবী ঐক্য ও স্থাধীনতা পিষিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে বসিয়াছেন বলিয়া ভারতসচিবকে ধন্যবাদ দিতে যাঁহারা সানন্দে মহাসুখে নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, তাঁহারা দেশের নেতা, সম্ভাভ, ধনীলোক, দেশে তাঁহাদের "Stake" আছে, সম্মান আছে, প্রতিপত্তি আছে। বোধ হয় এই ধনসম্পত্তি সম্মান প্রতিপত্তি ইংরাজের দত্ত, মায়ের দত্ত নহে বলিয়া তাঁহারা কৃতন্মতা অপবাদের ভয়ে জন্মভূমিকে উপেক্ষা করিয়া মরলীকেই ভজিতেছেন। দরিদ্র মা একদিকে, বরদাতা, শান্তিরক্ষক, সম্পত্তি রক্ষক গভর্ণমেন্ট অপরদিকে, যাঁহারা মাকে ভালবাসেন, তাঁহারা একদিকে যাইবেন; যাঁহারা নিজেকে ভালবাসেন, তাঁহারা অপরদিকে যাইবেন; কিন্তু আর দুইদিকে থাকিবার চেম্টা যেন না করেন, দুই দিকের দেয় পুরস্কার ও সুবিধা ভোগ করিবার দুরাশা যেন পোষণ না করেন। যাঁহারা কনভেনসমে যোগদান করিতে

প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহারা নিজ লোকপ্রিয়তা, দেশবাসীর হাদয়ে প্রতিপত্তি ও দেশহিতৈষিতার গৌরব পদতলে দলন করিয়া সেই কৃস্থানে ছুটিতেছেন। এই প্রস্থান তাঁহাদের রাজনীতিক মহাপ্রস্থান।

হরকিসনলালের অপমান

তেজস্বী স্থদেশহিতৈষী ইংরাজ কখনও দেশদ্রোহীর সম্মান করিতে ভালোবাসেন না। যদি স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কয়েকদিন মৌখিক ভদ্রতা ও প্রীতি দেখান, তথাপি হাদয়ে অবজা ও অসম্মানের ভাব লুকায়িত হইয়া থাকে। পাঞ্জাবের হ্রকিসনলাল মনে করিয়াছিলেন, আমি রাজপুরুষদের অতীব প্রিয়, পাঞাবের লোকমত দলন করিয়া কনভেনসন করিতেছি, রাজ্-পুরুষদের সাহায্যে স্থদেশী বস্তুর প্রদর্শনী করিতেছি, গভর্ণমেন্টের নিকট আমার সকল আব্দার রক্ষিত ইইবে। হরকিসনলাল পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইবার জন্য লালায়িত, তাঁহার নামও নিকাচন-প্রাথীদের মধ্যে করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন নিয়মভঙ্গের জন্য সেই নাম গ্রহণ করা হয় নাই। ইহাতে লালাজীর প্রাণে বড় বাথা লাগিয়াছে। কন্ভেন্সনের হরকিসনলাল, গভর্ণমেন্টের হরকিসনলাল, প্রতিনিধি হইবেন না, নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করে নাই, এ কিরূপ কথা, কাহার এত বড় ধৃষ্টতা, র'স, গন্তর্ণমেন্টকে লিখি, সকলকে মজা দেখাইব। কিন্তু হরকিসনলালের আবেদনে বিপরীত ফল হইল। পঞাব গভর্ণমেন্ট লালাজীকে অপদস্থ করিয়া এক কথায় তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন, নিয়ম অনুসারে হরকিসনলালের নাম প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, প্রত্যাখ্যাতই থাকিবে। ন্যায্য কথা, ব্যক্তির খাতিরে নিয়ম্ভঙ্গ সভ্য রাজ-তত্ত্বের প্রথা নহে। কিন্তু হরকিসনলাল যখন মরলী ও মিন্টোর মনস্তুপ্টির জন্য প্রাণপণে খাটিয়াছেন, নাম প্রত্যাখ্যান করিবার পূর্বে তাঁহাকে সতর্ক করিতে পারিতেন, ভুল সংশোধন করা যাইত। আমরা বুঝি, জানিয়া গুনিয়া এই অপমান করা হইয়াছে, মধ্যপন্থীদলকে শিখাইবার জন্য করা হইয়াছে। রাজ-পুরুষেরা মধ্যপন্থীদিগকে স্থপক্ষে আকর্ষণ করিতে চান, কিন্তু কি রূপ মধ্য-পন্থী ? যে মধ্যপন্থী একহাতে গভর্ণমেন্টের পা টিপিতে, এক হাতে গলা টিপিতে অভ্যন্ত, গভর্ণমেন্টের নিন্দাও করিবেন, তাঁহাদের অনুগ্রহের দানও আদায় করিবেন, সেইরূপ মধ্যপন্থীর আর ইংরাজের বাজারে দর নাই। সম্পূর্ণ রাজভক্ত, সম্পূর্ণ সহকারিতা করিবেন, সেইরূপ মধ্যপন্থী হও, নচেৎ চরম-পছীর নাায় তোমরাও বহিত্কৃত হইবে। নৃতন কৌন্সিলের নিয়মাবলীর যে উদ্দেশ্য, হরকিসনলালের অপমান করিবারও সেই উদ্দেশ্য।

আবার জাগ

বঙ্গবাসী, অনেকদিন ঘুমাইয়া রহিয়াছ, যে নব জাগরণ হইয়াছিল, যে

২৩৬

নব-প্রাণ সঞ্চারক আন্দোলন সমস্ত ভারতকে আন্দোলিত করিয়াছিল, তাহা নিভেজ হইয়া পড়িয়াছে, মিয়ুমাণ অবস্থায়, অর্দ্ধনিব্রাণপ্রাণ্ড অগ্নির ন্যায় অল্প অল্প জুলিতেছে। এখন সঙ্গটাবস্থা, যদি বাঁচাইতে যাও, মিথ্যা ভয়, মিথ্যা কূটনীতি ও আত্মরক্ষার চেল্টা বর্জন করিয়া কেবলই মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আবার সম্মিলিত হইয়া কার্য্যে লাগ। যে মিলনের আশায় এতুদিন অপেক্ষা করিয়াছিলাম, সে আশা ব্যর্থ। মধ্যপন্থীদল জাতীয় পক্ষের সহিত মিলিত হুইতে চায় না. গ্রাস করিতে চায়। সেইরূপ মিলনের ফলে যদি দেশের হিত হইত, আমরা বাধা দিতাম না। যাঁহারা সত্যপ্রিয়, মহান আদর্শের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, ভগবান ও ধম্মকে একমাল সহায় বলিয়া কম্মক্ষেত্রে অবতীণ, তাঁহারা না হয় সরিয়া যাইতেন, যাঁহারা কূটনীতির আগ্রয় লইতে সম্মত, তাঁহারা মধ্যপন্থীদের সহিত যোগদান করিয়া, মেহতার আধিপত্য, মরলীর আজা শিরোধার্য্য করিয়া দেশের হিত করিতেন। কিন্তু সেইরূপ কটনীতিতে ভারতের উদ্ধার হইবার মহে। ধেশেমর বলে, সাহসের বলে, সত্যের বলে ভারত উঠিবে। অত্এব যাঁহারা জাতীয়তার মহান আদর্শের জন্য সক্ষ্ম ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, যাঁহারা জননীকে আবার জগতের শীর্ষস্থানীয়া শজিশালিনী, জ্ঞানদায়িনী বিশ্বমঙ্গলকারিণী ঐশ্বরী শক্তি বলিয়া মানবজাতির সম্মথে প্রকাশ করিতে উৎসুক, তাঁহারা মিলিত হউন, ধর্মবলে, ত্যাগবলে বলীয়ান হইয়া মাতৃকার্য্য আরম্ভ কর্জন। মায়ের সন্তান! আদর্শ দুল্ট হইয়াছ, আবার ধর্ম্মপথে এস। কিন্তু আর উদ্দাম উত্তেজনার বশে যেন কোন কার্য্য না কর, সকলে মিলিয়া এক প্রতিজ্ঞা, এক পস্থা, এক উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া যাহা ধর্ম্ম-সঙ্গত, যাহাতে দেশের হিত অবশ্যম্ভাবী, তাহাই করিতে শিখ।

নাসিকে খুন

নাসিকবাসী সাবরকর কয়েকটি উদ্দাম কবিতা লিখিয়াছিলেন বলিয়া ইংরাজ বিচারালয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হইলেন, সাবরকরের একজন অল্প-বয়য় বয়ু নাসিকের কলেক্টর জ্যাকসনকে হত্যা করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইলেন। রাজনীতিক হত্যা সম্পর্কে আমাদের মত আমরা পূর্কেই প্রকাশ করিয়াছি, বার বার সেই কথার পুনরারত্তি করা র্থা। ইংরাজের পত্রিকাসকল ক্রোধে অধীর হইয়া সমস্ত ভারতের উপর এই হত্যার দোষ আরোপ করিয়া গভর্ণমেন্টকে আরও কঠোর উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছেন। ইহার অর্থ দোষী নির্দ্দোধীকে বিচার না করিয়া ঘাহাকে সন্দেহ কর, তাহাকে ধর, যাহাকে ধর, তাহাকে নির্কাসিত কর, দ্বীপান্তরে পাঠাও, ফাঁসিকাঠে ঝুলাও। যাঁহারা গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করেন, তাঁহাদিগকে নিঃশেষ কর। দেশে প্রগাঢ় অক্সকার, গভীর নীরবতা, পরম নিরাশা ব্যাপ্ত করিয়া ফেলুক,—তাহাতেই যদি রাজভোহের স্ফুলিঙ্গ সকল আর প্রকাশ না

হয়, গুণত বহিদ নিবিয়া যায়। এই উন্মণ্ডের প্রলাপ শুনিয়া, রটিশ রাজনীতির শোচনীয় অবনতি দেখিয়া দুয়াও হয়, বিদ্ময়ও হয়। যদি সেই পুরাতন রাজনীতিক কুশলতার ভগ্নাংশও থাকিত, তোমরা জানিতে যে অন্ধকারেই হত্যাকারীর সুবিধা, নীরবতার মধ্যে উন্মন্ত রাজীবিপ্লবকারীর পিন্তল ও বোমার শব্দ ঘন ঘন শোনা যায়, নিরাশাই গুণত সমিতির আশা। যাহাতে এই রাজনীতিক হত্যা অবলম্বন করিবার প্রবৃত্তি দেশ হইতে উঠিয়া যায়, আমরাও সেই চেল্টা করিতে চাই। কিন্তু তাহার একমান্ত উপায়, বৈধ উপায়-দ্বারা ভারতের রাজনীতিক উন্নতি ও স্বাধীনতা সাধিত হইতে পারে, ইহাই কার্যোতেই দেখান। কেবল মুখে এই শিক্ষা দিলে আর লোকে বিশ্বাস করিবে না, কার্যোতেও বুঝাইতে হইবে। সেই পুণ্য কার্যো তোমরাই বাধা দিতে পার। কিন্তু তাহাতে যেমন আমাদের বিনাশ হইবে, তোমাদেরও বিনাশ হইবার সম্ভাবনা।

ধর্ম্ম ১৮শ সংখ্যা ১৯এ পৌষ, ১৩১৬

মুমূৰ্যু কন্ভেন্সন

আমাদের কন্ভেন্সনপ্রিয় মহারথীগণ লাহোরে মেহতা মজলিস করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। পঞাবের প্রজাসকল কন্ভেন্সন চায় না, নানা উপায়ে তাহাদের অনিচ্ছা ও অশ্রদ্ধা জাপন করিয়াছিল, কিন্তু হরকিসনলাল নাছোড়বন্দা। লোকমত দলন করিবার জন্য কন্ভেন্সনের স্টিট, পঞাবের লোকমত দলন করিয়া রাজপুরুষগণের প্রসন্নতার উপর নির্ভর করিয়া যদি লাহোরে কনভেনসন বসাইতে পারেন, তবে মেহতা মজলিসের অভিত্ব সার্থক হয়। এই হঠকারিতার যথেষ্ট প্রতিফল হইয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে মোটে তিন শ প্রতিনিধি মেহতা মজলিসে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং দর্শক-রুন্দের সংখ্যা এত কম ছিল যে নাতিরুহৎ ব্রাদলা হলের অর্দ্ধেক ভাগ মাত্র পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই শূন্য মন্দিরে এই অল্প পূজকের হতাশ পুরোহিতগণ রটিশ রাজলক্ষীকে নানান ভব ভোজে সভুপ্ট করিয়া, তাঁহার চরণক্মলে অনেক আবেদন নিবেদনরূপ উপহার করিয়া, ভক্তদের উপযুক্ত আদর করেন না বলিয়া মৃদুমন্দ ভর্তসনা শুনাইয়া তাঁহাদের আর্য্যকুলে জন্ম চরিতার্থ করিলেন। মেহতা মজলিস জোর করিয়া নিজেকে জাতীয় মহাসভা নামে অভিহিত ক'রে, জাতীয় মহাসভার কোন অধিবেশনে অর্দ্ধশূন্য পাণ্ডালে অল্লজন প্রতিনিধি এই-রূপ হাস্যকর প্রহসন অভিনয় করিয়াছেন, বল দেখি? তোমাদের মজলিস সভা বটে, কিন্তু "মহা"-ও নহে, "জাতীয়"-ও নহে। যে সভায় জাতি যোগদান ক্রিতে অসম্মত, তাহার আবার 'জাতীয়' নাম!

₹80

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

ধশর্ম

১৯শ সংখ্যা

২৬এ পৌষ ১৩১৬

কন্ভেন্সনের দুদর্শা

বোদ্বাইয়ের "রাউুমতে" কন্ভেন্সনের প্রতিনিধি ও দর্শকর্দের সংখ্যা বাহির হইয়াছে। এই সংবাদপত্তের লাহোর পত্ত-প্রেরক লিখিয়াছেন, "লাহোরের ক্রীড্ কংগ্রেসের অধিবেশনে সবসৃদ্ধ ২২৪ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এই সংখ্যার অর্জেকের উপর পঞ্চাবের অধিবাসী ছিলেন। যাঁহারা আগে রাজ-নীতিক কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন, সেইরূপ ভদ্রলোক খুব অল্পই ছিলেন। দেশকের সংখ্যা ছয় শত বা সাত শত হইবে। সময়ে সময়ে হলের দুই ভাগই খালি ছিল। একজনও মুসলমান প্রতিনিধি বা দর্শক উপস্থিত ছিলেন না। সভাপতি মালবীয় অতিশয় দক্ষতার সহিত কার্যা চালাইলেন, নচেৎ এইবার ক্রীড় কংগ্রেসের আরও দুরবস্থা হইত।" পত্র-প্রেরকের শেষ উভিন্<mark>র</mark> মধ্যে কোনও গুণ্ত মতভেদের ইসারা পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ শাসন-সংস্কার লইয়া এই মতভেদ, দুই দলের আপোষের সর্ভ কন্ভেন্সনের তদিষয়ক প্রস্তাব দেখিলেই বোঝা যায়। প্রস্তাবের প্রথমাংশের সহিত শেষাংশের সম্পূর্ণ বিরোধ। প্রথমাংশে মিন্টো ও মরলীর উদারতা, প্রজার মনস্তৃতির জন্য উৎকট ও বিক্ট চেম্টা ইত্যাদি গুণের সানন্দ প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতার উদ্দাম লহরী, শেষাংশে কঠোর, প্রায় অভদভাষায় গভর্ণমেন্টের গালাগালি এবং ক্রোধ ও ঘুণার উদ্দাম উচ্ছাস। এই হাস্যকর অসঙ্গত সম্মিলনে মালবীয়ার দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে. কন্ভেন্সন করাল অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া আলাহাবাদে মালবীয়ার শীতল ছায়ায় আবার সম্মিলিত হইবার দুরাশা পোষণ করিতেছে।

দলাদলি ও একতার মিখ্যা ভান

মানুষমাত্র কথার দাস, বাক্দেবীর পুতুল। চিরপরিচিত শ্রুতিমধুর কথা প্রবণ করাইয়া মনকে নাচান আমাদের মধ্যপন্থী বন্ধুদের এক প্রকার সিদ্ধি। তাঁহারা ইংরাজ রাজনীতিবিদগণের শিষ্য। ইংরাজ যেমন কোন শ্রুতিমধুর কথা আর্ত্তি করিয়া—খথা, রটিশ শান্তি, রটিশ ন্যায়পরতা, স্বায়ত্ত-শাসনসংক্ষার ইত্যাদি,—বিশাল শূন্যভাবের আবরণে স্বীয় অভীল্ট কার্য্য সিদ্ধি করিতে অভ্যন্ত, তেমনই তাঁহাদের মধ্যপন্থী শিষ্যগণ "রটিশ ন্যায়পরতার এজলাস" "রটিশ প্রজার বিবেকবৃদ্ধি", "রটিশ সামাজ্যভুক্ত অধিকার" ইত্যাদি শ্রুতিমধুর শূন্য কথায় দেশের বৃদ্ধি বিব্রুত করিয়া এতদিন ভারতের প্রকৃত উন্নতির সুপন্থা রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এখনও সেই অভ্যাস যায় নাই।

তাঁহারা জাতীয়-পক্ষের স্বতন্ত কার্য্যশৃত্থলার উদ্যোগ চলিতেছে দেখিয়া "দলাদলি", একতা ইত্যাদি পরিচিত কথার রোল করিয়া লোকের মন নাচাইতে চেল্টা করিতেছেন। তাঁহারাই ক্রীড ও কন্লিটটিউসন স্থাটি করিয়া জাতীয়-পক্ষকে মরলীর মনস্তৃপিটর আশায় বহিপ্কৃত করিলেন, তাঁহারাই হুগলী প্রাদেশিক সমিতিতে জাতীয় পক্ষের কোন প্রস্তাব গহীত হইলে উঠিয়া সমিতি ভাসিয়া দিবেন, এই বিভীষিকা দেখাইলেন, তাঁহারাই জাতীয় পক্ষের নেতা-গণের সহিত একসঙ্গে কার্য্য করিতে ভীত ও অনিচ্ছক, মধ্যপন্থী নেতাদের নামের সঙ্গে কোনও ঘোষণায় তাঁহাদের স্বাক্ষর দিবার প্রস্তাব উঠিলে "কাজ নাই, কাজ নাই, গভর্ণমেন্ট চটিবে, বড় মানুষেরা চটিবে," বলিয়া সেই প্রস্তাব উড়াইয়া দেন। অথচ আমাদের উপর উল্টা চাপ দিতে লজ্জিত নন। আমরাই নাকি দলাদলি করিতেছি, সামান্য মতভেদের জন্য একসঙ্গে কার্য্য করিতে অনিচ্ছক, কন্ভেন্সনে ঢুকিয়া মেহতাকে বুঝাইবার চেপ্টা না করিয়া খুত্ত হইয়া থাকি। এতদিন আমরা কোন বাধা করি নাই, দেশ, আন্দোলন, রাজ-নীতিক ক্ষেত্র তোমাদেরই হাতে ছিল, এই ফল হইয়াছে যে, সমস্ত দেশ নীরব হইয়া পড়িয়াছে, ভারত নিদ্রা যাইতেছে, লোকের উৎসাহ, সাহস, আশা ভগ্নপ্রায় হইয়া গেল। আমরা দেশকে জাগাইতে চাই—তামাদিগকে চিনিয়া লইয়াছি: জানি যে ইচ্ছা থাকিলেও ভয় ও বিপদের আশস্কা তোমাদিগকে কার্য্য করিতে দিবে না,---আমাদের বিপদ হউক, দলন হউক, আমরা দেশের কার্য্য করিব, সেই উদ্যোগ করিতেছি। অমনই মধ্যপন্থীদের রব উঠিতেছে, আহা কি করিতেছ? একজোট হইয়া কি সুন্দর ঘুম মারিতেছিলাম। আবার দলাদলি। আমাদের প্রিয় একতা গেল, রক্ষা কর, মতিলাল কোথায়, অনাথবঙ্গু কোথায়, আমাদের রক্ষা কর। তোমাদের মনের ভাব জানি, জাতীয়-পক্ষ যদি কার্য্য-শৃঙখলার সহিত কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তোমাদের হয় সেই কার্য্যে যোগদান করিয়া গভর্ণমেন্টের অপ্রিয় হইতে হইবে, নয় নিশ্চেন্ট থাকিলে অকন্মণ্য ও ভীরু বলিয়া দেশবাসীর সম্মান ও তোমাদের নুষ্টপ্রায় নেতুত্বের ভুগ্নাংশ হারাইতে হইবে। এই জনাই চির অভ্যাসবশে মিথ্যা একতার ভান করিয়া তোমাদের সেই প্রিয় সুখকর নিশ্চেম্টতার জন্য উদ্বিগ্নতা প্রকাশ কর।

নিকাসনের বিভীষিকা

আমাদের পুলিশ বরুগণ রটনা করিয়াছেন যে, আবার নির্বাসনরাপ রক্ষান্ত নিক্ষিপত হইবে, এইবার নয়জন নহে, চবিবশ জনকে মোটরকারে রেলে, "Guide" জাহাজে গভর্ণমেন্টের খরচে নানা প্রদেশ ও বিবিধ জেল ঘুরিয়া আসিবার জন্য প্রস্থান করিতে হইবে। পুলিশের এই তালিকায় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ নাকি প্রথম নম্বর পাইয়াছেন। আমরা কখন বুঝিতে পারি নাই, নির্বাসন এমন কি ভয়ঙ্কর জিনিষ যে লোকে নির্বাসন নাম গুনিয়া ভয়ে জড়সড়

হইয়া দেশের কার্য্য, কর্ত্তব্য, মনুষ্যুত্ব পরিত্যাগ পূর্বেক কম্পিত কলেবরে ঘরের কোণে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়ে। চিদাম্বরম প্রভৃতি কম্মবীর বয়কট প্রচার দোষে যে কঠিন দণ্ড হাসিমুখে শিরোধার্য্য করিয়াছেন, তাহার তুলনায় এই দণ্ড অতি লঘু, অতি অকিঞ্চিৎকর। বাহিরে পরিশ্রম করিতেছিলাম, নানা দুশ্চিভার মধ্যে দেশসেবা করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, না হয় ভগবান লর্ড মিন্টো ও মরলীকে যন্ত্র করিয়া বলিলেন, যাও, নিশ্চিত্ত হইয়া বসিয়া থাক, নির্জনে আমার চিন্তা কর, ধ্যান কর, পুস্তক পড়, পুস্তক লিখ, জ্ঞান সঞ্চয় কর, জ্ঞান বিস্তার কর। জনতায় থাকার রস আস্বাদন করিতেছিলে, নিজ্জনতার রস আস্বাদন কর। এই এমন কি ভয়ানক কথা যে ভয়ে কাতর হইতে হয় ? কয়েকদিন প্রিয়জনের মুখ দেখিতে পারিব না,––বিলাতে বেড়াইতে গেলে তাহা হয়, অথচ লোকে বিলাতে বেড়াইতে যায়। ধরুন, অখাদ্য খাইয়া, গ্রীলম ও শীতে কফ্ট পাইয়া শরীর ভাঙ্গিয়া যাইবে। বাড়ীতে বসিয়াও রোগের হাত হইতে নিস্তার নাই, বাড়ীতেও অসুখ হয়, মরণ হয়, অদৃষ্ট-লিখিত আয়ুক্রম কেহ অন্যথা করিতে পারে না। আর হিন্দুর পক্ষে মরণে ভীষণতা নাই। দেহ গেল, প্রানো বস্তু গেল, আত্মা মরে না। সহস্রবার জন্মিয়াছি, সহস্রবার জন্ম-গ্রহণ করিব। ভারতের খাধীনতা না হয় স্থাপন করিতে পারিলাম না, ভারতের স্বাধীনতা ভোগ করিতে আসিব, কেহ আমাকে বারণ করিতে পারিবে না। এত ভয় কিসের? সন্তায় ইতিহাসে অমর নাম লিখাইলাম, স্বর্গের পথ উন্মুক্ত, অথচ কল্ট নাই, অথবা সামান্য শরীরক্রেশে মুক্তি ও ভুক্তি পাইলাম। এ ত কথা ? ট্রান্সভালের কুলীদের মহৎভাব এবং ভারতের শিক্ষিত লোকের এই জঘন্য কাতরভাব দেখিয়া লজ্জিত হইতে হয়।

নিৰ্কাসন অসম্ভব

আমাদের ধারণা, এই ভয় দেখান র্থা আস্ফালন মাত্র। প্রস্তাব করা হইয়াছে, হয়ত ইভিয়ান গভর্ণমেন্টের অনুমতিও হইয়াছে, কিন্তু লর্ড মরলী যে সম্মত হইবেন, তাহা আমরা সহজে বিশ্বাস করিতে চাই না। নয় জনকে নির্কাসিত করায় লর্ড মরলীকে য়থেপ্ট ভুগিতে হইয়াছে, আবার চকিশ জনকে নির্কাসন করিবেন? বিশেষতঃ ইহা জানা কথা যে লর্ড মরলী শ্রীয়ুক্ত কৃষ্ণ-কুমার মিত্র প্রভৃতি নয় জনকে কারামুক্তি দিতে উৎসুক, কেবল ইভিয়া গভর্ণমেন্টের জেদে পারিতেছেন না। এই অবস্থায় তিনি কি সহজে আর চকিশ জনকে নির্কাসন করিয়া দেশের গভীর অশান্তিকে আরও গভীর করিবেন, বিপ্রবকারীদের ইচ্ছার মত কার্য্য করিবেন? তিনি অনেক ভুল করিয়াছেন, কিন্তু এখনও তাঁহার উন্মন্ত অবস্থা হয় নাই। অবশ্য লর্ড মিন্টো যদি বলেন যে নির্কাসনের অনুমতি না দিলে তিনি ভারতের শান্তির জন্য দায়ী নহেন, কিম্বা পদত্যাগ করিবার ভয়্ম দেখান, তাহা হইলে লর্ড মরলী দায়ে ঠেকিয়া সম্মত

হুইতে পারেন। নাও হুইতে পারেন, কেন না লর্ড মিন্টো না থাকিলে রুটিশ সাম্রাজ্য যে ধ্বংস হুইবে, সেই কথায় লর্ড মরলী হয়ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না। যাহা হুউক চবিবশ জনকে নির্বাসন করুন, বা একশ জনকে নির্বাসন করুন, আরবিন্দ ঘোষকে নির্বাসন করুন, বা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজ্জীকে নির্বাসন করুন, কালচক্রের গতি থামিবার নহে।

ধন্ম ২০শ সংখ্যা ৪ঠা মাঘ ১৩১৬

নব্যুগের প্রথম শুভলক্ষণ

় শাসন সংস্কার নবযুগের প্রথম অবতারণা, সেই যুগে অবিশ্বাসের ঘোর অন্ধকার মধুর প্রীতির আলোকে পরিণত হইবে, এবং দণ্ডনীতির কঠোর মৃত্তি ইংরাজ প্রকৃতিতে লীন হইয়া সাম্যনীতির আনন্দময় বিকাশ ভারত-জীবনকে সুখে ও প্রেমে পূর্ণ করিবে, এই শ্রুতি-মধুর রব অনেকদিন অবধি শুনিতেছি। এতদিন পরে কুহকিনী আশার বাণী সফল হইল। যে সভা-নিষেধ আইন পূর্বে বাঙ্গালার একমাত্র জেলায় জারি হইয়াছিল, তাহা এখন সমস্ত ভারতে জারি হইয়াছে। গত গুক্রবার হইতে সমগ্র ভারত এই আইনের অধীন হইয়াছে। আইনে বিনা অনুমতিতে কোথাও কুড়ি জন লোক এক সঙ্গে দাঁড়াইতে বা বসিতে পারিবেন না, দাঁড়াইলে বা বসিলে পুলিসে যদি এই কুড়িজনের সম্মিলনকে প্রকাশ্য সভা নামে অভিহিত করিতে অভিলাষী হয়,–– সেইরূপ হাস্যরসপ্রিয় লোক পুলিসে অনেক আছে––তাহা হইলে যাঁহারা দাঁড়াইয়াছেন বা বসিয়াছেন, তাঁহারা আইনে দঙ্নীয়। প্রমাণ করিতে হইবে যে তাঁহারা "সভার" সভ্য ছিলেন না, বা সভ্য হইলেও "প্রকাশ্য" ছিলেন না। তবে যদি "প্রকাশ্য" না হন, কাজেই ভুপ্ত ছিলেন, তাহা আরও বিপজ্জনক। ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে ছয়মাস বিনা পয়সায় গভর্ণমেন্টের আতিখ্য এবং বিনা মাহিনায় সম্রাটের জন্য খাটুনীর সুযোগ লাভ করিয়া নূতন যুগের রসাস্থাদন করিতে পারিবেন। নিজগৃহে সম্মিলিত হইলেও রক্ষা নাই। সেই-খানে যদি রাজনীতির কথা হয়, বা সেইরূপ কথা হইবার কোন সভাবনা থাকে, অথবা সেইখানে অমৃতবাজার প্রিকা, পঞাবী, বেস্লী, কম্ম্যোগী ইত্যাদি রাজদোহী সংবাদপত্র পড়া হয় বা পড়া হইবার কোনও সভাবনা হয়, পুলিস আসিতে পারিবে, এবং গৃহস্বামী ও তাঁহার বন্ধুগণকে গভর্ণমেন্ট হোটেলে লইয়া যাইতে পারিবে। যদি কুড়িজনকে পিতার শ্রাদ্ধে বা কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ করি, সেখানেও এই পুলিস-লীলার সভাবনা। নব্যুগের সুপ্রভাত হইয়াছে। জয় মিন্টো-মরলী। জয় শাসন-সংস্কার।

২88

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

আইন ও হত্যাকারী

লাটসাহেব সমগ্র ভারতের উপর কেন এই অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বলা কঠিন। অনেকে বলে, হতাা ও ডাকাইতি হইতেছে বলিয়া এই সভা-নিষেধ ঘোষণা। গুণ্ত হত্যাকারী ও রাজনীতিক ডাকাত যে এই ভয়ঙ্কর ব্রহ্মান্তে ভীত হইবে, তাহা আমরা বিগ্রাস করিতে পারি না। তাঁহারা যে কুড়ি-জন মিলিয়া "প্রকাশ্য সভা" করিতে অভ্যস্ত, ইহাও কখনও শুনি নাই। ছয়-মাস কারাদভের ভয়ে তাঁহারা যে জেলার ম্যাজিট্রেট বা পুলিশ কমিশনারের নিকট অনুমতি লইয়া ৩০ত হত্যা বা ডাকাইতির পরামশ করিতে বসিবেন, তাহার সভাবনাও অত্যল। এই যুক্তির মন্ম আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তবে আমাদের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বন্ধুগণ বলেন যে তাহা নহে, দেশে আন্দোলন হইলেই হত্যা তাহার অবশ্যভাবী ফল, অতএব সভাসমিতি বন্ধ করা ও হত্যা ডাকাইতি বন্ধ করা একই কখা। তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে এই জগতে রাজনীতি অতি সহজ খেলা হইত, পাঁচ বৎসরের শিশুও শাসনকার্য্য চালাইতে পারিত। দুঃখের কথা, বর্তুমান রাজ-নীতিক অবস্থায় এই অভুত যুক্তির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরং বিপ্রীত সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য। এতদিন কি সভা সমিতি বন্ধ ছিল নাং চরমপ্রভীদলের স্ভাসমিতি অনেফদিন আগেই লোপ পাইয়াছে, মধ্যপন্থী নেতাগণ নিকাসিনের পরে আর সভাসমিতিতে যোগদান করা বন্ধ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে কলেজ ক্ষোয়ারে যে স্থদেশী সভা হয়, তাহাতে কোন বিখ্যাত বক্তাও উপস্থিত হন না, দর্শকমণ্ডলীও সংখ্যায় নগণ্য। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ জেল হইতে আসিবার পরে কয়েকদিন বজুতা করিয়াছিলেন বটে, তিনিও হগলী প্রাদেশিক সভার পরে নীরব হইয়া পড়িয়াছেন। সভার মধ্যে হত্যানিষেধের ঘন ঘন সভা এবং দক্ষিণ সভার অধিবেশনে ইংরাজবন্ধু গোখলের শক্তিময় বক্তৃতাই মাঝে মাঝে হয়। তবে হত্যা ডাকাইতি গোখলে মহাশয়ের বভৃতার ফল ? হইতে পারে, কেন না গোখলে মহাশয় ভারতের স্বাধীনতালুব্ধ যুবকগণকে বুঝাইয়া দিলেন যে বলপ্রয়োগই স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায়। নচেৎ সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে হত্যা ও ডাকাইতির র্দ্ধি দিন দিন হইতেছে। তাহাই স্বাভাবিক, ভিতরে বহিং থাকিলে অবাধ নির্গমনেই তাহা নিরাপদে ক্ষয় হয়, নির্গমনের পথ বন্ধ করায় তাহার তেজ রৃদ্ধি হয়, বলে নির্গমনের পথ খুলিয়া প্রতিরোধককে বিনাশ করিতে বাহির হয়।

আমরা কি নিশ্চেষ্ট থাকিব

এই আইন এখনও জেলা বা সহরে স্থানীয় গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রচারিত হয় নাই, কিন্তু কোনও প্রদেশে সতেজে আন্দোলন আরুধ হইবামার প্রযোজিত হইবে, সন্দেহ নাই, অত্এব ইহাকে সর্বপ্রকার আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য গভর্ণমেন্টের সঙ্কেত বলিতে হইবে। এখন বিবেচ্য এই, এই অবস্থায় জাতীয় পক্ষ কোন পথ অবলম্বন করিবে? আমরা আইনের ভিতরে আমাদের রাজ-নীতিক আন্দোলন আবদ্ধ রাখিতে চেপ্টিত আছি। আইনের গণ্ডী যদি এত সঙ্কীর্ণ হয় যে তাহার ভিতরে প্রকাশ্য আন্দোলন আর চলে না, তাহা হইলে আমাদের কি উপায় রহিয়াছে। এক উপায়, নীরবে এই দ্রান্তনীতির ফল অপেক্ষা করা। আমরা জানি, গভর্ণমেন্টও জানে যে ভারতবাসীর স্থাধীনতার আশা নির্বাপিত হয় নাই, মন্তকে নিগ্রহ দণ্ডের প্রহার করায় অসন্তোষ প্রেমে পরিণত হয় নাই। প্রজার স্পৃহা, প্রজার অসন্তোষ নিজের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ভমরিয়া রহিয়াছে। এখনও বিপ্লবকারীগণ লোকের মন ৩৭তহত্যা ও বল-প্রয়োগের পথে টানিতে পারে নাই, কিন্তু কবে টানিতে পারিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। একবার অনর্থ ঘটিত হইলে গভর্ণমেন্টের বিপদ এবং দেশের দুর্দশার আর সীমা থাকিবে না আমরা এই আশক্কায় এবং দেশের নবজীবন রক্ষার আশায় জাতীয় পক্ষ সৃশৃত্থলিত করিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম। আমাদের ধারণা ছিল যে স্বাধীনতা লাভের নির্দ্দোষ পন্থা দেখাইতে পারিলে গুপতহত্যা দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে। এখন বুঝিলাম ইংরাজ গভর্ণমেন্ট সেই উপায় অবলম্বন করিতে দিবেন না। এই অবস্থায় স্বভাবতঃই এই চিন্তা মনে আসে, তাহাই হউক, তাঁহাদের যখন এই ধারণা যে আরও উগ্র দগুনীতি প্রয়োগ করিলে রোগের উপশম হইবে, তাঁহারা প্রাণ ভরিয়া দঙ্নীতি প্রয়োগ করুন ৷ আমরা চুপ করিয়া দেখি কিসেতে কি হয়, আমরা ভ্রান্ত, না তাঁহারা ভ্রান্ত। যখন ইংরাজ রাজনীতিবিদগণ নিজেদের ভূল ব্যাবেন তখন আমাদের কম্মের সময় আসিবে। এই পত্থাকে masterly inactivity -- ফলবতী নিশ্চেণ্টতা বলা যায়।

চেম্টার উপায়

নিশ্চেপ্টতা অবলম্বন করায় আমাদের ভবিষ্যৎ সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে দেশের প্রচুর অমঙ্গল হইবার কথা। আমরা না হয় বন্ধৃতা বা সভাসমিতি নাই করিলাম, কুড়িজনের সম্মিলন নাই বা হইল, আমাদের উদ্দেশ্য বন্ধৃতা করাও নহে, ইংরাজী ধরণে আন্দোলন করাও নহে। দেশের কার্য্য করা আমাদের উদ্দেশ্য, কার্য্যের শৃত্থলা আমাদের মিলিত হইবার কারণ। সেই কার্য্যের শৃত্থলা বার চৌদ্দ জন দেশের প্রতিনিধি কি করিতে পারেন না? তাঁহারা যে কার্য্য-প্রণালী স্থির করিবেন দেশের লোক কি সেই পরিমাণে ক্ষুদ্র পরামর্শ-সভা করিয়া সুসম্পন্ন করিতে পারে না? আর যদি এই আইনও হয় যে পাঁচ জন একসঙ্গে বসিলে বেআইনী জনতা হইবে, তাহা হইলে কি আর কোনও নির্দ্দেষ উপায় নাই? শঙ্করাচার্য্যের দেশে কি সভাসমিতি না করিয়া

২৪৬

গ্রীঅরবিন্দের বাসলা রচনা

কোন মত প্রচার হয় না? মন্দিরে, বিবাহে, শ্রাদ্ধে, নানাস্থানে নানা অবসরে ভায়ে ভায়ে দেখা হয়, সামান্য কথার মধ্যে দেশের কার্য্যবিষয়ক দুয়েক কথা কি হইতে পারে না? আইনের গভীতে থাকিব, কিন্তু আইন যাহা বারণ করে না, তাহা ত করিতে পারি? এত করিয়াও যদি শেষে গভর্ণমেন্ট জাতীয় শিক্ষাপরিষদকে বেআইনী জনতা বলিয়া জাতীয় বিদ্যালয়সকল বন্ধ করে, শিক্ষাদেওয়া, স্বদেশী কাপড় পরা, বিদেশী মাল না কেনা, শালিসীতে কলহ মিটানকে গুরুতর অপরাধ বলিয়া সম্রম কারাবাস বা দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা করেন, আর যদি ট্রান্সভালবাসী কুলি ও দোকানদারদের সাহস, দেশহিতৈষিতা ও স্বার্থত্যাগ আমাদের গায়ে না থাকে, তাহা হইলে না হয় পুলিস ও গুণ্ত বিপ্লবকারীর পন্থা আর রোধ করা নিল্প্রয়োজন বলিয়া সরিয়া পড়িব। সেই পর্য্যন্ত চেল্টা করিয়া দেখা যাক।

ধর্ম্ম ২১শ সংখ্যা ১১ই মাঘ ১৩১৬

আর্যাসমাজ

আর্যাসমাজ স্থামী দয়ানন্দের সৃষ্টি। তিনি যে ভাব ও প্রেরণা দিয়া গিয়াছেন, আর্যাসমাজ যতদিন সে ভাবে ভাবাদ্বিত এবং সেই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত রহিবে, ততদিন তাহার তেজ, রৃদ্ধি ও সৌভাগ্য থাকিবে। বিভূতি বা মহাপুরুষ কোনও বিশেষ ভাব লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, সেই ভাব প্রকাশ করিয়া তাহার বলে জগতের উপকারী মহৎ কার্য্য করিয়া যান, বা নিজ ভাবের সঞ্চারে ও বিস্তারে শক্তির একটি বিশেষ কেন্দ্র স্থাপন করিয়া যান। তাঁহার সংস্থাপিত সংস্থা বড় হউক বা ছোট হউক সেই সংস্থা সেই বিভূতি বা মহাপুরুষের প্রতিনিধি হইয়া জগতে তাঁহার আর**ুধ কার্য্য করিতে থাকে**। যে দিন সংস্থায় মহাপুরুষের ভাব মলিন হইবে বা তিরোহিত হইবার লক্ষণ হইবে, সেই দিন হয় ইহা বিনষ্ট হইবে, নয় অন্য আকার ও অন্য ভাব গ্রহণ করিয়া জগতের অনিষ্ট করিতে আরম্ভ করিবে। তখন অন্যান্য মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া সংস্থার বিনাশ ঠেকাইতে পারেন এবং অনিচেটর মালা কমাইতে পারেন, কিন্তু আসল ভাব ফিরাইয়া আনিতে পারেন না। আর্য্য-সমাজের সংস্থাপক তেজয়ী স্বামী দয়ানন্দের ভাবের মধ্যে আমরা তিন তত্ত্ব পাই, পুরুষার্থ, স্বাধীনতা এবং কম্ম। এই তিন্টীকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম কর্ম্মঠ তেঁজস্বী স্বাধীনতাপ্রিয় পঞ্জাবী জাতির প্রিয় হইয়াছে, অতুল্য কম্মশৃঙ্খলা, কার্য্যসিদ্ধি এবং উত্তরোত্তর উন্নতি দেখাইতে পারিয়াছে। কিন্তু এখন যে পরীক্ষা আসিয়াছে আর্য্য-সমাজ উত্তীর্ণ হইবে, তাহা আমাদের

বোধ হয় না। লালা লাজপত রায়ের নিকাসনের সময়ে সমাজে অনেক দোষ প্রকাশ হইয়াছিল, এখন আরও শোচনীয় দুকালতার লক্ষণ দেখিতে পাই। যে মনুষ্যত্ব ও স্বাধীনতা দয়ানন্দ সরস্বতীর ভাবের ভিত্তি ছিল, সমাজ সে মনুষ্যত্ব ও স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলি দিয়া কিসেতে নিরাপদ থাকি, এই ভাবনায় ও ভয়ে উন্মন্ত হইয়াছে। বিনা বিচারে পরমানন্দকে তাড়ান এবং দুই সামান্য পত্র প্রকাশ হওয়ায় লালা লাজপত রায়কে তাঁহার সকল পদ ছাড়ান এই আশ্চর্য্য বিহলতার প্রমাণ। শীঘ্র মতি না ফিরিলে আর্য্যসমাজ মৃত্যুর পথে ধাবিত হইবে। যে যে ধন্ম জগতে রহিয়াছে, মনুষ্যজাতির মন অধিকার করিয়াছে, খ্রীল্টধন্ম, বৌদ্ধধন্ম, ইসলাম, শিখধন্ম, ছোট হউক, বড় হউক, পরীক্ষার সময় নিজ ভাব রক্ষা করিতে পারিয়াছে বিলয়া বাঁচিতে পারিয়াছে।

প্রহারকের পরিচয়

আমরা "একটা সত্য ঘটনা" বলিয়া যে বাঙ্গালীর ও বঙ্গদেশের অপমান ও লাল্ছনার র্ভান্ত প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে কাহারও নাম প্রকাশ করি নাই। সেই আত্মসংযমের কারণও ছিল। কিন্তু আমাদের সহযোগী হিতবাদী "প্রহারকের পরিচয়" শীর্ষক পত্র বাহির করিয়া আক্রমণকারী সাহেব ও মেমদের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছিলাম, প্রহারক রাইচ সাহেবের পুত্র, কিন্তু সহযোগীর পত্রপ্রেরক বিশেষ তদন্ত করিয়াছেন, তাঁহার প্রদন্ত সংবাদ নির্ভুল হইবার কথা। যাহা হউক যদি পূর্ববাঙ্গালার গভর্ণমেন্ট এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদের পথ সুগম করা হইয়াছে। নিন্দেন পত্র উদ্ধৃত করিলাম——

গত ২রা মাঘের দৈনিক হিতবাদীতে "ধম্ম" হইতে উদ্ধৃত "সত্য ঘটনা" শীর্ষক প্রবন্ধে গোয়ালন্দে জনৈক কাব্যতীর্থ পণ্ডিত মহাশয়ের কতিপয় শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতমহিলাকৃত লান্ছনার বিষয় অবগত হইয়া আমি উহার প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের চেম্টা করিয়া যাহা অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা আপনার দেশ-প্রসিদ্ধ প্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাইলাম।

আপনার পত্রিকায় ঘটনা যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য; যে দুইটী শ্বেতাঙ্গপুঙ্গব এই পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় করিয়াছে, তাহার একটী গত বৎসরের (ঢাকা) "বায়ড়া হাঙ্গামা" মোকদ্দমার প্রধান অভিনেতা স্থনামধন্য মহাবীর শ্রীল শ্রীযুক্ত ডি মন্টি সাহেব বাহাদুর; (ইহার কীন্তিকাহিনী সংবাদপত্রপাঠক মাত্রেই অবগত আছেন)। অপরটী মিঃ ল্যাণ্ডেল এণ্ড ক্লার্কের (পাবনা) নাকালিয়া পাটের কুঠির ম্যানেজার মিঃ রাইচ সাহেবের মাননীয় শ্যালক, এই শেষোক্ত ব্যক্তিই প্রথম আক্রমণকারী। দুঃশ্বের বিষয়, এই শ্যালক মহাশয়ের নাম জানিতে পারি নাই, তবে "রাইচ্ সাহেবের শ্যালক" এই পরিচয়ই

₹8৮

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

যথেস্ট। মহিলাদ্বয়ের একটী উজ রাইচ্ সাহেবের সহধশ্মিণী এবং অপর্টী তাঁহারই কনিষ্ঠা।

ইহারা গোয়ালন্দে এই অমানুষিক অভিনয় করিয়া পরদিন রাজিতে নারায়ণগঞ্জের পথে ময়মনসিংহে আসিয়া উপস্থিত হন এবং এখানে একদিন মাত্র ফিলিপপোলো সাহেবের বাংলায়ে অবস্থান করিয়া পরদিন জগন্নাথগঞ্জের পথে কালীগঞ্জ ঘটীমারে আড়ালিয়া অবতরণ করতঃ তথা হইতে এক মাইল দূরবর্তী নাকালিয়া কুঠীতে কুটুম্ব সমাগমে সজ্ঞানে এবং খোস মেজাজে আহার বিহার করিতেছেন।

শ্রী---

ইংলভের নিকাচনী

ইংলভের নিকাচনী আরম্ভ হইয়াছে। ফলে কোন্ দলের যে প্রাধান্য হইবে তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। আপাততঃ রক্ষণশীল দলেরই জয় হইতে চলিয়াছে। দক্ষিণ ও মধ্য ইংলণ্ডে ইহাদিগের প্রভাব অত্যন্ত অধিক দেখা যাইতেছে। লশুনে দুইদলেরই সমান প্রভাব বলিয়া বোধ হয়। উত্তরাংশেই উদারনীতিকগণের প্রভাব এবং ওয়েলস ও ফটলভ একরকম সম্পূর্ণরূপেই ইহাদিগের পক্ষে। নির্বাচনের ফলে উভয়ের ক্ষমতা সমান সমান হইলে যে দলই গভণ্মেন্ট করিতে চাহিবেন, ন্যাশনলিপ্টদিগের উপরই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইবে। রক্ষণশীলগণ হোমরালের পক্ষপাতী নহেন কাজেই ন্যাশনলিম্টদিগের সহিত যোগদান করিয়া উদারনীতিকগণ গভর্ণমেন্ট করিতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা গভর্ণমেন্ট চালাইতে পারিবেন না। কারণ অভিজাত সভার ভিটোর ক্ষমতা রহিয়াই যাইবে ও তাহারা পুনব্বার বজেট প্রত্যাখ্যান করিবে। কাজেই যে পথেই যাওয়া হউক না কেন তাহা সকলই রুদ্ধ। এই অভুত উভয় সঙ্কট এক মহা সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এই নির্কাচনের ফলের সহিত ভারতবর্ষের তত সংস্তব নাই। তবে আমরা এইটুকু আশা করি যে উদারনীতিকগণের জয় হইলে ও অভিজাত সভার ভিটোর ক্ষমতা লুপ্ত ও তৎসম্বন্ধে কোনরূপ পরিবর্তনাদি হইলে শাসন সংস্কারাদি সম্বন্ধে আমাদিগের একটু সুবিধা হইবে**। ইহা বাতিরেকে উদার**-নীতিকেরই জয় হউক, আর রক্ষণশীলেরই জয় হউক আমাদের পক্ষে উভয়ই সমান।

২৪৯

ধর্ম্ম ২৪শ সংখ্যা ২রা ফাল্ডন ১৩১৬

বিচার

বিচারের গুদ্ধতা সমাজের স্তম্ভয়রূপ। সেই গুদ্ধতা কওক জজের মন ও চিন্তের গুদ্ধতার উপর নির্ভর করে, কওক স্বাধীন লোকমত দ্বারা রক্ষিত হয়। জজ রাজার মুখ্য ধন্মের ভার বহন করেন, তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি, যেমন ঈশ্বর বিচারাসনে বসিয়া নিরপেক্ষভাবে শগ্রু মিগ্র, ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা ইত্যাদি ভেদ না করিয়া কেবলই ধর্ম্ম রক্ষা করেন, সেইভাবে বিচার করা তাঁহার ধর্ম্ম। যদি রাগদ্বেম, মানমর্য্যাদা, রাজনীতিক বা সামাজিক কোনও উদ্দেশ্যের বশে আইনের বিভাট করেন, তিনিও ধর্ম্মাচ্যুত হন, সমাজের বন্ধনও শিথিল হয়। আর যদি অজ বা লঘুচিন্ত ব্যক্তিকে বিচারকর্ত্তার আসনে বসান হয়, সেই রাজ্যের অকল্যাণ অবশ্যস্তাবী। আর সকল শাসনতন্তের বিভাগে বিভাট হওয়ায় অনিক্ট ক্ষণস্থায়ী হইতেও পারে, বিচারের অশুদ্ধতায় রাজা, রাজ্য ও প্রজার ধ্বংস হয়। কোনও শাসনতন্তের গুণ দোষ নির্থক,—যদি বিচারপ্রণালী নির্দোষ না হয়, সেই শাসনতন্তের প্রশংসা মিথ্যা।

লোকমতের প্রয়োজনীয়তা

মানুষ যদি নিজ্পাপ ও স্থিরবৃদ্ধি হইত, বিচার সম্বন্ধে লোকমতের স্বাধীনতা আবশ্যক হইত না। কিন্তু মানুষের মন চঞ্চল, তাহার চিন্তে কামনা ও রাগদ্বেষ প্রবল, তাহার বৃদ্ধি অন্তন্ধ ও পক্ষপাতপূর্ণ। এই অবস্থায় বিচারের গুদ্ধতা রক্ষা করিবার তিন উপায় আছে। প্রথম উপায় আইনজ, প্রৌচ্, ধীরপ্রকৃতি লোককে বিচারাসনে বসাইয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার প্রলোভন, ভয়প্রদর্শন, স্বার্থচিন্তা, পরের আদেশ, প্রার্থনা, অনুনয় ইত্যাদি হইতে দূরে রাখা; চঞ্চলমনা, আইনে অনভিজ্ঞ যুবক কখন বিচারাসনে আরাচ্ করা উচিত নহে, বিচারককে কোনমতে শাসকের অধীন করাও বিপজ্জনক; এই তত্ত্ব ও নিয়ম ইংলঞ্ডীয় বিচারপ্রণালীতে সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া রটিশ বিচারপ্রণালীর এত প্রশংসা। দ্বিতীয় উপায় বিচারের মহান নিচ্চলঙ্ক আদর্শ স্থাপন করিয়া সেই আদর্শ বিচারক, আইনব্যবসায়ী লোকও সর্ব্বসাধারণের মনে দৃঢ়ভাবে অন্ধিত করা। কিন্তু আদর্শপ্রভট্ট হওয়া মানুষের পক্ষে অতি সহজ, সেইজন্য লোকন্মতকে আদর্শের রক্ষকরূপে দাঁড় করান ভাল। বিচারক যদি জানেন যে

২৫০

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

আদর্শ হইতে লেশমার দ্রুল্ট হইলে লোকের নিন্দা ও কলজের পার হইব, তাঁহার মনে অন্যায় করিবার প্ররৃত্তি সহজে আশ্রয় পাইবে না।

আমাদের দেশে

আমাদের দেশে কয়েক কারণ বশতঃ বিচারককে শাসকের অধীন রাখা হইয়াছে, সেই জন্যে বিচারকের দায়িত্ব অনেকটা শাসকের উপর পড়িয়াছে। বিচারক ঈশ্বরের প্রতিনিধি না হইয়া শাসকের প্রতিনিধি হন। অতএব শাসকের দায়িত্ব অতি গুরুতর। ইহার উপর শাসনতন্তের সুবিধার জন্য অপকৃকেশ অনভিজ লোকের উপরেও বিচারের ভার দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। আবার সম্প্রতি নূতন আইনে বিচারকের বিচার সম্বন্ধে বিপরীত লোকমত বাজ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই সকল বাবস্থা শাসনের জন্য আবশ্যক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব ইহার সম্বন্ধে কথা বলিবার অধিকার আমাদের নাই। কিন্তু এই অবস্থায় শাসকের কি ভীষণ দায়িত্ব, তাহা শাসনকর্তারা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। তাঁহারা যেন সমরণ করেন যে, তাঁহারা এই অপূর্ব্ব ক্ষমতার কি প্রয়োগ করিতেছেন, তাহা ভগবান দেখিতেছেন, দেশের হিতাহিত, রাজ্যশাসনের ফলাফল এবং সাম্রাজ্যের সুখ শান্তি ও স্থায়িত্ব তাহারই উপর নির্ভর করে।

ধৰ্ম্ম ২৫শ সংখ্যা ৯ই কাল্ডন ১৩১৬

ভগবম্দৰ্শন

দেশপূজা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র নিকাসিত হইয়া আপ্রা জেলে কিরাপে ভগবানের প্রত্যক্ষ উপলন্ধি ও সক্রেদশন করিয়াছেন, তাহা তিনি রাক্ষসমাজের ছাত্রসমাজে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ যখন উত্তরপাড়ায় সেই কথাই বলিয়াছিলেন, পুণার ইপ্রিয়ান সোশাল রিফর্মর (সমাজ সংস্কারক) উপহাস করিয়া বলিলেন, দেখিতেছি জেলে ঈশ্বর দর্শনের ছড়াছড়ি হইতেছে। উপহাসের অর্থ এই যে এই সব কথা মাথাপাগলা লোকের কল্পনা অথবা মিথাবাদীর বুজরুকী। অথচ অরবিন্দবাবু যাহা বলিলেন, রাক্ষসমাজের শীর্ষস্থানীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার অবিকল তাহাই বলিয়াছেন। এমন কি যাহা অনেকের বিশেষ পরিহাসের যোগ্য কথা বোধ হইয়াছে, বিচারক ও জেলরের মধ্যে সেই সক্ব্যাপী প্রেমময় ও দয়ময় দর্শন, তাহাও দুজনেই লাভ

করিয়াছেন। অবশ্য, একই আধ্যাত্মিক উপলন্ধির দুই প্রকার তার্কিক সিদ্ধান্ত হইতে পারে, এক সত্য লইয়া নানা মত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যখন আগ্রায় ও আলিপুরে, যাহাদের ভিন্ন মত ও ভিন্ন প্রকৃতি, সেইরূপ দুইটি লোকের একই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইয়াছে, তখন কি কেহ তাহাকে পাগলামী বা বুজরুকী বলিতে পারে? পুণার "সমাজ সংস্কারক"-এর মতে ভগবান কখনও প্রত্যক্ষ দর্শন দেন না, তিনি নিয়মের অন্তরালে থাকেন, আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুভব করিতে পারি, ভগবানের অন্তিত্ব অনুভব করা বাতুলের কথা। একজন বিজ্ঞান—অনভিজ্ঞ লোক যদি বলেন যে অমুক রাসায়নিক প্রয়োগ মিথ্যা এবং কয়েকজন বিজ্ঞানবিদ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া করিয়া বলেন, ইহা সত্য, আমরা শ্বচক্ষে দেখিয়াছি, কাহার কথা অধিক বিশ্বাসযোগ্য, কাহার মত লোকে গ্রহণ করিতে বাধ্য?

জেলে দশন

এইরাপ লোকের আর এক অবিখাসের কারণ এই যে জেল অপবিত্র স্থান. খুনী চোর ডাকাতে পরিপূর্ণ, যদিও ভগবান দর্শন দেন, তবে পবিজ্ঞানে সাধু-সন্ন্যাসীকেই দুশ্ন দিবেন, আইনের জালে পতিত রাজনীতিককে, ঘোর রাজসিক কার্য্যে লি॰ত সংসারীকে জেলে দেখা দিবেন কেন? আমাদের মতে সাধু-সন্ন্যাসী অপেক্ষা এইরাপ লোককেই ভগবান সহজে ধরা দেন, আশ্রম ও মন্দির অপেক্ষা জেলে বা বধ্যভূমিতে ভগবদদর্শনের ছড়াছড়ি হইবার কথা। যাঁহারা মানবজাতির জন্য, দেশের জন্য খাটেন, জীব্ন উৎসর্গ করেন, তাঁহারা ভগবানের জন্য খাটেন, জীবন উৎসর্গ করেন। যীওখ্রীস্ট বলিয়াছেন, যে দুঃখীকে সাভুনা, দ্রিদ্রকে সাহায্য, তৃষ্ণার্তকে জল, নিরুপায়কে উপায় দেয়, সে আমাকেই দেয়, আমি সেই দুঃখী, সেই দরিদ্র, সেই তৃষ্ণার্ত্ত, সেই নিরুপায়। আবার জেলে অহঙ্কার সম্পূর্ণ চলিয়া যায়। সেইখানে লেশমাত্র স্বাধীনতা থাকে না, ভগবানের মুখের পানে আহার, নিদ্রা, সুখ, ভাগ্য, স্বাধীনতার জন্য চাহিতেই হয়। অতএব এই অবস্থায় সম্পূর্ণ নিভ্র, সম্পূর্ণ আথানিবেদন ও আথাসমর্পণ যেমন সহজ আর কোথাও তেমন সহজ নহে। কম্মীর আত্মসমর্পণ ভগবানের অতিপ্রিয়ে উপহার, এই পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা, এই বলিই শ্রেষ্ঠ বলি। ইহাতে যদি ভগবদ্দশন না হয়, তবে কিসে হইবে?

বেদে পুনৰ্জন্ম

য়ুরোপীয়গণ যখন প্রথম আর্য্যসাহিত্য আবিষ্কার করেন, তখন তাঁহাদের এমন আনন্দ হয় যে সমূচিত প্রশংসা করিবার কথাও জোটে না এবং পণ্ডিতগণ যাহা বলেন, তাহা ধূব সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। পরে পাশ্চাত্য হাদয়ে ঈর্য্যার বহিং প্রজ্বলিত হয় এবং অনেকে সেই ঈর্ষ্যার বশে সংস্কৃত ভাষা ও বিফল

সাহিত্য ব্রাহ্মণদের জাল জোচ্চুরি বলিয়া উড়াইবার চেম্টা করেন। সেই চেল্টা যখন হয়, য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা নূতন ফন্দী বাহির করিলেন; তাঁহারা প্রমাণ করিতে চেল্টা করিলেন যে, কিছুই হিন্দুর নিজস্ব নাই, সবই বিদেশ হইতে আমদানী। রামায়ণ ও মহাভারত হোমরের অনুকরণ, জ্যোতিষ, কাব্য, নাটক, আয়ুকেৰ্বদ, শিল্প, চিত্ৰকলা, স্থাপত্য বিদ্যা, গণিত, দেবনাগরী অক্ষর, পঞ্চন্ত, যাহা যাহা ভারতের গৌরব বলিয়া প্রসিদ্ধ, সবই গ্রীস, ঈজিপ্ত, বাবুলোন ইত্যাদি দেশ হইতে ধার করা, এবং গীতা খ্রীঘটধম্ম হইতে চোরাই মাল: হিন্দুধস্মের যদি কোন গুণ থাকে, তাহা বৌদ্ধধস্মের দান,—আর পাছে বলি, বুদ্ধ ত ভারতবাসী, তখন এই অভুত কল্পনা আবিফার করিলেন যে বুদ্ধ মোঙ্গল বা তুরস্ক জাতীয়; শাক্যগণ, শক বা Seythian; এই সময়ে এই মত প্রচার হয় যে, কম্মবাদ ও পুনজ্লবাদ বুদ্ধের পূক্বিভী হিন্দুধন্মেম ছিল না, বুদ্ধই এই দুই মত স্টিট করিলেন। সেইদিন দেখিলাম Hindu Spiritual Magazine-এর সম্পাদক মতপ্রচার করিয়াছেন যে এই কথা সত্য, বেদে পুনজ্জন্মবাদ নাই, পুনজ্জন্মবাদ হিন্দুধম্মের অঙ্গ নয়। জানিনা সম্পাদক মহাশয় এই কথা স্বয়ং বেদাধ্যয়ন করিয়া বলিয়াছেন, না ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতের প্রতিধ্বনি মাত্র। আমরা দেখাইতে পারি এবং দেখাইব যে উপনিষদগুলি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও বৃদ্ধের আবিভাবের পূ**র্ব্ববর্তী বলিয়া স্বীকার করেন**। যে উপনিষদগুলি বৈদিক জানের চরম বিকাশ, সেই উপনিষদে পুনর্জনা ধুব ও গৃহীত সত্য বলিয়া সকাঁত্র উল্লিখিত আছে। কম্মবাদও বেদে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধম্ম হিন্দুধমেম্র একটি শাখা মাত্র, হিন্দুধম্ম বৌদ্ধধমেম্র পরিলাম নহে।

আর্য্যসমাজের অবন্তি

আমরা আর্য্যসমাজের অবনতি দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। এই সমাজের অধ্যক্ষ সম্প্রতি এইরাপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে রাজভুজি আর্য্য সমাজের ধর্ম্মমতের মধ্যে এক মত বলিয়া গৃহীত, সেই হেতু যে "আমি রাজভুজ" বলিয়া শপথ গ্রহণ করিতে সম্মত, তাহাকেই আর্য্যসমাজে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত আর কাহাকেও নহে। অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জন্যও এই মহাত্মা এই বিধানের উপদেশ দিয়াছেন। ইহা যদি অধ্যক্ষজীর প্রকৃত মত হইত, আমরা কিছু বলিতাম না, কিন্তু আর্য্যসমাজের উপর ঘন ঘন রাজদ্রোহের অভিযোগ আসিয়া পড়িবার আগে তাহার এই উৎকট রাজভুজির উদ্রেক হয় নাই। ধর্ম্ম সকলেরই জন্য, যে ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে কেহ রাজনীতিক মতের জন্য বহিত্কৃত, সেই সম্প্রদায় ধর্ম্মসম্প্রদায় নহে, স্বার্থসম্প্রদায়। আমি রাজভুজ কি না রাজ-পুরুষ দেখিবেন এবং রাজপুরুষও আমার মনের ভাবের উপর অধিকার করিতে চেল্টা করেন না, কেবল রাজভুজির বিরুদ্ধভাব প্রচারে দেশের শান্তি যাহাতে নল্ট না হয়, নিজ অধিকার নল্ট না হয়, সেই চেল্টা করেন। যে ধর্ম্ম

'ধ্যুম্' পত্রিকার সম্পাদকীয়

২৫৩

মন্দিরের দারে তুমি ভগবন্তক্ত কিনা, এই প্রশ্ন জিঞ্চাসা না করিয়া, তুমি রাজভক্ত কিনা, এই প্রশ্ন জিঞ্চাসা করা হয়, সেই মন্দির যেন কোন ভগবন্তক্ত না মাড়ান। Render unto Caesar the things that are Caesar's, unto God the things that are God's. সম্রাটের প্রাপ্য যাহা তাহাই সম্লাটকে অর্পণ কর, ভগবানের প্রাপ্য যাহা তাহা ভগবানের, সম্লাটের নহে।

TALES OF PRISON LIFE

কারাকাহিনী

১৯০৮ সনের শুক্রবার ১লা মে আমি "বন্দেমাতরম্" আফিসে বসিয়া– ছিলাম, তখন শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী আমার হাতে মজঃফরপুরের একটি টেলিগ্রাম দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম মজঃফরপুরে বোমা ফাটিয়াছে, দুটি য়ুরোপীয়ান জীলোক হত। সেদিনের "এম্পায়ার" কাগজে আরও পড়িলাম, পুলিস কমিশনার বলিয়াছেন আমরা জানি কে কে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত এবং তাহারা শীঘ্র গ্রেপ্তার হইবে। জানিতাম না তখন যে আমি এই সন্দেহের মূখ্য লক্ষ্যস্থল, আমিই পুলিসের বিবেচনায় প্রধান হত্যাকারী, রাষ্ট্রবিপ্লবপ্রয়াসী যুবকদলের মন্তদাতা ও গুণ্ত নেতা। জানিতাম না যে এই দিনই আমার জীবনের একটা অঙ্কের শেষ পাতা, আমার সম্মুখে এক বৎসরের কারাবাস, এই সময়ের জন্য মানুষের জীবনের সঙ্গে যতই বন্ধন ছিল, সবই ছিল্ল হইবে, এক বৎসর কাল মানবসমাজের বাহিরে পিঞ্চরাবদ্ধ পশুর মত থাকিতে হইবে। আবার যখন কম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিব, তথায় সেই পুরাতন পরিচিত অরবিন্দ ঘোষ প্রবেশ করিবে না, কিন্তু একটি নৃতন মানুষ, নৃতন চরিত্র, ন্তন বুদ্ধি, নৃতন প্রাণ, নৃতন মন লইয়া নৃতন কঁমর্যভার প্রহণ করিয়া আলিপুরস্থ আশ্রম হইতে বাহির হইবে। বলিয়াছি এক বৎসর কারাবাস, বলা উচিত ছিল এক বৎসর বনবাস, এক বৎসর আশ্রমবাস। অনেক দিন হাদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবল চেল্টা করিয়াছিলাম, উৎকট আশা পোষণ করিয়াছিলাম জগদ্ধাতা পুরুষোভ্যকে বলুভাবে, প্রভুভাবে লাভ করি। কিন্তু সহস্র সাংসারিক বাসনার টান, নানা কম্পের্য আসজি, অঞ্চানের প্রগাঢ় অন্ধকারে তাহা পারি নাই। শেষে প্রম দয়ালু সর্ক্মজলময় শ্রীহ্রি সেই সকল শহুকে এক কোপে নিহত করিয়া তাহার সুবিধা করিলেন, যোগাশ্রম দেখাইলেন, স্বয়ং গুরুরাপে, সখারাপে সেই ক্ষুদ্র সাধন কুটীরে অবস্থান করিলেন। সেই আশ্রম ইংরাজের কারাগার। আমার জীবনে এই আশ্চর্য্য বৈপরীত্য বরাবর দেখিয়া আসিতেছি যে আমার হিতৈষী বন্ধুগণ আমার যতই না উপকার করুন, অনিপ্টকারীগণ--শরু কাহাকে বলিব, শরু আমার আর নাই--শরুই অধিক উপকার করিয়াছেন। তাঁহারা অনিষ্ট করিতে গেলেন, ইষ্ট্ই হইল। র্টিশ গবর্ণমেন্টের কোপ-দৃষ্টির একমাত্র ফল, আমি ভগবানকে পাইলাম। কারাগৃহবাসে আন্তরিক জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কয়েকটী বাহ্যিক ঘটনা মাল্ল বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু যাহা কারা-বাসের মুখ্য ভাব তাহা প্রবন্ধের প্রারম্ভে একবার উল্লেখ করা ভাল বিবেচনা করিলাম। নতুবা পাঠকগণ মনে করিবেন যে, কণ্টই কারাবাসের সার। কষ্ট যে ছিল না তাহা বলা যায় না, কিন্তু অধিকাংশকাল আনন্দেই কাটিয়া গিয়াছে।

গুরুবার রাজিতে আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়াছিলাম, ভোরে প্রায় ৫ টার সময় আমার ভগিনী সম্ভুত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিল,

জাগিয়া উঠিলাম। পরমুহূর্জে ক্ষুদ্র ঘর্টী সশস্ত্র পুলিসে ভরিয়া উঠিল; সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্রেগান, ২৪ পর্গণার ক্লার্ক সাহেব, সুপরিচিত শ্রীমান বিনোদ কুমার ৩৫০তর লাবণ্যময় ও আনক্দায়ক মূভি, আর কয়েকজন ইন্সেক্টার, লাল পাগড়ি, গোয়েন্দা, খানাতল্লাসীর সাক্ষী। হাতে পিস্তল লইয়া তাহারা বীরদর্পে দৌড়াইয়া আসিল, যেন বন্দুক-কামানসহ একটি সুরক্ষিত কেল্লা দখল করিতে আসিল। জনিলাম, একটা খেতার বীরপুরুষ আমার ভগিনীর বুকের উপর পিস্তল ধরে, তাহা স্থচক্ষে দেখি নাই। বিছানায় বসিয়া আছি, তখনও অর্দ্ধনিদিত অবস্থা, ক্রেগান জিভাসা করিলেন, "অরবিন্দ ঘোষ কে, আপনিই কি?" আমি বলিলাম, "আমিই অরবিন্দ ঘোষ"। অমনি একজন পুলিসকে আমাকে গ্রে**ণ্**তার করিতে বলেন। তাহার পর ক্রেগানের একটি অতিশয় অভদ কথায় দুজনের অলক্ষণ বাক্বিতভা হইল। আমি খানাতলা-সীর ওয়ারেন্ট চাহিলাম, পড়িয়া তাহাতে সহি করিলাম। ওয়ারেন্টে বোমার কথা দেখিয়া বুঝিলাম, এই পুলিস সৈন্যের আবিভাব মজঃফরপুরের খুনের সহিত সংশ্লিজ্ট। কেবল বুঝিলাম না আমার বাড়ীতে বোমা বা অন্য কোন স্ফোটক পদার্থ পাইবার আগেই বডি ওয়ারেন্ট-এর অভাবে কেন আমাকে গ্রেপ্তার করে। তবে সেই সম্বন্ধে র্থা আপত্তি করিলাম না। তাহার পরেই ক্রেগানের হকুমে আমার হাতে হাতকভি়, কোমরে দড়ি দেওয়া হইল। একজন হিন্দুস্থানী কনপেটবল সেই দড়ি ধরিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল ৷ সেই সময়েই শ্রীযুক্ত অবিনাশ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত শৈলেক্ত বসুকে পুলিস উপরে আনে, তাহাদেরও হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি। প্রায় আধ ঘন্টার পর কাহার কথায় জানি না, তাহারা হাতকড়ি ও দড়ি খুলিয়া লয়। ক্রেগানের কথার ভাবে প্রকাশ পাইল যে, তিনি যেন হিংস্ত পশুর গর্ভে ঢুকিয়াছেন, যেন আমরা অশিক্ষিত হিংস্ত স্বভাববিশিষ্ট আইন-ভঙ্গকারী, আমাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা বা ভট কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে ঝগড়ার পর সাহেব একটু নরম হইয়া পড়িলেন। বিনোদ বাবু তাঁহাকে আমার সম্বন্ধ কি বুঝাইতে চেস্টা করেন। তাহার পর ক্রেগান আমাকে জিঞাসা করেন, "আপনি নাকি বি-এ পাশ করিয়াছেন? এইরাপ বাসায় এমন সজ্জাবিহীন কামরায় মাটিতে শুইয়াছিলেন, এই অবস্থায় থাকা কি আপনার মত শিক্ষিত লোকের পক্ষে লজ্জাজনক নহে?" আমি বলিলাম, "আমি দরিদ্র, দরিদ্রের মতই থাকি।" সাহেব অমনি সজোরে উত্তর করিলেন, "তবে কি আপনি ধনী লোক হইবেন বলিয়া এই সকল কাণ্ড ঘটাইয়াছেন ?" দেশ-হিতৈষিতা, স্বাৰ্থত্যাগ বা দাৱিদ্য <u>রতের মাহাজ্য এই স্থূলবুদ্ধি ইংরাজকে বোঝান দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া আমি</u> সে চেপ্টা করিলাম না।

এতক্ষণ খানাতল্লাসী চলিতেছে। ইহা সাড়ে পাঁচটার সময় আরম্ভ হয় এবং প্রায় সাড়ে এগারটায় শেষ হয়। বাক্সের ভিতর বা বাহিরে যত খাতা, চিঠি, কাগজ, কাগজের টুকরা, কবিতা, নাটক, পদ্য, গদ্য, প্রবন্ধ, অনুবাদ যাহা

পাওয়া যায়, কিছুই এই সক্রোসী খানাতল্লাসীর কবল হইতে মুক্তি পায় না। খানাতল্লাসীর সাক্ষীদের মধ্যে রক্ষিত মহাশয় যেন একটু মনঃক্ষুগ্ধ; পরে অনেক বিলাপ করিয়া তিনি আমাকে জানাইলেন, পুলিস তাঁহাকে কিছু না বলিয়া হঠাৎ ধরিয়া লইয়া আসে, তিনি আদবে খবর পান নাই যে, তাঁহাকে এমন ঘূণিত কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে। রক্ষিত মহাশয় অতি করুণ ভাবে এই হরণকাণ্ড বর্ণনা করেন। অপর সাক্ষী সমরনাথের ভাব অন্য-রূপ, তিনি বেশ সফুডির সহিত প্রকৃত রাজভুক্তের ন্যায় এই খানাতল্লাসীর কার্য্য সুসম্পন্ন করেন, যেন to the manner born. খানাতল্লাসীতে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয় নাই। তবে মনে পড়ে ক্ষুদ্র কার্ডবোর্ডের বাক্সে দক্ষিণেশ্বরের যে মাটি রক্ষিত ছিল, ক্লার্ক সাহেব তাহা বড় সন্দিগ্ধচিত্তে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করেন, যেন তাঁহার মনে সন্দেহ হয় যে, এটা কি নৃতন ভয়ঙ্কর তেজবিশিষ্ট ফেফাটক পদার্থ। এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ ভিত্তিহীন বলা যায় না। শেষে ইহা যে মাটি ভিন্ন আর কিছু নয়, এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণকারীর নিকট পাঠান অনাবশ্যক, এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। আমি খানাতল্লাসীতে বাক্স খোলা ভিন্ন আর কোন কার্য্যে যোগদান করি নাই। আমাকে কোন কাগজ বা চিঠি দেখান বা পড়িয়া শুনান হয় নাই, মান্ত অলক-ধারীর একখানা চিঠি ক্লেগান সাহেব নিজের মনোরঞ্জনার্থ উচ্চৈঃস্থরে পড়েন। বন্ধুবর বিনোদ গুণ্ত তাঁহার শ্বাভাবিক ললিত পদ্বিন্যাসে ঘর কম্পিত করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান, শেল্ফ হইতে বা আর কোথা হইতে কাগজ বা চিঠি বাহির করেন, মাঝে মাঝে "অতি প্রয়োজনীয়, অতি প্রয়োজনীয়" বলিয়া তাহা ক্রেগানকে সমর্পণ করেন। এই প্রয়োজনীয় কাগজগুলি কি তাহা আমি জানিতে পারি নাই। সেই বিষয়ে কৌতুহলও ছিল না, কারণ আমি জানিতাম যে, আমার বাড়ীতে বিসেফারক পদার্থের প্রস্তুত প্রণালী বা ষড়যন্তে লিপ্ত থাকার কোনও কাগজ থাকা অসম্ভব।

আমার ঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার পর পুলিস পাশের ঘরে আমাদের লইয়া যায়। ক্রেগান আমার ছোট মাসীর বাক্স খুলেন, একবার দুইবার চিঠিতে দৃষ্টিপাত করেন মাত্র, তৎপরে মেয়েদের চিঠি নিয়ে দরকার নাই, এই বলিয়া তাহা ছাড়িয়া যান। তারপর একতলায় পুলিস মহাখ্মাদের আবির্ভাব। একতলায় বসিয়া ক্রেগান চা পান করেন, আমি এক পেয়ালা কোকো ও রুটী খাই, সেই সুযোগে সাহেব তাঁহার রাজনৈতিক মতগুলি যুক্তিতর্ক দেখাইয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন—আমি অবিচলিতচিত্তে এই মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিলাম। তবে জিক্তাসা করি, না হয় শরীরের উপর অত্যাচার করা পুলিসের সনাতন প্রথা, মনের উপরও এইরূপ অমানুষিক অত্যাচার করা কি unwritten law—এর চতুঃসীমার মধ্যে আসে? আশা করি আমাদের পরম মান্য দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এই সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন।

২৬০

নীচের ঘরগুলি ও "নবশক্তি" আফিসের খানাতল্লাসীর পর পুলিস "নবশক্তি"র একটি লোহার সিন্দুক খুলিতে আবার দোতালায় যায়। আধ ঘন্টা চেল্টা করিয়া যখন অকৃতকার্য্য হইল তখন তাহা থানায় লইয়া যাওয়াই ঠিক হইল। এইবার একজন পুলিস সাহেব একটী দ্বিচক্রযান আবিষ্কার করেন, তাহার উপর রেলের লেবেলে কুঠিয়ার নাম ছিল। অমনি কুঠিয়ায় সাহেবকে যে গুলি করে তাহারই বাহন বলিয়া এই গুরুতর প্রমাণ সানন্দে লইয়া যান।

প্রায় সাড়ে এগারটার সময় আমরা বাটী হইতে যাত্রা করিলাম। ফটকের বাহিরে আমার মেসো মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু গাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। মেসো মহাশয় আমাকে জিজাসা করিলেন, "কোন্ অপরাধে গ্রেপ্তার হইলে?" আমি বলিলাম, "আমি কিছুই জানি না, ইহারা ঘরে প্রবেশ করিয়াই গ্রেপ্তার করেন, আমার হাতে হাতকড়ি দেন, বড়ি ওয়ারেন্ট দেখান নাই।" মেসো মহাশয় হাতকড়ি হাতে দেওয়ার কারণ জিজাসা করায় বিনোদ বাবু বলিলেন, "মহাশয়, আমার অপরাধ নাই, অরবিন্দ বাবুকে জিজাসা করুন, আমিই সাহেবকে বলিয়া হাতকড়ি খুলাইয়া নিলাম।" ভূপেন বাবু অপরাধ জিজাসা করায় গুপত মহাশয় নরহত্যার ধারা দেখাইলেন, ইহা শুনিয়া ভূপেন বাবু অপিরাধ জিজাসা করায় গুপত মহাশয় নরহত্যার ধারা দেখাইলেন, ইহা শুনিয়া ভূপেন বাবু স্তম্ভিত হইলেন, আর কোনও কথা বলিলেন না। পরে শুনিলাম, আমার সলিসিটর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রে পট্রীটে আসিয়া খানাতন্ত্রাসীতে আমার পক্ষে উপস্থিত থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, পুলিস তাঁহাকে ফিরাইয়া দেয়।

আমাদের তিনজনকে থানায় লইয়া যাওয়া বিনোদ বাবুর ভার। থানায় তিনি আমাদের সঙ্গে বিশেষ ভদ্র ব্যবহার করিলেন। সেইখানেই স্থান ও আহার করিয়া লালবাজারে রওনা হইলাম। লালবাজারে কয়েক ঘন্টা বসাইয়া রয়ড স্ট্রীটে লইয়া যায়, সেই শুভ স্থানে সদ্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইলাম। রয়ড জুীটে ডিটেক্টিভ পুলব মৌলবী শাম্স-উল–আলমের সহিত আমার প্রথম আলাপ ও প্রীতি স্থাপন হয়। মৌলবী সাহেবের তখন তত প্রভাব ও উৎসাহোদ্যম হয় নাই, বোমার মামলার প্রধান অন্বেষ্ণকারী কিন্তা নটুন সাহেবের prompter বা জীবন্ত সমর্পশক্তিরূপে তিনি তখন বিরাজ করেন নাই, রামসদয় বাবুই তখন এই মামলার প্রধান পাণ্ডা। মৌলবী সাহেব আমাকে ধর্ম্মর সম্বন্ধে অতিশয় সরস বজ্তা গুনাইলেন। হিন্দুধর্ম ও ইস্লাম ধর্মের একই মূলমন্ত্র, হিন্দুদের ওঙ্কারে ত্রিমাত্রা অ উ ম, কোরাপের প্রথম তিন অক্ষর অ ল ম, ভাষাতত্ত্বের নিয়মে 'ল'-এর বদলে 'উ' ব্যবহার হয়, অতএব হিন্দু ও মুসলমানের একই মত্র। তথাপি নিজের ধম্মের পার্থক্য অক্ষুল রাখিতে হয়, মুসলমানের সঙ্গে আহার করা হিন্দুর পক্ষে নিন্দনীয়। সত্যবাদী হওয়াও ধম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। সাহেবেরা বলেন অরবিন্দ ঘোষ হত্যাকারী দলের নেতা, ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা বড় দুঃখ ও লজ্জার কথা, তবে সত্যবাদিতা রক্ষা

করিতে পারিলে situation saved হয়। মৌলবীর দৃঢ় বিশ্বাস, বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষের ন্যায় উচ্চচরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহাই করিয়া থাকুন, তাহা মুজকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি এই সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মৌলবী সাহেব নিজের মত ছাড়িলেন না। তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রবল ধশর্মভাব দেখিয়া আমি অতিশয় চমৎকৃত ও প্রীত হইলাম। নিজে বেশী কথা বলা ধৃষ্টতা মাল বিবেচনা করিয়া নমভাবে তাঁহার অমূল্য উপদেশ শুনিয়া লইলাম এবং তাহা স্যক্ষে হাদয়ে অঙ্কিত করিলাম**। এত ধম্মভাবে মাতোয়ারা হইয়াও মৌলবী** সাহেব ডিটেক্টিভগিরি ছাড়েন নাই। একবার বলিলেন, "আপনি যে আপনার ছোট ভাইকে বোমা তৈয়ার করিবার জন্য বাগানটি ছাড়িয়া দিলেন, বড় ভুল করিলেন, ইহা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নাই।" তাঁহার কথার অর্থ বুঝিয়া আমি একটু হাসিলাম, বলিলাম, "মহাশয় বাগান যেমন আমার, তেমনি আমার ভাইয়ের, আমি যে তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম, বা ছাড়িয়া দিলেও বোমা তৈয়ারী করিবার জন্য ছাড়িলাম, এ খবর কোথায় পাইলেন ?" মৌলবী সাহেব অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না না, আমি বলিতেছি যদি তাহা করিয়া থাকেন।"এই মাহাত্মা নিজের জীবন চরিতের একটী পাতা আমাকে খুলিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "আমার জীবনে যত নৈতিক বা আথিক উন্নতি হইয়াছে, আমার বাপের একটা অতিশয় মূল্যবান উপদেশই তাহার মূল কারণ। তিনি স্কর্বা বলিতেন, সম্মুখের অল কখনও ছাড়িতে নাই। এই মহাবাক্য আমার জীবনের মূল-মন্ত্র, ইহা সর্বাদা সমরণ করিয়াছি বলিয়া আমার এই উন্নতি।" ইহা বলিবার সময় মৌলবী সাহেব যে তীর দৃশ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন, তাহাতে আমার বোধ হইল যেন আমিই তাঁহার সম্মুখের অল্ল। সন্ধ্যাবেলায় স্থনামখ্যাত শ্রীযুক্ত রামসদয় মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। তিনি আমার উপর অত্যস্ত দয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, সকলকে আমার আহার ও শয্যা সম্বন্ধে যত্ন করিতে বলিলেন। পর মূহুর্ত্তে কয়েকজন আসিয়া আমাকে ও শৈলেন্দ্রকে লইয়া ঝড়র্স্টির মধ্যে লালবাজার হাজতে লইয়া যায়। রামসদয়ের সহিত এই একবার মাত্র আমার আলাপ হয়। বুঝিতে পারিলাম লোকটি বুদ্ধিমান ও উদ্যেমশীল কিন্তু তাঁহার কথাবার্তা, ভাবভঙ্গী, স্বর, চল্লন সবই কুল্লিম ও অস্বাভাবিক, সর্বদা যেন তিনি রসমঞে অভিনয় করিতেছেন। এইরূপ এক একজন আছে যাহাদের শরীর, বাক্য, চেল্টা যেন অনুতের অবতার। তাহারা কাঁচা মনকে ভুলাইতে মজবুত, কিন্তু যাহারা মনুষ্য চরিত্রে অভিজ বা অনেক দিন লোকের সঙ্গে মিশিয়াছে, তাহাদের নিকট প্রথম পরিচয়েই তাহারা ধরা পড়ে।

লালবাজারে দোডালায় একটা বড় ঘরে আমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে রাখা হইল। আহার হইল অল্মোত্র জলখাবার। অল্পাঞ্চণ পরে দুইজন ইংরাজ ঘরে প্রবেশ করেন, পরে শুনিলাম একজন স্বয়ং পুনিস কমিশনার হ্যালিডে সাহেব। দুইজন এক সঙ্গে আছি দেখিয়া হ্যালিডে সার্জ্জেন্টের উপর চটিয়া উঠিলেন, আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, খবরদার এই লোকটির সঙ্গে ফেন্টেইনা থাকে বা কথা বলে। সেই মুহূর্ত্তেই শৈলেনকে অন্য ঘরে সরাইয়া বন্ধ করে। আর সকলে যখন চলিয়া যায়, হ্যালিডে আমাকে জিঞ্জাসা করেন, "এই কাপুরুষোচিত দুক্ষন্দের্ম লিণ্ড ছিলেন বলিয়া আপনার কি লজ্জা করে না?" "আমি লিণ্ড ছিলাম, ইহা ধরিয়া লইবার আপনার কি অধিকার?" উহার উত্তরে হ্যালিডে বলিলেন, "আমি ধরিয়া লই নাই, আমি সবই জানি।" আমি বলিলাম, "কি জানেন বা না জানেন আপনারাই অবগত, এই হত্যাকাণ্ডের সহিত সকল সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে অশ্বীকার করি।" হ্যালিডে আর কোন কথা বলিলেন না।

সেই রাত্রে আমার আর কয়েকজন দর্শক আসে, ইহারাও পুলিস। ইহাদের আসার মধ্যে এক রহস্য নিহিত ছিল, সে রহস্য আমি আজ পর্যান্ত তলাইতে পারি নাই। গ্রেপ্তারের দেড়ু মাস আগে একটা অপরিচিত ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তিনি বলেন, "মহাশয় আপনার সঙ্গে আমার আলাপ নাই, তবে আপনার উপর ভক্তি আছে বলিয়া আপনাকে সতর্ক করিতে আসিলাম, আর জানিতে চাই আপনার কোননগরের কোনও লোকের সঙ্গে কি আলাপ আছে, সেখানে কখন কি গিয়াছিলেন বা সেখানে বাড়ী আছে কি?" আমি বলিলাম, "বাড়ী নাই, কোন্নগরে একবার গিয়াছিলাম, কয়েকজনের সঙ্গে আলাপও আছে।" তিনি বলিলেন, "আর কিছু বলিব না তবে ইহার পর কোননগরের কাহারও সহিত দেখা করিবেন না, আপনার ও আপনার ভাই বারীন্দ্রের বিরুদ্ধে দুপ্টেরা ষড়যন্ত করিতেছে, শীঘ্রই আপনাদিগকে তাহারা বিপদে ফেলিবে । আর আমাকে কোনও কথা জিঞ্চাসা করিবেন না।" আমি বলিলাম, "মহাশয় এই অসম্পূর্ণ সংবাদে আমার কি উপকার হইল আমি বুঝিতে পারিলাম না, তবে উপকার করিতে আসিয়াছেন তাহার জন্য ধন্যবাদ। আমি আর কিছু জানিতে চাই না। ভগবানের উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তিনিই সর্বাদা আমাকে রক্ষা করিবেন, সেই বিষয়ে নিজে চেণ্টা করা বা সতর্ক হওয়া নিল্প্রয়োজন।" তাহার পরে এই সম্বন্ধে আর কোনও খবর পাই নাই। এই আমার অপরিচিত হিতৈষী যে মিথ্যা কল্পনা করেন নাই, এই রাজে প্রমাণ পাইলাম। একজন ইন্ম্পেক্টর আর কয়েকজন পুলিস কম্মচারী আসিয়া কোন্নগরের সমস্ত কথা জানিয়া লইলেন। তাঁহারা বলিলেন, "কোন্নগরে কি আপনার আদি স্থান? সেখানে বাড়ী আছে কি ? সেইখানে কখনও গিয়াছিলেন? কবে গিয়াছিলেন? কেন গিয়াছিলেন? বারীস্তের কোন্নগরে সম্পত্তি আছে কি?"---এইরূপ অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাপারটা কি ইহা বুঝিবার জন্য আমি এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলাম। এই চেম্টায় কৃতকার্য্য হইলাম না, তবে প্রশ্নগুলির ও পুলিসের কথার ধরণে বোঝা গেল যে পুলিসে কি খবর পাইয়াছে তাহা সত্য কি মিখ্যা এই অনুসন্ধান

চলিতেছে। অনুমান করিলাম যেমন তাই-মহারাজের মোকদ্দমায় তিলককে ভণ্ড, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ও অত্যাচারী প্রতিপন্ন করিবার চেল্টা হইয়াছিল এবং সেই চেল্টায় বোম্বে গবর্গমেন্ট যোগদান করিয়া প্রজার অর্থের অপব্যয় করিয়াছিলেন,—তেমনই এস্থলেও কয়েকজন আমাকে বিপদে ফেলিবার চেল্টা করিতেছিল।

রবিবার সমস্তদিন হাজতে কাটিয়া গেল। আমার ঘরের সম্মুখে সিঁড়িছিল। সকালে দেখিলাম কয়েকজন অল্পবয়ক্ষ বালক সিড়িতে নামিতেছে। মুখ চিনি না কিন্তু আন্দাজে বুঝিলাম ইহারাও এই মোকদ্মায় ধৃত, পরে জানিতে পরিলাম ইহারা মানিকতলার বাগানের ছেলে। এক মাস পরে জেলে তাহাদের সঙ্গে আলাপ হয়। অলক্ষণ পরে হাত-মুখ ধুইতে আমাকেও নীচে লইয়া যায়——স্থানের বন্দোবস্ত নাই, কাজেই স্থান করিলাম না। সেই দিন সকালে আহারের মধ্যে ডাল, ভাত সিদ্ধ, কয়েক গ্রাস জোর করিয়া উদরস্থ করিলাম, তাহার পর তাহা ত্যাগ করিতে হইল। বিকাল বেলা মুড়ি। তিন দিন ইহাই আমাদের আহার ছিল। কিন্তু ইহাও বলিতে হয় যে সোমবারে সাজ্জেন্ট আমাকে শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চা ও কটী খাইতে দিলেন।

পরে শুনিলাম আমার উকিল কমিশনারের নিকট বাড়ী হইতে আহার দিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন, হাালিডে সাহেব তাহাতে সম্মত হন নাই। ইহাও শুনিলাম যে, আসামীদের সঙ্গে উকিল বা এটণীর দেখা করা নিষিদ্ধ। জানি না এই নিষেধ আইন-সঙ্গত কিনা? উকিলের প্রামর্শ পাইলে আমার যদিও সুবিধা হইত, তবে নিতাভ প্রয়োজন ছিল না বটে, কিন্তু তাহাতে অনেকের মোকদ্মার ক্ষতি হইয়াছে। সোমবারে কমিশনারদের নিকট আমাদের হাজির করে। আমার সঙ্গে অবিনাশ ও শৈলেন ছিল। সকলকে ভিন্ন ভিন্ন দল করিয়া লইয়া যায়। আমরা তিনজনই পূর্বেজনোর পূণ্যফলে পূর্বের গ্রেপ্তার হইয়া-ছিলাম এবং আইনের জটিলতা কতকটা অনুভব করিয়াছিলাম বলিয়া তিনজনই কমিশনারের নিকট কোনও কথা বলিতে অস্বীকৃত হই। প্রদিন ম্যাজিন্ট্রেট থর্ণহিলের কোর্টে আমাদের লইয়া যায়। এই সময় শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত, ম্যানুয়েল সাহেব আর আমার একজন আত্মীয়ের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ম্যানুয়েল সাহেব আমাকে জিঞাসা করিলেন, "পুলিসে বলে আপনার বাড়ীতে অনেক সন্দেহজনক লেখা পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ চিঠি বা কাগজ কি ছিল ?" আমি বলিলাম, "মিঃসন্দেহে বলিতে পারি, ছিল না, থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব।" অবশ্য তখন মিষ্টান্ন পত্ৰ ('sweets letter') বা 'scribbling' এর কথা জানিতাম না। আমার আশ্বীয়কে বলিলাম, "বাড়ীতে ব'ল কোন ভয় যেন না করে, আমার নির্দোষিতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইবে ।" আমার মনে তখন হইতে দৃ**ঢ় বিশ্বাস জিন্মাছিল যে ইহা হইবেই।** প্রথম নিজ্জন কারাবাসে মন একটু বিচলিত হয় কিন্তু তিন দিন প্রার্থনা ও ধ্যানে কাটানর ফলে নিশ্চনা শাস্তি ও অবিচনিত বিশ্বাস পুনঃ প্রাণকে অভিভূত করে।

থর্ণহিল সাহেবের এজলাস হইতে আমাদের আলিপুরে গাড়ী করিয়া লইয়া যায়। এই দলে ছিল নিরাপদ, দীনদয়াল, হেমচন্দ্র দাস প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে হেমচন্দ্র দাসকে চিনিতাম, একবার মেদিনীপুরে তাঁহার বাড়ীতে উঠি। কে তখন জানিত যে এইরূপ বন্দীভাবে জেলের পথে তাঁহার সহিত দেখা হইবে। আলিপুরে আমাদের ম্যাজিণ্ট্রেটের কোর্টে কতক্ষণ থাকিতে হইল, কিন্তু মাাজিক্ট্রেটের সম্মুখে আমাদের হাজির করা হয় নাই, কেবল ভিতর হইতে তাহার হকুম লিখাইয়া আনে। আমরা আবার গাড়িতে উঠিলাম; তখন একটি ভদ্রলোক আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "গুনিতেছি ইহারা আপনার নিজ্জন কারাবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, হকুম লেখা হইতেছে। হয়ত কাহারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে দিবে না এইবার যদি বাড়ীর লোককে কিছু বলিতে চান, আমি সংবাদ পৌছাইয়া দিব।" আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম, কিন্তু যাহা বলিবার ছিল,তাহা আমার আত্মীয়ের দারা জানান হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে আর কিছু বলিলাম না। আমার উপর দেশের লোকের সহানুভূতি ও অযাচিত অনুগ্রহের দৃশ্টান্তরূপে এই ঘটনার উল্লেখ করিলাম। তৎপরে কোর্ট হইতে আমরা জেলে গিয়া জেলের কম্মচারীগণের হাতে সম্পিত হই। জেলে ঢুকিবার আগে আমাদের খান করায়, জেলের পোষাক পরাইয়া পিরাণ, ধৃতি, জামা সংশোধিত করিবার জন্য লইয়া যায়। চারি দিন পরে আমরা স্নান করিয়া স্বর্গসুথ অনুভব করিলাম। স্নানের পর তাহারা সকলকে নিজ নিজ নিদিত্ট ঘরে পৌছাইয়া দেয়, আমিও আমার নিজন কারাগারে তুকিলাম, ক্ষুদ্র ঘরের গরাদ বন্ধ হইল। ৫ই মে আলিপুরে কারাবাস <mark>আরভ</mark>। পর-বৎসর ৬ই মে নিম্কৃতি পাই।

আমার নির্জন কারাগৃহটি নয় ফুট দীর্ঘ, পাঁচ ছয় ফুট প্রস্থ ছিল; ইহার জানালা নাই, সম্মুখভাগে রহৎ লোহার গরাদ, এই পিঞ্জরই আমার নিদ্দিষ্ট বাসস্থান হইল। ঘরের বাহিরে একটি ক্ষুদ্র উঠান, পাথরের জমি, ইটের উচ্চ দেওয়াল, সামনে কাঠের দরজা। সেই দরজার উপরিভাগে মানুষের চক্ষুর সমান উচ্চতায় ক্ষুদ্র গোলাকার রক্স, দরজা বন্ধ হইলে শান্তী এই রক্ষে চক্ষু লাগাইয়া সময় সময় দেখে, কয়েদী কি করিতেছে। কিম্বু আমার উঠানের দরজা প্রায়ই খোলা থাকিত। এইরূপ ছয়টি ঘর পাশাপাশি, সেইগুলিকে ছয় ডিক্রী বলে। ডিক্রীর অর্থ বিশেষ সাজার ঘর—বিচারপতি বা জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের হকুমে যাহাদের নির্জন কারাবাসের দণ্ড নির্দারিত হয় তাহাদেরই এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহুরে থাকিতে হয়। এই নির্জন কারাবাসেরও কম্বেশী আছে। যাহাদের বিশেষ সাজা হয়, তাহাদের উঠানের দরজা বন্ধ থাকে; মনুষ্য সংসার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়া শান্তীর চক্ষু ও পরিবেশনকারী কয়েদীর দুবেলায় আগমন তাহাদের জগতের সঙ্গে একমাত্র সমন্ত্র এই ব্যবস্থা হইলে। এই সাজার উপরও সাজা আছে,—হাতে-পায়ে হাতকড়া ও বেড়ী পরিয়া নির্জন

কারাবাসে থাকা। এই চরম শাস্তি কেবল জেলের শাস্তিভঙ্গ করা বা মারা-মারির জন্য নয়, বার বার খাটুনীতে এটী হইলেও এই শাস্তি হয়। নিজন্ম কারাবাসের মোকদ্মার আসামীকে শাস্তি-স্বরূপ এইরূপ কল্ট দেওয়া নিয়ম-বিরুদ্ধ, তবে স্বদেশী বা 'বন্দেমাতরম্'-কয়েদী নিয়মের বাহিরে, পুলিসের ইচ্ছায় তাহাদের জন্যও স্বন্দোবস্ত হয়।

আমাদের বাসস্থান ত এইরূপ ছিল, সাজ-সরঞ্জামের সম্বন্ধেও আমাদের সহাদয় কর্ত্তৃপক্ষ আতিথ্য সৎকারের গুটী করেন নাই। একখানা থালা ও একটি বাটী উঠানকে সুশোভিত করিত। উত্তমরূপে মাজা হইলে এই আমার সক্ষি থালা-বাটির এমন রাপার ন্যায় চাক্চিক্য হইত যে, প্রাণ জ্ড়াইয়া যাইত এবং সেই নির্দোষ কিরণময় উজ্জ্বতার মধ্যে 'স্বর্গজগতে' নিখুঁত ব্রিটিশ রাজ-তত্তের উপমা পাইয়া রাজভজ্জির নিম্মল আনন্দ অনুভব করিতাম। দোষের মধ্যে থালাও তাহা বুঝিয়া আনন্দে এত উৎফুল্ল হইত যে, একটু জোরে আঙুল দিলেই তাহা আরবীস্থানের ঘূর্ণামান দরবেশের ন্যায় মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে থাকিত, তখন এক হাতে আহার করা, এক হাতে থালা ধরিয়া থাকা ভিন্ন উপায় ছিল না। নচেৎ ঘুরপাক খাইতে খাইতে জেলের অতুলনীয় মুণ্টার লইয়া তাহা পলাইয়া যাইবার উপক্রম করিত। থালা হইতে বাটিটাই আরও প্রিয় ও উপকারী জিনিষ ছিল। ইহা জড় পদার্থের মধ্যে যেন ব্রিটিশ সিভিলিয়ান। সিভিলিয়ানের যেমন সব্বকার্য্যে স্বভাবজাত নৈপুণা ও যোগাতা আছে, জজ, শাসনকর্তা, পুলিস, গুল্ক-বিভাগের কর্তা, মিউনিসিপ্যালিটির অধ্যক্ষ, শিক্ষক, ধম্মোপদেল্টা, যাহা বল, তাহাই বলিবামাল হইতে পারে,––যেমন তাঁহার পক্ষে তদন্তকারী, অভিযোগ-কর্তা, পুলিস বিচারক, এমন কি সময় সময় বাদীর পক্ষের কৌন্সিলীরও এক শরীরে এক সময়ে প্রীতি-সম্মিলন হওয়া সুখসাধ্য, আমার আদরের বাটিরও তদুপ। বাটির জাত নাই, বিচার নাই, কারাগ্ছে যাইয়া এই বাটিতে জল নিয়া শৌচক্রিয়া করিলাম, সেই বাটিতেই মুখ ধুইলাম, স্থান করিলাম, অল্পন্নণ পরে আহার করিতে হইল, সেই বাটিতেই ভাল বা তরকারী দেওয়া হইল, সেই বাটিতেই জলপান করিলাম এবং আচমন করিলাম। এমন সব্বকার্য্যক্ষম মূল্যবান বস্ত ইংরাজের জেলেই পাওয়া সম্ভব। বাটি আমার এই সকল সাংসারিক উপকার করিয়া যোগ সাধনের উপায় স্বরূপও হইয়া দাঁড়াইল। ঘূণা পরিত্যাগের এমন সহায় ও উপদেষ্টা কোথায় পাইব? নিজ্জন কারাবাসের প্রথম পালার পরে যখন আমাদের এক সঙ্গে রাখা হয়, তখন আমার সিভিলিয়ানের অধিকার পৃথকীকরণ হয়,—–কর্তৃপক্ষেরা শৌচ– ক্রিয়ার জন্য স্বতন্ত উপকরণের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু একমাসকাল এতদ্বারা এই অযাচিত ঘৃণা সংষম শিক্ষালাভ হইল। শৌচক্রিয়ার সমস্ত ব্যবস্থাই যেন এই সংযম শিক্ষার দিকে লক্ষ্য করিয়া বিহিত। বলা হইয়াছে, নির্জন কারাবাস বিশেষ শান্তির মধ্যে গণ্য এবং সেই শান্তির মূলতত্ত্ব যথাসাধ্য মনুষ্য সংসর্গ ও মুক্ত আকাশ সেবা বর্জন। বাহিরে শৌচের ব্যবস্থা হইলে এই তত্ত্ব ভঙ্গ হয় ২৬৬

বলিয়া ঘরের ভিতরেই দুইখানা আল্কাতরা মাখান টুকরী দেওয়া হইত। সকালে ও বিকাল বেলায় মেথর আসিয়া তাহা পরিষ্কার করিত, তাঁর আন্দোলন ও মন্দর্মপানী বজ্তা করিলে অন্য সময়েও পরিষ্কার করা হইত, কিন্তু অসময়ে পায়খানায় যাইলে প্রায়ই প্রায়শ্চিত্তরূপে কয়েক ঘণ্টা দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হইত। নির্জ্জন কারাবাসের দ্বিতীয় পালায় এই সম্বন্ধে কতকটা রিফরম্ হয়, কিন্তু ইংরাজের রিফরম্ হইতেছে পুরাতন আমলের মূলতত্ত্ব সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া শাসন-প্রণালী সংশোধন। বলা বাহুল্য, এই ক্ষুদ্র ঘরে এমন ব্যবস্থা থাকায় সর্বাদা, বিশেষতঃ আহারের সময় এবং রান্ত্রিতে বিশেষ অশোয়ান্তি ভোগ করিতে হইত। জানি, শোবার ঘরের পার্যে পায়খানা রাখা, স্থানে স্থানে বিলাতী সভ্যতার অঙ্গবিশেষ, কিন্তু একটি ক্ষুদ্র ঘরে শোবার ঘর, খাবার ঘর ও পায়খানা—ইহাকে too much of a good thing বলে। আমরা কু-অভ্যাসগ্রন্ত ভারতবাসী, সভ্যতার এত উচ্চ সোপানে পৌছা আমাদের পক্ষে কন্টকর।

গৃহ-সামগ্রীর মধ্যে আরও ছিল একটী স্নানের বাল্ডী, জল রাখিবার একটা টিনের নলাকার বাল্তী এবং দুটা জেলের কম্বল। স্নানের বাল্তী উঠানে রাখা হইত, সেইখানে স্থান করিতাম। আমার ভাগ্যে প্রথমতঃ জল– কল্ট ছিল না কিন্তু তাহা পরে ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ পার্শ্বের গোয়াল ঘরের কয়েদী স্নানের সময় আমার ইচ্ছামত বাল্তীতে জল ভরিয়া দিত, সেইজন্য স্থানের সময়ই জেলের তপস্যার মধ্যে প্রত্যহ গৃহস্থের বিলাসর্ভি ও সুখ-প্রিয়তাকে তৃপ্ত করিবার অবসর। অপর আসামীদের ভাগ্যে ইহাও ঘটে নাই, এক বাল্তীর জলেই তাহাদিগকে শৌচক্রিয়া, বাসন মাজা ও স্থান সম্পন্ন করিতে হইত। মোকদ্দমার আসামী বলিয়া এই অতিমার বিলাস করিতে দেওয়া হইত, কয়েদীদের দুই-চারি বাটি জলে স্থান হইত। ইংরাজেরা বলে ভগবৎ প্রেম ও শরীরের স্বচ্ছন্দতা প্রায়ই সমান ও দুর্ল্ভ সদ্গুণ, তাহাদের জেলে এই জাতীয় প্রবাদের যাথার্থ্য রক্ষণার্থ অথবা অতিরিক্ত স্নানসুখে কয়েদীর অনিচ্ছাজনিত তপস্যায় রসভঙ্গ ভয়ে এই ব্যবস্থা প্রচলিত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। আসামীরা কর্তৃপক্ষদের এই দয়াকে কাকের স্থান বলিয়া তাচ্ছিল্য করিত। মানুষমাএই অসভোষ-প্রিয়। স্থানের ব্যবস্থা হইতে পানীয় জলের ব্যবস্থা আরও চমৎকার। তখন গ্রীত্মকাল, আমার ক্ষুদ্র ঘরে বাতাসের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু মে মাসের উগ্র ও প্রখর রৌদ্র অবাধে প্রবেশ করিত। ঘরটি উত্তপত উন্নের মত হইয়া উঠিত। এই উন্নে সিদ্ধ হইতে অদম্য জলতৃষ্ণা লাঘব করিবার উপায় ওই টিনের বাল্তীর অর্জউষ্ণ জল। বার বার তাহা পান করিতাম, তৃষ্ণাতো যাইতই না বরং স্বেদ নির্গমন এবং অল্পক্ষণে নবীভূত তৃষ্ণাই লাভ হইত। তবে এক একজনের উঠানে মাটির কলসী রাখা ছিল, তাঁহারা পূর্বেজনাকৃত তপস্যা সমরণ করিয়া নিজেকে ধন্য মানিতেন। ইহাতে ঘোর পুরুষার্থবাদীকেও অদৃষ্ট মানিতে বাধ্য হইতে হয়, কাহারও ভাগ্যে ঠাণ্ডা জল জুটিত, কাহারও ভাগ্যে তৃষ্ণা লাগিয়াই থাকিত,

সব কপালের জোর। কর্তৃপক্ষেরা কিন্তু সম্পূর্ণ পক্ষপাত শূন্য হইয়া কলসী বা টিন বিতরণ করিতেন। এই যদৃচ্ছা লাভে আমি সম্ভুপ্ট হইলে বা না হইলেও আমার জলকল্ট জেলের সহাদয় ডাজার বাবুর অসহ্য হয়। তিনি কলসী যোগাড় করিতে উদ্যোগী হন, কিন্তু এই সব বন্দোবন্তে তাঁহার হাত নাই বলিয়া তিনি অনেক দিন তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই, শেষে তাঁহারই কথায় মুখ্য জমাদার কোথা হইতে কলসী আবিষ্কার করিল। তাহার আগেই আমি তৃষ্ণার সঙ্গে অনেক দিনের ঘোর সংগ্রামে পিপাসা-মুক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। এই তপ্ত গৃহে আবার জেলে তৈয়ারী করা দুইটা মোটা কম্বলই আমাদের বিছানা। বালিস নাই, কাজেই একটি কম্বল পাতিয়া আর একটি কম্বল পাট করিয়া বালিস বানাইয়া গুইতাম। যখন গ্রমের ক্লেশ অসহ্য হইয়া আর থাকা যাইত না, তখন মাটীতে গড়াইয়া শরীর শীতল করিয়া আরাম লাভ করিতাম। মাতা বসুন্ধরার শীতল উৎসঙ্গ স্পর্শের কি সুখ, তাহা তখন বুঝিতাম। তবে জেলে সেই উৎসঙ্গ স্পর্শ বড় কোমল নয়, তদ্যারা নিদ্রার আগ্রমন বাধা-প্রাপ্ত হইত বলিয়া কম্বলের শরণ লইতে হইত। যে দিন রুষ্টি হইত সেদিন বড় আনন্দের দিন হইত। ইহাতেও একটি এই অসুবিধা ছিল যে, ঝড়র্পিট হইলেই ধূলা, পাতা ও তৃপসঙ্কুল প্রভঞ্নের তাভব নৃত্যের পর আমার খাঁচার মধ্যে ছোট খাট একটি জলপাবন হইত। তাহার পরে রাত্তিতে ভিজা কম্বল লইয়া ঘরের কোণে পলায়ন ভিন্ন উপায় ছিল না। প্রকৃতির এই লীলা বিশেষ সাস হইলেও জলপ্লাবিত মাটি যতক্ষণ না শুকাইত ততক্ষণ নিদার আশা পরিত্যাগ পর্বেক চিভার আশ্রয় লইতে হইত, কেননা শৌচক্রিয়ার সামগ্রীর নিকটই একমাত্র শুফস্ল থাকিত কিন্তু সেই দিকে কম্বল পাতিতে প্রবৃত্তি হইত না। এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও ঝড়ের দিনে ভিতরে প্রচুর বাতাস আসিত এবং ঘরের সেই ত॰ত উনুন তাত-বিদূরিত হইত বলিয়া ঝড়র্পিটকে সাদরে স্বাগত করিতাম।

আলিপুর গবর্ণমেন্ট হোটেলের যে বর্ণনা করিলাম, এবং ভবিষ্যতে আরও করিব, তাহা নিজের কল্টভোগ জাপন করিবার জন্য নয়,—সুসভ্য রটিশ রাজ্যে মোকদ্দমার আসামীর জন্য কি অডুত ব্যবস্থা, নির্দোষীর দীর্ঘকালব্যাপী কি যন্ত্রণা হইতে পারে, ইহা দেখাইবার জন্য এই বর্ণনা। যে সব কল্টের কারণ দেখাইয়াছি, সে সব ছিল বটে, কিন্তু ভগবানের দয়া দৃঢ় ছিল বলিয়া কয়েকদিন মাত্র এই কল্ট অনুভব করিয়াছিলাম, তাহার পরে—কি উপায়ে তাহা পরে বলিব—মন সেই দুঃখের অতীত হইয়া কল্ট অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। সেইজন্য জেলের স্মৃতি মনে উদয় হইলে ক্রোধ বা দুঃখ না হইয়া হাসিই পায়। যখন সক্রপ্রথম জেলের বিচিত্র পোষাক পরিয়া আমার পিজরে তুকিয়া থাকিবার বন্দোবস্ত দেখিলাম তখন এই ভাবই মনে প্রকাশ পাইল। মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। আমি ইংরাজ জাতির ইতিহাস ও আধুনিক আচরণ নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের বিচিত্র ও রহস্যময় চরিত্র অনেকদিন আগে ব্রিয়া লইয়াছিলাম, সেইজন্য আমার প্রতি তাহাদের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়াও

কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত বা দুঃখিত হইলাম না । সাধারণ দৃশ্টিতে আমাদের সহিত এইরূপ বাবহার করা তাহাদের পক্ষে অতিশয় অনুদার ও নিন্দনীয়। আমরা সকলে ভদ্রলোকের সন্তান, অনেকে জমিদারের ছেলে, কয়েকজন বংশে, বিদ্যায়, গুণে, চরিত্রে ইংলণ্ডের শীর্ষস্থানীয় লোকের সমকক্ষ। আমরা যে অভিযোগে ধৃত, তাহাও সামান্য খুন, চুরি, ডাকাতি নয়; দেশের জন্য বিদেশী রাজপুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধ-চেল্টা করা বা সমরোদ্যোগের যড়যন্ত্র। তাহাতেও অনেকের দোষের সম্বন্ধে প্রমাণের নিতাভ অভাব, পুলিসের সন্দেহই তাহাদের ধৃত হইবার একমাত্র কারণ। এইরাপ স্থলে সামান্য চোর-ডাকাতদের মত রাখা—–চোর-ডাকাত কেন, পশুর ন্যায় পিঞ্জরে রাখিয়া পশুর অখাদ্য আহার খাওয়ান, জলকল্ট, ক্ষুৎপিপাসা, রৌদ্র, রুল্টি, শীত সহ্য করান ইহাতে রুটিশ রাজপুরুষদের ও রটিশ জাতির গৌরব রদ্ধি হয় না। ইহা কিন্তু তাঁহাদের জাতীয় চরিত্রগত দোষ। ইংরাজদের দেহে ক্ষত্রিয়োচিত গুণ থাকিলেও শত্রু বা বিরুদ্ধাচরণকারীর সঙ্গে ব্যবহার করিবার সময় তাঁহারা ষোল-আনা বেণে। আমার কিন্তু তখন বিরক্তি ভাব মনে স্থান পায় নাই, বরং আমার ও দেশের সাধারণ অশিক্ষিত লোকের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় নাই দেখিয়া একটু আনন্দিত হইয়াছিলাম, অধিকন্ত এই ব্যবস্থা মাতৃভজ্ির প্রেমভাবে আহতি দান করিল। একে বুঝিলাম যোগ শিক্ষা ও দদ্ভজয়ে অপূর্বে উপকরণ ও অনুকূল অবস্থা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আমি চরমপ্থী দলের একজন, যাহাদের মতে প্রজাতন্ত এবং ধনী-দরিদ্রে সাম্য জাতীয় ভাবের একটি প্রধান অঙ্গ। মনে পড়িল সেই মতকে কার্যো পরিণত করা কর্ত্তব্য বলিয়া সুরাট যাল্লার সময় সকলে এক সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হইয়াছিলাম, ক্যাম্পে নেতারা নিজেদের স্বতন্ত বন্দোবস্ত না করিয়া সকলের সঙ্গে একভাবে এক ঘরে শুইতাম। ধনী, দরিদ্র, রান্ধণ, বৈশ্য, শূদ্র, বাঙ্গালী, মারাঠা, পাঞ্জাবী, গুজরাটি দিব্য ভ্রাতৃভাবে এক সঙ্গে থাকিতাম, ওইতাম, খাইতাম। মাটিতে শ্যা, ডাল-ভাত দহিই আহার, সর্ব্ববিষয়ে শ্বদেশী ধরণের প্রাকাঠা হইয়াছিল। কলিকাতা ও বোম্বে সহরের বিলাত-ফেরত ও মাদ্রাজের তিলক কাটা ব্রাহ্মণ-সভান এক সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। এই আলিপুর জেলে বাসকালীন আমার দেশের কয়েদী, আমার দেশের চাষা, লোহার, কুমার, ডোম-বাগদীর সমান আহার, সমান থাকা, সমান কল্ট, সমান মানমর্য্যাদা লাভ করিয়া বুঝিলাম সর্বশরীরবাসী নারায়ণ এই সাম্যবাদ, এই একতা, এই দেশব্যাপী ভ্রাতৃভাবে সম্মত হইয়া যেন আমার জীবনব্রতে স্বাক্ষর দিয়াছেন। যেদিন জন্মভূমি-রাপিণী জগজ্জননীর পবিল্ল মণ্ডপে দেশের সক্ষ শ্রেণী ভাতৃভাবে একপ্রাণ হইয়া জগতের সম্মুখে উন্নতমস্তকে দাঁড়াইবেন, সহবাসী আসামী ও কয়েদীদের প্রেমপূর্ণ আচরণে এবং রাজপুরুষদের এই সাম্যভাবে এই কারাবাসে হাদয়ের মধ্যে সেই শুভদিনের পূর্কাভাস লাভ করিয়া কতবার হ্যান্বিত ও পুলকিত হইতাম। সেদিন দেখিলাম পুনার "Indian Social Reformer " আমার

একটি সহজ বোধগম্য উক্তি লইয়া বিদূপ করিয়া বলিয়াছেন, "জেলে ভগবৎসামিধ্যের বড় ছড়াছড়ি হইল দেখিতেছি!" হায়, মানসম্ভমান্বেয়ী অল্প বিদ্যায়,
অল্প সদ্গুণে গব্বিত মানুষের অহঙ্কার ও অল্পতা! জেলে, কুটীরে, আশ্রমে,
দুঃখীর হৃদয়ে ভগবৎপ্রকাশ না হইয়া বুঝি ধনীর বিলাস-মন্দিরে বা সুখান্বেয়ী
স্বার্থান্ধ সংসারীর আরাম-শয্যায় তাহা সন্তব? ভগবান বিদ্যা, সন্তম, লোকমান্যতা, লোকপ্রশংসা, বাহ্যিক স্বচ্ছন্দতা ও সভ্যতা দেখেন না। তিনি দুঃখীর
নিকটেই দয়াময়ী মাতৃরূপ প্রকাশ করেন। যিনি মানবমাত্রে, জাতিতে, স্বদেশে,
দুঃখী-গরীব পতিত পাপীতে নারায়ণকে দেখিয়া সেই নারায়ণের সেবায় জীবন
সমর্পণ করেন তাঁহারই হৃদয়ে নারায়ণ আসিয়া বসেন। আর উত্থানোদ্যত
পতিত জাতির মধ্যে দেশ-সেবকের নির্জন কারাগারেই ভগবৎ-সামিধ্যের
ছডাছিড সন্তব।

জেলর আসিয়া কম্বল ও থালা-বাটির বন্দোবস্ত করিয়া চলিয়া গেলে পর আমি কম্বলের উপরে বসিয়া জেলের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। এই নির্জন কারাবাস লালবাজার হাজত হইতে অনেক ভাল বোধ হইল। সেখানে সেই প্রকাণ্ড ঘরের নিজ্জনতা যেন বিশাল বপু ছড়াইবার অবকাশ পাইয়া আরও নিজ্জনতা র্দ্ধি করে। এইখানে ক্ষুদ্র ঘরের দেওয়াল সঙ্গীস্বরূপ যেন নিকটে আসিয়া ব্রহ্মময় হইয়া আলিসন করিতে উদ্যত। সেইখানে দোতালার ঘরের অতি উচ্চ জানালা দিয়া বাহিরের আকাশও দেখা যায় না, এই জগতে গাছ-পালা, মানুষ, পশু-পক্ষী, বাড়ী-ঘর যে আছে তাহা অনেকবার কল্পনা করা কঠিন হয়। এই স্থানে উঠানের দরজা খোলা থাকায় গরাদের নিকটে বসিলে বাহিরে জেলের খোলা জায়গা ও কয়েদীদের যাতায়াত দেখা যায়। উঠানের দেওয়ালের গায়ে একটি র্ক্ষ ছিল, তাহার নয়নরঞ্জক নীলিমায় প্রাণ জুড়াইতাম। ছয় ডিক্রীর ছয়টি ঘরের সামনে যে শান্তী ঘুরিয়া থাকে, তাহার মূখ ও পদশব্দ অনেকবার পরিচিত বন্ধুর ঘোরাফেরার মত প্রিয় বোধ হইত। ঘরের পার্শ্ববর্তী পোয়ালঘরের কয়েদীরা ঘরের সম্মুখ দিয়া গরু চরাইতে লইয়া যাইত। গরু ও গোপাল নিত্য প্রিয় দৃশ্য ছিল। আলিপুরের নির্জন কারাবাসে অপূবর্ব প্রেম শিক্ষা পাইলাম। এইখানে আসিবার আগে মানুষের মধ্যেও আমার ব্যক্তিগত ভালবাসা অতিশয় ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল এবং পণ্ড-পক্ষীর উপর রুদ্ধ প্রেম-স্রোত প্রায় বহিত না। মনে আছে রবিবাবুর একটি কবিতায় মহিষের উপর গ্রাম্য বালকের গভীর ভালবাসা বড় সুন্দরভাবে বণিত আছে, সেই কবিতা প্রথম পড়িয়া কিছুতেই তাহা আমার হাদয়সম হয় নাই, ভাবের বর্ণনায় অতিশয়োক্তি ও অস্বাভাবিকতা দোষ দেখিয়াছিলাম ৷ এখন পড়িলে তাহা অন্য চক্ষে দেখিতাম ৷ আলিপুরে বসিয়া বুঝিতে পারিলাম, সর্বর্প্রকার জীবের উপর মানুষের প্রাণে কি গভীর ভালবাসা স্থান পাইতে পারে, গরু, পাখী, পিপীলিকা পর্যান্ত দেখিয়া কি তীব্র আনন্দ স্ফুরণে মানুষের প্রাণ অস্থির হইতে পারে।

কারাবাসের প্রথম দিন শান্তিতে কাটিয়া গেল। সবই ন্তন, তাহাতে মনে সফুডি হইল। লালবাজার হাজতের সঙ্গে তুলনা করিয়া এই অবস্থাতেই প্রীতিলাভ করিলাম এবং ভগবানের উপর নির্ভর ছিল বলিয়া এখানে নির্জনতা বোধ হয় নাই। জেলের আহারের অন্তত চেহারা দেখিয়াও এই ভাবের ব্যাঘাত হয় নাই। মোটা ভাত, তাহাতেও খোলা, কঙ্কর, পোকা, চুল, ময়লা ইত্যাদি কত প্রকার মশলা দেওয়া,—–স্বাদহীন ডালে জলের ভাগ অধিক, তরকারীর মধ্যে ঘাস–পাতা ওদ্ধ শাক। মানুষের আহার যে এত স্থাদহীন নিঃসার হইতে পারে, তাহা আমি আগে জানিতাম না। এই শাকের বিমর্ষ গাঢ় কৃষ্ণ মৃত্তি দেখিয়াই ভয় পাইলাম, দুই গ্রাস খাইয়া তাহাকে ভক্তিপূর্ণ নমস্কার করিয়া বর্জন করিলাম। সকল কয়েদীর ভাগ্যে একই তরকারী জোটে, এবং একবার কোন প্রকার তরকারী আরম্ভ হইলে তাহা অনন্তকাল চলিতে থাকে। এই সময় শাকের রাজত্ব ছিল। দিন যায়, পক্ষ যায়, মাস যায়, কিন্তু দুবেলা শাকের তরকারী, ঐ ডাল, ভাত। জিনিষ্টা বদলান দুরের কথা চেহারারও লেশমার পরিবর্ডন হয় নাই, তাহার ঐ নিত্য সনাতন অনাদ্যন্ত অপরিণামাতীত অদ্বিতীয় রূপ। দুই সন্ধ্যার মধ্যেই কয়েদীকে এই নগ্নর মায়াজগতের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মাইবে। এই বিষয়েও অন্য আসামী হইতে আমার ভাগ্য সুপ্রসম ছিল, তাঁহাও ডাজারবাবুর দয়ায়। তিনি আমার জন্য হাস্পাতাল হইতে দুধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তদাুরা কয়েকদিন শাক দশ্ন হইতে পরিক্রাণ পাইয়াছিলাম।

সেই রাত্রে সকাল সকাল ঘুমাইলাম, কিন্তু নিশ্চিত্ত নিদ্রাভোগ করা নিজ্জন কারাবাসের নিয়ম নয়, তাহাতে কয়েদীর সুখপ্রিয়তা জাগিতে পারে। সেই জন্য এই নিয়ম আছে যে, যতবার পাহারা বদলায়, ততবার কয়েদীকে ডাক হাঁক করিয়া উঠাইতে হয়, সাড়া না দিলে ছাড়িতে নাই। যাঁহারা যাঁহারা ছয় ডিক্রীতে পাহারা দিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এই কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ ছিলেন,—সিপাহীদের মধ্যে প্রায়ই কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞান অপেক্ষা দয়া ও সহানুভূতির ভাব অধিক ছিল, বিশেষতঃ হিন্দুস্থানীদের স্বভাব এইরাপ। কয়েকজন কিন্তু ছাড়ে নাই। তাহারা আমাদিগকে এইরাপ উঠাইয়া এই কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিত, "বাবু ভাল আছেন ত?" এই অসময় রহস্য সব সময় প্রীতিকর হইত না, তবে বুঝিলাম খাহারা এইরাপ করিতেছে তাহারা সরলভাবে নিয়ম বলিয়া আমাদিগকে উঠাইতেছে। কয়েক দিন বিরক্ত হইয়াও ইহা সহ্য করিলাম, শেষে নিদ্রা রক্ষার জন্য ধমক দিতে হইল। দুই চারিবার ধমক দিবার পরে দেখিলাম, রাত্রে কুশল সংবাদ নেওয়া প্রথা আপনিই উঠিয়া গেল।

পরদিন সকালে চারিটা বাজিয়া পনের মিনিটে জেলের ঘণ্টা বাজিল। কয়েদীদের উঠাইবার জন্য এই প্রথম ঘণ্টা। কয়েক মিনিট পর আবার ঘণ্টা বাজে, তাহার পর কয়েদীরা ফাইলে বাহিরে আসে, হাত মুখ ধুইয়া লফ্সী খাইয়া খাটুনি আরম্ভ করে। এত ঘণ্টা বাজানোর মধ্যে ঘুম হওয়া অসম্ভব

বুঝিয়া আমিও উঠিলাম। ৫টার সময় গরাদ খোলা হয়, আমি হাত-মুখ ধুইয়া আবার ঘরে বসিলাম। অল্পঞ্চণ পরে লফ্সী আমার দরজায় হাজির হুইল কিন্তু সেই দিন তাহা খাই নাই, কেবল তাহার সহিত চাক্ষুষ পরিচয় হুইল। ইহার কয়েকদিন পরে প্রথমবার এই পরমার ভোগ হয়। লফ্সীর অর্থ ফেনের সহিত সিদ্ধ ভাত, ইহাই কয়েদীর ছোট হাজরী। লফ্সীর ব্রিমুন্ডি বা তিন অবস্থা আছে। প্রথম দিন লফ্সীর প্রাক্তভাব, অমিপ্রিত মূলপদার্থ, ওদ্ধ শিব গুল্লমূতি। দ্বিতীয় দিন লফ্সীর হিরণ্যগর্ভ, ডালে সিদ্ধ, খিচুড়ি নামে অভিহিত, পীতবর্ণ, নানা ধর্মসঙ্কুল। তৃতীয় দিনে লফ্সীর বিরাট মূর্ভি অল্প গুড়ে মিপ্রিত, ধুসর বর্ণ, কিয়েও পরিমাণে মনুষ্যের ব্যবহার যোগ্য। আমি প্রাঞ্জ ও হিরণ্য-গভ সেবন সাধারণ মর্জা মনুষ্যের অতীত বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম, এক একবার বিরাটের দুগ্রাস উদরস্থ করিয়া র্টিশ রাজত্বের নানা সদ্খণ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্চ দরের humanitarianism ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে মগ্ন হইতাম। বলা উচিত লফ্সীই বাঙ্গালী কয়েদীর একমাত্র পুশ্টিকর আহার, আর সবই সারশূন্য। তাহা হইলেও বা কি হইবে? তাহার যেরূপ স্থাদ, তাহা কেবল ক্ষুধার চোটেই খাওয়া যায়, তাহাও জোর করিয়া, মনকে কত বুঝাইয়া তবে খাইতে হয়।

সেদিন সাড়ে এগারটার সময় স্থান করিলাম। প্রথম চারি পাঁচ দিন বাড়ী হইতে যাহা পরিয়া আসিয়াছিলাম, তাহাই পরিয়া থাকিতে হইল। স্নানের সময় যে গোয়ালঘরের রুদ্ধ কয়েদী ওয়ার্ডার আমার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি একটি এণ্ডির দেড় হাত চওড়া কাপড় যোগাড় করিয়াছিলেন, আমার একমাত্র বস্তু শুকান পর্যান্ত ইহা পরিয়া বসিয়া থাকিতাম। আমায় কাপড় কাচিতে বা বাসন মাজিতে হইত না, গোয়ালঘরে একজন কয়েদী ইহা করিত। এগারটার সময় খাওয়া। ঘরে চুপড়ির সালিধ্য বর্জন করিবার জন্য গ্রীপেমর রৌদ্র সহ্য করিয়া প্রায়ই উঠানে খাইতাম। শান্ত্রীও ইহাতে বাধা দিতেন না। সভ্যার খাওয়া পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটার সময় হইত। তাহার পর আর গারদ খোলা নিষিদ্ধ ছিল। সাতটার সময় সন্ধ্যার ঘন্টা বাজে। মুখ্য জমাদার কয়েদী ওয়ার্ডারদের একত করিয়া উচ্চৈঃশ্বরে নাম পড়িয়া যান, তাহার পর সকলে স্ব স্থা স্থানে যায়। প্রান্ত কয়েদী নিদ্রার শরণ লইয়া জেলের সেই একমার সুখ অনুভব করে। এই সময় দুর্কলচেতা নিজের দুর্ভাগ্য বা ভবিষ্যৎ জেলদুঃখ ভাবিয়া কাঁদে। ভগবভুক্ত, নীরব রাগ্রিতে ঈশ্বর-সালিধা অনুভব করিয়া প্রার্থনায় বা ধাানে আনন্দ ভোগ করেন। রাঞ্জিত এই দুর্ভাগ্য পতিত সমাজ-পীড়িত তিন সহস্র ঈশ্বরস্প্ট প্রাণীর সেই আলিপুর জেল স্বরূপ প্রকাণ্ড যন্ত্রণাগৃহ বিশাল নীরবতায় মগ্ন হয়।

দেখা হইত না। তাঁহারা স্বতন্ত স্থানে রক্ষিত ছিলেন। ছয় ডিক্রীর পশ্চাভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরের দুটী লাইন ছিল, এই দুটী লাইনে সব শুদ্ধ চুয়ালিশিটি ঘর, সেই জন্য ইহাকে চুয়াল্লিশ ডিক্রী বলে। এই ডিক্রীর একটা লাইনে অধিকাংশ আসামীর বাসস্থান নিদিস্ট ছিল। তাঁহারা cell-এ আবদ্ধ হইয়াও নিজ্জন কারাবাস ভোগ করেন নাই, কেন না এক ঘরে তিনজন করিয়া থাকিতেন। জেলের অন্য দিকে আর একটি ডিক্রী ছিল, তাহাতে কয়েকটি বড় ঘর ছিল, এক একটী ঘরে বারজন পর্যাভ থাকিতে পারিত। যাঁহাদের ভাগ্যে এই ডিক্রী পড়িত, তাঁহারা অধিক সুখে থাকিতেন। এ ডিক্রীতে অনেকে এক ঘরে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা রাত দিন গল্প করিবার অবসর ও মনুষ্যসংস্গ লাভ করিয়া সুখে কালযাপন করিতেন। তবে তাঁহাদের মধ্যে একজন এই সুখে বঞ্চিত ছিলেন। ইনি হেমচন্দ্র দাস। জানি না কেন ইহার উপর কর্তৃপক্ষের বিশেষ ভয় অথবা ক্রোধ ছিল, এত লোকের মধ্যে নিজ্জন কারাবাসের যন্ত্রণা ভোগ করাইবার জন্য কর্তুপক্ষ তাঁহাকেই স্বতন্ত করিয়াছিলেন। হেমচন্দের নিজের ধারণা ছিল যে, পুলিস অশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে দোষ স্বীকার করাইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার উপর এই ক্রোধ। তাঁহাকে এই ডিক্রীর একটী অতি ক্ষুদ্র ঘরে আবদ্ধ করিয়া বাহিরের দরজা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া রাখা হইত। বলিয়াছি, ইহাই এই বিশেষ সাজার চরম অবস্থা। মাঝে মাঝে পুলিস নানা জাতির, নানা বর্ণের, নানা আকৃতির সাক্ষী আনাইয়া identification প্রহসন অভিনয় করাইত। তখন আমাদের সকলকে আফিসের সম্মুখে এক দীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দাঁড় করাইত। জেলের কর্তৃপক্ষেরা আমাদের সঙ্গে জেলের অন্য অন্য মোকদমার আসামী মিশাইয়া তাহাদিগকে দেখাইতেন । ইহা কিন্তু নামের জন্য। এই আসামীদের মধ্যে শিক্ষিত বা ভদ্রলোক একজনও ছিল না, যখন তাহাদের সহিত এক শ্রেণীতে দাঁড়াইতাম, তখন এই দুই প্রকার আসামীবর্গের এত অমিল থাকিত যে, এক দিকে বোমার মোকদ্মায় অভিযুক্ত বালকদের তেজ্যী তীক্ষবুদ্ধি প্রকাশক মুখের ভাব ও গঠন এবং অন্যদিকে সাধারণ আসামীর মলিন পোষাক ও নিভেজ মুখের চেহারা দেখিয়া কে কোন্ শ্রেণীর লোক তাহা যিনি নির্ণয় করিতে না পারিতেন, তাঁহাকে নির্কোধ কেন, নিকৃষ্ট মনুষ্যবুদ্ধিরহিত বলিতে হয়। এই identification প্যারেডে আসামীদের অপ্রিয় ছিল না। এতদ্যারা জেলের একঘেয়ে জীবনের একটি বৈচিত্র্য হইত, এবং পরস্পরকে দুটী কথাও বলিবার অবকাশ পাওয়া যাইত। গ্রেপ্তারের পর এইরূপ একটী প্যারেডে আমার ভাই বারীস্তকে প্রথম দেখিতে পাইলাম, কিন্তু তাহার সঙ্গে তখন কথা হয় নাই। প্রায়ই নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীই আমার পার্থে দাঁড়াইতেন, সেই জন্য তাঁহার সঙ্গে তখন এই সময়ে আলাপ একটু অধিক হইয়াছিল। গোঁসাই অতিশয় সুপুরুষ, লম্বা, ফরসা, বলিষ্ঠ, পুষ্টকায় কিন্তু তাঁহার চোখের ভাব কুর্ভি প্রকাশক ছিল, কথায়ও বুদ্ধিমভার কোন লক্ষণ পাই নাই। এই বিষয়ে অন্য যুবকদের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ প্রভেদ ছিল।

তাঁহাদের মুখে প্রায়ই উচ্চ ও পবিত্র ভাব অধিক এবং কথায় প্রখর বুদ্ধি, জানলিপ্সা ও মহৎ স্বার্থহীন আকাৎক্ষা প্রকাশ পাইত। গোঁসাইয়ের কথা নির্বোধ
ও লঘুচেতা লোকের কথার ন্যায় হইলেও তেজ ও সাহসপূর্ণ ছিল। তাঁহার
তখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, তিনি খালাস পাইবেন। তিনি বলিতেন, "আমার
বাবা মোকদ্দমার কীট, তাঁহার সঙ্গে পুলিস কখনও পারিবে না। আমার
এজাহারও আমার বিরুদ্ধে যাইবে না, প্রমাণিত হইবে পুলিস আমাকে শারীরিক
যন্ত্রপা দিয়া এজাহার করাইয়াছে।" আমি জিজাসা করিলাম, "তুমি পুলিসের
হাতে ছিলে। সাক্ষী কোথায়?" গোঁসাই অম্লানবদনে বলিলেন, "আমার
বাবা কত শত মোকদ্দমা করিয়াছেন, ও সব বেশ বোঝেন। সাক্ষীর অভাব
হইবে না।" এইরূপ লোকই Approver হয়।

ইতিপূর্বে আসামীর অনর্থক অসুবিধা ও নানা কল্টের কথা বলা হইয়াছে কিন্তু ইহাও বলা উচিত যে এই সকলই জেলের প্রণালীর দোষ; এই সকল কল্ট জেলের কাহারও ব্যক্তিগত নিষ্ঠুরতা বা মনুষ্যোচিত গুণের অভাবে হয় নাই। বরং আলিপুর জেলে ফাঁহাদের উপর কর্তৃত্বের ভার ছিল, তাঁহারা সকলেই অতিশয় ভদ্র, দয়াবান এবং ন্যায়পরায়ণ। যদি কোনও জেলে কয়েদীর যন্ত্রণার কম হয়, য়ুরোপীয় জেল প্রণালীর অমানুষিক বর্কর্তা, দয়ায় ও ন্যায়-প্রায়ণ্তায় লঘুকৃত হয়, তবে আলিপুর জেলে ও এমারসন সাহেবের রাজত্বে সেই মন্দের ভাল ঘটিয়াছে। এই ভাল হইবার দুটী প্রধান কারণ জেলের ইংরাজ সপারিন্টেভেন্ট এমারসন সাহেব ও বাঙ্গালী হাসপাতাল আসিল্টান্ট ভাক্তার বৈদ্যনাথ চাটাজির অসাধারণ গুণ। ইহাদের মধ্যে একজন য়ুরোপের লুণ্ডপ্রায় খৃণ্টান আদর্শের অবতার, অপরটী হিন্দুধন্মের সারমম্ম দয়া ও পরোপকারের জীবভ মৃতি। এমারসন সাহেবের মত ইংরাজ আর এই দেশে বড় আসে না, বিলাতেও আর বড় জন্মায় না। তাঁহার শরীরে খৃত্টান gentleman-এর যে সকল গুণ হওয়া উচিত, সকলই এক সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। তিনি শান্তিপ্রিয়, বিচারশীল, দয়াদাক্ষিণ্যে অতুলনীয়, ন্যায়বান; ভদ্র ব্যবহার ভিন্ন অধমের প্রতিও অভদ্রতা প্রকাশ করিতে স্বভাবতঃ অক্ষম, সরল, অকপট, সংযমী ৷ দোষের মধ্যে তাঁহার কম্মকুশলতা ও উদাম কম ছিল, জেলরের উপর সমুদয় কম্মভার অর্পণ করিয়া তিনি স্বয়ং নিশ্চেষ্ট থাকিতেন। ইহাতে যে বড় বেশী ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা আমার বোধ*্*হয় না৷ জেলর যোগেজবাবু দক্ষ ও যোগ্য পুরুষ ছিলেন, বহমূত রোগে অতিশয় ক্লিণ্ট হইয়াও স্বয়ং কার্য্য দেখিতেন এবং সাহেবের স্বভাব চিনিতেন বলিয়া জেলে ন্যায়নিষ্ঠা ও <u>ক্</u>রতার অভাব রক্ষা করিতেন। তবে তিনি এমারসনের মত মহাঝা লোক ছিলেন না, সামান্য বাঙ্গালী সরকারী ভূত্য মাত্র, সাহেবের মন রাখিতে জানিতেন, দক্ষতা ও কওঁবাবুদ্ধির সহিত কম্ম করিতেন, স্থাভাবিক ভদুতা ও শাভভাবের সহিত লোকের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন, ইহা ছাড়া তাঁহার মধ্যে কোন বিশেষ গুণ লক্ষ্য করি নাই। চাকরীর উপর তাঁহার প্রবল মায়া

ছিল। বিশেষতঃ তখন মে মাস, পেন্সন নিবার সময় তাঁহার নিকটবতী হইয়াছিল, জানুয়ারীতে পে-সন নিয়া দীঘঁ পরিশ্রমোপাজিঁত বিশ্রাম ভোগ করিবার আশা তখন বর্ডমান ছিল। আলিপুরের বোমার মোকদমার আসামীর আবির্ভাব দেখিয়া আমাদের জেলর মহাশয় নিতান্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়াছিলেন। এই সব উগ্রস্থভাব তেজস্বী বাঙ্গালী বালক কোন্ দিনে কি কাণ্ড করিয়া বসিবেন. এই ভাবনায় তিনি অস্থির হইয়া থাকিতেন। তিনি বলিতেন, তালগাছে চড়িতে আর দেড়ইঞি বাকী। কিন্তু সেই দেড়ইঞ্চির অর্দ্ধেকটা মাত্র তিনি চড়িতে পারিয়াছিলেন। আগস্ট মাসের শেষেই বোকানন সাহেব জেলে পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিয়া সম্ভণ্ট হইয়া গেলেন। জেলর মহাশয় আনন্দে বলিলেন. "আমার কম্মকালে এই সাহেবের শেষ আসা, আর পেন্সনের ভয় নাই।" হায়, মানুষ মাত্রের অন্ধতা! কবি যথার্থই বলিয়াছেন, বিধি দুঃখী মনুষ্যের দুটী পরম উপকার করিয়াছেন। প্রথম, ভবিষাৎ নিবিড় অন্ধকারে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, দিতীয়, তাহার একমাত্র অবলম্বন ও সাভুনাস্থল স্বরূপ অন্ধ আশা তাহাকে দিয়াছেন। এই উজ্জির চার পাঁচদিন পরেই নরেন গোঁসাই কানাইয়ের হস্তে হত হইলেন, বোকাননের জেলে ঘন ঘন আসা আরম্ভ হইল। তাহার ফলে যোগেন্দ্র বাবুর অকালে কর্ম্ম গেল এবং শোক ও রোগের মিলিত আক্রমণে তাঁহার দেহত্যাগও ঘটিল। এইরূপ কম্মচারীর উপর সম্পূর্ণ ভার না দিয়া এমারসন সাহেব যদি স্বয়ং সব কার্য্য দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজত্ব-কালে আলিপুর জেলের অধিক সংস্কার ও উন্নতি হইবার সভাবনা ছিল। তিনি যতটুকু দেখিতেন, তাহা সুসম্পন্নও করিতেন, তাঁহার চরিব্রগত গুণেও জেল্টী নরক না হইয়া মানুষের কঠোর শাস্তির স্থানই হইয়া রহিয়াছিল ৷ তিনি অন্যত্র গেলেও তাঁহার সাধুতার ফল সম্পূর্ণ ঘুচে নাই, এখনও পরবভী কম্মচারীগণ তাঁহার সাধৃতা দশ আনা বজায় রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন।

যেমন জেলের অন্যান্য বিভাগে বাঙ্গালী যোগেন বাবু হর্তাকর্তা ছিলেন, তেমনই হাসপাতালে বাঙ্গালী ডাজার বৈদ্যনাথ বাবু সর্কেসকর্যা ছিলেন। তাঁহার উপরিন্তন কম্ম্চারী ডাজার ডেলী, এমারসন সাহেবের ন্যায় দয়াবান না হইয়াও অতিশয় ভদ্রলোক ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বালকদের শান্ত আচরণ, প্রফুল্লতা ও বাধ্যতা দেখিয়া অশেষ প্রশংসা করিতেন এবং অল্পন্ম ক্ষেদের সহিত হাসিতামাসা ও অপর আসামীদের সহিত রাজনীতি, ধর্ম্ম ও দর্শনবিষয়ক চর্চা করিতেন। ডাজার সাহেব আইরিশ বংশজাত, সেই উদার ও ভাবপ্রবণ জাতির অনেক গুণ তাঁহার শরীরে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। তাঁহার লেশমাত্র ক্রয়তা ছিল না, এক একবার ক্রোধের বশবন্তী হইয়া রাচ কথা বা কঠোর আচরণ করিতেন কিন্তু প্রায়ই উপকার করাই তাঁহার প্রিয় ছিল। তিনি জেলের কয়েদীদের চাতুরী ও কৃত্রিম রোগ দেখিতে অভান্ত ছিলেন, কিন্তু

এমনও হইত যে প্রকৃত রোগীকেও এই কৃত্রিমতার ভয়ে উপেক্ষা করিতেন, তবে প্রকৃত রোগ বুঝিতে পারিলে অতি যত্ন ও দয়ার সহিত রোগীর ব্যবস্থা করিতেন। আমার একবার সামান্য ছব হয়। তখন বর্ষাকাল, অনেক বাতায়নযুক্ত প্রকাণ্ড দালানে জলসিক্ত মুক্ত বায়ু খেলা করিত, তথাপি আমি হাসপাতালে যাইতে বা ঔষধ খাইতে অনিচ্ছুক ছিলাম। রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার মত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এবং ঔষধ সেবনে আমার আর বড় আস্থা ছিল না, রোগ কঠোর না হইলে প্রকৃতির সাধারণ ক্রিয়াতেই স্বাস্থ্যলাভ হইবে, এই বিশ্বাস ছিল। বর্ষার বাতাস স্পর্ণে যাহা অনিস্ট ইওয়া সম্ভব, তাহা যোগবলে দমন করিয়া নিজের তর্কবৃদ্ধির নিকট আমার যোগশিক্ষাগত ক্রিয়া সকলের যাথার্থ্য ও সফলতা প্রতিপালন করিবার ইচ্ছা ছিল। ভান্তার সাহেব কিন্তু আমার জন্য মহা চিভিত ছিলেন, বড় আগ্রহের সহিত তিনি হাস-পাতালে যাইবার প্রয়োজনীয়তা আমাকে বুঝাইলেন। সেইস্থানে গমন করিলে যতদূর সম্ভব নিজের বাড়ীর মত থাকিবার খাইবার ব্যবস্থা করিয়া আমাকে সাদরে রাখিলেন। পাছে ওয়ার্ডে থাকিলে বর্ষার জন্য আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এইজন্য তাঁহার ইচ্ছা ছিল আমাকে অনেকদিন এই সুখে রাখেন। কিন্তু আমি জোর করিয়া ওয়ার্ভে ফিরিয়া গেলাম, আর হাসপাতালে থাকিতে অসম্মত হইলাম। তাঁহার সকলের উপর সমান অনুগ্রহ ছিল না, বিশেষতঃ যাঁহারা পুল্টশরীর ও বলবান ছিলেন, তাঁহাদের রোগ হইলেও হাসপাতালে রাখিতে ভয় করিতেন। তাঁহার এই ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে যদি জেলে কোনও কাও হয় তাহা সবল ও চঞ্চল বালকদের দ্বারা হইবে। শেশ্বে ঠিক ইহার বিপরীত ফল হইল, হাসপাতালে যে কাণ্ড ঘটিল, তাহা ব্যাধিগ্ৰস্ত, বিশীৰ্ণ, গুচ্চকায় সত্যেন্দ্ৰ নাথ বসু এবং রোগক্লিষ্ট ধীরপ্রকৃতি অল্লভাষী কানাইলাল ঘটাইলেন। ডাক্তার ডেলীর এই সকল গুণ থাকিলেও বৈদানাথ বাবুই তাঁহার অধিকাংশ স্ৎকার্য্যের প্রবর্ত্তক ও প্রেরণাদায়ক ছিলেন। বাস্তবিক বৈদ্যনাথ বাবুর ন্যায় হৃদয়বান লোক আমি আগেও দেখি নাই, পরেও দেখিবার আশা করি না, তিনি যেন দয়া ও উপকার করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কোনও দুঃখ কাহিনী অবগত হওয়া এবং তাহা লাঘৰ করিবার জন্য ধাবিত হওয়া **তাঁ**হার চরিত্রে যেন স্বাভাবিক কারণ ও অবশ্যভাবী কার্য্য হইয়াছিল। তিনি এই যন্ত্রণাপূর্ণ দুঃখালয়ে যেন নরকের প্রাণী সকলকে স্থর্গের সমত্র সঞ্চিত নন্দন-বারি বিতরণ করিতেন। কোনও অভাব, অন্যায় বা অনুর্থক কল্ট অপনোদন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল তাহা ডাক্তার বাবুর কর্ণে পৌ**ছা**ইয়া দেওয়া। তাহা অপনোদন করা তাঁহার ক্ষমতার ভিতরে থাকিলে তিনি সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে ছাড়িতেন না। বৈদ্যনাথ বাবু হাদয়ে গভীর দেশভক্তি পোষণ করিতেন কিন্ত সরকারী চাকর বলিয়া প্রাণের সেই ভাবকে চরিতার্থ করিতে অক্ষম ছিলেন। তাঁহার একমাত্র দোষ অতিরিক্ত সহানুভূতি। কিন্তু সেই ভাব জেলের কর্ম্ম-চারীর পক্ষে দোষ হইলেও উচ্চ নীতির অনুসারে মনুখ্যত্বের চরম বিকাশ এবং

অন্যায় ভাবে কম্মচ্যুত করেন।

২৭৬

ভগবানের প্রিয়তম গুণ বলা যায়। সাধারণ কয়েদী ও "বন্দেমাতরং" কয়েদীতে তাঁহার পক্ষে কোনও ভেদ ছিল না, পীড়িত দেখিলে সকলকেই যত্ন করিয়া হাসপাতালে রাখিতেন এবং সম্পূর্ণ শারীরিক স্বাস্থালাভ না হওয়া পর্যান্ত ছাড়িতে ইচ্ছা করিতেন না। এই দোষই তাঁহার পদচুতির প্রকৃত কারণ। গোঁসাইয়ের হত্যার পরে কর্তৃপক্ষ তাঁহার এই আচরণে সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে

এই সকল কম্মচারীদের দয়া ৩ মনুষ্যোচিত ব্যবহার বর্ণনা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। জেলে আমাদের জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, ইতিপুর্বের তাহার আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি এবং ইহার পরেও রটিশ জেলপ্রণালীর আমানুষিক নিষ্ঠুরতা প্রতিপন্ন করিবার চেল্টা করিব। পাছে কোনও পাঠক এই নিষ্ঠুরতা কম্মচারীদের চরিত্রের কুফল বলিয়া মনে করেন, সেইজন্য মুখ্য কম্মচারীদের গুণ বর্ণনা করিলাম। কারাবাসের প্রথম অবস্থার বিবরণে তাঁহাদের এই সকল গুণের আরও প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

নির্জন কারাবাসে প্রথম দিনের মনের ভাব বর্ণনা করিয়াছি। এই নির্জন কারাবাসে কাল্যাপনের উপায় স্বরূপ পুস্তক বা অন্য কোন বস্তু ব্যতীত কয়েকদিন থাকিতে হইয়াছিল। পরে এমারসন সাহেব আসিয়া আমাকে বাড়ী হইতে ধূতি জামা∙ও পড়িবার বই আনাইবার অনুমতি দিয়া যান । আমি কম্মচারীদের নিকট কালি কলম ও জেলের ছাপান চিঠির কাগজ আনাইয়া আমার পূজনীয় মেসোমহাশয় সঞ্জীবনীর সূপ্রসিদ্ধ সম্পাদককে ধুতি জায়া এবং পড়িবার বইর মধ্যে গীতা ও উপনিষদ পাঠাইতে অনুরোধ করিলাম। এই পুস্তকদ্বয় আমার হাতে পৌছিতে দুই চারি দিন লাগে। তাহার পূর্কো নিজ্জন কারাবাসের মহত্ব বুঝিবার যথেল্ট অবসর পাইয়াছিলাম। কেন এইরূপ কারাবাসে দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিরও ধ্বংস হয় এবং তাহা অচিরে উন্মাদ অবস্থা প্রাপত হয়, তাহাও বুঝিতে পারিলাম এবং সেই অবস্থায়ই ভগ-বানের অসীম দয়া এবং তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইবার কি দুর্লভ সুবিধা হয় তাহাও হাদয়ঙ্গম হইল। কারাবাসের পূর্বের আমার সকালে এক ঘন্টা ও সক্র্যাবেলায় এক ঘন্টা ধ্যান করিবার অভ্যাস ছিল। এই নির্জন কারাবাসে আর কোনও কার্য্য না থাকায় অধিককাল ধ্যানে থাকিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মানুষের সহস্ত-পথ-ধাবিত চঞ্চল মনকে ধ্যানাথে অনেকটা সংযত ও এক লক্ষ্যগত রাখা অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে সহজ নয়। কোনও মতে দেড়ঘণ্টা দুইঘণ্টা একভাবে রাখিতে পারিতাম, শেষে মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, দেহও অবসন্ন হইয়া পড়িত। প্রথম নানা চিন্তা লইয়া থাকিতাম। তাহার পরে সেই মানুষের আলাপ-রহিত চিন্তার বিষয়শূন্য অসহনীয় অকমর্মণ্যতায় মন ধীরে ধীরে চিন্তা শক্তি রহিত হইতে লাগিল। এমন অবস্থা হইতে লাগিল যেন সহস্র অস্পত্ট চিন্তা মনের দ্বার সকলের চারিদিকে ঘুরিতেছে অথচ প্রবেশ পথ নিরুদ্ধ, দুয়েকটি প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াও সেই নিস্তব্ধ মনোরাজ্যের

নীরবতায় ভীত হইয়া নিঃশব্দে পলায়ন করিতেছে। এই অনিশ্চিত অবশ অবস্থায় অতিশয় মানসিক কম্ট পাইতে লাগিলাম। প্রকৃতির শোভায় চিত্ত-র্তি স্লি॰ধ হইবার এবং তপত মন সাস্তুনা পাইবার আশায় বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু সেই একমাত্র রক্ষ, নীল আকাশের পরিমিত খণ্ডটুকু এবং সেই জেলের নিরানন্দ দৃশো কতক্ষণ মানুষের এই অবস্থাপ্রাণত মন সাভুনা লাভ করিতে পারে? দেওয়ালের দিকে চাহিলাম। জেলের ঘরের সেই নিজীব সাদা দেওয়াল দশ্নে যেন মন আরও নিরুপায় হইয়া কেবল বদ্ধাবস্থার যন্ত্রণাই উপলব্ধি করিয়া মস্তিফ পিঞ্জরে ছটফট করিতে লাগিল। আবার ধ্যানে বসিলাম, ধ্যান কিছুতেই হইল না বরং সেই তীব্র বিফল চেপ্টায় মন আরও শ্রান্ত, অকম্মণ্য ও দৃংধ হইতে লাগিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, শেষে মাটিতে কয়েকটি বড বড কাল পিপীলিকা গর্ডের নিকট বেডাইতেছে দেখিলাম. তাহাদের গতিবিধি ও চেল্টা চরিত্র নিরীক্ষণ করিতে সময় কাটিয়া গেল। তাহার পরে দেখিলাম ক্ষদ্র ক্ষদ্র লাল পিপীলিকা বেড়াইতেছে। কালতে লালেতে বড় ঝগড়া, কালগুলি লালকে পাইয়া দংশন করিতে করিতে প্রাণবধ করিতে লাগিল। অত্যাচার পীড়িত লাল পিপীলিকার উপর বড় দয়া ও সহানুভূতি হইল। আমি কালঙলিকে তাড়াইয়া তাহাদের বাঁচাইতে লাগিলাম। ইহাতে একটি কার্য্য জুটিল, চিন্তার বিষয়ও পাওয়া গেল, পিপীলিকাগুলির সাহায্যে এই কয়েকদিন কাটান গেল। তথাপি দীর্ঘ দিনার্দ্ধ যাপন করিবার উপায় আর জুটিতেছিল না। মনকে ব্ঝাইয়া দিলাম, জোর করিয়া চিন্তা আনিলাম, কিন্তু দিন দিন মন বিদ্রোহী হইতে লাগিল, হাহাকার করিতে লাগিল। কাল যেন তাহার উপর অসহ্য ভার হইয়া পীডন করিতেছে, সেই চাপে চূর্ণ হইয়া সে হাঁপ ছাড়িবার শক্তিও পাইতেছে না, যেন স্বপ্নে শকুদারা আক্রান্ত <mark>ব্যক্তি গলাপীড়নে মরিয়া যাইতেছে অথচ হাত পা</mark> থাকিয়াও নড়িবার শক্তি রহিত। আমি এই অবস্থা দেখেয়া আশ্চর্য্য হইলাম! সত্য বটে, আমি কখন অকম্মণ্য নিশেচ্ট হইয়া থাকিতে ভালবাসি নাই, তবে কতবার একাকী থাকিয়া চিভায় কাল্যাপন করিয়াছি, এক্ষণে এতই কি মনের দুর্বলতা হইয়াছে যে অল্পদিনের নির্জ্জনতায় এত আকুল হইয়া পড়িতেছি? ভাবিতে লাগিলাম, হয়ত সেই স্বেচ্ছাপ্রাণ্ড নির্জেনতা ও এই পরেচ্ছাপ্রাণ্ড নির্জেন্ডায় অনেক প্রভেদ আছে। বাড়ীতে বসিয়া একাকী থাকা এক কথা, আর পরের ইচ্ছায় কারাগৃহে এই নিজ্জনবাস স্বতন্ত কথা। সেখানে যখন ইচ্ছা হয় মানুষের আশ্রয় লইতে পারি, পুস্তকগত জ্ঞান ও ভাষা লালিত্যে, বন্ধু-বান্ধবের প্রিয় সভাষণে, রাস্তার কোলাহলে, জগতের বিবিধ দৃশ্যে মনের তৃথিত সাধন করিয়া প্রাণকে শীতল করিতে পারি ৷ কিন্তু এখানে কঠিন নিয়মে আবদ্ধ হইয়া পরের ইচ্ছায় সর্বসংস্তব রহিত হইয়া থাকিতে হইবে। কথা আছে, যে নিজ্জনতা সহ্য করিতে পারে, সে হয় দেবতা নয় পশু, এই সংযম মানুষের সাধ্যাতীত। সেই কথায় আমি আগে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতাম না, এখন বুঝিলাম

সত্য সত্যই যোগাভ্যস্ত সাধকেরও এই সংযম সহজসাধ্য নয়। ইতালীর রাজহত্যাকারী ব্রেশীর ভীষণ পরিণাম মনে পড়িল। তাঁহার নিষ্ঠুর বিচারকগণ তাঁহাকে প্রাণে না মারিয়া সপত বৎসরের নির্জন কারাবাসে দণ্ডিত করিয়া-ছিলেন। এক বৎসরও অতিবাহিত না হইতেই ব্রেশী উন্মাদাবস্থা প্রাণত হইয়াছিলেন। তবে এতদিন সহ্য করিলেন ত! আমার মনের দৃঢ়তা কি এতই কম? তখন বুঝিতে পারি নাই যে ভগবান আমার সহিত খেলা করিতেছেন, ক্রীড়াচ্ছলে আমাকে কয়েকটী প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতেছেন। প্রথমতঃ, কিরুপ মনের গতিতে নির্জন কারাবাসের কয়েদী উন্মন্ততার দিকে ধাবিত হয়, তিনি তাহা দেখাইয়া এইরূপ কারাবাসের অমানুষিক নিছুরতা বুঝাইয়া আমাকে য়ুরোপীয় জেলপ্রণালীর ঘোর বিরোধী করিলেন, এবং যাহাতে আমার সাধ্যমত আমি দেশের লোককে ও জগৎকে এই বর্করতা হইতে ফিরাইয়া দয়ানুমোদিত জেলপ্রণালীর পক্ষপাতী করিবার চেল্টা করি তিনি সেই শিক্ষা আমাকে দিলেন। মনে পড়ে, আমি পনের বৎসর আগে বিলাত হইতে দেশে আসিয়া যখন বোম্বাই হইতে প্রকাশিত ইন্দুপ্রকাশ প্রিকায় কংগ্রেসের নিবেদন-নীতির তীব্র প্রতিবাদপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলাম, তখন স্বর্গগত মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে যুবকদের মনে এই প্রবন্ধ-গুলির ফল হইতেছে দেখিয়া তাহা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইবামাত্র আমাকে আধঘন্টা পর্য্যন্ত এই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের কোনও কার্য্যভার গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। তিনি আমার উপর জেলপ্রণালী সংশোধনের ভার দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। রাণাডের এই অপ্রত্যাশিত উক্তিতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত ও অসম্ভপ্ট হইয়াছিলাম, এবং সেই ভার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম ৷ তখন জানিতাম না যে ইহা সৃ্দৃর ভবিষ্যতের পূর্বোভাস মাত্র এবং একদিন স্বয়ং ভগবান আমাকে জেলে একবৎসর কাল রাখিয়া সেই প্রণালীর ক্রুরতা ও ব্যর্থতা এবং সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবেন। এক্ষণে বুঝিলাম অদ্যকার রাজনৈতিক অবস্থায় এই জেলপ্রণালীর সংশোধনের সম্ভাবনা নাই, তবে স্ব-অধিকার প্রাণ্ড ভারতে যাহাতে বিদেশী সভ্যতার এই নারকীয় অংশ গৃহীত না হয়, তাহা প্রচার করিতে ও তৎসম্বন্ধে যুক্তি দেখাইতে জেলে বসিয়া আমার অভরাঝার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। ভগবানের দিতীয় অভিসন্ধি বুঝিলাম, আমার মনের এই দুব্বলতা মনের সম্মুখে তুলিয়া তাহা চিরকালের জন্য বিনাশ করা। যে যোগাবস্থা-প্রার্থী তাহার পক্ষে জনতা ও নির্জ্জনতা সমান হওয়া উচিত। বাস্তবিক অতি অল্পদিনের মধ্যে এই দুর্ব্বলতা ঘূচিয়া গেল, এখন বোধ হয় বিশ বৎসর একাকী থাকিলেও মন টলিবে না। মঙ্গলময় অমঙ্গল দারাও পরম মঙ্গল ঘটান। তৃতীয় অভিসন্ধি, আমাকে এই শিক্ষা দেওয়া যে আমার যোগাভ্যাস স্বচেষ্টায় কিছু হইবে না, শ্রদ্ধা ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই সিদ্ধিলাডের পন্থা, ভগবান স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া যে শক্তি সিদ্ধি বা আনন্দ দিবেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া তাঁহার কার্য্যে লাগান আমার যোগলিপ্সার একমার উদ্দেশ্য। যে-দিন হইতে অঞ্জানের প্রগাঢ় অন্ধকার লঘীভূত হইতে লাগিল, সে-দিন হইতে আমি জগতের ঘটনা-সকল নিরীক্ষণ করিতে করিতে মঙ্গলময় শ্রীহরির আশ্চর্যা অনন্ত মঙ্গল স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতেছি। এমন ঘটনা নাই,—সেই ঘটনা মহান্ হৌক বা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম হৌক,—যাহার দ্বারা কোনও মঙ্গল সম্পাদিত হয় না। প্রায়ই তিনি এক কার্য্য দ্বারা দুই চারি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। আমরা জগতে অনেকবার অন্ধশক্তির খেলা দেখি, অপব্যয়ই প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া ভগবানের সর্বজ্ঞতাকে অস্বীকার করিয়া ঐশ্বরিক বৃদ্ধির দোষ দিই। সে অভিযোগ অমূলক। ঐশী শক্তি কখনও অন্ধ ভাবে কার্য্য করেন না, তাঁহার শক্তির বিন্দুমার অপব্যয় হইতে পারে না, বরং তিনি এমন সংযত ভাবে অল্প ব্যয়ে বহু ফল উৎপাদন করেন যে তাহা মান্যের কল্পনার অতীত।

এইরাপ ভাবে মনের নিশ্চেষ্টতায় পীড়িত হইয়া কয়েক দিন কম্টে কাল-যাপন করিলাম। একদিন অপরাহেশ আমি চিভা করিতেছিলাম, চিভা আসিতেই লাগিল, হঠাৎ সেই চিন্তা সকল এমন অসংযত ও অসংলগ্ন হইতে লাগিল যে বুঝিতে পারিলাম চিভার উপর বুদ্ধির নিগ্রহশক্তি লুপ্ত হইতে চলিল। তাহার পরে যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন মনে পড়িল যে বুদ্ধির নিগ্রহ শজিং লুপ্ত হইলেও বুদ্ধি স্বয়ংলুপ্ত বা এক মুহূর্ভ দ্রুস্ট হয় নাই, বরং শাভভাবে মনের এই অপূর্ব্ব ক্রিয়া যেন নিরীক্ষণ করিতেছিল। কিন্তু তখন আমি উন্মত্তা ভয়ে ক্রন্ত হইয়া ইহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। প্রাণপণে ভগবানকে ডাকিলাম, আমার বুদ্ধিভ্রংশ নিবারণ করিতে বলিলাম। সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত অভঃকরণে হঠাৎ এমন শীতলতা ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, উভপ্ত মন এমন স্থিগ্ধ, প্রসন্ন ও পরম সুখী হইল যে পূর্বে এই জীবনে এমন সুখময় অবস্থা অনুভব করিতে পারি নাই। শিশু মাতৃক্রোড়ে যেমন আশ্বস্ত ও নিভীক হইয়া গুইয়া থাকে আমিও যেন বিশ্বজননীর ক্রোড়ে সেইরূপ শুইয়া রহিলাম। এই দিনেই আমার কারাবাসের কণ্ট ঘুচিয়া গেল। ইহার পরে কয়েকবার বদ্ধাবস্থার অশান্তি, নিজ্জন কারাবাস ও কম্মহীনতায় মনের অশোয়ান্তি, শারীরিক ক্লেশ বা ব্যাধি, যোগান্তর্গত কাতর অবস্থা ঘটিয়াছে, কিস্ত সে দিনে ভগবান এক মুহূর্তে অভরাত্মায় এমন শক্তি দিলেন যে এই সকল দুঃখ মনে আসিয়া ও মন হইতে চলিয়া যাইবার পরে কোন দাগ বা চিহ্ন রাখিতে পারিত না, দুঃখের মধ্যেই বল ও আনন্দ উপভোগ করিয়া বুদ্ধি মনের দুঃখকে প্রত্যাখ্যান করিতে সক্ষম হইত। সেই দুঃখ পদাপত্তে জলবিন্দুবৎ বোধ হইত। তাহার পরে যখন পুস্তক আসিল, তখন তাহার প্রয়োজনীয়তা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। বই না আসিলেও আমি থাকিতে পারিতাম। যদিও আমার আন্তরিক জীবনের ইতিহাস লেখা এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য নয়, তথাপি এই ঘটনা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পরে দীর্ঘকাল নির্জন কারাবাসে কেমন করিয়া আনন্দে থাকা সম্ভব হইল, তাহা এই ঘটনা হইতেই বোঝা যাইবে । ২৮০ শ্রীজরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

এই কারণেই ভগবান সেই অবস্থা ঘটাইয়াছিলেন। তিনি উন্মত্তা না ঘটাইয়া নিজ্জন কারাবাসে উন্মত্তার ক্রমবিকাশের প্রণালী আমার মনের মধ্যে অভিনয় করাইয়া বুদ্ধিকে সেই নাটকের অবিচলিত দুর্শকরূপে বসাইয়া রাখিলেন। তাহাতে আমি শক্তি পাইলাম, মানুষের নিষ্ঠুরতায় অত্যাচার-পীড়িত বাজিদের উপর দয়া ও সহানুভূতি বাড়িল এবং প্রার্থনার অসাধারণ শক্তি ও সফলতা হাদয়ঙ্গম করিলাম।

আমার নিজ্জন কারাবাসের সময় ডাজার ডেলী ও সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব প্রায় রোজ আমার ঘরে আসিয়া দুই চারিটি গল্প করিয়া যাইতেন। জানি না কেন, আমি প্রথম হইতে তাঁহাদের বিশেষ অনুগ্রহ ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারিয়াছিলাম। আমি উহাদের সহিত বিশেষ কোন কথা কহিতাম না, তাঁহারা যাহা জিঞাসা করিতেন, তাহার উত্তর দিতাম। যে বিষয় উত্থাপন করিতেন, তাহা হয় নীরবে ভূনিতাম, না হয় দু' একটা সামান্য কথা মালু বলিয়া ক্ষান্ত হইতাম। তথাপি তাঁহারা আমার নিকট আসিতে ছাড়িতেন না। একদিন ডেলী সাহেব আমাকে বলিলেন, আমি সহকারী সুপারিশ্টেণ্ডেণ্টকে বলিয়া বড় সাহেবকে সঁশ্মত করাইতে পারিয়াছি যে তুমি প্রত্যহ সকালে ও বিকালে ডিক্রীর সামনে বেড়াইতে পারিবে। তুমি যে সমস্ত দিন এক ক্ষুদ্র কুঠ্রীতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে, ইহা আমার ভাল লাগে না, ইহাতে মন খারাপ হয় এবং শরীরও খারাপ হয়। সেই দিন হইতে আমি সকালে বিকালে ডিক্রীর সম্মুখে খোলা জায়গায় বেড়াইতাম। বিকালে দশ মিনিট, পনর মিনিট, কুড়ি মিনিট বেড়াইতাম, কিন্তু সকালে এক ঘন্টা, এক একদিন দুই ঘন্টা পর্য্যন্ত বাহিরে থাকিতাম, সময়ের কোনও নিয়ম ছিল না। এই সময় বড় ভাল লাগিত। একদিকে জেলের কারখানা, অপরদিকে গোয়াল ঘর---আমার স্বাধীন রাজ্যের এই দুই সীমা ছিল। কারখানা হইতে গোয়াল ঘর, গোয়াল ঘর হইতে কারখানা, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে হয় উপনিষদের গভীর ভাবোদীপক অক্ষয় শজিদায়ক মন্ত সকল আহুতি করিতাম, না হয় কয়েদীদের কার্য্যকলাপ ও যাতায়াত লক্ষ্য করিয়া সর্ক্যটে নারায়ণ এই মূল সত্য উপলবিধ করিবার চেষ্টা করিতাম। রক্ষে, গৃহে, প্রাচীরে, মনুষ্যে, পশুতে, পক্ষীতে, ধাতুতে, মৃত্তিকায় সর্কং খলিবদং ব্রহ্ম মনে মনে এই মন্ত্রোচারণ-পূর্কক সর্ক-ভূতে সেই উপলব্ধি আরোপ করিতাম। এইরাপ করিতে করিতে এমন ভাব হইয়া যাইত যে, কারাগার আর কারাগারই বোধ হইত না। সেই উচ্চ প্রাচীর, সেই লোহার গরাদ, সেই সাদা দেওয়াল, সেই সূর্য্যরশ্মিদীপত নীলপ্রশোভিত রক্ষ, সেই সামান্য জিনিসপূর যেন আর অচেতন নহে, যেন সক্রোগী চৈতন্যপূর্ণ হইয়া সজীব হইয়াছে, তাহারা আমাকে ভালবাসে, আমাকে আলিখন করিতে চায় এইরাপ বোধ হইত। মনুষ্য, গাভী, পিপীলিকা, বিহঙ্গ চলিতেছে, উড়িতেছে,

গাহিতেছে, কথা বলিতেছে, অথচ সবই প্রকৃতির ক্রীড়া; ভিতরে এক মহান্ নিম্মল নিলিপ্ত আত্মা শান্তিময় আনন্দে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। এক এক-বার এমন বোধ হইত যেন ভগবান সেই রক্ষতলে আনন্দের বংশী বাজাইতে দাঁড়াইয়াছেন; এবং সেই মাধুর্য্যে আমার হাদয় টানিয়া বাহির করিতেছেন। সর্বদা বোধ হইতে লাগিল, যেন কে আমাকে আলিসন করিতেছে, কে আমাকে কোলে করিয়া রহিয়াছে। এই ভাববিকাশে আমার সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করিয়া কি এক নিম্মল মহতী শাভি বিরাজ করিতে লাগিল, তাহার বর্ণনা করা যায় না। প্রাণের কঠিন আবরণ খুলিয়া গেল এবং সবর্বজীবের উপর প্রেমের স্রোত বহিতে থাকিল। প্রেমের সহিত দয়া, করুণা, অহিংসা ইত্যাদি সাত্ত্বিক ভাব আমার রজঃপ্রধান স্বভাবকে অভিভূত করিয়া বিশেষ বিকাশ লাভ করিতে লাগিল। আর যতই বিকাশ পাইতে লাগিল, ততই আনন্দ রুদ্ধি হইল এবং নিম্মল শান্তিভাব গভীর হইল। মোকদ্মার দুশ্ভিরা প্রথম হইতে দূর হুইয়া গিয়াছিল, এখন বিপরীত ভাব মনে স্থান পাইল। ভগবান মঙ্গলময়, আমার মঙ্গলের জন্যই আমাকে কারাগৃহে আনিয়াছেন, নিশ্চয় কারামুজি ও অভিযোগখণ্ডন হইবে, এই দঢ় বিশ্বাস হইয়া গেল। ইহার পরে অনেক দিন আমার জেলের কোনও কল্টভোগ করিতে হয় নাই।

এই অবস্থা ঘনীভূত হইতে কয়েক দিন লাগিল, তাহারই মধ্যে ম্যাজিণ্টেটের আদালতে মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। নির্জন কারাবাসের নীরবতা হইতে হঠাৎ বহিজ্পতের কোলাহলের মধ্যে আনীত হইয়া প্রথম মন বড় বিচলিত হইল, সাধনার ধৈর্য্যভঙ্গ হইল এবং সেই পাঁচ ঘূল্টাকাল মোকদ্মমার নীরস ও বির্জির কথা শুনিতে মন কিছুতে সম্মত হইল না। প্রথম আদালতে বসিয়া সাধনা করিতে চেম্টা করিতাম, কিন্তু অনভ্যস্ত মন প্রত্যেক শব্দ ও দৃশ্যের দিকে আকৃষ্ট হইত, গোলের মধ্যে সেই চেল্টা ব্যূর্থ হইত, পরে ভাবের পরিবর্তন হয়, এবং সমীপবতী শব্দ দৃশ্য মনের বহিভ্ত করিয়া সমস্ত চিভাশক্তি অভুম্খী করিবার শক্তি জন্মাইয়াছিল, কিন্তু মোকদ্দমার প্রথম অবস্থায় তাহা ঘটে নাই, তখন ধ্যানধারণার প্রকৃত ক্ষমতা ছিল না। সেই কারণে এই রুথা চেল্টা পরিত্যাগ করিয়া মধ্যে মধ্যে সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করিয়া সম্ভুত্ট থাকিতাম, অবশিত্ট সময় বিপদকালের সঙ্গীদের কথা ও তাহাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতাম, অন্য চিন্তা করিতাম, অথবা কখনও নটন সাহেবের শ্রবণ-যোগ্য কথা বা সাক্ষীর সাক্ষ্যও শুনিতাম । দেখিতাম নিজ্জন কারাগৃহে যেমন সময় কাটান সহজ ও সুখকর হইয়া উঠিয়াছে, জনতার মধ্যে এবং সেই গুরুতর মোকদমার জীবন মরণের খেলার মধ্যে সময় কাটান তেমন সহজ নয়। অভিযুক্ত বালকদের হাসি তামাসা ও আমোদ-প্রমোদ শুনিতে ও দেখিতে বড় ভাল লাগিত, নচেৎ আদালতের সময় কেবলই বির্জিকর বোধ হইত। সাড়ে চার্টা বাজিলে সানন্দে কয়েদীদের গাড়ীতে উঠিয়া জেলে যাইতাম।

পনর যোল দিনের বন্দী অবস্থার পরে স্থাধীন মনুষ্য-জীবনের সংসর্গ ও

পরস্পরের মুখ দর্শনে অন্যান্য কয়েদীদের অতিশয় আনন্দ হইয়াছিল। গাড়ীতে উঠিয়াই তাহাদের হাসি ও কথার ফোয়ারা খুলিয়া যাইত এবং যে দশ মিনিটকাল তাহাদিগকে গাড়ীতে থাকিতে হইত, তাহার এক মুহুর্ভও সেই স্রোত থামিত না। প্রথম দিন আমাদের খুব সম্মানের সহিত আদালতে লইয়া যায়। আমাদের সঙ্গেই য়ুরোপীয়ান সার্জেন্টের ক্ষুদ্র প্লটন এবং তাহাদের নিকট আবার গুলিভরা পিস্তল ছিল। গাড়ীতে উঠিবার সময় এক-দল সশস্ত পুলিশ আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকিত এবং গাড়ীর পশ্চাতে কুচ-কাওয়াজ করিত, নামিবার সময়ও তদূপ আয়োজন ছিল। এই সাজসজা দেখিয়া কোন কোন অনভিজ দশক নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন যে, এই হাসাপ্রিয়া অল্পবয়স্ক বালকগণ না জানি কি দুঃসাহসিক বিখ্যাত মহাযোদ্ধার দল। না জানি তাহাদের প্রাণে ও শরীরে কত সাহস ও বল যে খালি হাতে শত পুলিস ও গোরার দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া পলায়ন করিতেও সক্ষম। সেইজন্য বোধ হয় অতি সম্মানের সহিত তাহাদিগকে এইরূপে লইয়া গেল। কয়েক দিন এইরূপ ঠাট চলিল, তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাহা ক্মিতে লাগিল, শেষে দুই চারিজন সাজ্জেন্ট আমাদের লইয়া যাইত ও লইয়া আসিত। নামিবার সময় তাহারা বড় দেখিত না, আমরা কি ভাবে জেলে ঢুকি; আমরা যেন স্বাধীন ভাবে বেড়াইয়া বাড়ীতৈ ফিরিয়া আসিতেছি, সেইরাপে জেলে চুকিতাম। এইরাপ অয়ত্র ও শিথিলতা দেখিয়া পুলিস কমিশনার সাহেব ও কয়েকজন সুপারিন্টেভেন্ট চটিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রথম দিন পঁচিশ ত্রিশজন সাজ্জেন্টের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, আজকাল দেখিতেছি, চার পাঁচজনও আসে না।" তাঁহারা সাজ্জেন্টদের তির্ভার করিতেন এবং রক্ষণাবেক্ষণের কঠোর ব্যবস্থা করিতেন, তাহার পর দুদিন হয় ত আর দুইজন সার্জেন্ট আসিত, তাহার পর পুকোঁকার শিথিলতা আবার আরম্ভ হইত! সাজেঁন্টগণ দেখিলেন যে, এই বোমার ভক্তগণ বড় নিরীহ শাভ লোক, তাহাদের পলায়নের কোন উদ্যোগ নাই, কাহাকেও আক্রমণ করিবার বা হত্যা করিবার মৎলবও নাই, তাঁহারা ভাবিলেন, আমরা কেন অমূল্য সময় এই বির্ক্তিকর কার্য্যে নদ্ট করি । প্রথমে আদালতে ঢুকিবার ও বাহির হইবার সময় আমাদিগকে তল্লাস করিত, তাহাতে সাজ্জেন্টদের কোমল করম্পর্শ সুখ অনুভব করিতাম, ইহা ভিন্ন এই তলাসে কাহারও লাভ বা ক্ষতির সভাবনা ছিল না। বেশ বোঝা গেলে যে, এই তল্পাসের প্রয়োজনীয়তায় আমাদের রক্ষকদের গভীর অনাস্থা ছিল। দুই চারিদিন পরে ইহাও বন্ধ হইল। আমরা নিবিবয়ে বই, রুটি, চিনি যাহা ইচ্ছা আদালতের ভিতরে লইয়া যাইতাম। প্রথম লুকাইয়া, তাহার পরে প্রকাশ্য ভাবে লইয়া যাইতাম। আমরা বোমা বা পিন্তল ছুঁড়িতে যাইব না, সেই বিশ্বাস তাঁহাদের শীঘ্র দূর হইল। কিন্তু দেখিলাম একমাত্র ভয় সাজ্জেণ্টদের মন হইতে বিদূরিত হয় নাই। কে জানে কাহার মনে কবে ম্যাজিন্ট্রেট সাহেবের মহিমান্বিত মস্তকে পাদুকা নিক্ষেপ করিবার বদ মৎলব ঢুকিবে, তাহা হইলেই

সর্বনাশ। সেই জন্য জুতা লইয়া ভিতরে যাইবার সবিশেষে নিষেধ ছিল এবং সেই বিষয়ে সার্জেন্টগণ সর্বাদা সতর্ক ছিলেন। আর কোনরূপ সাবধানতার প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য দেখি নাই।

মোকদমার স্থারপ একটু বিচিত্র ছিল। ম্যাজিন্ট্রেট, কৌন্সিলী, সান্ধ্রী, সান্ধ্রী, Exhibits, আসামী, সকলই বিচিত্র। দিন দিন সেই সান্ধ্রীও Exhibits –এর অবিরাম স্রোত, সেই কৌন্সিলীর নাটকোচিত অভিনয়, সেই বালক-শভাব ম্যাজিন্ট্রেটের বালকোচিত চপলতা ও লঘুতা, সেই অপূর্বভাব দেখিতে দেখিতে অনেকবার এই কল্পনা মনে উদয় হইত যে আমরা রিটিশ বিচারালয়ে না বসিয়া কোন নাটগৃহের রঙ্গমঞ্চে বা কোনো কল্পনাপূর্ণ ঔপন্যাসিক রাজ্যে বসিয়া আছি। এক্ষণে সেই রাজ্যের বিচিত্র জীবসকলের সংক্ষিপত বর্ণনা করিতেছি।

এই নাটকের প্রধান অভিনেতা সরকার বাহাদুরের কৌন্সিলী নর্টন সাহেব ছিলেন। তিনি প্রধান অভিনেতা কেন, এই নাটকের রচয়িতা, সূত্রধর (Stage manager) এবং সাক্ষীর স্মারক (prompter) ছিলেন,—এমন বৈচিত্র্যময় প্রতিভা জগতে বিরল। কৌন্সিলী নটন মাদ্রাজী সাহেব, সেইজন্য বোধ হয় বঙ্গদেশীয় ব্যারিপটার মণ্ডলীর প্রচলিত নীতি ও ভদ্রতায় অনভাস্ত ও অনভিজ। তিনি এক সময় জাতীয় মহাসভার একজন নেতা ছিলেন, সেইজন্য বোধ হয় বিরুদ্ধাচরণ বা প্রতিবাদ সহ্য করিতে অক্ষম এবং বিরুদ্ধাচারীকে শাসন করিতে অভাস্ত। এইরূপ প্রকৃতিকে লোকে হিংস্রস্বভাব বলে। নর্টন সাহেব কখন মাদ্রাজ কর্পোরেশনের সিংহ ছিলেন কি না, বলিতে পারি না, তবে আলিপুর কোর্টের সিংহ ছিলেন বটে। তাঁহার আইন অভিজ্তার গভীরতায় মুগ্ধ হওয়া কঠিন—সে যেন গ্রীসমকালের শীত। কিন্তু বজুতার অনর্গল স্রোতে, কথার পারিপাট্যে, কথার চোটে লঘু সাক্ষ্যকে গুরু করার অভুত ক্ষমতায়, অমূলক বা অল্পমূলক উক্তির দুঃসাহসিকতায়, সাক্ষী ও জুনিয়ার ব্যারিপ্টারের উপর ত্মীতে এবং সাদাকে কালো করিবার মনোমোহিনী শক্তিতে নর্টন সাহেবের অতুলনীয় প্রতিভা দেখিলেই মুগ্ধ হইতে হইত। শ্রেষ্ঠ কৌন্সিলীর মধ্যে তিন শ্রেণী আছে,—-যাঁহারা আইন-পাণ্ডিত্যে এবং যথার্থ ব্যাখ্যায় ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে জজের মনে প্রতীতি জন্মাইতে পারেন, যাঁহারা চতুর ভাবে সাক্ষীর নিকট সত্য কথা বাহির করিয়া ও মোকদমার বিষয়ীভূত ঘটনা ও বিবেচ্য বিষয় দক্ষতার সহিত প্রদর্শন করিয়া জজ বা জুরির মন নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে পারেন এবং যাঁহারা কথার জোরে, বিভীষিকা প্রদর্শনে, বজুতার প্রোতে সাক্ষীকে হতবুদ্ধি করিয়া, মোকদ্মার বিষয়ের দিব্য গোলমাল করিয়া, গলার জোরে জজ বা জুরীর বুদ্ধি স্থানচ্যুত করিয়া মোকদমায় জিতিতে পারেন। নর্টন সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে অগ্রগণ্য। ইহা দোষের কথা নহে। কৌন্সিলী ব্যবসায়ী মানুষ, টাকা নেন, যে টাকা দেয় তাহার অভিপ্সীত উদ্দেশ্য সিদ্ধ

করা তাঁহার কর্ত্ব্য কম্ম। এখন রুটিশ আইন প্রণালী দারা সত্য কথা বাহির করা বাদী প্রতিবাদীর আসল উদ্দেশ্য নহে, কোনও উপায়ে মোকদ্মায় জয় লাভ করাই উদ্দেশ্য। অতএব কৌন্সিলী সেই চেম্ট্য করিবেন, নচেৎ তাঁহাকে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়। ভগবান অন্য খণ না দিয়া থাকিলে যে খণ আছে, ভাহার জোরেই মোকদমায় জিতিতে হইবে, সুতরাং নটন সাহেব স্বধন্ম পালনই করিতেছিলেন। সরকার বাহাদুর তাঁহাকে রোজ হাজার টাকা দিতেন। এই অর্থব্যয় রুথা হইলে সরকার বাহাদুরের ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি যাহাতে না হয় নটন সাহেব প্রাণপণে সেই চেম্টা করিয়াছেন। তবে যে মোকদমা রাজনীতি সংক্রান্ত, তাহাতে বিশেষ উদার ভাবে আসামীকে সুবিধ্য দেওয়া এবং সন্দেহ-জনক বা অনিশ্চিত প্রমাণের উপর জোর না করা রুটিশ আইন পদ্ধতির নিয়ম। নটন সাহেব যদি এই নিয়ম সর্ব্বদা সমর্প করিতেন তবে আমার বোধ হয় না তাঁহার কেসের কোন হানি হইত। অপর দিকে কয়েকজন নির্দোষী লোককে নির্জন কারাবাসের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না এবং নিরীহ অশোক নন্দী প্রাণে বাঁচিতেও পারিতেন। কৌন্সিলী সাহেবের সিংহপ্রকৃতি বোধ হয় এই দোষের মূল। হলিংশেদ হল ও প্রটাক যেমন সেক্সপিয়রের জন্য ঐতিহাসিক নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, পুলিস তেমনি এই মোকদমা নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিল। আমাদের নাটকের সেক্সপিয়র ছিলেন, নর্টন সাহেব। তবে সেক্সপিয়রে নর্টনে এক প্রভেদ দেখিয়াছিলাম। সেক্সপিয়র, সংগৃহীত উপাদানের কয়েক অংশ মাঝে মাঝে ছাড়িয়াও দিতেন, ন্ট্ন সাহেব ভাল মন্দ সত্য মিথ্যা সংলগ্ন অসংলগ্ন অনৌ অনীয়ান্, মহতো মহীয়ান যাহা পাইতেন একটিও ছাড়েন নাই, তাহার উপর স্বয়ং কল্পনাস্কট প্রচুর suggestion, inference, hypothesis যোগাড় করিয়া এমন সুন্দর plot রচনা করিয়াছিলেন যে সেক্সপিয়র, ডেফো ইত্যাদি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও উপন্যাস লেখক এই মহাপ্রভুর নিকট পরাজিত হইলেন। নিপুক বলিতে পারেন যে যেমন ফলস্টাফের হোটেলের হিসাবে এক আনা খাদ্য ও অসংখ্য গ্যালন মদ্যের সমাবেশ ছিল, তেমনই নর্টনের plot-এ এক রতি প্রমাণের সঙ্গে দশমন অনুমান ও suggestion ছিল। কিন্তু নিন্দুকও পারিপাট্য ও রচনা-কৌশল প্রশংসা করিতে বাধ্য ৷ নার্টন সাহেব plot -এর এই নাটকের নায়করূপে আমাকেই পছন্দ করিয়াছিলেন দেখিয়া আমি সমধিক প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম ৷ যেমন মিল্টনের Paradise Lost -এর সয়তান, আমিও তেমনি নটন সাহেবের plot-এর কল্পনাপ্রসূত মহাবিলোহের কেল-স্বরূপ অসাধারণ তীক্ষুবৃদ্ধিসম্পন্ন ক্ষমতাবান ও প্রতাপশালী bold bad man 👍 আমিই জাতীয় আন্দোলনের আদি ও অন্ত, স্রপ্টা, পাতা ও রটিশ 🐇 সামাজ্যের সংহার প্রয়াসী। উৎকৃষ্ট ও তেজস্বী ইংরাজী লেখা দেখিবামাত্র ন্ট্ন লাফাইয়া উঠিতেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন, অরবিন্দ ঘোষ। আন্দোলনের বৈধ অবৈধ যত সুশৃঙ্খলিত অঙ্গ বা অপ্রত্যাশিত ফল সকলই অরবিন্দ ঘোষের

স্থৃতিটু, এবং যখন অরবিন্দের স্থিট তখন বৈধ হইলেও নিশ্চয় অবৈধ অভিসন্ধি অপ্তভাবে তাহার মধ্যে নিহিত। তাঁহার বোধ হয় বিশ্বাস ছিল যে আমি ধরা না পড়িলে বোধ হয় দুই বৎসরের মধ্যে ইংরাজের ভারত সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। আমার নাম কোনও ছেঁড়া কাগজের টুকরায় পাইলে নটন মহা খুসি হইতেন, এবং সাদরে এই পরম মূলাবান প্রমাণ ম্যাজিস্ট্রেটের শ্রীচরণে অর্পণ করিতেন। দুঃখের কথা, আমি অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, নচেৎ আমার প্রতি সেই সময়ের এত ভজি ও অনবরত আমার ধ্যানে নর্টন সাহেব নিশ্চয় তখনই মুজিলাভ করিতেন, তাহা হইলে আমাদের কারাবাসের সময় ও গ্রেণ্মেন্টের অর্থবায় উভয়ই সকুচিত হইত। সেশন্স্ আদালতে আমি নির্দ্দোষী প্রমাণিত হওয়ায় নর্টন কৃত plot -এর শ্রী ও গৌরব বিনষ্ট হয়। বেরসিক বীচক্রফ্ট হ্যামলেট নাটক হইতে হ্যামলেটকে বাদ দিয়া বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্যকে হতন্ত্রী করিয়া গেলেন। সমালোচককে যদি কাব্য পরিবর্তন করিবার অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে এইরূপ দুর্দশা হইবে না কেন? ন্ট্ন সাহেবের আর এক দুঃখ ছিল যে, কয়েক জন সাক্ষীও এইরূপ বেরসিক ছিল যে, তাঁহার রচিত plot -এর অনুযায়ী সাক্ষ্য দিতে তাহারা সম্পূর্ণ অসম্মত হুইয়াছিল। নর্টন সাহেব ইহাতে চটিয়া লাল হুইতেন, সিংহ গর্জনে সাক্ষীর প্রাণ বিকম্পিত করিয়া তাহাকে শাসাইয়া দিতেন। স্বরচিত কথার অন্যথা প্রকাশে কবির এবং স্থদত্ত শিক্ষা-বিরুদ্ধে অভিনেতার আর্ত্তি, স্থর বা অঙ্গ-ভঙ্গীতে নাটকের সূত্রধরের যে ন্যায়সঙ্গত ও অদমনীয় ক্রোধ হয়, নর্টন সাহেবের সেই ক্রোধ হইত। ব্যারিপ্টার ভুবন চাটাজীর সহিত তাঁহার যে সংঘর্ষ হইয়াছিল, এই সাজ্বিক ব্রেগধই তাহার কারণ। চাটার্জী মহাশয়ের ন্যায় এরূপ রসানভিজ লোক ত দেখি নাই। তাঁহার সময় অসময় জান আদবে ছিল না। নর্টন সাহেব যখন সংলগ্ন অসংলগ্নের বিচারকে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল কবিত্বের খাতিরে যে সে প্রমাণ ঢুকাইয়া দিতেছিলেন, তখন চাটার্জী মহাশয় উঠিয়া অসংলগ্ন বা inadmissible বলিয়া আপত্তি করিতেন। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে সংলগ্ন বা আইনসঙ্গত প্রমাণ বলিয়া নয়, নটন কৃত নাটকের উপযোগী হইতে পারে বলিয়া সেই সাক্ষ্যগুলি রুজু হইতেছে। এই অসপত ব্যবহারে নটন কেন, বালি সাহেব পর্যান্ত চটিয়া উঠিতেন। একবার বালি সাহেব চাটার্জী মহাশয়কে করুণ স্বরে বলিয়াছিলেন, 'Mr. Chatterji, we were getting on very nicely before you came' "আপনি যখন আসেন নাই, আমরা নিকিল্লে মোকদ্দমা চালাইতেছিলাম।" তাহা বটে, নাটকের রচনার সময়ে কথায় কথায় আপত্তি তুলিলে নাটকও অগ্রসর হয় না, দর্শকরন্দেরও রসভঙ্গ হয়।

নার্টন সাহেব যদি নাটকের রচয়িতা, প্রধান অভিনেতা ও সূত্রধর হন, ম্যাজিন্ট্রেট বালিকে নাট্যকারের পৃষ্ঠপোষক বা Patron বলিয়া অভিহিত করা যায়। বালি সাহেব বোধ হয়, ক্ষচ জাতির গৌরব। তাঁহার চেহারা

স্কটলণ্ডের সমারক-চিহা। অতি সাদা, অতি লম্বা, অতি রোগা, দীর্ঘ, দেহ-যদিটর উপর ক্ষুদ্র মন্তক দেখিয়া মনে হইত যেন অভ্রভেদী অক্টারলোনী মনুমেন্টের উপর ক্ষুদ্র অক্টারলোনী বসিয়া আছেন, বা ক্লিয়পালার obelisk এর চূড়ায় একটি পাকা নারিকেল বসান রহিয়াছে। তাঁহার চুল ধূলার বর্ণ (sandy haired) এবং স্কটলণ্ডের সমস্ত হিম ও বরফ তাঁহার মুখের ভাবে জমিয়া রহিয়াছে। যাঁহার এত দীর্ঘ দেহ, তাঁহার বুদ্ধিও তদুপ হওয়া চাই, নচেৎ প্রকৃতির মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। কিন্তু এই বিষয়ে বালিস্প্টির সময়ে প্রকৃতি দেবী বোধ হয় একটু অমনোযোগী ও অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন। ইংরাজ কবি মারলো এই মিতব্যয়িতা infinite riches in a little room (ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে অসীম ধন) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বালি দর্শনে কবির বর্ণনার বিপরীত ভাব মনে উদয় হয়, infinite rooms in little riches। বাস্তবিক এই দীর্ঘ দেহে এত অল্প বিদ্যাবৃদ্ধি দেখিয়া দুঃখ হইত এবং এই ধরণের অল্পসংখ্যক শাসনকর্তা দারা ব্লিশ কোটি ভারতবাসী শাসিত হইয়া রহিয়াছে সমরণ করিয়া ইংরাজের মহিমা ও ব্রিটিশ শাসন প্রণালীর উপর প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইত। বালি সাহেবের বিদ্যা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর জেরার সময় প্রকাশ হইয়াছিল। স্বয়ং কবে মোকদমা স্থীয় করকমলে গ্রহণ করিয়াছিলেন বা কি করিয়া মোকদমা গ্রহণ সম্পন্ন হয়, এত বৎসরের ম্যাজিক্ট্রেটগিরির পরে তাহা নির্ণয় করিতে পিয়া বালির মাথা ঘুরিয়া পিয়াছিল, সেই সমস্যার মীমাংসায় অসমর্থ হইয়া চক্রবর্ত্তী সাহেবের উপর সেই ভার দিয়া সাহেব নিল্কৃতি পাইতে সচেল্ট হইয়াছিলেন। এখনও বালি কবে মোকদমা গ্রহণ করিলেন, এই প্রশ্ন মোকদ্দমার অতি জটিল সমস্যার মধ্যে গণ্য। চাটাজী মহাশয়ের নিকট যে করুণ নিবেদনের উল্লেখ করিলাম, তাহাতেও সাহেবের বিচার প্রণালীর কতকটা অনুমান করা যায়। প্রথম হইতে তিনি নর্টন সাহেবের পাণ্ডিত্য ও বাগিমতায় মল্তমুগ্ধবৎ হইয়া তাঁহার বশ হইয়াছিলেন। এমন বিনীত-ভাবে নর্টনের প্রদশিত পথ অনুসরণ করিতেন, নর্টনের মতে মত দিতেন, নটনের হাসিতে হাসিতেন, নটনের রাগে রাগিতেন যে, এই সরল শিশুর আচরণ দেখিয়া মাঝে মাঝে প্রবল শ্লেহ ও বাৎসল্য ভাব মনে আবির্ভৃত হইত। বালি নিতাভ বালকস্বভাব। কখন তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া ভাবিতে পারি নাই, বোধ হইত যেন স্কুলের ছাত্র হঠাৎ স্কুলের শিক্ষক হইয়া শিক্ষকের উচ্চ মঞে আসীন হইয়াছেন। সেই ভাবে তিনি কোর্টের কার্য্য চালাইতেন। কেহ তাঁহার প্রতি অপ্রিয় ব্যবহার করিলে স্কুলের শিক্ষকের ন্যায় শাসন করিতেন। আমাদের মধ্যে যদি কেহ কেহ মোকদ্দমা প্রহসনে বিরক্ত হইয়া প্রস্পরে কথাবার্তা আরম্ভ করিতেন, বালি সাহেব স্কুলমাপ্টারী ধরণে বকিয়া উঠিতেন, না শুনিলে সকলকে দাঁড়াইবার হকুম করিতেন, তাহাও তৎক্ষণাৎ না শুনিলে প্রহরীকে দাঁড় করাইতে বলিতেন। আমরা এই দকুলমাপ্টারী ধরণ প্রতীক্ষা

ক্রিতে এত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম যে যখন বালিতে ও চাটাজী মহাশয়ে ঝগড়া লাগিয়া গিয়াছিল, আমরা তখন প্রতিক্ষণে এই প্রত্যাশায় ছিলাম যে ব্যারিস্টার মহাশয়ের উপর এবার দাঁড়াইবার শাস্তি প্রচারিত হইবে। বালি সাহেব কিন্তু উল্টা উপায় ধরিলেন, চীৎকার করিয়া "Sit down Mr. Chatterji'' বলিয়া আলিপুর স্কুলের এই নবাগত দুরন্ত ছাত্রকে বসাইয়া দিলেন। যেমন এক একজন মাণ্টার, ছাত্র কোন প্রশ্ন করিলে বা পড়ার সময় অতিরিক্ত ব্যাখ্যা চাহিলে, বিরক্ত হইয়া তাহাকে শাসাইয়া দেন, বালিও আসামীর উকিল আপন্তি করিলে বিরক্ত হইয়া তাহাকে শাসাইতেন। কোন কোন সাক্ষী নর্টনকে ব্যতিব্যস্ত করিত। নর্টন বাহির করিতে চাহিতেন যে অমক লেখা অমক আসামীর হস্তাক্ষর, সাক্ষী যদি বলিতেন, না, এ ত ঠিক সেই লেখার মত লেখা নয়, তবে হইতে পারে, বলা যায় না,--অনেক সাক্ষী এইরূপ উত্তর দিতেন, নটন ইহাতে অধীর হইতেন। বকিয়া ঝকিয়া, চেঁচাইয়া শাসাইয়া কোন উপায়ে অভীপিসত উত্তর বাহির করিবার চেপ্টা করিতেন। তাঁহার শেষ প্রশ্ন এই হইত, "What is your belief?" তুমি কি মনে কর, হাঁ কি না। সাক্ষী হাঁ-ও বলিতে পারিতেন না, না-ও বলিতে পারিতেন না, বারবার ঘূরিয়া ফিরিয়া সেই উভরই করিতেন। নর্টনকে বুঝাইবার চেপ্টা করিতেন যে তাঁহার কোনও belief নাই, তিনি সন্দেহে দোলায়মান। কিন্ত নটন সেই উত্তর চাহিতেন না, বারবার মেঘ-গর্জনের রবে সেই সাংঘাতিক প্রশ্নে সাক্ষীর মাথায় বজ্ঞাঘাত পড়িত, "Come, sir, what is your belief?" নটনের রাগে বালি রাগিয়া উপর হইতে গর্জন করিতেন, "টোমার বিসওয়াস কি আছে?" বেচারা সাক্ষী মহা ফাঁপরে পড়িতেন। তাঁহার কোন বিস্ওয়াস নাই, অথচ একদিকে ম্যাজিজুেট, অপর দিকে নটন ক্ষুধিত ব্যাঘের ন্যায় তাঁহার নাড়ী ভুঁড়ি ছিড়িয়া অমূল্য অপ্রাপ্য বিস্ওয়াস বাহির করিতে কৃতোদ্যম হইয়া দুইদিক হইতে ভীষণ গৰ্জন করিতেছেন। প্রায়ই বিস্ওয়াস বাহির হইত না, সাক্ষী ঘশর্মাক্ত কলেবরে ঘূর্ণ্যমান বৃদ্ধিতে তাঁহার যন্ত্রণাস্থান হইতে প্রাণ লইয়া পলাইয়া যাইতেন। এক একজন বিস্ওয়াসের অপেক্ষা প্রাণই প্রিয় জিনিস বলিয়া কুত্রিম বিস্ওয়াস নর্টন সাহেবের চরণকমলে উপহার দিয়া বাঁচিতেন, নর্টনও অতি সম্ভুষ্ট হইয়া বাকী জেরা শ্লেহের সহিত সম্পন্ন করিতেন। এইরূপ কৌন্সিলীর সঙ্গে এইরূপ ম্যাজিণ্ট্রেট জুটিয়াছিলেন বলিয়া মোকদ্দমা আরও নাটকের আকার ধারণ করিয়াছিল।

কয়েকজন সাক্ষী এইরাপ বিরুদ্ধাচরণ করিলেও অধিকাংশই নটন সাহেবের প্রয়ের অনুকূল উত্তর দিতেন। ইহাদের মধ্যে চেনা মুখ অতি অল্পইছিল। এক একজন কিন্তু পরিচিত ছিলেন। দেবদাস করণ মহাশয় আমাদের বিরক্তি দৃর করিয়া খুব হাসাইয়াছিলেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ। এই সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়াছিলেন যে, যখন মেদিনীপুর সম্মিলনীর সময় সুরেম্রবাবু তাঁহার ছাত্রের নিকট গুরুভিভি প্রার্থনা

গ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

করিয়াছিলেন, অরবিন্দবাবু তখন বলিয়া উঠিয়াছিলেন "দ্রোণ কি করিলেন ?" ইহা শুনিয়া নটন সাহেবের আগ্রহ ও কৌতূহলের সীমা ছিল না, তিনি নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন দ্রোণ কোন বোমার ভজ বা রাজনৈতিক হত্যাকারী, অথবা মাণিকতলা বাগান বা ছাত্র ভাভারের সঙ্গে সংযুক্ত। নটন মনে করিয়াছিলেন এই বাক্যের অর্থ বোধ হয় যে অরবিন্দ ঘোষ সুরেন্দ্রবাবুকে গুরুভজ্জির বদলে বোমারূপ পুরস্কার দিবার প্রামর্শ দিয়াছিলেন, তাহা হইলে মোকদ্মার অনেক সুবিধা হইতে পারে। অতএব তিনি আগ্রহে জিঞাসা করিয়াছিলেন, "দ্রোণ কি করিলেন?" প্রথমতঃ সাক্ষী কিছুতেই প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। তাহা লইয়া পাঁচ মিনিট টানাটানি হয়, শেষে করণ মহাশয় দুই হাত আকাশে নিক্ষেপ করিয়া নটনকে জানাইলেন, ''দ্রোণ অনেক অনেক আশ্চর্য্য কাণ্ড করিয়াছিলেন।" ইহাতে নর্টন সাহেব সন্তুপ্ট হইলেন না। দ্রোণের বোমার অনুস্কান না পাইলে সভুজ্ট হইকেন কেন ? আবার জিভাসা করিলেন, "অনেক কাণ্ড আবার কি ? বিশেষ কি করিলেন বলুন ?" সাক্ষী ইহার অনেক উত্তর করিলেন, একটিতেও দ্রোণাচার্য্যের জীবনায় এই শুণ্ত রহস্য ভেদ হয় নাই। নটন সাহেব চটিলেন, গড়জন আরম্ভ করিলেন। সাক্ষীও চীৎকার আরম্ভ করিলেন। একজন উকিল হাসিয়া এই সন্দেহ প্রকাশ করিলেন যে. সাক্ষী বোধ হয় জানেন না, দোণ কি করিলেন। করণ মহাশয় ইহাতে ক্রোধে অভিমানে আগুন হইলেন। চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি? আমি? আমি জানি না দ্রোণ কি করিলেন? বাঃ, আমি কি আদ্যোপান্ত মহাভারত রুথা পড়িয়াছি?" আধঘণ্টা দ্রোণাচার্য্যের মৃতদেহ লইয়া করণে নটনে মহাযুদ্ধ চলিল। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর নার্টন আলিপুর বিচারালয় কম্পিত করিয়া তাঁহার প্রশ্ন ঘোষণা করিতে লাগিলেন, "Out with it, Mr. Editor! What did Dron do?" সম্পাদক মহাশয় উত্তরে এক লম্বা রামকাহিনী আরস্ত করিলেন, তাহাতে দ্রোণ কি করিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়া গেল না। সমস্ত আদালত হাসির মহা রোলে প্রতিধানিত হইল। শেষে টিফিনের সময়ে করণ মহাশয় মাথা ঠাভা করিয়া একটু ভাবিয়া চিভিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং সমস্যার এই মীমাংসা জানাইলেন যে, বেচারা দ্রোণ কিছুই করেন নাই, র্থাই আধ ঘন্টাকাল তাঁহার পরলোকগত আজা লইয়া টানাটানি হইয়াছে, অজ্জুনই গুরু দ্রোণকে বধ করিয়াছিলেন। অজুনের এই মিথ্যা অপবাদে দ্রোণাচার্য্য অব্যাহতি পাইয়া কৈলাসে সদা-শিবকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন যে, করণ মহাশয়ের সাক্ষ্যে আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় তাঁহাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইল না। সম্পাদক মহাশয়ের এক কথায় সহজে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ সপ্রমাণ হইত। কিন্তু আগুতোষ সদাশিব তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।

্যাঁহারা সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে

পারেন। পুলিস ও গোয়েন্দা, পুলিসের প্রেমে আবদ্ধ নিম্নশ্রেণীর লোক ও ভদলোক এবং স্থাদোষে পুলিসের প্রেম বঞ্চিত, অনিচ্ছায় আগত সাক্ষীচয়। প্রত্যেক শ্রেণীর সাক্ষ্য দিবার প্রথা স্বতন্ত ছিল। পুলিস মহোদয়গণ প্রফুল্লভাবে অশ্লানবদনে তাঁহাদের পূক্জিত বক্তব্য খনের মত বলিয়া যাইতেন, যাহাকে চিনিতে হয়, চিনিয়া লইতেন, কোনও সন্দেহ নাই, দিধা নাই, ভুলচুক নাই। পুলিসের বন্ধুসকল অতিশয় আগ্রহের সহিত সাক্ষ্য দিতেন, যাহাকে চিনিতে হয়, তাহাকেও চিনিয়া লইতেন, যাহাকে চিনিতে হয় না, তাহাকেও অনেকবার অতিমাত্র আগ্রহের চোটে চিনিয়া লইতেন। অনিচ্ছায় আগত যাঁহারা, তাঁহারা যাহা জানিতেন, তাহা বলিতেন, কিন্তু তাহা অতি অলু হইত; নটন সাহেব তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া সাক্ষীর পেটে অশেষ মূল্যবান ও সন্দেহনাশক প্রমাণ আছে ভাবিয়া জেরার জোরে পেট চিরিয়া তাহা বাহির করিবার বিস্তর চেম্টা করিতেন। ইহাতে সাক্ষীগণ মহা বিপদে পড়িতেন। এক দিকে নটন সাহেবের গর্জন ও বালি সাহেবের আরক্ত চক্ষু, অপর দিকে মিথ্যা সাক্ষ্যে দেশবাসীকে দীপাভরে পাঠাইবার মহাপাপ। নটন ও বালিকে সভুত্ট করিবেন, না ভগ-বানকে সম্ভুষ্ট করিবেন, সাক্ষীর পক্ষে এই প্রশ্ন গুরুতর হইয়া উঠিত। এক দিকে মানুষের ক্রোধে ক্ষণস্থায়ী বিপদ, অপর দিকে পাপের শাস্তি নরক ও পর-জন্মে দুঃখ। কিন্তু তিনি ভাবিতেন, নরক ও পরজন্ম এখনও দূরবতী অথচ মনুষ্যকৃত বিপদ প্রমুহুর্তে গ্রাস করিতে পারে। কবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নারাজ হওয়ায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধে ধৃত হইবেন, সেই ভয় অনেকের মনে বিদ্যমান থাকিবার কথা, কারণ এইরূপ স্থলে পরিণামের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অতএব এই শ্রেণীর সাক্ষীর পক্ষে তাঁহারা যতক্ষণ সাক্ষীর কাঠগড়ায় অতি-বাহিত করিতেন, ততক্ষণ বিলক্ষণ ভীতি ও যন্ত্রণার সময় হইত। জেরা শেষ হইলে অর্দ্ধ-নির্গত প্রাণ আবার ধড়ে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে যন্ত্রণা-মুজ করিত। কয়েকজন সাহসের সহিত সাক্ষ্য দিয়া নটনের গড়্জনে ভূক্ষেপও করেন নাই, ইংরাজ কৌন্সিলীও তাহা দেখিয়া জাতীয় প্রথা অনুসরণ পূর্বক নরম হইয়া পড়িতেন। এইরূপ কত সাক্ষী আসিয়া কত প্রকার সাক্ষ্য দিয়া গেলেন, কিন্তু একজনও পুলিসের উল্লেখযোগ্য কোন সুবিধা করেন নাই। একজন স্পেষ্ট বলিলেন, আমি কিছুই জানি না, কেন পুলিস আমাকে টানিয়া আনিয়াছেন, তাহা বুঝি না! এইরাপ মোকদমা করিবার প্রথা বোধ হয়, ভারতেই হইতে পারে, অন্য দেশ হইলে জজ ইহাতে চটিয়া উঠিতেন ও পুলিসকে তীব্র গঞ্জনার সহিত শিক্ষা দিতেন। বিনা অনুসন্ধানে দোষী ও নির্দোষী নিবিবচারে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া আন্দাজে শত শত সাক্ষী আনিয়া দেশের টাকা নষ্ট করা এবং নির্থক আসামীদিগকে কারা-যন্ত্রণার মধ্যে দীর্ঘকাল রাখা, এই দেশেরই পুলিসের পক্ষে শোভা পায়। কিন্তু বেচারা পুলিস কি করিবে ? তাঁহারা নামে গোয়েন্দা কিন্তু সেইরাপ ক্ষমতা যখন তাঁহাদের নাই, তখন এই-রূপে সাক্ষীর জন্য বিশাল জাল ফেলিয়া উত্তম মধ্যম অধম সাক্ষী যোগাড়

করিয়া আন্দাজে কাঠগড়ায় উপস্থিত করাই একমাত্র উপায়। কে জানে, তাহারা কিছু জানিতে পারে, কিছু প্রমাণ দিতেও পারে।

আসামী চিনিবার ব্যবস্থাও অতি রহস্যময় ছিল। প্রথমতঃ, সাক্ষীকে বলা হইত, তুমি কি ইহাদের মধ্যে কাহাকেও চিনিতে পারিবে? সাক্ষী যদি বলিতেন, হাঁ, চিনিতে পারি, তৎক্ষণাৎ নটন সাহেব হর্ষোৎফুল্ল হইয়া কাঠগড়ায় identification parade এর ব্যবস্থা করাইয়া তাঁহাকে সেইখানে তাঁহার সমরণশক্তি চরিতার্থ করিবার আদেশ দিতেন। যদি তিনি বলিতেন, জানি না, হয়ত চিনিতেও পারি, তিনি একটু বিমর্ষ হইয়া বলিতেন, আচ্ছা যাও, চেল্টা কর। যদি কেহ বলিতেন, না, পারিব না, তাহাদের দেখি নাই অথবা লক্ষ্য করি নাই: তথাপি নটন সাহেব তাঁহাকে ছাড়িতেন না। যদি এতঙলি মূখ দেখিয়া পূর্বজন্মের কোনও সমৃতি জাগ্রত হয়, সেই জন্য তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে পাঠাইতেন। সাক্ষীর তেমন যোগশক্তি ছিল না। হয় ত পূর্ব্ব– জন্মবাদে আস্থাও নাই, তিনি আসামীদের দীর্ঘ দুই শ্রেণীর আদি হইতে অভ পর্য্যন্ত সাজ্জেন্টের নেতৃত্বের অধীনে গন্তীর ভাবে কুচ করিয়া আমাদের মুখের দিকে না চাহিয়াও মাথা নাড়িয়া বলিতেন, না, চিনি না। নার্টন নিরাশ হাদয়ে এই মৎস্পুন্ জীবভ জাল ফিরাইয়া লইতেন। এই মোকদ্মায় মনুষ্যের সমরণশক্তি কতদূর প্রথর ও অল্লন্ড হইতে পারে, তাহার অপূর্ব্ব প্রমাণ পাওয়া গেলঃ ত্রিশ চল্লিশ জন দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাদের নাম জানা নাই, তাঁহাদের সহিত কোন জন্মে একবারও আলাপ হয় নাই, অথচ দুইমাস প্রের্ব কাহাকে দেখিয়াছি, কাহাকে দেখি নাই, অমুককে অমুক তিন স্থানে দেখিয়াছি, অমুক দুইস্থানে দেখি নাই,---উহাকে দাঁত মাজিতে একবার দেখিয়াছি অতএব তাঁহার চেহারা আমার মনে জন্ম-জন্মান্তরের মত অঙ্কিত হইয়া রহিল। ইহাকে কবে দেখিলাম কি করিতেছিলেন, কে সঙ্গে ছিলেন, না একাকী ছিলেন, কিছুই মনে নাই, অথচ তাঁহারও চেহারা আমার মনে জন্ম-জন্মান্তরের জন্য অঞ্চিত হইয়া রহিল: হরিকে দশবার দেখিয়াছি সুতরাং তাঁহাকে ভুলিবার কোন সম্ভাবনা নাই, শ্যামকে একবার মোটে আধ মিনিটের জন্য দেখিলাম, কিন্তু তাহাকেও মরণের অভিম দিন পর্যাভ ভুলিতে পারিব না, কোন ভুল হইবার সভাবনা নাই.--এইরূপ সমরণশক্তি এই অসম্পূর্ণ মানব প্রকৃতিতে, এই তমাভিভূত মর্ত্তাধামে সচরাচর দেখা যায় না। অথচ একজনের নহে; দুই জনের নহে; প্রত্যেক পুলিস পুরবের এইরাপ বিচিত্র নির্ভুল অদ্রান্ত সমরণশক্তি দেখা গেল। এতদ্বারা সী, আই, ডী,-র উপর আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা দিন দিন প্রগাঢ় হইতে লাগিল। দুঃখের কথা, সেসন্স কোর্টে এই ভক্তি কমাইতে হইয়াছিল। ম্যাজিট্রেটের কোর্টে যে দুই একবার সন্দেহ হয় নাই তাহাও নয়। যখন লেখা সাক্ষ্যে দেখিলাম যে, শিশির ঘোষ এপ্রিল মাসে বোম্বাইতে ছিলেন অথচ কয়েক-জন পুলিস পুঙ্গৰ ঠিক সেই সময়ে তাঁহাকে ষ্কটস্ লেনে ও হ্যারিসন রোডে দেখিয়াছিলেন, তখন একটু সন্দেহ হইল বটে। শ্রীহটুবাসী বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন স্থূল শরীরে বানিয়াচঙ্গে পিতৃভবনে থাকিয়াও বাগানে ও স্কটস্ লেনে––যে ফুটস্ লেনের ঠিকানা বীরেড জানিতেন না, ইহার অকাট্য প্রমাণ লেখা সাক্ষ্যে পাওয়া গেল––তাঁহার সূক্ষ শরীর সী. আই. ডী.র সূক্ষ দৃপ্টিগোচর হইয়াছিল. তখন আরও সন্দেহ হইল। বিশেষতঃ যাঁহারা ऋটস্ লেনে কখনও পদার্পণ করেন নাই, তাঁহারা যখন গুনিলেন যে, সেখানে পুলিস তাঁহাদিগকে অনেকবার দেখিয়াছেন, তখন একটু সন্দেহের উদ্রেক হওয়া নিতাভ অস্বাভাবিক নহে। একজন মেদিনীপুরের সাক্ষী বলিলেন যে তিনি--মেদিনীপুরের আসামীরা বলিলেন যে তিনিই গোয়েন্দা—শ্রীহটের হেমচন্দ্র সেনকে তমলুকে বজুতা করিতে দেখিয়াছিলেন ৷ কিন্তু হেমচন্দ্র স্থুল চক্ষে কখন তমলুক দেখেন নাই, অথচ তাঁহার ছায়াময় শরীর দূর শ্রীহটু হইতে তমলুকে ছুটিয়া তেজস্বী ও রাজদ্রোহপূর্ণ স্থদেশী বজুতা করিয়া গোয়েন্দা মহাশয়ের চক্ষুত্পিত এবং কর্ণতৃপ্তি সম্পাদন করিয়াছিল। কিন্তু চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায়ের ছায়াময় শরীর মাণিকতলায় উপস্থিত হইয়া আরও রহস্যময় কাণ্ড করিয়াছিল ৷ দুই জন পুলিস কম্মচারী শপথ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা অমুক দিনে অমুক সময়ে চারুবাবুকে শ্যামবাজারে দেখিয়াছিলেন, তিনি শ্যামবাজার হইতে একজন ষড়যন্তকারীর সহিত মাণিকডলার বাগানে হাঁটিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই পর্যাভ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অতি নিকট হুইতে দেখিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ভুল হুইবার কথা নাই। উকিলের জেরায় সাক্ষীদ্বয় টলেন নাই। ব্যাসস্য বচনং সত্যং, পুলিসের সাক্ষ্যও অন্যরূপ হইতে পারে না। দিন ও সময় সম্বন্ধেও তাঁহাদের ভুল হইবার কথা নহে, কারণ ঠিক সেইদিনে সেই সময়ে চারুবাবু কলেজ হইতে ছুটি লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন, চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের অধ্যক্ষের সাক্ষ্যে ইহা প্রমাণিত হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, ঠিক সেই দিনে সেই সময়ে চারুবাবু হাওড়া স্টেশনের প্লাটফরমে চন্দননগরের মেয়র তাদিভাল, তাদিভালের স্ত্রী, চন্দননগরের গভর্ণর ও অন্যান্য সম্ভান্ত য়ুরোপীয় ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে কহিতে পায়চারি করিতেছিলেন। ইহারা সকলে সেই কথা সমরণ করিয়া চারুবাবুর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ফ্রেঞ্চ গভর্ণমেন্টের চেষ্টায় পুলিস চারুবাবুকে মুক্তি দেওয়ায় বিচারালয়ে এই রহস্য উদ্ঘাটন হয় নাই। চারুবাবুকে এই পরামর্শ প্রদান করিতেছি যে তিনি এইসকল প্রমাণ Psychical Research Society র নিকট পাঠাইয়া মনুষাজাতির জান-সঞ্যোর সাহায্য করুন। পুলিসের সাক্ষ্য যিথ্যা হইতে পারে না,— বিশেষতঃ সী, আই, ডী,র ---অতএব থিয়সফীর আশ্রয় ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই। মোটের উপর রুটিশ আইন প্রণালীতে কত সহজে নির্দোষীর কারাদণ্ড, কালা-পানি ও ফাঁসি পর্যান্ত হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত এই মোকদ্মায় পদে পদে পাইলাম। নিজে কাঠগড়ায় না দাঁড়াইলে পাশ্চাত্য বিচার প্রণালীর মায়াবী অসত্যতা হাদয়সম করা যায় না। য়ুরোপের এই প্রণালী জুয়াখেলা বিশেষ;

ইহা মানুষের স্থাধীনতা, মানুষের সুখ-দুঃখ, তাহার ও তাহার পরিবার ও আখ্রীয়-বঞ্র জীবনব্যাপী যন্ত্রণা, অপমান, জীবন্ত মৃত্যু লইয়া জুয়াখেলা। ইহাতে কত দোষী বাঁচে, কত নির্দ্ধোষী মরে, তাহার ইয়ন্তা নাই। য়ুরোপে Socialism ও Anarchism এর এত প্রচার ও প্রভাব হইয়াছে, এই জুয়া-খেলার মধ্যে একবার আসিলে, এই নিষ্ঠ্র নিবিবচার সমাজরক্ষক পেষণযন্তের মধ্যে একবার পড়িলে তাহা প্রথম বোধগম্য হয়। এমত অবস্থায় ইহা আশ্চর্যোর কথা নহে, যে অনেক উদারচেতা দয়ালু লোক বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এই সমাজ ভালিয়া দাও, চুরমার কর, এত পাপ, এত দুঃখ, এত নির্দ্ধোষীর তপ্ত নিঃশ্বাসে ও হৃদয়ের শোণিতে যদি সমাজ রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা রক্ষা করা নিম্প্রয়োজন।

ম্যাজিন্ট্রেটের কোর্টে একমাত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সাক্ষ্য। সেই ঘটনা বর্ণনা করিবার পূর্বের আমার বিপদের সঙ্গী বালক আসামীদের কথা বলি। কোর্টে ইহাদের আচরণ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, বঙ্গে নূতন যুগ আসিয়াছে, নূতন সভুতি মায়ের কোলে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেকালের বাঙ্গালীর ছেলে দুই প্রকার ছিল, হয় শান্ত, শিল্ট, নিরীহ, সচ্চরিত্র, ভীরু, আত্মসম্মান ও উচ্চাকাঞ্জা শূন্য, নয়ত দুশ্চরিল, দুর্দান্ত, অস্থির, ঠগ, সংযম ও সত্তাশূন্য! এই দুই চরমাবস্থার মধ্যস্থলে নানারূপ জীব বঙ্গজননীর ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আট দশজন অসাধারণ প্রতিভাবান শক্তিমান ভবিষ্যুৎ কালের পথপ্রদর্শক ভিন্ন এই দুই শ্রেণীর অতীত তেজস্বী আর্য্যসন্তান প্রায়ই দেখা যাইত না। বাসালীর বৃদ্ধি ছিল, মেধাশক্তি ছিল, কিন্তু শক্তি ও মনুষ্যত্ব ছিল না। কিন্তু এই বালকগণকে দেখিয়াই বোধ হইত যেন অন্য কালের অন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত উদারচেতা দুর্দান্ত তেজস্বী পুরুষ সকল আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেই নিভীক সরল চাহনি, সেই তেজপূর্ণ কথা, সেই ভাবনাশূন্য আনন্দময় হাস্য, এই ঘোর বিপদের সময়ে সেই অকুল তেজিয়িতা, মনের প্রসন্নতা, বিমর্ষতা ভাবনা বা সভাপের অভাব, সেকালের তমঃক্লিফ্ট ভারতবাসীর নহে, নূতন যুগের নূতন জাতির, নৃতন কম্মস্রোতের লক্ষণ। ইহারা যদি হত্যাকারী হন, তবে বলিতে হয় যে, হত্যার রক্তময় ছায়া তাঁহাদের স্বভাবে পড়ে নাই, কুরতা, উন্নত্তা, পাশবিক ভাব তাঁহাদের মধ্যে আদবে ছিল না। তাঁহারা ভবিষ্যতের জন্য বা মোকদ্দমার ফলের জন্য লেশমাত্র চিন্তা না করিয়া কারাবাসের দিন বালকের আমোদে, হাস্যে, ক্রীড়ায়, পড়া-ওনায়, সমালোচনায় কাটাইয়াছিলেন। তাঁহারা অতি শীঘ্র জেলের কম্মচারী, সিপাহী, কয়েদী, য়ুরোপীয় সার্জ্জেন্ট, ডিটেকটিভ, কোর্টের কম্মচারী, সকলের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছিলেন এবং শরু মির বড় ছোট বিচার না করিয়া সকলের সঙ্গে গল্প ও উপহাস আরম্ভ করিয়া-

ছিলেন। কোর্টের সময় তাঁহাদের পক্ষে অতি বির্জিকর ছিল, কারণ মোকদ্মো প্রহসনে রস অতি অল্প ছিল। এই সময় কাটাইবার জনা তাঁহাদের পড়িবার বই ছিল না, কথা কহিবার অনুমতিও ছিল না । যাঁহারা যোগ আরম্ভ করিয়া– ছিলেন, তাঁহারা তখনও গণ্ডগোলের মধ্যে ধ্যান করিতে শেখেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে সময় কাটান বড় কঠিন হইয়া উঠিত। প্রথমতঃ দুই চারিজন পড়িবার বই ভিতরে আনিতে লাগিলেন, তাঁহাদের দেখাদেখি আর সকলে সেই উপায় অবলম্বন করিলেন। তাহার পরে এক অভুত দৃশ্য দেখা যাইত যে, মোকদ্মা চলিতেছে. ত্রিশ চল্লিশ জন আসামীর সমস্ত ভবিষ্যৎ লইয়া টানাটানি হইতেছে. তাহার ফল ফাঁসিকাছে মৃত্যু বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইতে পারে, অথচ সেই আসামীগণ সেই দিকে দৃকপাত না করিয়া কেহ বঙ্কিমের উপন্যাস, কেহ বিবেকানন্দের রাজযোগ বা Science of Religions, কেহ গীতা, কেহ পুরাণ, কেহ য়ুরোপীয় দর্শন একাগ্রমনে পড়িতেছেন। ইংরাজ সার্জেন্ট বা দেশী সিপাহী কেহই তাঁহাদের এই আচরণে বাধা দিত না। তাঁহারা ভাবিয়া-ছিলেন, ইহাতেই যদি এতঙলি পিঞারাবদ্ধ ব্যায় শান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদেরও কার্য্য লঘু হয়; অধিকস্ত ইহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। কিন্ত একদিন বালি সাহেবের দৃশিট এই দৃশ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইল, এই আচরণ ম্যাজিক্ট্রেট সাহেবের অসহ্য হইয়া উঠিল। দুই দিন তিনি কিছু বলেন নাই, পরে আর থাকিতে পারিলেন না, বইয়ের আমদানি বন্ধ করিবার ছকুম দিলেন। বাস্তবিক বালি এমন সুন্দর বিচার করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কোথায় সকলে আনন্দ লাভ করিবেন, না সকলে বই পড়িতেন। ইহাতে বালির গৌরব ও রটিশ জিল্টিসের মহিমার প্রতি ঘোর অসম্মান প্রদর্শন করা হইত সন্দেহ নাই।

আমরা যতদিন স্বতন্ত ঘরে আবদ্ধ ছিলাম, ততদিন কেবল গাড়ীতে, ম্যাজিস্ট্রেট আসিবার পূর্ব্বের একঘণ্টা বা আধঘণ্টাকাল এবং টিফিনের সময়ে কতকটা আলাপ করিবার অবসর পাইতাম। যাঁহাদের পরস্পরের সহিত পরিচয় বা আলাপ ছিল, তাঁহারা এই সময়ে cell এর নীরবতা ও নির্জ্জনতার শোধ লইতেন, হাসি, আমোদ ও নানা বিষয়ের আলোচনায় সময় কটোইতেন। কিন্তু এইরাপ অবসরে অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপের সুবিধা হয় না, সেইজন্য আমার ভাই বারীন্দ্র ও অবিনাশ ভিন্ন আমি আর কাহারও সহিত অধিক আলাপ করিতাম না, তাঁহাদের হাসি ও গল্প গুনিতাম, স্বয়ং তাহাতে যোগ দিতাম না। কিন্তু একজন আমার কাছে মাঝে মাঝে ঘোঁসিয়া আসিতেন, তিনি ভাবী approver নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। অন্য বালকদের ন্যায় তাঁহার শান্ত ও শিক্ট স্বভাব ছিল না, তিনি সাহসী, লমুচেতা এবং চরিত্রে, কথায়, কম্মে অসংযত ছিলেন। ধৃত হইবার কালে নরেন গোঁসাই তাঁহার স্বাভাবিক সাহস ও প্রগল্ভতা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু লঘুচেতা বলিয়া কারাবাসের যৎ-কিঞ্চিৎ দুঃখ অসুবিধা সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল। তিনি

জমিদারের ছেলে সুতরাং সুখে, বিলাসে, দুর্নীতিতে লালিত হইয়া কারাগৃহের কঠোর সংযম ও তপস্যায় অত্যন্ত কাত্র হইয়াছিলেন, আর সেই ভাব সকলের নিকট প্রকাশ করিতেও কুষ্ঠিত হন নাই। যে কোন উপায়ে এই যন্ত্রণা হইতে মক্ত হইবার উৎকট বাসনা তাঁহার মনে দিন দিন বাডিতে লাগিল। প্রথম তাঁহার এই আশা ছিল যে নিজের স্বীকারোজি প্রত্যাহার করিয়া প্রমাণ করিতে পারিবেন যে পলিস তাঁহাকে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়া দোষ স্বীকার করাইয়া-ছিলেন। তিনি আমাদের নিকট জানাইলেন যে, তাঁহার পিতা সেইরূপ মিখ্যা সাক্ষী যোগাড় করিতে কুতসঞ্চল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিনেই আর এক ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার পিতা ও একজন মোক্তার তাঁহার নিকট জেলে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিলেন, শেষে ডিটেকটিভ শ্যামসূল আলমও তাঁহার নিক্ট আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া গোপনে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। এই সময়ে হঠাৎ গোঁসাইয়ের কৌতুহল ও প্রশ্ন করিবার প্ররুড়ি হইয়াছিল বলিয়া অনেকের সন্দেহের উদ্রেক হয়। ভারতবর্ষের বড় বড় লোকের সহিত তাঁহাদের আলাপ বা ঘনিষ্ঠতা ছিল কি না, গুণ্ত সমিতিকে কে কে আথিক সাহায্য দিয়া তাহা পোষণ করিয়াছিলেন, সমিতির লোক বাহিরে বা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কে কে ছিল, কাহারা এখন সমিতির কার্য্য চালাইবেন, কোথায় শাখা সমিতি রহিয়াছে ইত্যাদি অনেক ছোট বড প্রশ্ন বারীন্দ্র ও উপেন্দ্রকে করিতেন। গোঁসাইয়ের এই জানতৃষ্ণার কথা অচিরাৎ সকলের কর্ণগোচর হইল এবং শামসূল আলমের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতার কথাও আর গোপনীয় প্রেমালাপ না হইয়া open secret হইয়া উঠিল। ইহা লইয়া অনেক আলোচনা হয় এবং কেহ কেহ ইহাও লক্ষ্য করে যে এইরাপ পুলিস দর্শমের পরই সবর্বদা নব নব প্রশ্ন গোঁসাইয়ের মনে জুটিত। বলা বাছল্য তিনি এই সকল প্রশ্নের সভোষজনক উত্তর পান নাই। যখন প্রথম এই কথা আসামীদের মধ্যে রাষ্ট্র হইতে লাগিল, তখন গোঁসাই স্বয়ং স্বীকার করিয়াছিলেন যে পুলিস তাঁহার নিকট আসিয়া "রাজার সাক্ষী" হইবার জন্য তাঁহাকে নানা উপায়ে বঝাইবার চেম্টা করিতেছেন। তিনি আমাকে কোর্টে একবার এই কথা বলিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে জিজাসা করিয়াছিলাম "আপনি কি উত্তর দিয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "আমি কি শুনিব! আর শুনিলেও আমি কি জানি যে তাঁহাদের মনের মত সাক্ষ্য দিব?" তাহার কিয়েৎ দিন পরে আবার যখন এই কথা উল্লেখ করিলেন, তখন দেখিলাম, ব্যাপারটা অনেক দূরে গড়াইয়াছে। জেলে Identification parade এর সময় আমার পার্শ্বে গোঁসাই দাঁড়াইয়া-ছিলেন, তখন তিনি আমাকে বলেন, "পুলিস কেবলই আমার নিকট আসেন।" আমি উপহাস করিয়া বলিলাম, "আপনি এই কথা বলুন না কেন যে সার আনু ফ্রেজার ৩°ত সমিতির প্রধান পুষ্ঠপোষক ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে।" গোঁসাই বলিলেন, "সেই ধরণের কথা বলিয়াছি বটে। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাঙ্জি আমাদের head এবং তাঁহাকে

একবার বোমা দেখাইয়াছি।" আমি স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে জিজাসা করিলাম, "এই কথা বলিবার প্রয়োজন কি ছিল?" গোঁসাই বলিলেন, "আমি –দের শ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িব। সেই ধরণের আরও অনেক খবর দিয়াছি। বেটারা corroboration খুঁজিয়া খুঁজিয়া মরুক। কে জানে, এই উপায়ে মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যাইতেও পারে।" ইহার উত্তরে আমি কেবল বলিয়াছিলাম, "এই মপ্টামি ছাডিয়া দিন। উহাদের সঙ্গে চালাকী করিতে গেলে নিজে ঠকিবেন।" জানি না, গোঁসাইয়ের এই কথা কতদূর সত্য ছিল। আর সকল আসামীদের এই মত ছিল যে আমাদের চক্ষে ধূলা দিবার জন্য তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন, আমার বোধ হয় যে তখনও গোঁসাই approver হইতে সম্পূর্ণ কৃতনিশ্চয় হন নাই, তাঁহার মন সেই দিকে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল সত্য, কিন্তু পলিসকে ঠকাইয়া তাঁহাদের কেস মাটি করিবার আশাও তাঁহার ছিল। চালাকী ও অসদুপায়ে কার্যাসিদ্ধি দুতপ্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রেরণা। তখন হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, গোঁসাই পুলিসের বশ হইয়া সত্য মিখ্যা তাহাদের যাহা প্রয়োজন, তাহা বলিয়া নিজে রক্ষা পাইবার চেণ্টা করিবেন। একটা নীচ খভাবের আরও নিশনতর দুঞ্জশের্মর দিকে অধঃপতন আমাদের চক্ষের সম্মুখে নাটকের মত অভিনীত হইতে লাগিল। আমি দিন দিন দেখিলাম, গোঁসাইয়ের মন কিরূপে বদলাইয়া যাইতেছে, তাহার মুখ, ভাবভঙ্গী, কথাবার্তারও পরিবর্তন হইতেছে। তিনি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার সঙ্গীদের সর্বানাশ করিবার যোগাড় করিতেছিলেন তাহার সমর্থন জন্য ক্রমে ক্রমে নানা অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক যুক্তি বাহির করিতে লাগিলেন। এমন interesting psychological study প্রায়ই হাতের নিকট পাওয়া যায় না।

প্রথম কেহই গোঁসাইকে জানিতে দিলেন না যে সকলে তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনিও এমন নির্কোধ যে অনেক দিন ইহার কিছু বুঝিতে পারেন নাই, তিনি ভাবিয়াছিলেন, আমি খুব গোপনে পুলিসের সাহায্য করিতেছি। কিন্তু কয়েক দিন পরে যখন হকুম হইল যে, আর আমাদের নির্জেন কারাবাসে না রাখিয়া একসঙ্গে রাখা হইবে, তখন সেই নূতন ব্যবস্থায় পরস্পরের সহিত রাত-দিন দেখা ও কথাবার্তা হওয়ায় আর বেশী দিন কিছুই লুকাইয়া ছিল না। এই সময়ে দুই একজন বালকের সহিত গোঁসাইয়ের ঝগড়া হয়, তাহাদের কথায় ও সকলের অপ্রীতিকর ব্যবহারে গোঁসাই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার অভিসন্ধি কাহারও অক্তাত নহে। যখন গোঁসাই সাক্ষ্য দেন, তখন কয়েকটী ইংরাজী কাগজে এই খবর বাহির হয় যে, আসামীগণ এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় চমৎকৃত ও উত্তেজিত হইলেন। বলা বাহুলা, ইহা নিতাভ রিপোর্টারদেরই কল্পনা। অনেক দিন আগেই সকলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই প্রকার সাক্ষ্য দেওয়া হইবে। এমন কি, যে দিনে যে

সাক্ষ্য দেওয়া হইবে, তাহাও জানিতে পারা গিয়াছিল। এই সময়ে একজন আসামী গোঁসাইয়ের নিকট গিয়া বলিলেন---দেখ ভাই, আর সহ্য হয় না; আমিও approver হইব, তুমি শামসূল আলমকে বল আমারও যেন খালাস পাইবার ব্যবস্থা করেনে। গোঁসাই সম্মত হইলেন, কয়েক দিন পরে তাঁহাকে বলিলেন যে, এই অর্থে গ্রন্মেন্ট হইতে চিঠি আসিয়াছে যে, সেই আসামীর অনকল নির্ণয় (favourable consideration) হইবার সম্ভাবনা আছে। এই বলিয়া গোঁসাই তাহাকে উপেন প্রভৃতির নিকট হইতে এইরূপ কয়েকটি আবশ্যকীয় কথা বাহির করিতে বলিলেন, যেমন—কোথায় গুণ্ত সমিতির শাখা সমিতি ছিল, কাহারা তাহার নেতা, ইত্যাদি। নকল approver আমোদ-প্রিয় ও রসিক লোক ছিলেন, তিনি উপেন্দ্রনাথের সহিত প্রামর্শ করিয়া গোঁসাইকে কয়েকটি কল্পিত নাম জানাইয়া বলিলেন যে, মান্তাজে বিশ্বস্তর পিলে, সাতারায় প্রুষোভম নাটেকর, বোঘাইতে প্রোফেসার ভট্ট এবং বরোদায় কৃষ্ণাজীরাও ভাও এই গুণ্ত সমিতির শাখার নেতা ছিলেন। গোঁসাই আনন্দিত হইয়া এই বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পুলিসকে জানাইলেন। পুলিসও মান্ডাজে তল্ল তল্ল করিয়া খুঁজিলেন, অনেক ছোট বড় পিলেকে পাইলেন, কিস্তু একটীও পিলে বিশ্বস্তর বা অর্দ্ধ বিশ্বস্তরও পাইলেন না, সাতারার পুরুষোত্তম নাটেকরও তাঁহার অন্তিত্ব ঘন অন্ধকারে ৩°ত রাখিয়া রহিলেন, বোদাইয়ে একজন প্রোফেসার ভট পাওয়া গেল, কিন্তু তিনি নিরীহ, রাজভক্ত ভদ্রলোক, তাঁহার পিছনে কোন ভুপ্ত সমিতি থাকিবার সভাবনা ছিল না। অথচ সাক্ষ্য দিবার সময় গোঁসাই প্রকিলালে উপেনের নিকট শোনা কথা বলিয়া কল্পনা-রাজ্য নিবাসী বিশ্বস্তর পিলে ইত্যাদি ষড়যন্তের মহারথীগণকে নর্টনের শ্রীচরণে বলি দিয়া তাঁহার অভুত prosecution theory পুষ্ট করিলেন। বীর কৃষ্ণাজীরাও ভাও লইয়া পুলিস আর একটি রহস্য করিলেন। তাঁহারা বাগান হইতে বরোদার কৃষ্ণাজীরাও দেশপাণ্ডের নামে কোনও "ঘোষ" দারা প্রেরিত টেলিগ্রামের নকল বাহির করিলেন। সেইরাপ নামের কোন লোক ছিল কি না, বরোদাবাসী তাহার কোন সন্ধান পান নাই, কিন্তু সত্যবাদী গোঁসাই বরোদা-বাসী কৃষ্ণাজীরাও ভাওয়ের কথা বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয় কৃষ্ণাজীরাও ভাও ও কৃষ্ণাজীরাও দেশপাণ্ডে একই। আর কৃষ্ণাজীরাও দেশপাণ্ডে থাকুন বা না থাকুন, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধ কেশবরাও দেশপাণ্ডের নাম চিঠিপতে পাওয়া গিয়াছিল। অতএব নিশ্চয় কৃষ্ণাজীরাও ভাও, কৃষ্ণাজীরাও দেশপাণ্ডে একই লোক। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, কেশবরাও দেশপাণ্ডে গুণ্ত ষড়যন্তের একজন প্রধান পাণ্ডা। এইরূপ অসাধারণ অনুমান সকলের উপর নটন সাহেবের সেই বিখ্যাত theory প্রতিষ্ঠিত ছিল।

গোঁসাইয়ের কথা বিশ্বাস করিলে ইহাই বিশ্বাস করিতে হয় যে, তাঁহারই কথায় আমাদের নিজন কারাবাস ঘুচিয়া যায় এবং আমাদের একত বাসের হকুম হয়। তিনি বলিয়াছিলেন যে, পুলিস তাঁহাকে সকলের মধ্যে রাখিয়া

ষ্ড্যন্ত্রের গুণ্ত কথা বাহির করিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করেন। গোঁসাই জানিতেন না যে সকলে পুরের্বই তাঁহার নূতন ব্যবসার কথা জানিতে পারিয়াছেন, সেইজন্য কাহারা ষ্ট্যন্তে লিপ্ত, কোথায় শাখা সমিতি, কে টাকা দিতেন বা সাহায্য করিতেন, কে এখন ৩°ত সমিতির কার্য্য চালাইবেন, এইরূপ অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। এই সকল প্রশ্নের কিরাপ উত্তর লাভ করিয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত উপরে দিয়াছি। কিন্তু গোঁসাইয়ের অধিকাংশ কথাই মিখ্যা। ডাক্তার ডেলি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, তিনিই এমারসন সাহেবকে বলিয়া কহিয়া এই পরিবর্তন করাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ডেলির কথাই সত্যঃ তাহার পরে হয়ত পুলিস নূতন ব্যবস্থার কথা অবগত হইয়া তাহা হইতে এইরূপ লাভের কল্পনা করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, এই পরিবর্তনে আমি ভিন্ন সকলের পরম আনন্দ হইল, আমি তখন লোকের সঙ্গে মিশিতে অনিচ্ছুক ছিলাম, সেই সময়ে আমার সাধনা খুব জোরে চলিতেছিল। সমতা, নিফামতা ও শান্তির কতক কতক আন্মাদ পাইয়াছিলাম, কিন্তু তখনও সেই ভাব দৃঢ় হয় নাই। লোকের সঙ্গে মিশিলে, পরের চিন্তাস্তোতের আঘাত আমার অপকু নবীন চিন্তার উপর পড়িলেই এই নব ভাব হ্রাস পাইতে পারে, ভাসিয়া যাইতেও পারে। বাস্তবিক তাহাই হইল। তখন বৃঝিতাম না যে আমার সাধনের পূণ্তার জন্য বিপরীত ভাবের উদ্রেক আবশ্যক ছিল, সেইজন্য অভ্র্য্যামী আমাকে হঠাৎ আমার প্রিয় নিজ্লনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া উদ্দাম রজোগুণের স্রোতে ভাসাইয়া দিলেন। আর সকলেই আনন্দে অধীর হইলেন। সেই রাগ্রিতে যে ঘরে হেমচন্দ্র দাস, শচীন্দ্র সেন ইত্যাদি গায়ক ছিলেন সেই ঘর সব্বাপেক্ষা রুহু ছিল, অধিকাংশ আসামী সেইখানে একল হইয়াছিলেন, এবং দুটা তিনটা রাত্রি পর্য্যন্ত কেহ ঘুমাইতে পারেন নাই। সারা রাত হাসির রোল, গানের অবিরাম স্রোত, এতদিনের রুদ্ধ গল্প বর্ষাকালের বন্যার মত বহিতে থাকায় নীরব কারাগার কোলাহল-ধ্রনিত হইল। আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম কিন্ত যতবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ততবারই শুনিলাম সেই হাসি, সেই গান, সেই গল সমান বেগে চলিতেছে৷ শেষ রাত্রে এই স্রোত ক্ষীণ হইয়া গেল, গায়কেরাও ঘুমাইয়া পড়িলেন, আমাদের ওয়ার্ড নীরব হইল।

কারাগৃহ ও স্বাধীনতা

মনুষ্যমাত্রেই প্রায় বাহ্য অবস্থার দাস, স্থূলজগতের অনুভূতির মধ্যেই আবদ্ধ। মানসিক ক্রিয়াসকল সেই বাহ্যিক অনুভূতিকেই আশ্রয় করে, বুদ্ধিও স্থুলের সঙ্কীণ সীমা লঙ্ঘন করিতে অক্ষম; প্রাণের সুখদুঃখ বাহ্য ঘটনার প্রতিধ্বনি মাত্র। এই দাসত্ব শ্রীরের আধিপত্যজনিত। উপনিষদে বলা হইয়াছে, "জগৎ-স্রুদটা স্বয়ভূ শরীরের দার সকল বহিম্মুখীন করিয়া গড়িয়াছেন বলিয়া সকলের দৃষ্টি বহিজ্গতে আবদ্ধ, অন্তরাস্থাকে কেহও দেখে না। সেই ধীরপ্রকৃতি মহাঝা বিরল যিনি অমৃতের বাসনায় ভিতরে চক্ষু ফিরাইয়া আত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন।" আমরাও সাধারণতঃ যে বহিম্মুখীন সূলদৃষ্টিতে মনুষ্যজাতির জীবন দেখি, সেই দৃষ্টিতে শরীরই আমাদের মুখ্য সম্বল। য়ুরোপকে যতই না জড়বাদী বলি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যমান্তই জড়বাদী। শরীর ধর্মসাধনের উপায়, আমাদের বহু-অশ্বযুক্ত রথ, যে দেহ-রথে আরোহণ করিয়া আমরা সংসার পথে ধাবিত হই। আমরা কিন্তু দেহের অষথার্থ প্রাধান্য ষীকার করিয়া দেহাঅক বুদ্ধিকে এমন প্রশ্রয় দিই যে বাহ্যিক কম্ম ও বাহ্যিক শুভাত্তভ দারা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হইয়া থাকি। এই অজ্ঞানের ফল জীবন-ব্যাপী দাসত্ব ও পরাধীনতা। সুখদুঃখ শুভাশুভ সম্পদ-বিপদ আমাদের মানসিক অবস্থাকে নিজের অনুযায়ী করিতে সচেষ্ট ত হয়ই, আমরাও কামনার ধ্যানে সেই স্রোতে ভাসিয়া যাই। সুখলালসায় দুঃখভয়ে পরের আশ্রিত হই, পরের দত্ত সুখ, পরের দত্ত দুঃখ গ্রহণ করিয়া অশেষ কল্ট ও লান্ছনা ভোগ করি। কেন না, প্রকৃতি হৌক বা মনুষ্য হৌক যে আমাদের শরীরের উপর কিঞ্চিনাত্র আধিপত্য করিতে পারে কিংবা নিজশক্তির অধিকার-ক্ষেত্রে আনিতে পারে, ভাহারই প্রভাবের অধীন হইতে হয়। ইহার চরম দৃষ্টাভ শরুগ্রস্থ বা কারাবদ্ধের অবস্থা। কিন্ত যিনি বন্ধুবান্ধব-বেল্টিত হইয়া স্বাধীনভাবে মুক্ত আকাশে বিচরণ করেন, কারাবদ্ধের ন্যায় তাঁহারও এই দুর্দশা। শরীরই কারাগৃহ, দেহাঅকবুদ্ধিরূপ অজ্ঞানতা কারারূপ শরু।

এই কারাবাস মনুষ্যজাতির চিরন্তন অবস্থা। অপরপক্ষে সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় মনুষ্যজাতির শ্বাধীনতা লাভার্থ অদমনীয় উচ্ছাস ও প্রয়াস দেখিতে পাই। যেমন রাজনীতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনে যুগে যুগে এই চেল্টা। আত্মসংযম, আত্মনিগ্রহ, সুখ-দুঃখ বর্জন, Stoicism, Epicureanism, asceticism, বেদান্ত, বৌদ্ধধ্দর্ম, অদৈতবাদ, মায়াবাদ, রাজযোগ, হঠযোগ, গীতা, জানমার্গ, ভক্তিমার্গ, কন্দর্ম-

মার্গ,——নানা পত্না একই গম্যস্থান। উদ্দেশ্য——শরীর জয়, স্থুলের আধিপত্য বর্জন, আন্তরিক জীবনের স্বাধীনতা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-বিদ্গণ এই সিদ্ধান্ত। করিয়াছেন যে স্থূলজগৎ ভিন্ন অন্য জগৎ নাই, স্থূলের উপর স্ক্রা প্রতিষ্ঠিত, স্ক্ষা অনুভব স্থূল অনুভবের প্রতিকৃতি মাত্র, মনুষ্যের স্বাধীনতাপ্রয়াস বার্থ, ধর্ম্মদর্শন বেদান্ত অলীক কল্পনা, সম্পূর্ণ ভূতপ্রকৃতি–আবদ্ধ আমাদের সেই বন্ধনমোচনে বা ভূতপ্রকৃতির সীমা উল্লখ্যনে মিথ্যা চেল্টা। কিন্তু মানব-হাদয়ের এমন গূঢ়তর ভরে এই আকাঙ্কা নিহিত যে সহল্ল যুক্তিও তাহা উন্মূলন করিতে অসমর্থ। মনুষ্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে কখনও সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। চিরকাল মনুষ্য অস্পস্টরাপে অনুভব করিয়া আসিতেছেন যে ভূলজয়ে সমর্থ সূক্ষ্ম বস্তু তাহার অভ্যন্তরে দৃঢ়ভাবে বর্তমান, সূক্ষ্মময় অধিষ্ঠাতা নিত্য-মুক্ত আনন্দময় পুরুষ আছেন। সেই নিত্যমুক্তি ও নিশর্মল আনন্দলাভ করা ধন্মের উদ্দেশ্য। এই যে ধন্মের উদ্দেশ্য, সেই বিজ্ঞান কল্পিত evolution এরও উদ্দেশ্য। বিচারশক্তি ও তাহার অভাব পশু ও মনুষ্যের প্রকৃত ভেদ নহে। পশুর বিচারশক্তি আছে, কিন্তু পশুদেহে তাহার উৎকর্ষ হয় না। পশু মনুষ্যের প্রকৃত ভেদ এই যে শরীরের নিকট সম্পূর্ণ দাসত্ব স্বীকার পাশ্বিক অবস্থা, শরীর জয় ও আভরিক স্বাধীনতার চেপ্টাই মনুষাত্ব বিকাশ। এই স্বাধীনতাই ধম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, ইহাকেই মুক্তি বলে। এই মুক্ত্যর্থে আমরা অভঃকরণস্থ মনোময় প্রাণশরীরনেতাকে জ্ঞানছারা চিনিতে কিয়া কম্মভজি-দ্বারা প্রাণ মন শ্রীর অর্পণ করিতে সচেষ্ট হই। "যোগস্থঃ কুরু কম্মাণি" বলিয়া গীতার যে প্রধান উপদেশ এই স্বাধীনতাই সেই গীতোক্ত যোগ। আন্তরিক সুখদুঃখ যখন বাহ্যিক গুভাগুড সম্পদ-বিপদকে আশ্রয় না করিয়া খুয়ংজাত, স্বয়ং-প্রেরিত, স্বসীমাবদ্ধ হয়, তখন মনুষ্যের সাধারণ অবস্থার বিপরীত অবস্থা হয়, বাহ্যিক জীবন আন্তরিক জীবনের অনুযায়ী করা যায়, কম্মবন্ধন শিথিল হয়। গীতার আদর্শ পুরুষ কম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তমে কম্মসন্নাস করেন ৷ তিনি "দুঃখেদ্বনুদ্রিয়মনাঃ সুখেষু বিগত– স্পৃহঃ" আন্তরিক স্বাতন্ত্র লাভ করিয়া আত্মরতি ও আত্মসম্ভপট হইয়া থাকেন। তিনি প্রাকৃত লোকের ন্যায় সুখলালসায় দুঃখভয়ে কাহারও আগ্রিত হন না, পরের দত্ত সুখ-দুঃখ প্রহণ করেন না, অথচ কম্মভোগ করেন না। বরং মহাসংযমী মহাপ্রতাপাবিত দেবাসুর যুদ্ধে রাগ ভয় ক্রোধাতীত মহারথী হইয়া ভগবৎ প্রেরিত যে কম্ম্যোগী রাষ্ট্রবিপ্লব অথবা প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ধর্ম্ম-সমাজ রক্ষা করিয়া নিক্ষাম ভাবে ভগবৎকর্ম্ম সুসম্পন্ন করেন, তিনি গীতার শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

আধুনিক যুগে আমরা নূতন পুরাতনের সিলিস্থলে উপস্থিত। মানুষ বরাবরই তাঁহার গভব্যস্থানে অগ্রসর হইতেছেন, সময়ে সময়ে সমতল ভূমি ত্যাগ করিয়া উচ্চে আরোহণ করিতে হয়, এবং সেইরূপ আরোহণ সময়ে রাজ্যে সমাজে ধন্মের জানে বিপ্লব হয়। বর্তমানকালে স্থূল হইতে সূজো আরোহণ

করিবার উদ্যোগ চলিতেছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্থূল জগতের পুঙখানুপুঙখ পরীক্ষা ও নিয়ম নির্দ্ধারণ করায় আরোহণ মার্গের চতুঃপার্শ্বস্থ সমতল ভূমি পরিষ্কার হইয়াছে। সূক্ষাজগতের বিশাল রাজ্যে পাশ্চাত্য জানীদিগের প্রথম পদক্ষেপ হইতেছে, অনেকের মন সেই রাজ্য জয়ের আশায় প্রলুব্ধ। ইহা ভিন্ন অন্য লক্ষণ দেখা যাইতেছে—যেমন অল্প দিনে থিয়সফির বিস্তার, আমেরিকায় বেদান্তের আদর, পাশ্চাত্য দর্শনশান্তে ও চিন্তাপ্রণালীতে ভারতবর্ষের পরোক্ষভাবে কিঞ্চিৎ আধিপত্য ইত্যাদি। কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ ভারতের আক্সিক ও আশাতীত উপান। ভারতবাসী জগতের গুরুস্থান অধিকার করিয়া নূতন যুগ পরিবর্ত্তন করিতে উঠিতেছেন। তাঁহার সাহায্যে বঞ্চিত হইলে পাশ্চাত্যগণ উন্নতি-চেপ্টায় সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন না। যেমন আন্তরিক জীবনবিকাশের সক্রপ্রধান উপায়স্বরূপ ব্রহ্মজান তত্ত্জান ও যোগাভাাসে ভারত ভিল্ল অন্য কোন দেশ উৎকর্ষলাভ করে নাই, তেমনই মনুষ্য-জাতির প্রয়োজনীয় চিত্তদ্ধি ইন্দ্রিয়সংযম ব্রহ্মতেজ তপঃক্ষমতা ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগশিক্ষা ভারতেরই সম্পত্তি। বাহ্য সুখদুঃখকে তাচ্ছিল্য করিয়া আভরিক স্বাধীনতা অর্জন করা ভারতবাসীরই সাধ্য, নিফাম কমের্ম ভারত-বাসীই সমর্থ, অহঙ্কার-বজ্জন ও কম্মে নিলিপ্ততা তাঁহারই শিক্ষা ও সভ্যতার চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জাতীয় চরিত্রে বীজরাপে নিহিত।

এই কথার যাথার্থ্য প্রথম আলিপুর জেলে অনুভব করিলাম। এই জেলে প্রায়ই চোর ডাকাত হত্যাকারী থাকে। যদিও কয়েদীর সঙ্গে আমাদের কথা কহা নিষিদ্ধ, তথাপি কার্য্যতঃ এই নিয়ম সম্পূর্ণ পালন করা হইত না, ভাহা ছাড়া রাঁধুনি পানিওয়ালা ঝাড়ু দার মেহতর প্রভৃতি যাহাদের সংস্তবে না আসিলে নয়, তাহাদের সঙ্গে অনেক সময় অবাধে বাক্যালাপ হইত৷ যাঁহারা আমার এক অপরাধে অপরাধী বলিয়া ধৃত, তাঁহারাও নৃশংস হত্যাকারীর দল প্রভৃতি দুঃশ্রাব্য বিশেষণে কলঙ্কিত ও নিন্দিত। যদি কোনও স্থানে ভারতবাসীর চরিত্র ঘৃণার চক্ষে দেখিতে হয়, যদি কোন অবস্থায় তাহার নিকৃপ্ট অধম ও জঘন্য ভাবের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়, তবে আলিপুর জেলই সেই স্থান, আলিপুরে কারাবাসই সেই নিকৃষ্ট হীন অবস্থা। আমি এই স্থানে এই অবস্থায় বার মাস কাটাইলাম। এই বারমাস অনুভবের ফলে, ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা, মনুষ্য চরিত্রের উপর দ্বিশুণ ভঙ্গি এবং স্থাদেশের ও মনুষাজাতির ভবিষাৎ উন্নতি ও কল্যাণের দশগুণ আশা লইয়া কম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছি। ইহা আমার স্বভাবজাত optimism অথবা অতিরিক্ত বিশ্বাসের ফল নহে। শ্রীযুঞ বিপিনচন্দ্র পাল বক্সার জেলে ইহা অনুভব করিয়া আসিয়াছিলেন, আলিপুর জেলে ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার ডেলি সাহেবও ইহা সমর্থন করিতেন। ডেলি সাহেব মনুষ্যচরিত্রে অভিভ সহাদয় ও বিচক্ষণ লোক, মনুষ্য চরিত্রের নিকৃষ্ট ও জঘন্য রুত্তি সকল প্রত্যুহ তাঁহার সম্মুখে বিদ্যমান, অথচ তিনি আমাকে বলিতেন, "ভারতের ভদ্রলোক বা ছোটলোক,

সমাজের সম্ভান্ত ব্যক্তি বা জেলের কয়েদী যতই দেখি ও শুনি, আমার এই ধারণা দৃঢ় হয় যে চরিত্রে ও গুণে তোমরা আমাদের চেয়ে ঢের উঁচু। এই দেশের কয়েদী ও য়ুরোপের কয়েদীর আকাশ পাতাল তফাৎ। এই ছেলেদের দেখে আমার এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে। এদের আচরণ চরিত্র ও নানা সদ্গুণ দেখে। কে কল্পনা করতে পারে যে, এরা anarchist বা হত্যাকারী। তাদের মধ্যে ক্রুরতা উদ্দামভাব অধীরতা বা ধৃষ্টতা কিছুমাত্র না দেখে সব উল্টা গুণই দেখি।" অবশ্যই জেলে চোর ডাকাত সাধু-সন্নাসী হয় না। ইংরাজের জেল চরিত্র শুধরাইবার স্থান নহে, বরং সাধারণ কয়েদীর পক্ষে চরিত্রহানি ও মনুষ্যকুনাশের উপায়মাত। তাহারা যে চোর ডাকাত খুনী ছিল, সেই চোর ডাকাত খুনীই থাকে, জেলে চুরি করে, শক্ত নিয়মের মধ্যেও নেশা করে, জুয়াচুরি করে। তাহা হইলে কি হইবে, ভারতবাসীর মনুষাত্র গিয়াও যায় না। সামাজিক অবনতিতে পতিত, মনুষ্যত্ব নাশের ফলে নিষ্পেষিত, বাহিরে কালিমা কদ্যাভাব কলঙ বিকৃতি, তথাপি ভিতরে সেই লুপ্তপ্রায় মনুষ্ত ভারতবাসীর মজ্জাগত সদ্ভণে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করে, পুনঃ পুনঃ কথায় ও আচরণে তাহা প্রকাশ পায়। ফাঁহারা উপরের কাদাটুকু দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লন, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে ইহাদের মধ্যে মনুষ্যভের লেশমাল দেখিতে পাই নাই। কিন্তু যিনি সাধুতার অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া নিজ সহজসাধ্য স্থির-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন, তিনি এই মতে কখনও মত দিবেন না। ছয় মাস কারাবাসের পরে শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল বক্সার জেলে চোর ডাকাতের মধ্যেই সক্র্যটে নারায়ণকে দশ্ন করিয়া উত্তরপাড়ার সভায় মুক্তকণ্ঠে এই কথা স্বীকার করিয়াছিলেন। আমিও আলিপুর জেলেই হিন্দুধম্মের এই মূলতত্ত্ব হাদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম, চোর ডাকাত খুনীর মধ্যে সক্পথম মনুষ্য দেহে নারায়ণকে উপল²ধ করিলাম।

এই দেশে কত শত নিরপরাধ ব্যক্তি দীর্ঘকাল জেলরাপ নরকবাস ভাগ দারা পূর্বজন্মাজিত দৃষ্কশর্ম ফল লাঘব করিয়া তাঁহাদের স্থাপথ পরিষ্কার করিতেছেন। কিন্তু সাধারণ পাশ্চাত্যবাসীগণ যাহারা ধশ্র্মভাব দারা পূত ও দেবভাবাপন্ন নহে, তাহারা এইরাপ পরীক্ষায় কতদূর উত্তীর্ণ হয়, যাঁহারা পাশ্চাত্য দেশে রহিয়াছেন বা পাশ্চাত্য চরিত্র-প্রকাশক সাহিত্য পড়িয়াছেন, তাঁহারাই সহজে অনুমান করিতে পারেন। এরাপ স্থলে হয়ত তাঁহাদের নিরাশা-প্রীড়িত রোধ ও দুঃখের অশুজলপ্লুত হাদয় পাথিব নরকের ঘার অন্ধকারে এবং সহবাসীদের সংস্কবে পড়িয়া তাহাদেরই ক্রুরতা ও নীচর্ত্তি আশ্রয় করে;—নয়ত দুর্বলিতার নিরতিশয় নিজেষণে বল বৃদ্ধি হীন হইয়া তাহাতে মনুষ্যের নল্টাবশেষ মাত্র অবশিশ্র্ট থাকে।

আলিপুরের একজন নিরপরাধীর কথা বলি। এ ব্যক্তি ডাকাতিতে লিপ্ত বলিয়া দশ বৎসর সম্রম কারাবাসে দণ্ডিত। জাতে গোয়ালা, অশিক্ষিত, লেখা-পড়ার ধার ধারে না, ধন্ম, সম্বলের মধ্যে ভগবানে আস্থা ও আর্যাশিক্ষা-সুলভ

ধৈর্য্য ও অন্যান্য সদ্গুণ ইহাতে বিদ্যমান। এই রূদ্ধের ভাব দেখিয়া আমার বিদ্যা ও সহিষ্ণুতার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। রূদ্ধের নয়নে সর্কাদা প্রশান্ত সরল মৈত্রীভাব বিরাজিত, মুখে সক্র্দা অমায়িক প্রীতিপূর্ণ আলাপ। সময় সময় নিরপরাধে কল্টভোগের কথা পাড়েন, স্ত্রী-ছেলেদের কথা বলেন, করে ভগবান কারামুজি দিয়া স্ত্রী-ছেলেদের মুখদর্শন করাইবেন, এই ভাবও প্রকাশ করেন, কিন্তু কখনও তাঁহাকে নিরাশ বা অধীর দেখি নাই। ভগবানের কুপাপেক্ষায় ধীরভাবে জেলের কম্ম সম্পন্ন করিয়া দিন যাপন করিতেছেন। রুদ্ধের যত চেষ্টা ও ভাবনা নিজের জন্যে নহে, পরের সুখ-সুবিধা সংক্রাভ। দয়া ও দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি তাঁহার কথায় কথায় প্রকাশ পায়, পরসেবা তাঁহার স্বভাব-ধম্ম। নয়তায় এই সকল সদ্ভণ আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমা হইতে সহস্ৰভণ উচ্চ হাদয় বুঝিয়া এই নয়তায় আমি সব্বদা লজ্জিত হইতাম, রুদ্ধের সেবা গ্রহণ করিতে সংকোচ হইত, কিন্তু তিনি ছাড়েন না, তিনি সর্ব্বদা আমার সুখ-সোয়াস্তির জন্যে চিন্তিত। যেমন আমার উপর তেমনই সকলের উপর— বিশেষ নিরপরাধ ও দুখীজনের প্রতি তাঁহার দয়াদৃপিট বিনীত সেবা-সম্মান আরো অধিক। অথচ মুখে ও আচরণে কেমন একটি স্বাভাবিক প্রশান্ত গান্তীযাঁ ও মহিমা প্রকাশিত। দেশের প্রতিও ইহার যথেগ্ট অনুরাগ ছিল। এই রুদ্ধ কয়েদীর দয়া-দাক্ষিণ্যপূর্ণ খেতশমশ্রুমণ্ডিত সৌমামূণ্ডি চিরকাল আমার স্মৃতি-পটে অঙ্কিত থাকিবে। এই অবনতির দিনেও ভারতবর্ষের চাষার মধ্যে---আমরা যাহাদের অশিক্ষিত ছোটলোক বলি,—তাহাদের মধ্যে এইরাপ হিন্দু-সভান পাওয়া যায়, ইহাতেই ভারতের ভবিষাৎ আশাজনক। শিক্ষিত যুবক-মশুলী ও অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায় এই দুইটি শ্রেণীতেই ভারতের ভবিষ্যুৎ নিহিত, ইহাদের মিলনেই ভবিষ্যৎ আর্য্যজাতি গঠিত হইবে।

উপরে একটি অশিক্ষিত চাষার কথা বলিলাম, এখন দুইজন শিক্ষিত যুবকের কথা বলি। ইহারা সাত বৎসর সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইয়াছেন। ইহারা হ্যারিসন রোডের কবিরাজদ্বয়, নগেন্দ্রনাথ ও ধরণী। ইহারাও যেরূপ শান্তভাবে, যেরূপ সন্তুপ্টমনে, এই আকৃষ্মিক বিপত্তি, এই অন্যায় রাজদণ্ড সহ্য করিতেন, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইত। কখনও তাঁহাদের মুখে ক্রোধ-দুপ্ট বা অসহিষ্ণুতা-প্রকাশক একটি কথা শুনি নাই। যাঁহাদের দোষে জেলরূপ নরকে যৌবনকাল কাটাইতে হইল, তাঁহাদের প্রতি যে লেশমাত্র রেগধ তিরক্ষার ভাব বা বিরক্তি পর্যান্ত আছে, তাহার কোন লক্ষণ কখনও দেখিতে পাই নাই। তাঁহারা আধুনিক শিক্ষার গৌরবস্থল পাশ্চাত্যভাষায় ও পাশ্চাত্যবিদ্যায় অভিজ্ঞতা-বঞ্চিত, মাতৃভাষাই ইহাদের সম্বল, কিন্তু ইংরাজীশিক্ষালব্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহাদের তুল্য কম লোক দেখিয়াছি। দুইজনেই মানুষের নিকট আক্ষেপ কিয়া বিধাতার নিকট নালিস না করিয়া সহাস্য মুখে নতমন্তকে দণ্ড প্রহণ করিয়াছেন। দুটি ভাইই সাধক কিন্তু প্রকৃতি বিভিন্ন। নগেন্দ্র ধীর প্রকৃতি, গভীর, বুর্ষ্ণিমান। হরিকথা ও ধর্ম্মবিষয়ে আলাপ অত্যন্ত ভাল-

বাসিতেন। যখন আমাদিগকে নির্জন কারাবাসে রাখা হইল তখন জেলের কর্তৃপক্ষ জেলের খাটুনি সমাপেত আমাদিগকে বই পড়িবার অনুমতি দিলেন। নগেন্দ্র ভগবদ্গীতা পড়িতে চাহিয়া বাইবেল পাইয়াছিলেন। বাইবেল পড়িয়া তাঁহার মনে কি কি ভাবের উদয় হয়, কাঠগড়ায় বসিয়া আমার নিকট তাহার বর্ণনা করিতেন। নগেন্দ্র গীতা পড়েন নাই তথাপি আশ্চর্য্যের সহিত দেখিলাম বাইবেলের কথা না বলিয়া গীতার শ্লোকার্থ বলিতেছেন—এমন কি এক একবার মনে হইত যে ভগবদ্গুণাত্মক মহৎ উক্তিসকল কুরুক্ষেত্রে প্রীকৃষ্ণ-মুখ-নিঃস্ত উক্তিগুলি সেই বাসুদেব মুখপদ্ম হইতে এই আলিপুরের কাঠগড়ায় আবার নিঃস্ত হইতেছে। গীতা না পড়িয়া বাইবেল গীতার সমতাবাদ, কন্দর্মফলত্যাগ, সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন ইত্যাদি ভাব উপলব্ধি করা সামান্য সাধনার লক্ষণ নহে। ধরণী নগেন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধিমান নন, কিন্তু বিনীত ও কোমল প্রকৃতি, স্বভাবতঃই ভক্ত। তিনি সর্ব্বাদ মাতৃধ্যানে বিভোর, তাঁহার মুখের প্রসন্নতা, সরল হাস্য ও কোমল ভক্তিভাব দেখিয়া জেলের জেলত্ব উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া পড়িত। ইহাদের দেখিয়া কে বলিতে পারে, বাঙ্গালী হীন অধ্য ? এই শক্তিব, এই মনুষ্যত্ব, এই পবিত্র অগ্নি ভদমরাশিতে লুক্কায়িত আছে মাত্র।

ইঁহারা উভয়েই নিরপরাধ। বিনা দোষে কারারুদ্ধ হইয়াও নিজ্ঞণে বা শিক্ষাবলে বাহ্য সৃখ-দুঃখের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া আন্তরিক জীবনের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা অপরাধী, তাঁহাদের মধ্যেও জাতীয় চরিত্রের সদ্ওণ বিকাশ পাইত। বার মাস আলিপুরে ছিলাম, দুয়েকজন ভিন্ন যত কয়েদী, যত চোর ডাকাত খুনীর সঙ্গে আমাদের সংস্থব ঘটিয়াছিল, সকলের নিকটেই আমরা সদ্যবহার ও অনুকূলতা পাইতাম ৷ আধুনিক-শিক্ষা-দৃষিত আমাদের মধ্যে বরঞ্চ এসকল গুণের অভাব দেখা যায়। আধুনিক শিক্ষার অনেক গুণ থাকিতে পারে কিন্তু সৌজন্য ও নিঃস্বার্থ পরসেবা সেই গুণের মধ্যগত নহে। যে দয়া সহানুভূতি আর্যশিক্ষার মূল্যবান অঙ্গ, তাহা এই চোর-ডাকাতের মধ্যেও দেখিতাম। মেহতর ঝাড়ুদার পানি-ওয়ালাকে বিনা দোষে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে নিজ্জন কারাবাসের দুঃখ-কচ্ট কতকপরিমাণে অনুভব করিতে হইত, কিন্তু তাহাতে একদিনও আমাদের উপর অসন্তুম্পিট বা ক্রোধ প্রকাশ করে নাই। দেশীয় জেলরক্ষকদের নিক্ট তাহারা মাঝে মাঝে দুঃখ প্রকাশ করিত বটে, কিন্তু প্রসন্নমুখে আমাদের কারামুক্তি প্রার্থনা করিত । একজন মুসলমান কয়েদী অভিযুক্তদিগকে নিজের ছেলেদের ন্যায় ভাল-বাসিতেন, বিদায় লইবার সময় তিনি অশুজল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। দেশের জন্যে এই লান্ছনা ও কণ্টভোগ বলিয়া অন্য সকলকে দেখাইয়া দুঃখ করিতেন, "দেখ, ইহারা ভদ্রলোক, ধনী লোকের সন্তান, গরীব-দুঃখীকে পরিত্রাণ ক্রিতে পিয়া ইহাদের এই দুর্দ্দশ।" যাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার বড়াই করেন, তাঁহাদের জিজাসা করি, ইংলন্ডের জেলে নিম্নশ্রেণীর কয়েদী, চোর ডাকাত খুনীর এইরূপ আঅসংযম দয়া-দাক্ষিণ্য কৃতভতা পরার্থে ভগবদ্-

908

ভত্তি কি দেখা যায়? প্রকৃতপক্ষে য়ুরোপ ভোক্ভূমি, ভারত দাতৃভূমি। দেব ও অসুর বলিয়া গাঁতায় দুই শ্রেণীর জীব বণিত আছে। ভারতবাসী স্বভাবতঃ দেব-প্রকৃতি, পাশ্চাত্যগণ স্বভাবতঃ অসুর প্রকৃতি। কিন্তু এই ঘোর কলিতে পড়িয়া তমোভাবের প্রধান্যবশতঃ আর্য্য-শিক্ষার অবলোপে, দেশের অবনতিতে, আমরা নিকৃষ্ট আসুরিকর্ত্তি সঞ্চয় করিতেছি আর পাশ্চাত্যগণ অন্যদিকে জাতীয় উন্নতি ও মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশের গুণে দেবভাব অর্জন করিতেছেন। ইহা সত্ত্বেও তাহাদের দেবভাবে কতকটা অসুরত্ব এবং আমাদের আসুরিক ভাবের মধ্যেও দেবভাব অস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। তাহাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, সেও অসুরত্ব সম্পূর্ণ হারায় না। নিকৃষ্টে নিকৃষ্টে যখন তুলনা করি, ইহার যথার্থতা তখন অতি স্পষ্টরূপে বোঝা যায়।

এই সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিবার আছে, প্রবন্ধের অতিদীর্ঘতার ভয়ে লিখিলাম না। তবে জেলে যাঁহাদের আচরণে এই আন্তরিক স্বাধীনতা দর্শন করিয়াছি, তাঁহারা এই দেবভাবের চরম দৃষ্টান্ত। এই সম্বন্ধে পরবর্তী প্রবন্ধে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

আর্য্য আদর্শ ও গুণত্রয়

'কারাগৃহ ও স্বাধীনতা'-শীর্ষক প্রবন্ধে আমি কয়েকজন নিরপরাধী কয়েদীর মানসিক ভাব বর্ণনা করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেল্টা করিয়াছি যে, আর্য্যশিক্ষার গুণে কারাবাসেও ভারতবাসীর আন্তরিক-স্বাধীনতারূপ মহামূল্য পৈতৃকসম্পত্তি বিনশ্ট হয় না--উপরস্ত ঘোর অপরাধীর মধ্যেও সেই সহস্রবর্ষ সঞ্চিত আর্য্যচরিত্রগত দেবভাবও ভগ্নাবশিষ্টরাপে বর্তমান থাকে। আর্যাশিক্ষার মূলমন্ত সাত্তিকভাব। যে সাত্তিক, সে বিশুদ্ধ, সাধারণতঃ মনুষ্য-মাত্রেই অস্তদ্ধ। রজোগুণের প্রাবল্যে, তমোগুণের ঘোর নিবিড়তায় এই অস্তদ্ধি পরিপুষ্ট ও বদ্ধিত হয়। মনের মালিনা দুই প্রকার,—জড়তা, বা অপ্রর্ডি-জনিত মালিনা; ইহা তমোখণপ্রসূত। দিতীয়,––উত্তেজনা বা কুপ্রবৃত্তিজনিত মালিনা; ইহা রজোগুণপ্রসূত। তমোগুণের লক্ষণ অভানমোহ, বুদির সূলতা, চিন্তার অসংলগ্নতা, আলস্য, অতিনিদ্রা, কম্মে আলস্যজনিত বিরক্তি, নিরাশা, বিষাদ, ভয়, এক কথায় যাহা নিশ্চেষ্টতার পরিপোষক তাহাই। জড়তা ও অপ্রবৃত্তি অঞ্জানের ফল, উত্তেজনা ও কুপ্রবৃত্তি প্রান্তজ্ঞানসভূত। কিন্তু তমো-মালিন্য অপনোদন করিতে হইলে রজেণ্ডেণের উদ্রেক দারাই তাহা দূর করিতে হয়। রজোগুণই প্ররুত্তির কারণ এবং প্রবৃত্তিই নিরুত্তির প্রথম সোপান। যে জ্ডু, সে নির্ও নয়,––জড়ভাব জানশূন্য; আর জান্ই নির্তির মার্গ । কামনা– শুনা হইয়া যে কম্মের্ম প্রবৃত হয়, সে নির্তঃ কম্মত্যাগ নির্তি নয় । সেই জন্য ভারতের ঘোর তামসিক অবস্থা দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "রজোগুণ চাই, দেশে কম্মবীর চাই, প্রর্ত্তির প্রচণ্ড স্রোত বহুক। তাহাতে যদি পাপও আসিয়া পড়ে, তাহাও এই তামসিক নিশ্চেষ্টতা অপেক্ষা সহস্ত গুণে ভাল।"

সত্যই আমরা ঘার তমামধ্যে নিমগ্ন হইয়া সত্ত্তণের দোহাই দিয়া মহাসাত্ত্বিক সাজিয়া বড়াই করিতেছি। অনেকের এই মত দেখিতে পাই যে,
আমরা সাত্ত্বিক বলিয়াই রাজসিক জাতিসকল দ্বারা পরাজিত, সাত্ত্বিক বলিয়া
এইরূপ অবনত ও অধঃপতিত। তাঁহারা এই যুক্তি দেখাইয়া খৃষ্টধর্ম্ম হইতে
হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট। খৃষ্টানজাতি প্রত্যক্ষফলবাদী,
তাঁহারা ধর্মের ঐহিক ফল দেখাইয়া ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে
চেষ্টা করেন; তাঁহারা বলেন—খ্র্টান জাতিই জগতে প্রবল, অতএব খ্র্ষ্টান
ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আর আমাদের মধ্যে অনেকে বলেন—ইহা দ্রম, ঐহিক
ফল দেখিয়া ধর্মের শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করা যায় না, পারলৌকিক ফল দেখিতে

হয়, হিন্দুরা অধিক ধাশিমক বলিয়া, অসুর প্রকৃতি বলবান পাশ্চাত্যজাতির অধীন হইয়াছে। কিন্তু এই যুক্তির মধ্যে আর্য্যজান-বিরোধী ঘোর ভ্রম নিহিত। সত্ত্ত্ত্বপ কখনই অবনতির কারণ হইতে পারে না; এমনকি সত্ত্বপ্রধান জাতি দাসত্র-শৃঙখলিত হইয়া থাকিতে পারে না। ব্রহ্মতেজই সত্ত্তেণের মুখ্যফল, ক্ষরতেজ ব্রহ্মতেজের ভিডি। আঘাত পাইলে শান্ত ব্রহ্মতেজ হইতে ক্ষরতেজের সফুলিঙ্গ নির্গত হয়, চারিদিক জ্বলিয়া উঠে। যেখানে ক্ষত্রতেজ নাই, সেখানে রিচাতিজে উকিতে পোরে না। দিশে যেদি একজন প্রকৃত রাহাণ থাকে সে এক শ' ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করে। দেশের অবনতির কারণ সত্ত্থণের আতিশয্য নয়, রজোগুণের অভাব, তমোগুণের প্রাধান্য। রজোগুণের অভাবে আমাদের অভ-নিহিত সত্ত্ব শ্লান হইয়া তমোমধ্যে ও°ত হইয়া পড়িল। আলস্য, মোহ, অভান, অপ্রর্ত্তি, নিরাশা, বিষাদ, নিশ্চেল্টার সঙ্গে সঙ্গে দেশের দুর্দ্দশা অবনতিও বদ্ধিত হইতে লাগিল। এই মেঘ প্রথমে লঘু ও বিরল ছিল, কালের গতিতে ক্রমশঃ এতদূর নিবিড়তর হইয়া পড়িল, অভান অন্ধকারে ডুবিয়া আমরা এমন নিশ্চেষ্ট ও মহদাকাঙ্কাবজিত হইয়া পড়িলাম যে, ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষগণের উদয়েও সেই অন্ধকার পূর্ণ তিরোহিত হইল না। তখন সূর্য্য-ভগবান রজোভণ-জনিত প্ররুত্তি দ্বারা দেশরক্ষার সক্র**ন্ধ** করিলেন।

জাগ্রত রজঃশক্তি প্রচঙ্জাবে কার্য্যকরী হইলে তমঃ প্রায়নোদ্যত হয় বটে কিন্তু অন্যদিকে স্বেচ্ছাচার, কুপ্রবৃত্তি ও উদাম উচ্ছু>খলতা প্রভৃতি আসুরিক ভাব আসিবার আশকা। রজঃশক্তি যদি স্থ স্থ প্রেরণায় উন্মততার বিশাল প্রবৃত্তির উদরপ্রণকেই লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে এই আশক্ষার যথেষ্ট কারণও আছে। রজোগুণ উচ্ছৃ>স্বলভাবে স্থপথগামী হইলে অধিককাল টিকিতে পারে না, ক্লান্তি আসে, তমঃ আসে, প্রচণ্ড ঝটিকার পরে আকাশ নিম্মল পরিষ্কার না হইয়া মেঘাচ্ছন্ত বায়ুস্পন্দনরহিত হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে ফ্রান্সের এই পরিণাম হইয়াছে। সেই রাষ্ট্রবিপ্লবে রজোগুণের ভীষণ প্রাদুর্ভাব, বিপ্লবান্তে তামসিকতার অল্লাধিক পুনরুখান, আবার রাষ্ট্রবিপ্লব, আবার ক্লান্তি, শক্তিহীনতা, নৈতিক অবনতি, ইহাই গত শতবর্ষে ফ্লান্সের ইতিহাস। যতবার সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতারূপ আদর্শজনিত সাজ্বি প্রেরণা ফ্রান্সের প্রাণে জাগিয়াছে, ততবারই ক্রমশঃ রজোগুণ প্রবল হইয়া সভ্সেবা-বিমুখ আসুরিকভাবে পরিণতি লাভ করিয়া স্বপ্রর্তিপ্রণে ষত্রবান হইয়াছে। ফলতঃ, তমোগুণের পুনরাবিভাবে ফ্রান্স তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত মহাশক্তি হারাইয়া মিয়মাণ বিষম অবস্থায় হরিশ্চন্দ্রের মত না স্বর্গে না মর্ত্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এইরূপ পরিণাম এড়াইবার একমাত্র উপায় প্রবল রজঃশক্তিকে সত্সেবায় নিযুক্ত করা। যদি সাভ্রিকভাব জাগ্রত হইয়া রজঃশক্তির চালক হয়, তাহা হইলে তমোগুণের পুনঃ প্রাদুর্ভাবের ভয়ও নাই, উদ্দাম শক্তিও শৃঙখলিত নিয়ন্তিত হুইয়া উচ্চ আদর্শের বশে দেশের ও জগতের হিতসাধন করে। স**জ্বো**দ্রেকের উপায় ধর্ম্মভাব––স্বার্থকে ডুবাইয়া পরার্থে সমস্ত শক্তি অর্পণ––ভগবানকে

আত্মসমর্পণ করিয়া সমস্ত জীবনকে এক মহা ও পবিত্র যজে পরিণত করা। গীতায় কথিত আছে, সত্ত্বজঃ উভয়ে তমঃ নাশ করে; একা সত্ত্ব কখন তমঃকে পরাজয় করিতে পারে না। সেইজন্য ভগবান অধুনা ধম্মের পুনরুখান করাইয়া আমাদের অভনিহিত সত্তকে জাগাইয়া পরে রজঃশক্তিকে দেশময় ছড়াইয়া দিয়াছেন। রামমোহন রায় প্রভৃতি ধমেমাপদেশক মহাআগণ সভুকে পুনরুদ্দীপিত করিয়া নবযুগ প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ধম্মজগতে যেমন জাগরণ হইয়াছিল, রাজনীতি বা সমাজে তেমন হয় নাই। কারণ ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না, সেইজন্য প্রচুর বীজ বপিত হইয়াও শস্য দেখা দেয় নাই। ইহাতেও ভারতবর্ষের উপর ভগবানের দয়া ও প্রসন্নতা বুঝা যায়। রাজসিক ভাবপ্রসূত জাগরণ কখনও স্থায়ী বা পূর্ণ কল্যাণপ্রদ হইতে পারে না। তৎপূর্বের জাতির অন্তরে কতকাংশে ব্রহ্মতেজ উদ্দীপিত হওয়া আবশ্যক। সেইজন্য এতদিন রজঃশক্তির স্রোত রুদ্ধ ছিল। ১৯০৫ খু<mark>ল্টাব্দে</mark> রজঃশক্তির যে বিকাশ হইয়াছে তাহা সাত্ত্বিকভাব পূর্ণ। এই নিমিত ইহাতে যে উদ্দামভাব দেখা গিয়াছে তাহাতেও আশক্ষার বিশেষ কারণ নাই, কেননা ইহা রজঃসাত্তিকের খেলা; এ খেলায় যাহা কিছু উদাম বা উচ্ছু>খল ভাব তাহা অচিরে নিয়মিত ও শৃঙ্খলিত হইবেই। বাহ্যশক্তির দারা নহে, ভিতরে যে ব্রহ্মতেজ, যে সাত্ত্বিক-ভাব, তাহা দারাই ইহা বশীভূত ও নিয়মিত হইবে। ধশর্মভাব প্রচার করিয়া আমরা সেই ব্রহ্মতেজ ও সাত্ত্বিকভাবের পোষকতা করিতে পারি মাত্র।

পূর্কেই বলিয়াছি পরার্থে সর্কশক্তি নিয়োগ করা সন্তোদ্রেকের এক উপায়। আর আমাদের রাজনীতিক জাগরণে এই ভাবের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এইভাব রক্ষা করা কঠিন। যেমন ব্যক্তির পক্ষে কঠিন জাতির পক্ষে আরও কঠিন। পরার্থের মধ্যে স্বার্থ অলক্ষিতভাবে ছুটিয়া আসে এবং যদি আমাদের বুদ্ধি বিশুদ্ধ না হয়, এমন জমে পতিত হইতে পারি যে আমরা পরার্থের দোহাই দিয়া স্বার্থকে আশ্রয় করিয়া পরহিত, দেশহিত, মনুষ্যজাতির হিত ভুবাইব অথচ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিব না। ভগবৎসেবা সত্ত্বোদ্রেকের অন্য উপায়। কিন্তু সেই পথেও হিতে বিপরীত হইতে পারে, ভগবৎসায়িধ্যরাপ আনন্দ পাইয়া আমাদের সাত্ত্বি-নিশ্চেষ্টতা জন্মিতে পারে, সেই আনন্দের আস্বাদ ভোগ করিতে করিতে দুঃখকাতর দেশের প্রতি ও মানবজাতির সেবায় পশ্চাৎমুখ হইতে পারি। ইহাই সাত্তিকভাবের বন্ধন। যেমন রাজসিক অহঙ্কার আছে, তেমনি সাভ্রিক অহঙ্কারও আছে। যেমন পাপ মানুষকে বদ্ধ করে, তেমনই পুণ্যও বদ্ধ করে। সম্পূর্ণ বাসনাশুন্য হইয়া অহঙ্কার ত্যাগ– পূর্ব্বক ভগবানকে আত্মসমর্পণ না করিলে পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। এই দুটি অনিষ্ট ত্যাগ করিতে হইলে প্রথম বিশুদ্ধ বুদ্ধির দরকার। দেহাত্মক বুদ্ধি বর্জন করিয়া মানসিক স্বাধীনতা অর্জন করাই বুদ্ধি-শোধনের পূর্ববর্তী অবস্থা। মন স্থাধীন হইলে জীবের আয়ন্ত হয়, পরে মনকে জয় করিয়া বুদ্ধির আশ্রয়ে মানুষ স্বার্থের হাত হইতে অনেকটা পরিত্রাণ লাভ করে। ইহাতেও স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে আমাদিগকে ত্যাগ করে না। শেষ স্বার্থ মুম্দ্রুত্ব, পরদুঃখকে ভুলিয়া নিজের আনন্দে ভোর হইয়া থাকিবার ইচ্ছা। ইহাও ত্যাগ করিতে হয়। সর্ব্রভূতে নারায়ণকে উপলব্ধি করিয়া সেই সর্ব্রভূতস্থ নারায়ণের সেবা ইহার ঔষধ; ইহাই সভ্তওণের পরাকার্ছা। ইহা হইতেও উচ্চতর অবস্থা আছে, তাহা সভ্তওণকেও অতিক্রম করিয়া গুণাতীত হইয়া সম্পূর্ণভাবে ভগবানকে আশ্রয় করা। গুণা্তীতের বর্ণনা গীতায় কথিত আছে, যেমন—

নান্যং গুণেজ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রুক্টানুপশাতি।
গুণেজ্যুক্ত পরং বেতি মদ্ভাবং সোহধিগক্ষতি॥
গুণানেতানতীতা গ্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমূত্যুজরাদুঃখৈবিমুজ্যেহমূতমমুতে॥
প্রকাশক্ষ প্রর্ত্তিক্ষ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেল্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নির্ক্তানি কাৎক্ষতি॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তর ইত্যেব যোহ্বতিষ্ঠতি নেসতে॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোক্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তল্যনিন্দাব্যসংস্তৃতিঃ॥
মানাপ্র্যানিয়োগুলাস্তল্যে মিক্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।
মাঞ্চ যোহ্বাভিচারেণ ভল্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সম্তীত্যৈতান্ ব্রক্ষভূয়ায় কল্পতে।।

"যখন জীব সান্ধী হইয়া গুণত্রয় অর্থাৎ গুগবানের ত্রৈগুণ্যায়ী শক্তিকেই একমাত্র কর্তা বলিয়া দেখে এবং এই গুণত্তরেরও উপর শক্তির প্রেরক ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তখন সে-ই জগবৎ সাধন্ম্য লাভ করে। তখন দেহস্থ জীব সূল ও সূল্য এই দুই প্রকার দেহসভূত গুণত্তয়কে অতিক্রম করিয়া জন্মমৃত্যু জরা-দৃঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমরত্ব ভোগ করে। সম্বুজনিত জান, রজো-জনিত প্রবৃত্তি বা তমোজনিত নিল্লা নিশ্চেল্টা জমস্বরূপে মোহ আসিলে বিরক্ত হয় না, এই গুণত্রয়ের আগমন নির্গমনে সমান ভাব রাখিয়া উদাসীনের নায় স্থিন হইয়া থাকে, গুণগ্রাম তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, এই সবই গুণের স্থধন্মজাত রতি বলিয়া দৃঢ় থাকে। যাহার পক্ষে সুখ-দৃঃখ সমান, প্রিয়-অপ্রিয় সমান, নিন্দা-স্তৃতি সমান, কাঞ্চন-লোল্ট্র উভয়ই প্রস্তরের তুলা, যে ধীর-স্থির, নিজের মধ্যে অটল, যাহার নিকট মান-অপমান একই, মিত্রপক্ষ ও শগ্রপক্ষ সমান প্রিয়, যে স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কার্য্যারম্ভ করে না, সকল ধর্ম্ম জগবানকে সমর্গণ করিয়া তাঁহারই প্রেরণায় কন্ম্ম করে, তাহাকেই গুণাতীত বলে। যে আমাকে নির্দ্ধোষ ভিত্তিযোগে সেবা করে, সে-ই এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া ব্রন্ধপ্রাপ্তির উপযুক্ত হয়।"

এই গুণাতীত অবস্থা লাভ সকলের সাধ্য না হইলেও তাহার পূর্ববর্তী

অবস্থা লাভ সত্ত্রপ্রধান পুরুষের অসাধ্য নহে। সাজ্বিক অহন্ধারকে ত্যাগ করিয়া জগতের সকল কার্য্যে ভগবানের ত্রৈগুণ্যময়ী শক্তির লীলা দেখা ইহার সর্ব-প্রথম উপক্রম। ইহা বুঝিয়া সাজ্বিক কর্তা কর্ভূত্ব-অভিমান ত্যাগে ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণপূর্বকৈ কম্ম করেন।

ভণত্রয় ও ভণাতীত্য সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা গীতার মূল কথা। কিন্তু এই শিক্ষা সাধারণতঃ গৃহীত হয় নাই, আজ পর্যান্ত যাহাকে আমরা আর্যাশিক্ষা বলি, তাহা প্রায় সাত্ত্বিক ভণের অনুশীলন। রজোভণের আদর এই দেশে ক্ষত্রিয়জাতির লোপে লুগ্ত হইয়াছে। অথচ জাতীয় জীবনে রজঃশক্তিরও নিরতিশয় প্রয়োজন আছে। সেইজন্য গীতার দিকে লোকের মন আজকাল আকৃষ্ট হইয়াছে। গীতার শিক্ষা পুরাতন আর্যাশিক্ষাকে ভিত্তি করিয়াও অতিক্রম করিয়াছে। গীতাকে ধর্ম্ম রজোভণকে ভয় করে না, তাহাতে রজঃশক্তিকে সত্ত্বসেবায় নিযুক্ত করিবার পদ্ম আছে, প্রর্ত্তি মার্গে মুক্তির উপায় প্রদশিত আছে। এই ধর্ম্ম অনুশীলনের জন্য জাতির মন কিরূপে প্রস্তুত হইতেছে, তাহা জেলেই প্রথম হাদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম। এখনও স্রোত নিম্মল হয় নাই, এখনও কলুষিত ও আবিল, কিন্তু অতিরিক্ত বেগ যখন অল্ব প্রশমিত হইবে, তখন তাহার মধ্যে যে বিভদ্ধ শক্তি লুক্কায়িত, তাহার নিখুঁত কার্য্য হইবে।

যাঁহারা আমার সঙ্গে বন্দী ও এক অভিযোগে অভিযুক্ত তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নির্দোমী বলিয়া মুক্তি পাইয়াছেন, আর সকলে ষড়যন্তে লিপ্ত বলিয়া দিছিত। মানবসমাজে হত্যা হইতে গুরুতর অপরাধ হইতে পারে না। জাতীয় স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া যে হত্যা করে, তাহার ব্যক্তিগত চরিত্র কলুষিত না হইতে পারে কিন্তু তাহাতে সামাজিক হিসাবে অপরাধীর গুরুত্ব লাঘব হইল না। ইহাও শ্বীকার করিতে হয় যে হত্যার ছায়া অন্তরাত্বায়া পড়িলে মনে যেন রক্তের দাগ বসিয়া থাকে, ক্রুরতার সঞ্চার হয়। ক্রুরতা বর্করোচিত গুণ, মনুষ্য উন্নতির ক্রমবিকাশে যে সকল গুণ হইতে অল্পে অল্পে বর্জিত হইতেছে, সেই সকলের মধ্যে ক্রুরতা প্রধান। ইহা সম্পূর্ণ বর্জন করিতে পারিলে মানবজাতির উন্নতির পথে একটি বিশ্বকর কন্টক উন্মূলিত হইয়া যাইবে। আসামীর দোষ ধরিয়া লইলে ইহাই বুঝাতে হইবে যে, ইহা রজঃশক্তির ক্ষণিক উদ্দাম উচ্ছৃত্ত্বলতার দারা দেশের স্বায়ী অমঙ্গল সাধিত হইবার কোনও আশক্ষা নাই।

অন্তরের যে স্বাধীনতার কথা পূর্কে বলিয়াছি, আমার সঙ্গীগণের সে স্বাধীনতা স্বভাবসিদ্ধ গুণ। যে কয়েকদিন আমরা একসঙ্গে এক রহৎ দালানে রক্ষিত ছিলাম, আমি তাঁহাদের আচরণ ও মনের ভাব বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। দুইজন ভিন্ন কাহারও মুখে বা কথায় ভয়ের ছায়া পর্যান্ত দেখিতে পাই নাই। প্রায় সকলেই তরুণবয়ক্ষ, অনেকে অল্পবয়ক্ষ বালক, যে অপরাধে ধৃত সাব্যস্ত হইলে তাহার দণ্ড যেরূপ ভীষণ তাহাতে দৃঢ়-

মতি পুরুষেরও বিচলিত হইবার কথা। আর ইহারা বিচারে খালাস হইবার আশাও বড় রাখিতেন না+ বিশেষতঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে সাক্ষী লেখাসাক্ষ্যের যেরূপ ভীষণ আয়োজন জমিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আইন-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মনে সহজেই ধারণা হয় যে, নিদোষীরও এই ফাঁদ হইতে নিগমনের পথ নাই। অথচ তাঁহাদের মুখে ভীতি বা বিষণ্গতার পরিবর্তে কেবল প্রফুল্লতা, সরল হাস্য, নিজের বিপদকে ভুলিয়া ধম্মের ও দেশের কথা। আমাদের ওয়ার্ডে প্রত্যেকের নিকট দুই-চারিখানি বই থাকায় একটি ক্ষুদ্র লাইরেরী জমিয়াছিল। এই লাইব্রেরীর অধিকাংশই ধম্মের বই, গীতা, উপনিষদ, বিবেকানন্দের পুস্তকাবলী, রামকৃষ্ণের কথামৃত ও জীবনচরিত, পুরাণ, স্তবমালা, ব্রহ্ম-সঙ্গীত ইত্যাদি। অন্য পুস্তকের মধ্যে বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী, স্থদেশীগানের অনেক বই, আর য়ুরোপীয় দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যবিষয়ক অল্পন্ন পুস্তক। সকলে কেহ কেহ সাধনা করিতে বসিত, কেহ কেহ বই পড়িত, কেহ কেহ আস্তে গল্প করিত। সকালের এই শান্তিময় নীরবতায় মাঝে মাঝে হাসির লহরীও উঠিত। "কাচেরী" না থাকিলে কেহ কেহ ঘুমাইত, কেহ কেহ খেলা করিত—-যে দিন যে খেলা জোটে, আসক্তি কাহারও নাই। কোন দিন মণ্ডলে বসিয়া কোন শান্ত খেলা— কোন দিন বা দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি, দিন কতক ফুটবল চলিল, ফুটবলটা অবশ্য অপূবৰ্ব উপকরণে গঠিত ৷ দিন কতক কানামাছিই চলিল; এক একদিন ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করিয়া একদিকে জুজুৎসু শিক্ষা অন্য দিকে উচ্চ লম্ফ ও দীর্ঘ লম্ফ আর একদিকে drafts বা দশপঁচিশ। দুই চারিজন গঞ্জীর প্রৌঢ় লোক ভিন্ন সকলেই প্রায় বালকদের অনুরোধে এই সকল খেলায় যোগ দিতেন। দেখিলাম ইহাদের মধ্যে বয়স্ক লোকেরও বালস্বভাব। সন্ধ্যাবেলায় পানের মজলিস জমিত। উল্লাস, শচীন্দ্র, হেমদাস, যাহারা গানে সিদ্ধ, তাহাদের চারিদিকে আমরা সকলে বসিয়া গান শুনিতাম। স্বদেশী বা ধম্মের গান ব্যতীত অন্য কোনরূপ গান হইত না। এক একদিন কেবল আমোদ করিবার ইচ্ছায় উল্লাসকর হাসির গান, অভিনয়, ventriloquism পেঁজেলেরে পল্প করিয়া সন্ধ্যা কাটাইত। * * * * মোকদমায় কেহ মন দিতে না, সকলেই ধম্মে বা আনকে দিন কাটাইত। এই নিশ্চিভ ভাব কঠিন কুক্রিয়াভ্যন্ত হাদয়ের পক্ষে অসম্ভব: তাহাদের মধ্যে কাঠিন্য, ক্রুরতা, কু-ক্রিয়াসজি, কুটিলতা লেশমাগ্র ছিল না। কি হাস্য কি কথা কি খেলা তাহাদের সকলই আনন্দময়, পাপহীন, প্রেমময়।

এই মানসিক স্থাধীনতার ফল অচিরে বিকাশপ্রাণ্ড হইতে লাগিল। এই-রূপ ক্ষেত্রেই ধর্মনবীজ বপন হইলে সর্বাঙ্গসুন্দর ফল সন্তবে। যীশু কয়েকজন বালককে দেখাইয়া শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "ঘাঁহারা এই বালকের তুলা, তাঁহারাই ব্রহ্মলোক প্রাণ্ড হন।" জান ও আনন্দ সত্ত্বপের লক্ষণ। যাঁহারা দুঃখকে দুঃখ জান করেন না, যাঁহারা সকল অবস্থায় আনন্দিত প্রফুল্লিড, তাঁহাদেরই যোগে অধিকার। জেলে রাজসিক ভাব প্রশ্র পায় না, আর নির্জন

কারাগারে প্রবৃত্তির পরিপোষক কিছুই নাই। এই অবস্থায় অসুরের মন চিরাভ্যস্ত রজঃশক্তির উপকরণের অভাবে আহত ব্যায়ের ন্যায় নিজেকে নাশ করে। পাশ্চাত্য কবিগণ যাহাকে eating one's own heart বলেন, সেই অবস্থা ঘটে। ভারতবাসীর মন সেই নির্জনতায়, সেই বাহ্যিক কল্টের মধ্যে চিরভন টানে আকৃষ্ট *হই*য়া ভগবানের নিক্ট ছুটিয়া যায়। আমাদের ইহাই ঘটিয়াছে। জানি না কোথা হইতে একটি স্রোত আসিয়া সকলকে ভাসাইয়া নিয়া গেল। যে কখনও ভগবানের নাম করে নাই, সেও সাধনা করিতে শিখিল। আর সেই পরম দয়ালুর দয়া অনুভব করিয়া আনন্দমগ্র হইয়া পড়িল। অনেক দিনের অভ্যাসে যোগীর যাহা হয়, এই বালকদের দু'চারি মাসের সাধনায় তাহা হইয়া গেল। রামকৃষ্ণ পর্মহংস একবার বলিয়াছিলেন, "এখন তোমরা কি দেখছ---ইহা কিছুই নয়, দেশে এমন স্রোত আসছে যে, অল্প বয়সের ছেলে তিন দিন সাধনা করে' সিদ্ধি পাবে⊹" এই বালকদিগকে দেখিলে তাঁহার ভবিষ্যদাণীর সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র থাকে না। ইহারা যেন সেই প্রত্যাশিত ধম্মপ্রবাহের মৃত্তিমভ পূর্বেপরিচয়; এই সাত্ত্বিভাবের তরল কাঠগড়া বহিয়া চারপাঁচজন ভিন্ন অন্য সকলের হাদয় মহানন্দে আপ্লুত করিয়া তুলিত। ইহার আস্বাদ যে একবার পাইয়াছে সে কখনও তাহা ভুলিতে পারে না এবং কখনও অন্য আনন্দকে ইহার তুল্য বলিয়া স্থীকার করিতে পারে না। এই সাত্ত্বিক-ভাবই দেশের উন্নতির আশা। ভাতৃভাব, আঅজ্ঞান, ভগবৎপ্রেম যেমন সহজে ভারতবাসীর মনকে অধিকার করিয়া কার্য্যে প্রকাশ পায়, আর কোনও জাতির তেমন সহজে হওয়া সভব নয়। চাই তমোবর্জন, রজোদমন, সত্তপ্রকাশ। ভারতবর্ষের জন্য ভগবানের গ্রু অভিসন্ধিতে তাহাই প্রস্তুত হইতেছে।

নবজন্ম

গীতায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিঞাসা করিলেন, "যাঁহারা যোগপথে প্রবেশ করিয়া শেষ পর্যান্ত যাইতে না যাইতে স্থলিতপদ ও যোগএকট হন, তাঁহাদের কি গতি হয়? তাঁহারা কি ঐহিক ও পার্রিক উভয় ফলে বঞ্চিত হইয়া ক্ষুখণ্ডিত মেঘের মত বিনপট হন?" উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "ইহলোকে বা পরলোকে সেইরূপ ব্যক্তির বিনাশ অসম্ভব। কল্যাণকৃৎ কখনও দুর্গতিপ্রাণ্ড হন না। পুণ্যলোকসকলে তাঁহার গতি হয়, সেখানে অনেককাল বাস করিয়া শুদ্ধ শ্রীমান্ পুরুষদের গৃহে অথবা যোগযুক্ত মহাপুরুষদের কুলে দুর্লভ জন্ম হয়, সেই জন্মে পূর্ব্বজন্মপ্রাপ্ত যোগলিপ্সাচালিত হইয়া সিদ্ধির জন্য আরও চেপ্টা করেন, শেষে অনেক জন্মের অভ্যাসে পাপমুক্ত হইয়া প্রম-গতি লাভ করেন।" যে পূর্বেজন্মবাদ চিরকাল আর্য্যধম্মের যোগল^{ন্}ধ জানের অঙ্গবিশেষ, পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার প্রতিপত্তি বিনপ্টপ্রায় হইয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার পরে বেদান্তশিক্ষাপ্রচারে ও গীতার অধায়নে সেই সত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে। স্থলজগতে যেমন heredity প্রধান সত্য, সূক্ষ্মজগতে তেমনই পূর্ব্বজন্মবাদ প্রধান সত্য। প্রীকৃষ্ণের উক্তিতে দুইটি সত্য নিহিত আছে। যোগছতট পুরুষ তাঁহার পুর্বজন্মাজিত ভানের সংস্কারের সহিত জন্মগ্রহণ করেন, সেই সংস্কার দারা বায়ুচালিত তরণীর ন্যায় যোগপথে চালিত হন। কিন্তু কম্মফলপ্রাণ্ডির যোগ্য শরীর উৎপাদনার্থ উপযুক্ত কুলে জন্মলাভ প্রয়োজন। উৎকৃষ্ট heredity যোগ্যশরীরের উৎপাদক। শুদ্ধ শ্রীমান্ পুরুষের গৃহে জন্ম হইলে শুদ্ধ সবল শরীর উৎপাদন সম্ভব, যোগীকুলে জন্মগ্রহণে উৎকৃষ্ট মন ও প্রাণ গঠিত হয় এবং সেইরাপ শিক্ষা ও মানসিক গতিলাভও হয়।

ভারতবর্ষে কয়েক বৎসর ধরিয়া দেখা যাইতেছে যেন একটি নৃত্য জাতি পুরাতন তমঃ-অভিভূত জাতির মধ্যে স্পট হইতেছে। ভারতমাতার পুরাতন সন্ততি ধন্ময়ানি ও অধন্মের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া ও সেইরাপ শিক্ষালাভ করিয়া অল্লায়, ক্লাশয়, স্বার্থপরায়ণ, সন্ধীর্ণহাদয় হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেক তেজস্বী মহাত্মা দেহপ্রাণ্ড হইয়া এই বিষম বিপৎকালে জাতিকে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের শক্তি ও প্রতিভার উপযুক্ত কন্ম না করিয়া কেবল জাতির ভবিষ্যৎ মাহাত্মা ও বিশাল কন্মের্মর ক্ষেত্র স্পিট করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদেরই পুণ্যবলে নব উষার কিরণমালা চারিদিক উছাসিত করিতেছে। ভারতজননীর নৃতন সন্ততি পিতামাতার গুণপ্রাণ্ড না হইয়া

নবজন্ম ৩১৩

সাহসী, তেজস্বী, উচ্চাশয়, উদার, স্বার্থত্যাপী, পরার্থে ও দেশহিতসাধনে উৎসাহী ও উচ্চাকাঙ্কাপূর্ণ হইয়াছে। এইজন্য আজকাল পিতামাতার বশ না হইয়া যুবকগণ স্বপথে পথিক হইতেছে, র্দ্ধে-তরুণে মতের অনৈক্য ও কার্য্যকালে বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। র্দ্ধগণ এই দেবাংশসভূত তরুণ সত্যযুগ-প্রবর্ত্তকগণকে স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতার সীমায় আবদ্ধ রাখিতে চাহিতেছেন, না বুঝিয়া কলির সাহায্য করিতেছেন। যুবকগণ মহাশন্তিস্পট অগ্নিস্ফুলিস, পুরাতন ভাঙ্গিয়া নৃতন গড়িতে উদ্যত, তাঁহারা পিতৃভন্তি ও বাধ্যতা রক্ষা করিতে অক্ষম। এই অনর্থের উপশম ভগবানই করিতে পারেন। তবে মহাশন্তির ইচ্ছা বিফল হইতে পারে না, এই নবীন সন্ততি যাহা করিতে আসিয়াছেন, তাহা সুসম্পন্ন না করিয়া যাইবেন না। এই নৃতনের মধ্যেও পুরাতনের প্রভাব আছে। অপকৃপ্ট heredity –র দোষে আসুরিক শিক্ষার দোষে অনেক কুলাসারও জন্মগ্রহণ করিয়াছে; যাহারা নব্যুগ-প্রবর্তনে আদিপ্ট তাঁহারাও অন্তনিহিত তেজ ও শক্তি বিকাশ করিতে পারিতেছেন না। নবীন্দিগের মধ্যে সত্যযুগ প্রকাশের একটি অপূর্ব্ব লক্ষণ, ধন্দের্য মতি ও অনেকের হাদয়ে যোগলিপ্সা ও অর্দ্ধবিকশিত যোগশন্তি।

আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় অভিযুক্ত অশোক নন্দী শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে একজন। যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন তাঁহারা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না যে, ইনি কোনও ষড়যন্তে লিপ্ত হইয়াছিলেনঃ ইনি অল্প ও অবিশ্বাসযোগ্য প্রমাণে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি অন্য যুবকগণের ন্যায় প্রবল দেশ-সেবার আকা>ক্ষায় অভিভূত হন নাই। বুদ্ধিতে, চরিছে, প্রাণে তিনি সম্পূর্ণ যোগী ও ভক্ত, সংসারীর গুণ তাঁহার মধ্যে ছিল না। তাঁহার পিতামহ সিদ্ধ তান্ত্রিক যোগী ছিলেন, তাঁহার পিতাও যোগপ্রাণ্ড শক্তিবিশিষ্ট পুরুষ। গীতায় যে যোগীকুলে জন্ম মানুষের পক্ষে অতি দুর্লভ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাঁহার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। অল্পবয়সে তাঁহার অন্তনিহিত যোগ-শক্তির লক্ষণ এক-একবার প্রকাশ পাইয়াছে। ধৃত হইবার বহু পূর্কে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার যৌবনকালে মৃত্যু নিদিপ্ট, অতএব বিদ্যালাভে ও সাংসারিকজীবনের পূকা আয়োজনে তাঁহার মন বসে নাই, তথাপি পিতার পরামর্শে পূর্বেঞাত অসিদ্ধি উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া তাহাই করিতেছিলেন এবং যোগপথেও আরাচ্ হইয়াছিলেন। এমন সময়ে তিনি অকসমাৎ ধৃত হইলেন। এই কম্মফলপ্রাণ্ড বিপদে বিচলিত না হইয়া অশোক জেলে যোগাভ্যাসে সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এই মোকদমায় আসামীদের মধ্যে অনেকে এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য না হইলেও অন্যতম ছিলেন। তিনি ভজি ও প্রেমে কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না। তাঁহার উদার চরিত্র, গভীর ভজি ও প্রেমপূর্ণ হৃদয় সকলের পক্ষে মুগ্ধকর ছিল। গোঁসাই-এর হত্যার সময়ে তিনি হাসপাতালে রুগ্ন অবস্থায় ছিলেন। সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভের পূর্বেই নির্জন

কারাবাসে রক্ষিত হইয়া তিনি বার বার জ্বভোগ করিতে লাগিলেন। সেই জরাবস্থাতেই মুক্তকক্ষে হিমে রাত্রি যাপন করিতে হইত। ইহাতে **ক্ষ**য়রোগ প্রাপ্ত হইয়া সেই অবস্থায়, যখন প্রাণরক্ষার আর আশা নাই, তখন বিষ্ম দভে দান্ডিত হইয়া তিনি আবার সেই মৃত্যুতাগারে রক্ষিত ছিলেন। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের আবেদনে তাঁহাকে হাসপাতালে লইবার ব্যবস্থা করা হইল, কিন্তু জামিনে মুজিদান করা হইল না। শেষে ছোটলাটের সহদয়তায় তিনি স্বগৃহে স্বজনের সেবা পাইয়া মরিবার অনুমতি পাইলেন। আপীলে মুক্ত হইবার পূর্বেই ভগবান তাঁহাকে দেহকারাবাস হইতে মুক্তি দিলেন। শেষকালে অশোকের যোগশক্তি বিলক্ষণ রৃদ্ধি পায়, মৃত্যুর দিন বিষ্ণুশক্তিতে অভিভূত হইয়া সকলকে ভগবানের মুক্তিদায়ক নাম ও উপদেশ বিতরণ করিয়া নামোচ্চারণ করিতে করিতে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। পূর্বজন্মাজিত দুঃখ-ফল ক্ষয় করিতে অশোক নন্দীর জন্ম হইয়াছিল, সেইজন্য এই অনর্থক কল্ট ও অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে। সত্যযুগ-প্রবর্তনে যে-শক্তির প্রয়োজন সেই শক্তি তাঁহার শরীরে অবতীর্ণ হয় নাই, কিন্তু তিনি স্বাভাবিক যোগশক্তি প্রকাশের উজ্জল দৃশ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। কন্মের্র গতি এইরাপই হয়। পুণ্যবান পাপফল ক্ষয় করিতে অল্পকাল পৃথিবীতে বিচরণ করেন, পরে পাপমুক্ত হইয়া দুষ্টদেহ ত্যাগ ও অন্যদেহ গ্রহণপূর্বেক অন্তনিহিত শক্তি প্রকাশ ও জীবের হিতসম্পাদন করিতে আসেন।

LETTERS

পত্রাবলী

প্রিয়তমা মূণালিনী,

তোমার ২৪এ আগপেটর পর পাইলাম। তোমার বাপ-মার আবার সেই দুঃখ হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, কোন্ ছেলেটি পরলোক গিয়াছে, তাহা তুমি লিখ নাই। দুঃখ হ'লে বা কি হয়। সংসারে সুখের অন্বেষণে গেলেই সেই সুখের মধ্যেই দুঃখ দেখা যায়, দুঃখ সর্বাদা সুখকে জড়াইয়া থাকে, এই নিয়ম যে পুর কামনার সম্বন্ধেই ঘটে তাহা নহে, সব সাংসারিক কামনার ফল এই। ধীর চিত্তে সব সুখ দুঃখ ভগবানের চরণে অর্পণ করাই মানুষের একমান্ন উপায়।

আমি কুড়ি টাকা না পড়িয়া দশ টাকা পড়িয়াছিলাম, তাই দশ টাকা পাঠাইব বলিয়াছিলাম; পনের টাকা যদি দরকার, পনের টাকাই পাঠাইব। এই মাসে সরোজিনী তোমার জন্যে দাজিলিংএ কাপড় কিনিয়াছে, তার টাকা পাঠাইয়াছি। তুমি যে এইদিকে ধার করিয়া বসেছ, তাহা কি করিয়া জানিব ? পনের টাকা লেগেছিল, পাঠাইয়াছি; আর তিন চারি টাকা লাগিবে, তাহা আগামী মাসে পাঠাইব। তোমাকে এইবার কুড়ি টাকা পাঠাইব।

এখন সেই কথাটি বলি। তুমি বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছ, যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত, সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক। এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কন্সের্মর ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়। সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ। সামান্য লোক অসাধারণ মত, অসাধারণ চেল্টা, অসাধারণ উচ্চ আশাকে যাহা বলে তাহা বোধ হয় তুমি জান। এই সকল ভাবকে পাগলামী বলে, তবে পাগলের কন্স্মক্ষেত্র সফলতা হইলে ওকে পাগল না বিনিয়া প্রতিভাবান মহাপুরুষ বলে। কিন্তু ক'জনের চেল্টা সফল হয়? সহস্র লোকের মধ্যে দশ জন অসাধারণ, সেই দশ জনের মধ্যে একজন কৃতকার্যা হয়। আমার কন্স্মক্ষেত্রে সফলতা দূরের কথা, সম্পূর্ণভাবে কন্স্মক্ষেত্রে অবতরণও করিতে পারি নাই, অতএব আমাকে পাগলই বুঝিবে। পাগলের হাতে পড়া দ্রীলোকের পক্ষে বড় অমঙ্গল, কারণ শ্রীজাতির সব আশা সাংসারিক সুখদুঃখেই আবদ্ধ। পাগল তাহার স্ত্রীকে সুখ দিবে না, দুঃখই দেয়।

হিন্দুধন্মের প্রণেতৃগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা অসামান্য চরিত্র, চেল্টা ও আশাকে বড় ভালবাসিতেন, পাগল হোক্ বা মহাপুরুষ হোক অসাধারণ লোককে বড় মানিতেন, কিন্তু এ সকলেতে স্ত্রীর যে ভয়ঙ্কর দুর্দশা হয়, তাহার কি উপায় হইবে? ঋষিগণ এই উপায় ঠিক করিলেন, তাঁহারা ৩১৮

স্ত্রীজাতিকে বলিলেন, তোমরা অন্য হইতে পতিঃ প্রমোগুরুঃ, এই মন্ত্রই স্ত্রী-জাতির একমাত্র মন্ত্র ব্ঝিবে। স্ত্রী স্বামীর সহধ্যিমণী, তিনি যে-কার্য্যই স্বধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সাহায্য দিবে, মন্ত্রণা দিবে, উৎসাহ দিবে, তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মানিবে, তাঁহারই সুখে সুখ, তাঁহারই দুঃখে দুঃখ করিবে। কার্য্য নির্বাচন করা পুরুষের অধিকার, সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া স্ত্রীর অধিকার :

এখন কথাটা এই, তুমি হিন্দুধস্মের পথ ধরিবে না নৃতন সভ্য ধস্মের পথ ধরিবে? পাগলকে বিবাহ করিয়াছ সে তোমার পূর্বজন্মাজ্জিত কন্ম-দোষের ফল। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা ভাল, সে কি রকম বন্দোবস্ত হইবে? পাঁচ জনের মতের আশ্রয় লইয়া তুমিও কি ওকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে ? পাগল ত পাগলামীর পথে ছুটিবেই ছুটিবে, তুমি ওকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, তোমার চেয়ে ওর স্বভাবই বলবান। তবে তুমি কি কোণে বসিয়া কাঁদিবে মাল্ল, না তার সঙ্গেই ছুটিবে, পাগলের উপযুক্ত পাগ্লী হইবার চেপ্টা করিবে, যেমন অন্ধরাজার মহিষী চক্ষুদ্ধয়ে বস্তু বাঁধিয়া নিজেই অন্ধ সাজিলেন ৷ হাজার ব্রাক্ষস্কুলে পড়িয়া থাক তবু তুমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে, হিন্দু পূর্ব্বপুরুষের রক্ত তোমার শরীরে, আমার সন্দেহ নাই তুমি শেষোক্ত পথই ধরিবে।

আমার তিনটি পাগলামী আছে ৷ প্রথম পাগলামী এই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তগ্বান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের, যাহা পরিবারের ভরণ-পোষণে লাগে আর যাহা নিতাভ আবশ্যকীয় তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকি রহিল, ভগবানকে ফেরৎ দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর। হিন্দুশান্তে বলে, যে ভগবানের নিকট ধন লইয়া ভগবানকে দেয় না, সে চোর। এ পর্য্যন্ত ভগবানকে দুই আনা দিয়া চৌদ্দ আনা নিজের সুখে খরচ করিয়া হিসাবটা চুকাইয়া সাংসারিক সুখে মত রহিয়াছি। জীবনের অর্দ্ধাংশটা র্থা গেল, পশুও নিজের ও নিজের পরি-বারের উদর পুরিয়া কৃতার্থ হয়।

আমি এতদিন পশুর্ত্তি ও চৌর্যার্তি করিয়া আসিতেছি ইহা বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়া বড় অনুতাপ ও নিজের উপর ঘূণা হইয়াছে, আর নয়, সে পাপ জন্মের মত ছাড়িয়া দিলাম। ভগবানকে দেওয়ার মানে কি, মানে ধর্ম-কার্য্যে ব্যয় করা। যে টাকা সরোজিনী বা ঊষাকে দিয়াছি তার জন্য কোন অনতাপ নাই, পরোপকার ধর্মা, আশ্রিতকে রক্ষা করা মহাধর্মা, কিন্তু শুধু ভাই-বোনকে দিলে হিসাবটা চোকে না। এই দুদ্দিনে সমস্ত দেশ আমার দারে আশ্রিত, আমার গ্রিশ কোটী ভাই-বোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে জনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কম্টে ও দুঃখে জর্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়।

কি বল, এই বিষয়ে আমার সহধশ্মিণী হইবে ৈ কেবল সামান্য লোকের

মত খাইয়া পরিয়া যাহা সত্যি সত্যি দরকার তাহাই কিনিয়া আর সব ভগবানকে দিব, এই আমার ইচ্ছা, তুমি মত দিলেই, ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলেই আমার অভিসন্ধি পূর্ণ হইতে পারে। তুমি বল্ছিলে 'আমার কোন উন্নতি হলো না', এই একটা উন্নতির পথ দেখাইয়া দিলাম, সে পথে যাইবে কি ?

দ্বিতীয় পাগলামী সম্প্রতিই ঘাড়ে চেপেছে, পাগলামিটা এই, যে-কোনমতে ভগবানের সাক্ষাৎ-দর্শন লাভ করিতে হইবে। আজকালকার ধর্ম্ম, ভগবানের নাম কথায় কথায় মুখে মেওয়া, সকলের সমক্ষে প্রার্থনা করা, লোককে দেখান আমি কি ধাল্মিক! তাহা আমি চাই না। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অন্তিত্ব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন-না-কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার দৃঢ় সক্ষর করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধন্দের্ম বলে, নিজের শরীরের নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, আমি সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধন্দের্মর কথা যিথ্যা নয়, যে-যে চিহেন্দর কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিবে না, কারণ তোমার অত জান হয় নাই, কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিতে কোন বাধা নাই, সেই পথে সিদ্ধি সকলের হইতে পারে, কিন্তু প্রবেশ করা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কেহ তোমাকে ধরিয়া নিয়া যাইতে পারিবে না, যদি মত খাকে তবে ইহার সম্বন্ধে আরও লিখিব।

তৃতীয় পাগলামী এই যে, অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতখলা মাঠ ক্ষেত্র বন প্রব্তে নদী বলিয়া জানে; আমি স্থদেশকে মা বলিয়া জানি, ভজি করি, পূজা করি। মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুরের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায় ? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা কদুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, ভানের বল। স্ক্রতেজ একমার তেজ নহে রস্কতেজও আছে, সেই তেজ ভানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটি অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল। তুমি ন-মাসির কথা শুনিয়া ভাবিয়াছিলে কোথাকার বদলোকে আমার সরল ভালমানুষ স্থামীকে কুপথে টানিয়া লইয়াছে। তোমার ভালমানুষ স্থামীই কিন্তু সেই লোককে ও আর শত শত লোককে সেই পথে, কুপথ হোক বা সুপথ হোক, প্রবেশ করাইয়াছিল, আরও সহস্র সহস্র লোককে প্রবেশ করাইবেন। কার্য্যসিদ্ধি আমি থাকিতেই হইবে তাহা আমি বলিতেছি না, কিন্তু হইবে নিশ্চয়ই। এখন বলি তুমি এ বিষয়ে কি করিতে চাও ? স্ত্রী স্বামীর শক্তি, তুমি উষার শিষা হইয়া সাহেব-পূজামন্ত জপ করিবে? উদাসীন হইয়া স্বামীর শক্তি খর্বা করিবে? না সহানুভূতি ও উৎসাহ দ্বিগুণিত করিবে? তুমি বলিবে, এই সব মহৎ কশ্মে আমার মত সামান্য মেয়ে কি করিতে পারে, আমার মনের বল নাই, বুদ্ধি নাই, ওই সব কথা ভাবিতে ভয় করে। তাহার সহজ উপায় আছে, ভগবানের আশ্রয় নাও, ঈশ্বর-প্রাণ্টিতর পথে একবার প্রবেশ কর, তোমার যেত্যে অভাব আছে তিনি শীঘ্র পূরণ করিবেন, যে ভগবানের নিকট আশ্রয় লইয়াছে, ভয় তাহাকে ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দেয়। আর আমার উপর যদি বিশ্বাস করিতে পার, দশ জনের কথা না শুনিয়া আমারই কথা যদি শোন, আমি তোমাকে আমারই বল দিতে পারি, তাহাতে আমার বলের হানি না হইয়া রৃদ্ধি হইবে। আমরা বলি স্ত্রী শ্বামীর শক্তি, মানে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিজের প্রতিমূত্তি দেখিয়া তাহার কাছে নিজের মহৎ আকাৎক্ষার প্রতিধ্বনি পাইয়া দ্বিগুণ শক্তি লাভ করে।

চিরদিন কি এই ভাবে থাকিবে? আমি ভাল কাপড় পরিব, ভাল আহার করিব, হাসিব নাচিব, যত রকম সুখ ভোগ করিব, এই মনের অবস্থাকে উন্নতি বলে না। আজকাল আমাদের দেশের মেয়েদের জীবন এই সঙ্কীর্ণ ও অতি হেয় আকার ধারণ করিয়াছে। তুমি এই সব ছেড়ে দাও, আমার সঙ্গে এস, জগতে ভগবানের কাজ করিতে আসিয়াছি, সেই কাজ আরম্ভ করি।

তোমার স্থভাবের একটা দোষ আছে, তুমি অতিমান্ত সরল। যে যাহা বলে, তাহাই শোন। ইহাতে মন চিরকাল অস্থির থাকে, বুদ্ধি বিকাশ পায় না, কোন কম্মে একাগ্রতা হয় না। এটা শোধরাতে হইবে, একজনেরই কথা শুনিয়া জান সঞ্চয় করিতে হইবে, এক লক্ষ্য করিয়া অবিচলিত চিতে কার্য্য সাধন করিতে হইবে, লোকের নিন্দা ও বিদূপকে তুচ্ছ করিয়া স্থির ভজি রাখিতে

আর একটা দোষ আছে, তোমার শ্বভাবের নয়, কালের দোষ। বঙ্গদেশে কাল অমন্তর হইয়াছে। লোকে গড়ীর কথাও গঙ়ীর ভাবে শুনিতে পারে নাঃ ধর্ম্ম, পরোপকার, মহৎ আকাঙ্কা, মহৎ চেল্টা, দেশোদ্ধার, যাহা গঙ্কীর যাহা উচ্চ ও মহৎ, সব নিয়ে হাসি ও বিদুপ, সবই হাসিয়া উড়াইতে চায়ঃ ব্রাহ্ম-স্কুলে থেকে থেকে তোমার এই দোষ একটু একটু হইয়াছে, বারিরও ছিল, অল্প পরিমাণে আমরা সকলেই এই দোষে দৃষিত, দেওঘরের লোকের মধ্যে ত আশ্চর্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মনের ভাব দৃঢ় মনে তাড়াইতে হয়, তুমি তাহা সহজে পারিবে, আর একবার চিন্তা করিবার অভ্যাস করিলে, তোমার আসল শ্বভাব ফুটিবেঃ পরোপকার ও শ্বার্থত্যাগের দিকে তোমার টান আছে, কেবলি এক মনের জ্বোরের অভ্যাব, ঈশ্বর-উপাসনায় সেই জ্বোর পাইবে।

এটাই ছিল আমার সেই গুপ্ত কথা। কারুর কাছে প্রকাশ না করিয়া নিজের মনে ধীর চিত্তে এই সব চিন্তা কর, এতে ভয় করিবার কিছু নাই, তবে

শ্রীঅরবিন্দের পত্র

৩২১

চিন্তা করিবার অনেক জিনিষ আছে। প্রথমে আর কিছু করিতে হইবে না কেবল রোজ আধ ঘন্টা ভগবানকৈ ধ্যান করিতে হয়, তাঁর কাছে প্রার্থনারূপে বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হয়। মন ক্রমে ক্রমে তৈয়ারী হইবে। তাঁর কাছে সক্র্যদা এই প্রার্থনা করিতে হয়, আমি যেন স্বামীর জীবন, উদ্দেশ্য ও ঈশ্বর-প্রাণ্ডির পথে ব্যাঘাত না করিয়া সক্র্যদা সহায় হই, সাধনভূত হই। এই করিবে?

তোমার

পণ্ডিচেরীর পত্র

শ্রীঅরবিন্দের পত্র

৩২৭

৭ই এপ্রিল, ১৯২০।

শ্লেহের---

তোমার চিঠি পেয়েছি, এ পর্যান্ত উত্তর লেখা হয়ে ওঠেনি। এই যে লিখতে বসেছি, সেটাও একটা miracle (আশ্চর্য্য কাণ্ড), কেন না আমার চিঠি লেখা হয় once in a blue moon (ক্ষুদে মঙ্গলবারে একবার); বিশেষ বাঙ্গলায় লেখা, যা এই পাঁচ সাত বৎসরে একবারও করিনি। শেষ করে যদি post এ (ডাকে) দিতে পারি, তা হ'লেই miracleটা (অসাধ্যসাধনটা) সম্পূর্ণ হয়।

প্রথম, তোমার যোগের কথা। তুমি আমাকেই তোমার যোগের ভার দিতে চাও; আমিও নিতে-রাজী। তার অর্থ, যিনি আমাকে ও তোমাকে প্রকাশ্যেই হোক, গোপনেই হোক, তাঁর ভাগবতী শক্তি দারা চালাচ্ছেন, তাঁকেই দেওয়া। তবে এর এই ফল অবশ্যস্তাবী জানবে যে, তাঁহারই দত্ত আমার যোগপন্থা,— যাকে পূর্ণযোগ বলি—সেই পন্থায় চলতে হবে।* * * যা নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, লেলে যা দিয়েছিলেন * * সেটি ছিল পথ খোঁজার অবস্থা, এদিক ওদিক ঘুরে দেখা; পুরাতন সকল খণ্ডযোগের এটী ওটী ছোঁয়া, তোলা; হাতে নিয়ে পরীক্ষা করা; এতীর এক রকম পুরো অনুভূতি পেয়ে ওটীর পিছনে যাওয়া।

তারপর পণ্ডিচারীতে এসে এই চঞ্চল অবস্থা কেটে গেল। অন্তর্য্যামী জগদ্ভরু আমাকে আমার পহার পূর্ণ নির্দেশ দিলেন। তার সম্পূর্ণ theory (তত্ত্ব) যোগ শরীরের দশ অঙ্গ; এই দশ বৎসর ধরে তারই development (বিকাশ) করাচ্ছেন অনুভূতিতে; এখনও শেষ হয় নি, আর দুই বৎসর লাগতে পারে।

যোগ-পহাটী কি, তা পরে লিখবো; অথবা তুমি যদি এখানে এস, তখনই সেই কথা হবে। এ বিষয়ে লেখা কথার চেয়ে মুখের কথা ভাল। এখন এই মান্ত বলতে পারি যে, পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ কশ্ম ও পূর্ণ ভক্তির সামঞ্জস্য ও ঐক্যকে মানসিক ভূমির (level) উপরে তুলে মনের অতীত বিজ্ঞান ভূমিতে পূর্ণ সিদ্ধ করা হচ্ছে তার মূলতত্ত্ব। পুরাতন যোগের দোষ এই ছিল যে, সে মন বুদ্ধিকে জানত, আর আত্মাকে জানত; মনের মধ্যেই অধ্যাত্ম অনুভূতি পেয়ে সন্তুল্ট থাকত। কিন্তু মন খণ্ডকেই আয়ন্ত করতে পারে; অনন্ত, অখণ্ডকে সম্পূর্ণ ধরতে পারে না। ধরতে হলে সমাধি, মোক্ষ, নিক্রাণ ইত্যাদিই মনের উপায়, আর উপায় নেই। সেই লক্ষ্যহীন মোক্ষলাভ এক এক জন করতে পারেন ঘটে; কিন্তু লাভ কি? ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান ত আছেনই। ভগবান মানুষে যা চান, সেটী হচ্ছে তাঁকে এখানেই মূন্তিমান করা, ব্যাপ্টিতে, সম্প্টিতে—— to realise God in life জীবনক্ষেত্রে ভগবানকে মূর্ত্ত করা)।

পুরাতন যোগপ্রণালী অধ্যাত্ম ও জীবনের সামঞ্জস্য বা ঐক্য করতে পারেনি,

জগৎকে মায়া বা অনিতা লীলা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। ফল হয়েছে জীবন-শক্তির হ্রাস, ভারতের অবনতি। গীতায় যা বলা হয়েছে, "উৎসীদেয়্রিমে লোকাঃ ন কুর্য্যাং কম্ম চেদহম্" ভারতের 'ইমে লোকাঃ' সত্য সত্যই উৎসন্ন হয়ে গেছে। কয়েক জন সন্ন্যাসী ও বৈরাগী সাধু সিদ্ধ মুক্ত হয়ে যাবে, কয়েক জন ভক্ত প্রেমে, ভাবে, আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করবে, আর সমস্ত জাতি প্রাণহীন, বুদ্ধিহীন হয়ে ঘোর তমোভাবে ডুবে যাবে, এ কিরূপ অধ্যাত্মসিদ্ধি? আগে মানসিক level এ (ভিত্তিতে) যত খণ্ড অনুভূতি পেয়ে মনকে অধ্যাত্মরসাপ্লত, অধ্যাত্মের আলোকে আলোকিত করতে হয়, তার পর উপরে উঠা। উপরে অথাৎ বিভানভূমিতে না উঠলে জগতের শেষ রহস্য জানা অসম্ভব, জগতের সমস্যা solved (মীমাংসা) হয় না। সেখানেই আত্মা ও জগৎ, অধ্যাত্ম ও জীবন––এই দ্বন্দ্বের অবিদ্যা ঘূচে যায়। তখন জগৎকে আর মায়া বলে দেখতে হয় না, জগৎ ভগবানের সনাতন লীলা, আত্মার নিত্য বিকাশ ৷ তখন ভগবানকে পূর্ণভাবে জানা, পাওয়া সম্ভব হয়; গীতায় যাকে বলে "সমগ্রং মাং জাতুম্"। অল্লময় দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান, আনন্দ, এই হল আত্মার পাঁচটী ভূমি। যতই উঁচুতে উঠি, মানুষের Spiritual evolution –এর (আধ্যাত্মিক বিকাশের) চরম সিদ্ধির অবস্থা তত্ই নিকট হয়ে আসে। বিজ্ঞানে উঠায় আনন্দে উঠা সহজ হয়ে যায়। অখণ্ড অনভ আনন্দের অবস্থায় স্থির প্রতিষ্ঠা হয়; শুধু ক্রিকালাতীত পরব্রেন্ধে নয়—-দেহে, জগতে, জীবনে। পূর্ণ সভা, পূর্ণ চৈতনা, পূর্ণ আনন্দ বিকসিত হ'য়ে জীবনে মূর্ভ হয়। এই চেপ্টাই আমার যোগপন্থার central clue (মূল কথা):

এরপ হওয়া সহজ নয়। এই পনের বৎসরের পরে আমি এইমার বিজ্ঞানের তিন্টী স্তরের নিশ্নতর স্তরে উঠে নীচের সকল র্ত্তি তার মধ্যে টেনে তালবার উদ্যোগে আছি। তবে এই সিদ্ধি যখন পূর্ণ হবে, তখন ভগবান আমার through (মধ্য) দিয়ে অপরকে অল্প আয়াসে বিজ্ঞান-সিদ্ধি দেবেন, এর কিছু মার সন্দেহ নেই। তখন আমার আসল কাজের আরম্ভ হবে। আমি কম্মসিদ্ধির জন্য অধীর নই। যা হবার, ভগবানের নির্দিণ্ট সময়ে হবে, উন্মত্তের মত ছুটে ক্ষুদ্র অহংয়ের শজিতে কম্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে প্রবৃত্তি নেই। যদি কম্মসিদ্ধি না-ও হয়, আমি ধৈর্যাচ্যুত হব না; এ কম্ম আমার নয়, ভগবানের। আমি আর কারুর ডাক শুনব না; গুগবান যখন চালাবেন তখন চলব।

বাঙ্গলা যে ঠিক প্রস্তুত নয়, আমি জানি। যে অধ্যাত্মের বন্যা এসেছে, সে হচ্ছে অনেকটা পুরাতনের নূতন রূপ, কিন্তু আসল রূপান্তর নয়। তবে এরও দরকার ছিল। বাঙ্গলা যত পুরাতন যোগকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে সেই-গুলির সংস্কার exhaust (ক্ষয়) করে আসল সার্টী নিয়ে জমী উর্বার করছে। আগে ছিল বেদান্তের পালা—অদ্বৈতবাদ, সন্ন্যাস, শঙ্করের মায়া ইত্যাদি। যা এখন হচ্ছে, এইবার বৈষণ্য ধন্দের্মর পালা—লীলা, প্রেম, ভাবের আনন্দে মেতে

যাওয়া। এইগুলি অতি পুরাতন, নবযুগের অনুপযোগী, এ সব টিকবে না, কারণ এরাপ উন্নাদনা টেঁকবার নয়। তবে বৈশ্বৰ ভাবের এই গুণ আছে যে, ভগবানের সঙ্গে জগতের একটি সম্বন্ধ রাখে, জীবনের একটি অর্থ হয়; (কিন্তু) খণ্ডভাব বলে পূর্ণ সম্বন্ধ, পূর্ণ অর্থ নাই। যে দলাদলির ভাব লক্ষ্য করেছ সেটী অনিবার্য্য। মনের ধন্মন—এই খণ্ডকে নিয়ে পূর্ণ বলা, আর-সকল খণ্ডকে বহিত্কত করা। যে সিদ্ধ (পুরুষ) ভাবটী নিয়ে আসেন, তিনি খণ্ডভাব অবলম্বন করেও পূর্ণের সন্ধান কতকটা রাখেন—(পূর্ণকে) মূর্ত্ত করতে না পারলেও। (কিন্তু) শিষ্যেরা তা পারে না, (গুরুতে তত্ত্বটি) মূর্ত্ত নয় বলে। পুঁটলি বাঁধছে বাঁধুক, দেশে ভগবান যে দিন পূর্ণ অবতীর্ণ হবেন পুঁটলি আপনি খুলে যাবে। এই সকল হচ্ছে অপূর্ণতার, কাঁচা অবস্থার লক্ষণ; তা'তে বিচলিত হুই নে। অধ্যান্ধ ভাব খেলুক দেশে, যে ভাবেই হোক, যত দলেই হোক,—পরে দেখা যাবে। এটা নব্যুগের শৈশব, এমন কি embryonic (জ্ঞাণ) অবস্থা। আভাস মাত্র, আরম্ভ নয়।

এই যোগের বিশিষ্টতা এই যে, সিদ্ধি একটু উপরে না উঠলে ভিত্তিও পাকা হয় না। (আমার যোগের) যারা সাধন করছে তাদের আগে অনেক পুরাতন সংস্কার ছিল, কয়েকটি খসেছে কয়েকটি এখনও আছে। আগে (তোমাদের) ছিল সন্ন্যাসের সংস্কার, অরবিন্দ-মঠ করতে চেয়েছিলে: এখন (তোমাদের) বুদ্ধি মেনেছে সম্যাস চাই না, (কিন্তু) প্রাণে সেই পুরাতনের ছাপ এখনও একে-বারে মুছে যায় নি । সেই জন্য সংসারে থেকে ত্যাগী সংসারী হতে বল । তোমরা কামনা ত্যাগের আবশ্যকতা বুঝেছ, কিন্তু কামনাত্যাগ আর আনন্দভোগের সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে ধরতে পার নি। আর আমার যোগটা নিয়েছিলে, যেমন বাঙ্গালীর সাধারণ স্বভাব––জানের দিক থেকে তেমন নয়, যেমন ভজির দিকে, কন্দের্মর দিকে। জান কিছু হয়েছে, অনেক বাকী আছে, আর ভাবুকতার কুয়াসা dissipated হয়নি––কাটেনি। তোমরা সাত্ত্বিকতার গণ্ডি পূরা– মাত্রায় কাটাতে পার নি, অহং এখনও রয়েছে ;এক কথায় তার development (বিকাশ) হয় নি। আমারও কোন তাড়াতাড়ি নেই, আমি তোমাদের নিজের স্বভাব অনুসারে develop করতে দিচ্ছি। এক ছাঁচে সকলকে ঢালতে চাই নে আসল জিনিষ্টাই সকলের মধ্যে এক হবে, নানা ভাবে নানা মৃত্তিতে ফুটবে। সকলে ভিতর থেকে grow করছে (বাড়ছে), গড়ে উঠছে। বাহির থেকে গঠন করতে চাই নে। তোমরা মূলটি পেয়েছ, আর সব আসবে।

ভেদপ্রতিষ্ঠ সমাজ চাই না. আত্মপ্রতিষ্ঠ--আত্মার ঐক্যের মৃত্তি—সংঘ চাই। এই idea বা ভাবকে নিয়েই দেবসংঘ নাম দেওয়া হয়েছে, যারা দেবজীবন চায় তাদেরই সংঘ দেবসংঘ। সেইরূপ সংঘ এক জায়গায় স্থাপন করে পরে দেশময় ছড়িয়ে দিতে হবে। এইরাপ চেপ্টার উপর অহমের ছায়া যদি পড়ে, সংঘ দলে পরিণত হয়। এই ধারণা সহজে হতে পারে যে, যে (শুদ্ধ) সংঘ শেষে দেখা দেবে এইটিই তাই: (যেন) সব হবে এই একমাত্র কেন্দ্রের পরিধি, যারা এর বাহিরে তারা ভেতরকার লোক নয়, (অথবা ভেতরকার) হলেও তারা প্রান্ত, আমাদের যে বর্তুমান ভাব তার সঙ্গে মেলে না বলেই (যেন প্রান্ত)।

তুমি হয়ত বলবে, সংঘের কি দরকার? মুক্ত হয়ে সর্বঘটে থাকব; সব একাকার হয়ে যাক, সেই রহৎ একাকারের মধ্যেই যা হয়। সে সত্যি কথা; কিন্তু (তা হচ্ছে) সত্যের একটি দিক মাত্র। আমাদের কারবার শুধু নিরাকার আত্মা নিয়ে নয়, জীবনকেও চালাতে হবে; আবার মূত্তি ভিন্ন জীবনের effective (কার্য্যকরী) গতি নেই। অরূপ যে মূর্ত্ত হয়েছে, সে নামরূপ গ্রহণ মায়ার খামখেয়ালি নয়; রূপের নিতান্ত প্রয়োজন আছে বলেই রূপ গ্রহণ, আমরা জগতের কোনও কাজ বাদ দিতে চাই না; রাজনীতি, বাণিজ্য, সমাজ, কাব্য, শিল্পকলা, সাহিত্য সবই থাকবে; এই সকলকে নূতন প্রাণ, নূতন আকার দিতে হবে।

রাজনীতিকে ছেড়েছি কেন? আমাদের রাজনীতি ভারতের আসল জিনিস নয় বলে, বিলাতী আমদানি, বিলাতী চঙের অনুকরণ মাত্র। তবে তারও দরকার ছিল। আমরাও বিলাতী ধরণের রাজনীতি করেছি; না করলে দেশ উঠত না; আমাদের experience (অভিজ্ঞতা) লাভ ও পূর্ণ development (বিকাশ) হতো না। এখনও তা'র দরকার আছে, বঙ্গদেশে তত নাই, যেমন ভারতের অন্য প্রদেশে। কিন্তু এখন সময় এসেছে ছায়াকে বিস্তার না করে বস্তুকে ধরবার; ভারতের প্রকৃত আত্মাকে জাগিয়ে সকল কম্ম তারই অনুরূপ করা চাই।

লোকে এখন রাজনীতিকে Spiritualise (অধ্যাত্মভাবে অনুপ্রাণিত) করতে চায় * * * তার ফল হবে, যদি কোন স্থায়ী ফল হয়, এক রকম Indianised Bolshevism (ভারতীয় বোল্সেভীজম্)। সে রকম কম্পের্যও আমার আপত্তি নেই; যাঁর যে প্রেরণা, তিনি তাই করুন। তবে এটা আসল বস্তু নয়; অস্তুদ্ধ রূপে Spiritual (অধ্যাত্ম) শক্তি চাললে—কাঁচা ঘটে কারণোদ্যির জল——হয় ঐ কাঁচা জিনিয়টা ভেঙ্গে যাবে, জল ছড়িয়ে নম্ট হবে, নয় অধ্যাত্ম শক্তি evaporate করে (লুপ্ত হয়ে) সেই অস্তুদ্ধ রূপই থাকবে; সর্বাক্ষেত্রেই তাই। Spiritual influence (অধ্যাত্ম প্রেরণা) দিতে পারি, তবে সেই শক্তি expended (খরচ) হবে শিব-মন্দিরে বানরের মূর্ত্তি গড়ে স্থাপন করতে। বানরটি প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় শক্তিমান হয়ে ভক্ত হনুমান সেজে রামের অনেক কাজ হয়ত করবে, যতদিন সেই শক্তি থাকবে। আমরা কিন্তু ভারত-মন্দিরে চাই হনুমান নয়——দেবতা, অবতার, স্বয়ং রাম।

সকলের সঙ্গে মিলতে পারি—কিন্তু সমস্তকে প্রকৃত পথে টানবার জন্য,

আমাদের আদর্শের spirit (ভাব) ও রূপকে অক্ষুপ্ত রেখে। তা না করলে দিশেহারা হব, প্রকৃত কর্ম্ম হবে না। Individually (ব্যক্তিগত ভাবে) সর্বাব্র থেকে কিছু হবে বটে, সংঘরূপে সর্বাব্র থেকে তার শতগুণ হয়। তবে এখনও সে সময় আসেনি। তাড়াভাড়ি রূপ দিতে গেলে ঠিক যা চাই তা হবে না। সংঘ হবে প্রথম চড়ান রূপ: যারা আদর্শ পেয়েছে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নানাস্থানে কাজ করবে; পরে Spiritual Commune—এর (অধ্যাত্মসংঘ) মত রূপ দিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে সব কর্ম্মকে আত্মানুরূপ, যুগানুরূপ আকৃতি দেবে। শক্ত বাধা রূপ নয়, অচলায়তন নয়; স্থাধীন রূপ, সমুদ্রের মত যা ছড়িয়ে যেতে পারে, নানাভঙ্গী লয়ে এটাকে ঘিরে, ওটাকে প্লাবিত করে, সবকে আত্মসাৎ করবে; করতে করতে Spiritual Community (দেবজাতি) দাঁড়াবে। এইটি হচ্ছে আমার বর্ত্তমান idea (ভাব), এখনও পুরো developed হয়নি। সবটা ভগবানের হাতে, তিনি যা করান।

তারপর তোমার পরের কয়েকটি বিশেষ কথার আলোচনা করি। তোমার য়াগের সম্বন্ধে যা লিখেছ, সে সম্বন্ধে এই পরে বিশেষ কিছু লিখতে চাই না, দেখা হলে সুবিধা হবে। দেহকে শব দেখা সন্মাসের নির্কাণ-পথের লক্ষণ, এই ভাব নিয়ে সংসার করা যায় না, সর্কবস্তুতে আনন্দ চাই—য়েমন আত্মায় তেমনি দেহে। দেহ চৈতন্যময়, দেহ ভগবানের রূপ। জগতে যা আছে তাতে ভগবানকে দেখলে, "সর্কামিদম্ রক্ষ—বাসুদেবঃ সর্কামিতি" এই দর্শন পেলে বিশ্বানন্দ হয়। শরীরেও সেই আনন্দের মূর্ত্ত তরঙ্গ ছোটে, এই অবস্থায় অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ হয়ে সংসার বিবাহ সবই করা যায়, সকল কম্পের্ম পাওয়া যায় ভগবানের আনন্দময় বিকাশ। (আমি নিজের মধ্যে) অনেক দিন থেকে মানসিক ভূমিতে মনের ইন্দ্রিয়ের সকল বিষয় ও অনুভূতি আনন্দময় করে তুলছি। এখন সেই সব বিজ্ঞানানন্দের (Supramental) রূপ ধারণ করছে। এই অবস্থায়ই সচিদানন্দের পূর্ণ দর্শন ও অনুভূতি।

দেবসংঘের কথা বলে তুমি লিখেছ—"আমি দেবতা নই, অনেক পিটিয়ে শানান লোহা।" * * * দেবতা কেহই নয়, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেবতা আছেন, তাঁকেই প্রকট করা দেবজীবনের লক্ষ্য। তা সকলেই করতে পারে। বড় আধার আছে, মানি। তোমার নিজের সম্বন্ধে সে বর্ণনাকে আমি accurate (যথাযথ) বলে গ্রহণ করছি না। তবে যেরূপ আধারই হোক, একবার ভগবানের স্পর্শ যদি পড়ে, আত্মা যদি জাগ্রত হন, তারপর বড় ছোট এ সবেতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। বেশী বাধা হতে পারে, বেশী সময় লাগতে পারে, বিকাশের তারতম্য হতে পারে, তারও কিছু ঠিক নেই। ভিতরের দেবতা সে সব বাধা ন্যূনতার হিসাব রাখে না; ঠেলে ওঠে। আমারও কি কম দোষ ছিল, মনের চিত্তের প্রণের দেহের কম বাধা ছিল? সময় কি লাগে নি? ভগবান কি কম পিটিয়েছেন? দিনের পর দিন, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত দেবতা হয়েছি বা কি হয়েছি জানি না; তবে কিছু হয়েছি বা হচ্ছি—ভগবান যা গড়তে

চেয়েছেন তাই যথেপ্ট। সকলেরই তাই।* * আমাদের শক্তি নয়, ভগ– বানের শক্তিই এই যোগের সাধক।

আমি যা অনেকদিন থেকে দেখছি তার দু' একটি কথা সংক্ষেপে বলি। আমার এ ধারণা হয় যে ভারতের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ প্রাধীনতা নয়, দারিন্তা নয়, অধ্যাত্মবাধের বা ধন্মের অভাব নয়, কিন্তু চিন্তাশক্তির হ্রাস—ভানের জন্মভূমিতে অজানের বিস্তার। সর্ব্বক্রই দেখি inability বা unwillingness to think,(চিন্তা করবার অক্ষমতা অনিচ্ছা) বা চিন্তা-"ফোবিয়া"। মধ্যযুগে যাই হোক, এখন কিন্তু এই ভাবটি ঘোর অবনতির লক্ষণ। মধ্যযুগ ছিল রাত্রিকাল, অজানীর জয়ের দিন। আধুনিক জগতে জানের জয়ের যুগ। যে বেশী চিন্তা করে, বিশ্বের সত্য তলিয়ে শিখতে পারে, তার তত শক্তি বাড়ে। য়ূরোপ দেখ, দেখবে দুটি জিনিস—অনন্ত বিশাল চিন্তার সমুদ্র, আর প্রকাপ্ত বেগবতী অথচ সুশৃত্থল শক্তির খেলা। য়ূরোপের সমস্ত শক্তি সেইখানে, সেই শক্তির বলে জগৎকে সে গ্রাস করতে পারছে, আমাদের পুরাকালের তপস্বীদের মত, যাদের প্রভাবে বিশ্বের দেবতারাও ভীত, সন্দৃত্ধ, বশীভূত। লোকে বলে য়ূরোপ ধ্বংসের মুখে ধাবিত। আমি তা মনে করি না। এই যে বিশ্বর, এই যে ওলটপালট—এ সব নবস্পিট্র পূর্ব্ববিস্থা।

তারপর ভারত দেখ। কয়েকজন solitary giants (একক অতিকায় মহাপুরুষ) ছাড়া সবর্গগুই * * * সোজা মানুষ, অর্থাৎ average man (সাধারণ গড়পড়তা মানুষ), যে চিন্তা করতে চায় না, পারে না, যার বিন্দুমাত্র শক্তি নেই, আছে কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা। ভারতে চায় সরল চিন্তা, সোজা কথা, য়ুরোপে চায় গভীর চিন্তা, গভীর কথা। সামান্য কুলীমজুরও চিন্তা করে, সব জানতে চায়, মোটামুটি জেনেও সম্ভুল্ট নয়, তলিয়ে দেখতে চায়। প্রভেদ এই যে মুরোপের শক্তি ও চিন্তার fatal limitation (অলঙ্ঘ্য সীমা) আছে। অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে এসে তার চিন্তাশক্তি আর চলে না। সেখানে য়ুরোপ সব দেখে হেঁয়ালি, nebulous metaphysics (কুহেলিকাময় তত্ত্ব-শাস্ত্র), yogic hallucination (যোগজ মতিপ্রম); ধোঁয়ায় চোখ রগড়ে কিছু ঠাহর করতে পারে না। তবে এখন এই limitation (সীমা) ও surmount (অতিক্রম) করবার য়ুরোপে কম চেণ্টা হচ্ছে না । আমাদের অধ্যাত্মবোধ আছে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের গুণে; আর যার সেই বোধ আছে তার হাতের কাছে রয়েছে এমন জান, এমন শক্তি যার এক ফুৎকারে য়ুরোপের সমস্ভ প্রকাণ্ড শক্তি তৃণের মত উড়ে যেতে পারে। কিন্তু সে শক্তি পাবার জন্য শক্তির (উপাসনা) দরকার। আমরা কিন্তু শক্তির উপাসক নই, সহজের উপাসক, সহজে শক্তি পাওয়া যায় না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিশাল চিন্তার সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে বিশাল জান পেয়েছিলেনঃ বিশাল সভ্যতা দাঁড় করিয়ে দিয়ে-ছিলেন। তাঁরা পথে যেতে যেতে অবসাদ এসে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ায় চিন্তার বেগ কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শক্তির বেগও কমে গেল। আমাদের সভ্যতা হয়ে গেছে

অচলায়তন, বাহ্য ধশের্মর গোঁড়ামি, অধ্যাঅভাব একটি ক্ষীণ আলোক বা ক্ষণিক উন্মাদনার তরজ। এই অবস্থা যতদিন থাকবে, ততদিন ভারতের স্থায়ী পুন-রুখান অসম্ভব।

বাসলা দেশেই এই দুর্বলতার চরম অবস্থা। বাসালীর ক্ষিপ্ত বুদ্ধি আছে. ভাবের capacity (সামর্থ্য) আছে, intuition (অন্তর্জান) আছে; এই সব গুণে সে ভারতে শ্রেষ্ঠ। এই সকল গুণই চাই, কিন্তু এগুলিই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, ধীর শক্তি, বীরোচিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে, তা হলে বাঙ্গালী ভারতের কেন, জগতের নেতা হয়ে যাবে। কিন্তু বাঙ্গালী তা চায় না, সহজে সারতে চায়, চিন্তা না করে জান, পরিশ্রম না করে ফল, সহজু সাধনা করে সিদ্ধি ৷ তার সম্বল আছে ভাবের উত্তেজনা, কিন্তু জ্ঞানশ্ন্য ভাবাতিশয্যই হচ্ছে এই রোগের লক্ষণ, তারপর অবসাদ, তমোভাব। এ দিকে দেশের ক্রমশঃ অবন্তি, জীবনশক্তি হ্রাস হয়েছে, শেষে বাঙ্গালী নিজের দেশে কি হয়েছে—খেতে পাচ্ছে না. পরবার কাপড় পাচ্ছে না, চারিদিকে হাহাকার, ধনদৌলত, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমি, চাষ পর্য্যন্ত পরের হাতে যেতে আরম্ভ করছে। শক্তিসাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। প্রেমের সাধনা করি, কিন্তু যেখানে জান ও শক্তি নাই সেখানে প্রেমও থাকে না; সঙ্গীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা আসে; ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ মনে, প্রাণে, হাদয়ে প্রেমের স্থান নাই। প্রেম কোথায় বঙ্গদেশে? যত ঝগড়া, মনোমালিন্য, ঈর্ষা, ঘূণা, দলাদলি এ দেশে আছে, ভেদক্লিস্ট ভারতে আর কোথাও তত নাই।

আর্য্যজাতির উদার বীর্যুগে এত হাঁকডাক, নাচানাচি ছিল না, কিন্তু যে চেল্টা আরম্ভ করত তারা, তা বহু শতাব্দী ধরে স্থায়ী থাকত। বাঙ্গালীর চেল্টা দু'দিন স্থায়ী থাকে।

তুমি বলছ চাই ভাবোন্মাদনা, দেশকে মাতানো। রাজনীতিক্ষেত্রে ও-সব করেছিলাম, স্থাদেশী সময়ে যা করেছিলাম সব ধূলিসাৎ হয়েছে। অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রে কি শুভতর পরিণাম হবে? আমি বলছি না যে কোনও ফল হয় নি। হয়েছে, যত movement (আন্দোলন) হয়, তার কিছু ফল হয়ে দাঁড়াবে, তবে তা অধিকাংশ possibility-র (সম্ভাবনার) রুদ্ধি, স্থিরভাবে actualise (বাস্তবন্ধপদান) করবার এটি ঠিক রীতি নয়। সেই জন্য আমি আর emotional excitement (প্রাণজ উন্তেজনা, আবেগমন্ততা), ভাব, মনমাতানোকে base (প্রতিষ্ঠা) করতে চাই না। আমার যোগের প্রতিষ্ঠা করতে আমি চাই বিশাল বীরসমতা, সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত আধারে সকল রুন্তিতে পূর্ণ, দৃঢ়, অবিচলিত শক্তিং, শক্তিসমুদ্রে জানসূর্য্যের রিশ্বির বিস্তার, সেই আলোকময় বিস্তারে অনন্ত প্রেম, আনন্দ, ঐক্যের স্থির ecstasy (তীরানন্দ)। লাখ লাখ শিষ্য চাই না, একশ ক্ষ্প্র-আমিত্বশূন্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্রন্তপে যদি পাই, তাই যথেপ্ট। প্রচলিত গুরুগিরির উপর আমার আস্থা নাই; আমি গুরু হতে চাই না। আমার স্পর্শে জেগে হোক, অপরের স্পর্শে জেগে হোক, কেহ যদি ভিতর থেকে নিজের সুশ্ত দেবের প্রকাশ করে ভগবৎ–জীবন লাভ করে, এটাই আমি চাই। এইরাপ মানুষই এই দেশকে তুলবে।

এই lecture (বজ্তা) পড়ে এ কথা ভাষবে না যে, আমি বঙ্গদেশের ভবিষ্যাৎ সম্বন্ধে নিরাশ। ওঁরা যা বলেন যে বঙ্গদেশেই এবার মহাজ্যোতির বিকাশ হবে, আমিও সেই আশা করছি।তবে other side of the shield (বিপরীত দিক), কোথায় দোষ, এটি, ন্যনতা তা দেখবার চেল্টা করেছি। এগুলি থাকলে সে জ্যোতি মহাজ্যোতিও হবে না, স্থায়ীও হবে না।

এই অসাধারণ লম্বা চিঠির তাৎপর্যা এই যে আমিও পুঁটলি বাঁধছি। তবে আমার বিশ্বাস যে সে পুঁটলি St. Peter এর (খুপ্টের প্রথম শিষা, খুল্টীয় স্থর্গের দ্বারী) চাদরের মত, অনন্তের যত শিকার তার মধ্যে গিজ গিজ করছে। এখন পুঁটলি খুলছি না, অসময়ে খুলতে গেলে শিকার পালাতে পারে। দেশেও এখন যাক্ছি না, দেশ তৈয়ারী হয়নি বলে নয়, আমি তৈয়ারী হইনি বলে। অপকৃ অপক্রে মধ্যে গিয়া কি কাজ করতে পারে?

ইভি---তোমার 'সেজদা'।

পত্রাবলী বাধা বিঘ্ন

প্রাবলী

৩৩৭

চিভাশূন্য বিশালতার অবস্থাকে প্রাণ ভালবাসে না। সে চায় গতি, যেরকম গতিই হোক, ভানের বা অভানের। কোন অচফল স্থির অবস্থা তার পক্ষে নীরস লাগে।

*

ব্যথায়, হতাশায়, নিরানন্দে, নিরুৎসাহে কেউ কখনও যোগপথে উন্নতি লাভ করেনি। ওই সব না থাকা ভাল।

*

উদ্ধের অনুভূতি চাই, নিশ্নপ্রকৃতির রাপান্তরও চাই। হর্ষ বিষাদ হতাশা নিরানন্দ সাধারণ প্রাণের খেলা, উন্নতির অন্তরায়—এসব অতিক্রম করে উদ্ধের বিশাল ঐক্য ও সমতা প্রাণে ও সর্ব্বর নামাতে হয়।

*

বাসনা দাবী খেয়াল কল্পনার জোর যতদিন থাকে প্রাণের আধিপত্য ত থাকেই। এই সব হচ্ছে প্রাণের খোরাক, খোরাক দিলে সে প্রকাণ্ড ও বলবান হবে না কেন?

*

যদি বাসনা পোষণ কর, অধীর হয়ে যাও সাধনার ফলের জন্যে, তাহলে শান্ত নীরব কেমন করে থাকবে। মানুষের স্বভাবের রূপান্তরের মত বড় কাজ, তা কি এক মুহূর্ডে হয় ? স্থির হয়ে মায়ের শক্তিকে কাজ করতে দাও, তাহলে সময়ে সব হয়ে যাবে।

*

তুমি যদি ভিতরে শান্ত ও সমপিত হয়ে থাক, তাহলে বাধা বিদ্ন ইত্যাদি তোমাকে বিচলিত করবে না। অশান্তি চঞ্চলতা আর "কেন হচ্ছে না, কবে হবে" এই ভাব চুকতে দিলে বাধা-বিদ্ন জোর পায়। তুমি বাধা-বিদ্নের দিকে অত নজর দাও কেন? মায়ের দিকে দাও। নিজের ভিতরে শান্ত সমপিত হয়ে থাক। নিশ্নপ্রকৃতির ছোট ছোট defect সহজে যায় না। তা নিয়ে বিচলিত হওয়া র্থা। মায়ের শক্তি যখন সমস্ত সন্তা অবচেতনা পর্যান্ত সম্পূর্ণ দখল করবে তখন যাবে। তাতে যতদিন লাগে তা হলেও ক্ষতি নাই। সম্পূর্ণ রূপান্তরের জন্য সময়ের দরকার।

*

আমরা দূরেও যাইনি ত্যাগও করিনি। তোমার মন প্রাণ যখন অশান্ত হয় তখন এই সব ভুল কল্পনা তোমার মনে ওঠে। বাধা যদি ওঠে, অহংকার যদি আসে, মায়ের উপর ভরসা হারাতে নেই——স্থিরভাবে তাঁকে ডাকতে ডাকতে অচঞ্চল থাক, বাধা অহংকার সরে যাবে। ৩৩৮

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

আসল কথা এই যে কাজের মধ্যে অহংকারের বা বহিঃপ্রকৃতির বশ হবে না, তা যদি হও কাজ ত আর সাধনার অংশ হয় না, তা হয়ে যায় সামান্য সাধারণ কাজের সমান। কাজকেও সম্পিত ভাবে ভিতর থেকে করতে হয়।

বহিশ্চেতনা অজ্ঞানময়, যা আসে উপর থেকে তার যেন একটা ভুল transcription, যেন ভুল নকল বা ভুল অনুবাদ করতে চায়, নিজের মত গড়তে যায়, নিজের কল্পিত ভোগ বা বাহ্যিক স্বার্থে বা অহংভাবের তৃপিতর দিকে ফিরাতে চেল্টা করে। এই হচ্ছে মানব স্বভাবের দুর্ব্বলতা। ভগবানকে ভগবানের জন্যই চাহিতে হয়, নিজের চরিতার্থতার জন্য নয়। যখন psychic being ভিতরে সকল হয়, তখন এই সব বহিঃপ্রকৃতির দোষ কমে যেতে থেতে শেষে নিশ্র্মল হয়ে যায়।

ইহা ত মানুষ মারই করে—প্রশংসায় হাল্ট, নিশায় দুঃখিত হয়। কিছু অভুত ব্যাপার নয়। তবে সাধকের পক্ষে এই দুর্বলতা অতিক্রম করাই নিতাত প্রয়োজন, স্তৃতি-নিশায় মান-অপমানে অবিচলিত থাকবে। কিন্তু তাহা সহজে হয় না—সময়ে হবে।

ইহাই সত্য চেতনার অবস্থা ও দৃষ্টি, গভীরে থাকলে বা বাহিরের চৈতন্যে এলে ইহা যদি থাকে, তা হলে সব ঠিক এগিয়ে যাবে ভাগবত উদ্দেশ্যের দিকে।

এই যোগপথে মিথ্যাই হচ্ছে বড় অন্তরায়, কোন রকম মিখ্যাকে স্থান দিতে নেই—–মনেও নয়, কথায়ও নয়, কার্যোও নয়।

তামসিক সমর্পণের সাথে তামসিক অহংকারের কোন সম্বন্ধ নাই। তামসিক অহংকার মানে "আমি পাপী, আমি দুর্ব্বল্ল. আমার কোন উন্নতি হবে না, আমার সাধনা হতে পারে না, আমি দুঃখী, ভগবান আমাকে গ্রহণ করেন নি, মরণই আমার একমাত্র আগ্রয়, মা আমাকে ভালবাসেন না, আর সকলকে ভালবাসেন" ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবা। Vital nature এরকম নিজেকে হীন দেখিয়ে নিজেকে আঘাত করে। সকলের চেয়ে খারাপ দুঃখী দুপ্ট নিপীড়িত বলে দেখিয়ে অহংভাবকে চরিতার্থ করতে চায়—বিপরীত ভাবে। রাজসিক অহংকার ঠিক উলটো। আমি বড় ইত্যাদি বলে নিজেকে ফাঁপিয়ে দেখাতে চায়।

অজ্ঞান অহংকারে ও বাসনাই হচ্ছে বাধা—–মন প্রাণ দেহ যদি উর্দ্ধৃচৈতন্যের আধার হয় তাহলে এই ভাগবত জ্যোতি শরীরে নামতে পারবে।

মানুষের মনই অবিশ্বাস কল্পনা, ভুল চিন্তায়, অপ্রদ্ধায় ভরা, অক্তানে ও দুঃখেও ভরা। সে অক্তানই সে অপ্রদ্ধার কারণ, সে দুঃখের উৎস। মানুষের বৃদ্ধি অক্তানের যন্ত্র; প্রায়ই ভুল চিন্তা ভুল ধারণা আসে, অথচ সে মনে করে আমারই চিন্তা সত্য। তার চিন্তায় ভুল আছে কি নাই আর ভুল কোথায় তা দেখে বিবেচনা করবার ইচ্ছাই তার নাই। এমন কি ভুল দেখালে অহংকারে লাগে, ক্রোধ হয় বা দুঃখ হয়, স্বীকার করতে চায় না। অথচ অপরের ভুল দোষ দেখাতে পারলে তার খুব তৃপ্তি হয়। পরের নিন্দা গুনলে সত্য বলে প্রহণ করে অমনই, কতদূর সত্য তা বিবেচনাও করে না। এরাপ মনের মধ্যে প্রদা বিশ্বাস সহজে হয় না। সেজন্য মানুষের কথা গুনতে নাই, তার প্রভাব নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে নাই। যদি গুনতে হয় আসল কথা, নিজের ভিতরে গিয়ে psychic being নকে জাগাতে হয়, তার মধ্যে থেকে আন্তে আন্তে সত্য বৃদ্ধি মনে বেড়ে যায়, সত্য ভাব ও feeling হাদয়ে আসে, সত্য প্রেরণা প্রাণে উঠে, psychic –এর আলোতে মানুষ বস্তু ঘটনা জগতের উপর নৃতন দৃশ্টি পড়ে, মনের অক্তান, ভুল দেখা, ভুল চিন্তা অবিশ্বাস অশ্রদ্ধা আর আসে না।

হয়ত শরীরে ধ্যানের কিছু বাধা আছে, যাতে বসতে চায় না, তবে ইহাও অনেকের সাধনায় ঘটে যে সাধনা আপনা আপনি চলে। জোর করে বসে ধ্যান করা আর হয় না। কিন্তু বসতে হাঁটতে গুয়ে থাকতে ঘুমোতে প্যান্ত সাধনা নামে।

*

বোধহয় বাহিরের স্পর্শ থেকে এইসব হয়েছে। এখন এই সব প্রাণের গোলমাল কয়েকজনের মধ্যে বার বার হচ্ছে। একজন থেকে গিয়ে আর একজনের মধ্যে যাচ্ছে একটা রোগের মত। বিশেষ এইভাব যে আমি মরব, আমি এই শরীর রাখব না, এই শরীরে আমার যোগ সাধনা হবে না, এটাই প্রবল। অথচ, এই দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ হতে বিনা বাধায় যোগসিদ্ধ হব, এই ধারণা অত্যন্ত মিথ্যা। এই ভাবে দেহ ত্যাগ করলে পরজন্মে বরং আরো বাধা হবে, আর মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকবেই না। এই সব হচ্ছে বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণ। তার উদ্দেশ্য সাধকের সাধনা ভেঙ্গে দিতে, মায়ের শরীরকে ভেঙ্গে দিতে, আশ্রমকে আর আমাদের কাজকৈ ভেঙ্গে দিতে। তুমি সাবধান হয়ে থাক। এই সব তোমার মধ্যে ঢুকতে দিও না।

বাইরের লোক আমাকে শাসন করে, আমার খুব লেগেছে, আমি মরে যাব, এ হচ্ছে প্রাণের অহংকারের কথা, সাধকের কথা নয়। আমি তোমাকে সতর্ক করেছি, অহংকারকে স্থান দিও না। কেহ্ যদি কোন কথা বলে, অবিচলিত হয়ে শান্তমনে নিরহংকারভাবে থাক, মায়ের সঙ্গে যুক্ত রয়ে। ৩৪০ শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

মরে যাওয়ায় কোন মিটমাট হয় না। এই জন্মে যেসব বাধাকে নচ্ট না করলে, তুমি কি মনে কর আর জন্মে সেগুলো তোমাকে ছেড়ে দেবে? এই জন্মেই পরিষ্কার করতে হয়।

এই সব প্রাণের র্থা বিলাপকে উঠতে দিলে কেমন করে অনুভূতি আসবে, এলেও কি করে টিকবে বা সফল হবে—এই প্রাণের কান্না শুধু অন্তরায় হয়ে যায়।

এই সব বিলাপ ও হাহতাশের কথা যোগপছায় অগ্রসর হবার বাধা, আর কিছু নয়——ভুধু প্রাণের একরকম তামসিকি খেলা। এই সব ছেড়ে দিয়ে শাভ-ভাবে সাধনা করলে শীঘ্র উন্নতি হয়।

যা দেখেছ তা সতাই—তবে যাকে খারাপ শক্তি বল, সে সাধারণ প্রকৃতি মার। সেই প্রকৃতিই মানুষকে প্রায় সব করায়—সাধনায় তার প্রভাব অতিক্রম করতে হয়—তবে সহজে হয় না,—দৃঢ় স্থির চেম্টায় শেষে হয়ে যায় সম্পূর্ণ-রূপে।

যখন সাধক খাঁটি চেতনার মধ্যে বাস করতে আরম্ভ করে তখনও অন্য অংশগুলি থাকে, তবে খাঁটি চেতনার প্রভাব বাড়তে বাড়তে ওইগুলোকে আন্তে আন্তে নিস্তেজ করে ফেলে।

খারাপ শক্তি ছাড়া কি এমন নীচে টানতে ও দুর্বল ব্যতিব্যস্ত করে ফেলতে পারে? Atmosphere -এ এইরাপ শক্তি অনেক ঘুরছে সাধকরা আশ্রম দেয় বলে। যদি আসে তোমার উপর, মাকে ডেকে প্রত্যাখ্যান করে দাও। কিছু করতে পারবে না, টিকতে পারবে না।

বাধা সহজে সম্পূর্ণ যায় না। খুলতে খুলতে, চেতনা বাড়তে বাড়তে শরীর-চেতনা পর্যান্ত যখন রূপান্তরিত হয় তখন বাধা সম্পূর্ণ চলে যায়। তার আগে কমে যাবে, বেরিয়ে যাবে, বাহিরে বাহিরে থাকবে,—তুমি বাধায় বিচলিত না হয়ে নিজেকে স্বতম্ভ করে রাখ। বাধাকে নিজের বলে আর স্বীকার করো না—তা হলে তার জোর কমে যাবে।

বাধা সকলের হয়—–যারা কাজ করে না, তাদেরও বিশেষ জোরে বাধা আসে।

বহিঃপ্রকৃতি ছাড়ছে না বলে বাধা হচ্ছে, বহিঃপ্রকৃতির যখন নবজন্ম হবে তখন আর বাধা থাকবে না। পত্ৰাবলী ৩৪১

আমি এই সম্বন্ধে বারবার তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে বাধা এক মুহূর্ত্তে যায় না—বাধা হচ্ছে সে-মানুষের বহিঃপ্রকৃতির স্বভাবের ফল—সে স্বভাব একদিনে বা অল্পদিনে বদলায় না—শ্রেষ্ঠ সাধকেরও নয়। তবে মায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে শান্ত ধীরভাবে উৎকণ্ঠিত না হয়ে যদি মাকে সর্ব্বদা ডেকে এগিয়ে চল, বাধা এলেও কিছু করতে পারবে না—সময়ে তার জোর কমে যাবে, নপট হয়ে যাবে, আর থাকবে না।

*

এই বাধা সকলেরই আছে। প্রতি মুহূর্তে যুক্ত হওয়া সহজে হয় না। ধীরভাবে সাধনা করতে করতে হয়ে যায়।

*

বাধা ত বিশেষ কিছু নয়, মানুষের বহিঃপ্রকৃতিতে যা থাকে তাই—সেগুলো মায়ের শক্তির working দারা ক্রমে দূরীকৃত হবে। তার জন্য চিন্তিত বা দুঃখিত হবারকোন কারণ নাই।

*

মাকে সর্বাদা সমারণ কর, মাকে ডাক তা হলে বাধা চলে যাবে। বাধাকে ভয় করো না, বিচলিত হয়ো না—স্থির হয়ে মাকে ডাক।

*

বাধা অনন্ত appear করে বটে। সে appearance সত্য নয়, রাক্ষসী মায়া মাত্র—ঠিক পথে চলতে চলতে শেষে পথ পরিষ্কার হয়ে যায়।

*

কতকটা তাই, তবে বাধা কাউকে সহজে ছাড়ে না, খুব বড় যোগীকেও নয়। মনের বাধা অপেক্ষাকৃত সহজে ছাড়ান যায়, কিন্তু প্রাণের বাধা, শরীরের বাধা তত সহজে যায় না, সময় লাগে।

*

বড় বড় সাধককেও বাধা আক্রমণ করতে পারে, তাতে কি? Psychic অবস্থা থাকলে, মায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলে এই সব আক্রমণের চেল্টা র্থা হয়ে যায়।

*

এই দুই বাধা সাধকের প্রায়ই থাকে। প্রথমটি প্রাণের, দ্বিতীয়টি শরীর-চেতনার——স্থতন্ত হয়ে থাকলে কমে গিয়ে শেষে আর থাকে না।

*

এই সব বাধা সকলেরই আসে, তা না হলে যোগসিদ্ধি অল্পদিনেই হয়ে যেত।

*

মানুষের প্রকৃতি ত সব সময় ভিতরে থাকতে পারে না—কিন্তু মাকে যখন

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

অংশুদ্ধ প্রকৃতিই সাধকের বাধার সৃষ্টি করে—কামভোগের ইচ্ছা, অজ্ঞানতা
কি মানুষের অশুদ্ধ প্রকৃতিরই অন্তর্গত। ঐশুলি সকলেরই আছে—
আসে বিচলিত না হয়ে শান্তভাবে নিজেকে পৃথক করে প্রত্যাখ্যান করতে

হাদি বল "আমি পাপী" ইত্যাদি তাতে দুর্করলতাই বাড়ে। বলতে হয়

হচ্ছে মানুষের অশুদ্ধ প্রকৃতি। এইশুলি মানুষের সাধারণ জীবনে থাকে,

—আমি চাই না, আমি ভগবানকে চাই, ভগবতী মাকে চাই—এইশুলি
সত্য চেতনার জিনিষ নয়। যতদিন আসবে ততদিন স্থিরভাবে

শান্তান করব—বিচলিত হব না, সায় দিব না।"

Sex force মানব মাত্রেরই আছে, সে impulse প্রকৃতির একটা

য়ত্র যার দ্বারা সে মানুষকে চালায়। সংসার সমাজ পরিবার সৃষ্টি
য়প্রাণীর জীবন অনেকটা তার উপর নির্ভর করে। সে জন্যে সকলের
রপ্ত sex impulse আছে। কেউ বাদ যায় না—সাধনা করলেও এই
য়লাpulse ছাড়তে চায় না, সহজে ছাড়ে না, সে প্রাণ শরীরে প্রকৃতি
সিরত না হওয়া পর্যান্ত ফিরে ফিরে আসে। তবে সাধক সাবধান হয়ে
সংযম করে, প্রত্যাখ্যান করে, যতবার আসে ততবার তাড়িয়ে দেয়——
সিরে করে শেষে লুপ্ত হয়ে যায়।

্রীরভাবে সাধনা করে চল—ক্রমে ক্রমে পুরাতন প্রকৃতির যা কিছু এখনও
আভে আভে চলে যাবে।

কথা সকলের আছে, এমন সাধক নাই আগ্রমে যার বাধা নাই। ভিতরে বিয়ে থাক, বাধার মধ্যেও সাহায্য পাবে, সত্য চৈতন্য সকল স্তরে ফুটবে।

্র তিক্ষণ বাধার কথা, আমি খারাপ আমি খারাপ ইত্যাদি কথা চিন্তা করে। কৈছে তোমার প্রধান অভ্রায়।

ভিভাবে মায়ের উপর নির্ভর করে স্থিরভাবে সাধারণ প্রকৃতিকে প্রত্যাখ্যান বুস্তে আস্তে জয় করা—–এইটি হচ্ছে এক্মাত্র পরিবর্তনের উপায়।

্বাধা ত বিরোধী শক্তির সৃষ্টি নয়—সাধারণ অশুদ্ধ প্রকৃতিরই সৃষ্টি, নুর মধ্যেই আছে।

সতার অংশ

সভার কোন অংশ ত্যাগ করা যায় না, রূপান্তরিত করতে হয়। প্রকৃতির কোন বিশেষ গতি ত্যাগ করা যায়, সন্তার অংশগুলো স্থায়ী।

সাধনা করতে করতে এমন অবস্থা হয় যে যেন স্বতন্ত দুটি সন্তা আছে, এক ভিতরের জিনিস নিয়ে থাকে, শান্ত বিশুদ্ধ ভাগবত সত্যের দৃষ্টি ও অনুভূতির মধ্যে থাকে অথবা তার সঙ্গে সংযুক্ত, আর একটি বাহিরের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ত। তারপরে দুটীর একটা ভাগবত ঐকা স্থাপন করা হয়——উধ্বৃদ্ধগৎ ও বহির্জগৎ এক হয়ে যায়।

সাধারণ মানুষের সামনের দিকই জাগ্রত—কিন্তু এই সামনের জাগ্রত চৈতন্য সত্যি-সত্যি জাগ্রত নয়, তা অবিদ্যাপূর্ণ, অজ। তার পেছনে রয়েছে inner being -এর ক্ষেগ্র—যে ভাবে রয়েছে, যেন ঘুমন্ত। কিন্তু এই আবরণটি খুললে এই পেছনের চৈতন্যই খোলা দেখা যায়, সেইখানেই আলো শক্তি শান্তি ইত্যাদি প্রথম নামে। যা বাহিরের জাগ্রত সন্তা করতে পারে না তা এই পেছনের ভেতরের সন্তা সহজে করতে পারে, ভগবানের দিকে বিশ্ব-চৈতন্যের দিকে নিজেকে খুলে বিশাল মুক্তচৈতন্য হয়ে যেতে পারে।

এই সব আক্রমণ যদি ঢুকতে না পারে বা ঢুকেও টিকতে না পারে, বুঝতে হবে যে outer being-এর চেতনা জাগ্রত হয়েছে আর তার গুদ্ধি অনেকটা progress করেছে।

ষখন অবচেত্না থেকে তমোভাব উঠে শরীরকে আক্রমণ করে, তখন এইরূপ অসুখের মতন করে—উপর থেকে মায়ের শক্তিকে শরীরের মধ্যে ডাক সব চলে যাবে।

অবচেতনার বাধা হতে মুক্ত হবার উপায় হচ্ছে প্রথম সেগুলোকে চিনে নেগুয়া, তারপর সেগুলোকে reject করা, শেষে মায়ের ভিতরের বা উপরের আলো চেতনা শরীর চেতনার মধ্যে নামান। তা হলে অবচেতনায় ignorant movements কে তাড়িয়ে তার বদলে সে চেতনার movements স্থাপিত হবে। কিন্তু এ সহজে হয় না—ধ্যেগ্রের সহিত করতে হবে——দৃঢ় patience চাই। মায়ের উপর ভরসাই সম্বল। তবে ভিতরে থাকতে পারলে, ভিতরের দৃশ্টি ও চেতনা রাখতে পারলে তত কল্ট ও পরিশ্রম হয় না—তা সব সময় পারা যায় না, তখন শ্রদ্ধা ও ধৈর্য্যের নিতান্ত প্রয়োজন হয়।

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

৬৪৬

যখন Physical consciousness প্রবল হয়ে আর সকলকে ঢেকে সমস্ত স্থান ছড়িয়ে থাকতে চেপ্টা করে, তখন এই রকম অবস্থা হয়—কারণ এই দেহ-চেতনার স্বতন্ত প্রকৃতি যখন প্রকাশ হয়, তখন সব বোধ হয় জড়বদ্ধ তমোময়, জানের প্রকাশ রহিত, শক্তির প্রেরণা রহিত। এই অবস্থাতে সম্মতি দেবেনা—যদি আসে, মায়ের আলো ও শক্তিকে এই দেহ-চেতনার মধ্যে প্রবেশ করে আলোময় ও শক্তিময় করবার জন্য ডেকে আনবে।

*

Physical -এর কেন্দ্র মেরুদণ্ডের শেষভাগে, যাকে মূলাধার বলে, সেখানে—তবে প্রায়ই দেখা দেয়না, তার presence অনুভব করা যায়।

×

এ ত প্রাণময় পুরুষ, emotional vital-এ অধিষ্ঠিত। প্রাণময় পুরুষের তিনটি স্তর আছে—হাদয়ে, নাভিতে, নাভির নীচে। হাদয়ে সে হয় emotional being, নাভিতে বাসনাময়, নাভির নীচে sensational অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের টান ও ক্ষুত্র ক্ষুদ্র প্রাণের ভাব নিয়ে ব্যস্ত।

*

আজাই এইরূপ অসীম বিরাট ইত্যাদি। ভিতরের মন প্রাণ physical consciousness যশ্বন সম্পূর্ণরূপে খোলে তারাও তাই হয়——বাহিরের মন প্রাণ দেহ তথু যত্ত, এই জগতের বাহিরের প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহার ও খেলার জন্য। বাহিরের মন প্রাণ দেহও যখন আলোময় চৈত্ন্যময় হয় তখন তারা আর সঙ্কীর্ণ আবদ্ধ বলে বোধ হয় না। তারাও অভ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

*

মনের অনেক রকম গতি হয়, যাদের কোন সামঞ্জস্য নাই—সাধকেরও হয়, সাধারণ মানুষেরও হয়, সকলেরই হয়; তবে সাধক দেখে ও জানে, সাধারণ মানুষ নিজের ভিতর কি হচ্ছে তা বোঝে না। ভগবানের দিকে সব ফিরাতে ফিরাতে এক-মন হয়ে যায়।

*

সাধারণ মনের তিনটি স্তর আছে। চিন্তার স্তর বা বুদ্ধির, ইচ্ছাশক্তির স্তর (বুদ্ধি-প্রেরিত will) আর বহিগামী বুদ্ধি। উপরের মনেরও তিনটি স্তর আছে—higher mind, illumined mind, intuition, মাথার মধ্যে যখন দেখছ, ওই সাধারণ মনের তিনটি স্তর হবে—উপরের দিকে খোলা, প্রত্যেকের মধ্যে একটি বিশেষ ভাগবতী শক্তি কাজ করতে নামছে।

*

এই বিরাট অবস্থা মাথায় যখন হয়, ওর অর্থ মন বিশাল হয়ে বিশ্বমনের সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে। গলা ইত্যাদির বিরাট হওয়ার অর্থ——সেই সেই কেন্দ্রের যে চেতনা তাদেরও সেই অবস্থা আরম্ভ হচ্ছে।

Higher mind – এ বাস করা তত কঠিন নয়—চেতনা মাথার একটু উপরে যখন ওঠে তখন তাহা আরম্ভ হয়—কিন্ত Over mind -এ উঠতে অনেক সময় লাগে, খুব বড় সাধক না হলে হয় না। এই সব স্তারে বাস করলে ম্নের বাঁধন ভেঙ্গে যায়, চেতনা বিশাল হয়ে যায়, ক্ষুদ্র অহংজ্ঞান কমে যায়, সবই এক, সকলই ভগবানের মধ্যে ইত্যাদি ভাগবত বা অধ্যান্ম জ্ঞান সহজ হয়ে যায়।

*

সাধনা হয় সময়ের প্রয়োজন অনুসারে। আগে ছিল ভিতরের সাধনায়, সহজ ধ্যানের অবস্থা—–এখন প্রয়োজন অভর বাহিরকে এক করা—–দেহ-চেতনা পর্যাস্ত।

*

জান অনেক রকম আছে—চেতনা যেমন, জানও তেমন। উর্দ্চেতনার জান সত্য ও পরিষ্কার—নিশ্ন-চেতনার জান সত্য-মিখ্যা–মিশ্রিত, অপরিষ্কার। বুদ্ধির জান একরকম, supramental চেতনার জান আর একরকম, বুদ্ধির অতীত। শাস্ত জান উর্দ্ধাচেতনার।

*

এই হচ্ছে উর্দ্ধতেনার সোপান—এই চেতনার অনেক স্তর বা সমতল ভূমি, এই সোপানে ভূমির পর ভূমিতে উঠে শেষে অতিমানসে উঠে—ভগবানের সীমাহীন আলোময় আনন্দময় অনন্তে।

*

উপরের এই জগৎ হচ্ছে উর্দ্ধানতন্যের ভূমি (plane), আমাদের যোগ-সাধনার দ্বারা নামছে। পাথিব জগৎ আজকাল বিরোধী প্রাণজগতের তাশুব-নুত্যে পূর্ণ ও ধ্বংসোনুখ।

*

Psychic being ভগবানের অংশ, সত্যের দিকে ভগবানের দিকে তার টান, আর সে-টান বাসনাশূন্য, দাবী নাই,নীচ কামনা নাই। Psychic emotion পবিদ্র নিশ্র্মল। Emotional vital -এর অংশ—বাসনা, দাবী, অহংকার, অভিমান ইত্যাদি যথেপ্ট আছে, ভগবানকে চায় নিজের অহংকার বাসনা চরিতার্থ করবার জন্যে—তবে Psychic—এর স্পর্শে শুদ্ধ পবিদ্র হতে পারে।

*

Psychic সন্তা মন প্রাণ দেহের পিছনে আর এই তিনটিকেই স্পর্শ করে থাকে। মনের ওই ধারে অধ্যান্ত সন্তা ও উর্দ্ধুচেতনা।

4

পিছন দিকে psychic being এর স্থান, আর সেখানে যত কেন্দ্র,—
যেমন হাদ্কেন্দ্র, প্রাণকেন্দ্র, শরীরকেন্দ্র, সেখানে মেরুদণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট,

সেখানে তাদের প্রতিষ্ঠার স্থান। এই জন্য এই পিছনের দিকটার চেতনার অবস্থা বড় important.

সবই নির্ভর করে psychic-এর প্রাধান্যের উপর—বহিঃপ্রকৃতি ক্ষুদ্র অহংকার আর বাসনা কামনা চরিতার্থ করবার জন্য বাস্ত, মানস পুরুষ আত্মানিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু ক্ষুদ্র অহমের তাতে কোন তৃশ্তি নাই, ক্ষুদ্রত্বকেই চায়। Psychic ভগবানকে নিয়ে ব্যস্ত, সমর্পণ তারই কাজ—এক Psychic-ই বহিঃপ্রকৃতিকে বশ করতে পারে।

হয় psychic আধারের নিয়ামক (ruler, চালক, পথপ্রদর্শক) হয়ে বুদ্ধি মন প্রাণ শরীর-চেতনাকে ভগবানের দিকে উনুখ করবে, নয় উদ্ধৃচিতনা শরীর-চেতনা পর্যান্ত নেমে সমন্ত আধারকে দখল করবে, তাহলে স্থুল চেতনায় শক্ত ভিত্তি হয়ে যাবে।

যা খুলেছে তা psychic আর heart –এর consciousness –উপর হতে আসছে higher mind –এর ও ভাগবত চেতনার আলো ও শান্তি। যা চাঁদের মত উঠছে, তা psychic থেকে আধ্যাত্মিক aspiration –এর স্লোত।

তাহাই চাই—-হাদয়পদা খোলা, সমস্ত nature হাদয়স্থ psychic being - এর বশ হওয়া, এতেই নবজনা হয়।

যোগের ভিত্তি

সংযম--প্রকৃতির গুদ্ধি--শান্তি ও সমর্পণ

নিজেকে সংযত করে রাখা—কারো দিকে আকর্ষণ হতে না দেওয়া, কারও vital টানকে প্রশ্রয় না দেওয়া, নিজেও তার উপর কিছু ফেলবেনা vital মোহ বা আকর্ষণ—ইহাকেই বলে নিজের মধ্যে ঠিক থাকা।

পাপের কথা কেন—পাপ নয়, মানুষের দুর্ববলতা। আন্থা সর্বাদা শুদ্ধ (চৈতাপুরুষও) শুদ্ধ, সাধনা দারা অন্তরতাও (inner mind, vital, psychic being) শুদ্ধ হতে পারে, অথচ external being, বহিঃসন্তা বহিঃপ্রকৃতিতে সেই চরিত্রের পুরাতন দুর্ববলতা অনেকদিন লেগে থাকতে পারে, সম্পূর্ণ শুদ্ধ করা কঠিন। চাই complete sincerity, চাই দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য, চাই সদা - জাগ্রত ভাব। Psychic being যদি সামনে থাকে, সর্বাদা জেগে থাকে, প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে ভয় নাই, কিন্তু তা সব সময়ে হয়না। রাক্ষসী মায়া সেই পুরাণো weak point-দের ধরে মনকে ভুলিয়ে প্রবেশ করবার পথ পায়। প্রত্যেকবার তাদের তাড়িয়ে দিয়ে পথ রোধ করতে হয়।

প্রাণকে ধ্বংস করতে নাই, প্রাণ ভিন্ন কোন কাজ করা যায় না, জীবনও থাকে না, প্রাণকে রূপান্তর দিতে হয়,ভগবানের যন্ত্র করতে হয়।

নিজের ভিতরে শান্তি, মায়ের শক্তি ও আলো রেখে শান্তভাবে সব কর— তাহলে আর কিছুর দরকার নাই——সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

দুই বিপরীত প্রভাবের দ্বন্দ—সত্যশক্তির প্রভাব যখন দেহকে স্পর্শ করে তখন সব সুস্থ হয়ে যায়——অবিদ্যার প্রভাবে রোগ ব্যথা স্থায়বিক বিকার ফিরে আসে।

অবিদ্যার মধ্যে যা থাকে সে-সব এক বিশ্ব-চৈতন্যের মধ্যেই থাকে আলো অন্ধকারের মত, তাই বলে আলো অন্ধকার সবই যে সমান তা নয়। অনধ কারকে বিজ্জন করবে, আলোকে বরণ করতে হবে।

কোন নিয়ম পালন করে হয়না। স্থির শান্ত দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে প্রত্যাখ্যান করলে অল্পে অবিদ্যার প্রভাব চলে যায়। উতলা হলে (বিব্রত হয়ে অল্প হয়ে হতাশ হয়ে) অবিদ্যাশক্তি আরও জোর পেয়ে আক্রমণ করবার সাহস পায়।

বাধা সহজে যায় না। খুব বড় সাধকেরও "আজই" এক মুহূর্তে সব

৩৫৪ শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

যখন শূন্য অবস্থা হয়, তখন শাস্ত হয়ে মাকে ভাক। শূন্য অবস্থা সকলেরই হয় তবে শাভ শূন্য অবস্থা হলে সাধনার উপকারী হয়——অশাস্ত হলে তার ফল হয় না। অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও উপলবিধ

অভিজ্ঞতা বাজে নয়—তাদের স্থান আছে, অর্থাৎ অনুভূতি prepare (তৈরী) করে, আধারকে খুলে দেবার সাহায্য করে, অন্য জগতের, নানা স্তরের জান দেয়। আসল অনুভূতি ভাগবত শান্তি, সমতা, আলো, জান, পবিত্রতা, বিশালতা, ভাগবত সামিধ্য, আত্মার উপলব্ধি, ভাগবত-আনন্দ, বিশ্বচৈতন্যের উপলব্ধি (যাতে অহংকার নদট হয়), নিশ্মল বাসনাশূন্য ভাগবত প্রেম, সর্বার ভাগবত দেশন, ইত্যাদির সম্যক অনুভূতি ও প্রতিষ্ঠা। এই সকল অনুভূতির প্রথম সোপান হচ্ছে উপরের শান্তির অবতরণ আর সমন্ত আধারে ও আধারের চারিদিকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা।

এই সব অভিজ্ঞতার মূল্য আছে, সত্য আছে—তাতে সাধনার উন্নতি হয়। তবে এগুলো যথেক্ট নয়—চাই অনুভূতি, ভাগবত শান্তি, সমতা, পবিৱতা, উর্দ্বের চৈতন্য জান শক্তি আনন্দের অবতরণ, প্রতিষ্ঠা—এটাই আসল।

গাছের প্রাণ আছে, চৈতন্য আছে—গাছগুলির সঙ্গে ভাবের বিনিময় সহজে হয়।

এই অনুভূতি খুব ভাল। প্রণামে মা ভিতর থেকে দিচ্ছেন,তাই feel করতে হয়—তথ্ বাহিরের appearance দেখে লোকে কত ভুল বুঝে ভিতরের দান নিতে ভুলে যায় বা নিতে পারে না।

হীরার আলো ত মায়েরই আলো, at its strongest এইরূপ মায়ের শরীর হতে বেরিয়ে সাধকের উপর পড়া খুব স্বাভাবিক, সাধক যদি ভাল অবস্থায় থাকে।

না, এ কল্পনা বা মিথ্যা নয়—-উপরের মন্দির উর্জু-চেতনার, নীচের মন্দির এই মন প্রাণ শরীরের রূপান্তরিত চেতনা—–মা নীচে নেমে এই মন্দির সৃষ্টি করেছেন আর সেখান থেকে সত্যের প্রভাব সর্ব্র তোমার মধ্যে বিস্তার কচ্ছেন।

ভাল, এইরাপ করে উর্দ্ধানতনা নামান চাই, শান্ত বিশ্বময় ভাব নিয়ে প্রথম মাথায়, (মানসক্ষেত্রে তার পর হাদয়ে emotional vital ও psychic -এ) তারপরে নাভিতে ও নাভির নীচে (vital -এ), শেষে সমস্ত physical -কে ব্যাপ্ত করে।

এই change (পিছনের দিকে) খুব ভাল, অনেকবার পিছন থেকে

শ্রীজরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

এই ধরণের আক্রমণ আসে, কিন্তু মায়েরে শক্তিও চৈতন্য সেখানে থাকলে আর প্রবেশ করতে পারে না। সাদা পদারে অর্থ এই যে সেখানে মায়ের চৈতন্য প্রকাশ হচ্ছে।

মাথায় এইরূপ হওয়ার অর্থ এই যে মন সম্পূর্ণ খুলেছে ও উপরের চেতনা গ্রহণ করেছে।

ইহাই চাই——বাহিরের জিনিষ ভিতরে যাওয়া, ভিতরের সঙ্গে এক হওয়া, ভিতরের ভাবকে গ্রহণ করা।

দেহকে এইরাপ দেখা ভাল। তবে দেহের মধ্যে চৈতন্য আবদ্ধ না থাকলে ও চৈতন্য বিশাল অসীম হয়ে গেলেও দেহকে চৈতন্যের অংশ ও মায়ের যন্ত্র বলে স্থীকার করতে হয়, শারীর চৈতন্যও রূপান্তর করতে হয়।

ইহা খুব ভাল লক্ষণ, এ নিম্নচেতনাই উঠে যাচ্ছে উদ্ভূচেতনার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। উপরের চেতনাও নামছে জাগ্রত চেতনার সঙ্গে মিলিত হবার জনো।

ইহা তোমার আজাচর অর্থাৎ ভিতরের বুদ্ধি চিন্তা দৃষ্টি ইচ্ছাশক্তির কেন্দ্র—সে এখন pressure-এর দরুন এমন খুলে গেছে জ্যোতিস্ময় হয়েছে যে উর্দ্ধ-চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয় আর উর্দ্ধ-চেতনার প্রভাব সমস্ত আধারের উপর বিস্তার করে।

মাথার উপরেই আছে উর্দুচেতনার স্থান, ঠিক মাথার উপরে সে আর্ভ হয় আর সেখান থেকে উঠে আরও উপরে অন্তে। সেখানে যে বিশাল শান্তি ও নীরবতা আছে তারই Presence তুমি অনুভব কর। সে শান্তি ও চেতনা সমস্ত আধারে নামা চাই।

বড় স্তর্টী অধ্যাত্ম চেতনা হবে, তার মধ্যে সত্যের মন্দির, তোমার vital-এর সঙ্গে এই স্তরের সম্বন্ধ স্থাপন হয়েছে, উদ্ধের শক্তি vital-এ ওঠা-নামা করছে যেন সেতু দিয়ে।

অনেকের কুণ্ডলিনীর জাগরণের অনুভূতি হয় না, কয়েকজনের হয়— এই জাগরণের উদ্দেশ্য সকল স্তর খুলে দেওয়া আর উর্জু-চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত করা, কিন্তু এই উদ্দেশ্য অন্য উপায়েও হয়। মায়ের মধ্যে থেকেই একটী emanation অর্থাৎ তাঁর সতা ও চেতনার অংশ, প্রতিকৃতি ও প্রতিনিধি হয়ে প্রত্যেক সাধকের কাছে একজন বেরিয়ে আসেন বা থাকেন তাকে সাহায্য করবার জন্যে—–প্রকৃত পক্ষে মা-ই সেই রূপ ধরে আসেন।

*

যে বিশালতা অনুভব করছ তার মধ্যে উদ্ধে বাস করতে হবে, ভিতরে গভীরেই তারই মধ্যে বাস করতে হবে—কিন্তু ইহা ছাড়া সকরে প্রকৃতির মধ্যে, এমন কি নিশ্নপ্রকৃতির মধ্যেও সে বিশালতা নামা চাই। তখন নিশ্নপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির সম্পূর্ণ রূপান্তরের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা হতে পারে। কারণ এই বিশালতা মায়ের চৈতন্যের বিশালতা—সংকীণ নিশ্নপ্রকৃতি যখন মায়ের চৈতন্যের মধ্যে বিশাল মুক্ত হয়ে যাবে, তখন সে মূল পর্যান্ত রূপান্তরিত হতে পারবে।

*

অনুভূতিকে যদি ব্যক্ত করি কথায় বা লেখায় তখন সে কমে যায় বা থেমে যায়, এইত অনেকের হয়। যোগীরা প্রায়ই সে জন্য কারুকে নিজের অনুভূতি কখন বলে না, অথবা সব দৃঢ় হয়ে গেলে তার পর বলে। তবে গুরুর কাছে, মায়ের কাছে বল্লে কমবে না, বাড়বে। বলার এই অভ্যাস স্থাপন করা উচিত।

বালকটি হাদয়স্থ ভগবান আর শক্তি ত মা-ই হবেন।

*

চক্র ঘুরছে, মানে outer being -এর মধ্যে মায়ের শক্তির কাজ চলছে—–তার রূপান্তর হবে।

*

অনুভূতি যখন হয় তখন অবিথাস না করে গ্রহণ করা ভাল। ইহা ছিল সত্য অনুভূতি---উপযুক্ত অনুপযুক্তের কথা হচ্ছে না, সাধনায় এই সব কথার বিশেষ কোন অর্থ নাই, মায়ের কাছে খুলতে পারলেই সব হয়।

*

মাথায় যা অনুভব কর তা বাহিরের মন (physical mind) আর নাভির নীচ থেকে যা অনুভব কর তাহা (lower vital) নিম্ন প্রাণ।

এইরূপ মায়ের মধ্যে মিশে যাওয়া প্রকৃত মুক্তির লক্ষণ।

*

এইরূপ শরীরে মায়ের আলো ভরে গেলে physical চেতনার রূপান্তর সম্ভব হয়।

এই অনুভূতিটি খুব সুন্দর ও সত্য—প্রত্যেক আধার এমনই মন্দির হওয়া

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

চাই। যা শুনেছ যে মা-ই সব করবেন, শুধু তাঁর মধ্যে ডুবে থাকা চাই, ইহাও খুব বড় সত্য।

*

যে বালিকাদের কথা লিখেছ তারা মায়ের শক্তি নানা স্তরে। তোমার অভিজ্ঞতাগুলি বেশ ভাল—অবস্থাও ভাল—সাধনা ভাল চলছে—বাধাগুলো আসে বহিঃপ্রকৃতি থেকে অবস্থা disturb করবার জন্য—গ্রহণ করো না।

*

কল্পনা নয়। মায়ের অনেক personality আছে, সেগুলো প্রত্যেকের different রূপ, সে-সব সময়ে সময়ে মায়ের শরীরে ব্যক্ত হয়। শাড়ীর রং যেমন, মা সে রঙের আলো বা শক্তি নিয়ে আসেন। কারণ প্রত্যেক রং এক একটা শক্তির (force-এর) দ্যোতক।

*

যা দেখেছ তা সম্পূর্ণ সত্য। এই গলার মধ্যে সন্তার একটা কেন্দ্র আছে। সে হচ্ছে externalising mind or physical mental—এর কেন্দ্র, অর্থাৎ যে মন বুদ্ধির সব খেলাকে বাহিরে আকৃতি দেয়, যে মন speech—এর অধিষ্ঠাতা, যে মন physical সব দেখে, তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মাথার নিম্নাভাগ আর মুখ তার অধিকারে রয়েছে। এই মন যদি উপরের চেতনা বা ভিতরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়, এগুলোকে ব্যক্ত করে, তবে ভাল। কিন্তু তার আরো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—নিম্ন অংশের সঙ্গে, lower vital ও physical consciousness (যার কেন্দ্র মূলাধার) যে তার সঙ্গে। এইজন্য এরকম হয়। সেই জন্যে বাক্যকে সংযত করা সাধনার বড় প্রয়োজন, যাতে সে উপরের ও ভিতরের চেতনাকে ব্যক্ত করতে অভ্যন্ত হয়, নিম্নের বা বাহিরের চেতনাকে নয়।

*

এই নীচে নামা শারীরিক চেতনার সকল সাধকেরই হয়—না নামলে সে চেতনার রূপান্তর হওয়া কঠিন।

*

এটা খুব বড় opening সূর্য্যের জ্যোতি যে নামছে——সে সত্যের জ্যোতি
—সে সত্য উদ্ধৃ মনেরও অনেক উপরে।

*

চেতনা উর্দ্ধের সত্যের দিকে খুলছে। স্বর্ণময়ূর—সত্যের জয়। মায়ের শক্তি physical পর্যান্ত নামছে—তার ফলে সত্যের আলো (সোনালী আলো) নামছে আর তুমি মায়ের দিকে শীঘ্র এগিয়ে চলছ।

শরীরের পেছনে অংশ সব চেয়ে অচেতন—প্রায়ই সবশেষে আলোকিত হয়। তুমি যা দেখেছ, তা সত্য।

*

হাঁ, তুমি নিভুল দেখেছ—মাথার উপর সাতটি পদা বা চক্র আছে তবে উদ্ধৃ মন না খুললে এগুলো দেখা যায় না।

*

উপরে খুব বড় একটি যে আছে সে ঊর্দ্ চেতনার অসীম বিশালতা। তুমি যে অনুভব করছ যে মাথা যে ঘুরে ঘুরে নেমে আসে সে ত স্থূল মাথা অবশ্য নয় কিন্তু মন-বুদ্ধি। সে ওই বিশালতার মধ্যে উঠে সেইভাবে নামে।

*

দুরকম শূন্য অবস্থা হয়—— physical তামসিক জড় নিশ্চেষ্টতা ভিতরে আর একটা শূন্যতা নিশ্চেষ্টতা হয় উর্দ্ধ চেতনার বিরাট শান্তি ও আত্মবোধ নামবার আগে। এই দুটোর মধ্যে কোনটি এসেছে তা দেখতে হবে, কারণ দুটোতেই সব থেমে যায়, ভিতরের চেতনা শূন্য হয়ে পড়ে থাকে।

*

মহেশ্বরীর দান শান্তি সমতা মুক্তির বিশালতা—তোমার এই সব বিশেষ দরকার আছে বলে তিনি তোমার আহানে দেখা দেন।

*

এ হচ্ছে তোমার ভিতরের মন আর মায়ের ভিতরের মনের যোগ—কপালে এই মনের centre —সে যোগ যখন হয় তখন সেই ভিতরের মনে ভগবৎ সত্যের দিকে একটা আকর্ষণ হয় আর উঠতে আরম্ভ করে।

*

সব সময় ভাল অবস্থা, সব সময় ভিতরে মায়ের দর্শন শ্রেষ্ঠ সাধকদেরও হয় না—সে হবে সাধনার পাকা অবস্থায়, সিদ্ধির অবস্থায়। সকলের হয় মাঝে মাঝে ভরা অবস্থা মাঝে মাঝে শূন্য অবস্থা। শূন্য অবস্থায়ও শান্ত হয়ে থাকা উচিত।

মায়ের উপর নির্ভর

কতদূর এসেছি, আর কতদূর এই সব প্রশ্নের বিশেষ কোনও লাভ নাই। মাকে কাণ্ডারী করে স্রোতে এগিয়ে চল, তিনি তোমাকে গভব্যস্থানে পৌছিয়ে দিবেন।

মা-ই গন্তব্যস্থান, তাঁর মধ্যে সবই আছে—তাঁকে পেলে সব পাওয়া যায় তাঁর চেতনার মধ্যে বাস করলে আরসব আপনিই ফুটে যায়।

মায়ের ভাব ত বদলায় না—-একই থাকে। তবে সাধকের নিজের মনের ভাবের মত দেখে যে বদলে গেছে—-কিন্তু তা সত্য নয়।

ধ্বংস হলে পরিবর্ত্তন কিসে হবে ? প্রাণের শরীরের পুরাতন প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে হবে, প্রাণকে শরীরকে নয়।

এ কথা সত্য যে সকলের মধ্যে মা আছেন ও তাঁর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ থাকা চাই, তবে সে সম্বন্ধ personal নয় সে লোকের সঙ্গে, কিন্তু মারই সঙ্গে একটা বিশাল ঐক্যের সম্বন্ধ।

একদিকে শান্তি ও সত্য চেতনার রূদ্ধি, আর দিকে সমর্পণ, ইহাই হচ্ছে সত্য পথ।

প্রাণকে ধবংস করবার ইচ্ছা ভুল ইচ্ছা—প্রাণকে ধবংস করলে শরীর বাঁচবে না, শরীর না বাঁচলে সাধনা করা যায় না।

তুমি বোধ হয় বড় বেশী শক্তি টেনেছ——সে জন্য শরীর ঠিক ধারণ করতে পাচ্ছে না। একটু শান্ত হয়ে থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

মা ভগবান ছাড়া তুমি নও——মা ত তোমার সঙ্গেই আছেন——সাধক পাতালে নামে সেখানে উপরের আলো ও চেতনা আনবার জন্য——এই বিশ্বাস রেখে ধীরচিত্তে চল, সে আলো সে চেতনা নামবেই।

মা ত আছেন তোমার ভিতরে। যে পর্দা পড়েছে physical প্রকৃতির, তারই উপর শক্তির কাজ করা হচ্ছে, সে মায়ের আলোকে শেষে transparent হয়ে যাবে।

*

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

মায়ের জয় হবেই এই বিশ্বাস সব সময় রেখে শান্ত ধীর, ভয়শূন্য হয়ে সাধনা করতে হয়।

পুরুষ কিছুই করেন না, প্রকৃতি বা শক্তিই সব করেন। ভবে পুরুষের ইচ্ছা না হলে কিছুই হতে পারে না।

শরীরে মা ত আছেনই—-গূঢ় চেতনায়—-কিন্তু যতদিন বাহির-চেতনায় অবিদ্যার ছাপ থাকে, অবিদ্যার ফলগুলো এক মুহূর্ত্তে দূরীভূত হয় না।

মা তোমাকে চান আর তুমি মাকে চাও। মাকে তুমি পাচ্ছ এবং আরও পাবে। তবে হয়ত তোমার physical consciousness -এ একটা আকাশ্যা আসতে পারে মাঝে মাঝে যে মায়ের বাহিরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ শারীরিক সামিধ্য ইত্যাদি থাকা চাই। মা ওসব দিচ্ছেন না কেন, মা হয়ত আমাকে চান না। কিন্ত জীবনের ও সাধনার এই অবস্থায় তাহা হতে পারে না, এমন কি তাহা দিলে সাধক তাতে মজবে আর ভিতরের আসল সাধনা ও রূপান্তর হবে না। চাই মার সঙ্গে ভিতরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সামিধ্য এবং চাই রূপান্তর হবে না। চাই মার সঙ্গে ভিতরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সামিধ্য এবং চাই রূপান্তর হবে। ইহাই মনে রেখে চল।

যদি মায়ের উপর শুদ্ধ প্রেম ও ভক্তি থাকে নির্ভর থাকে, তা হলে মাকে পাওয়া যায়। না থাকলে তীব্র চেম্টা দ্বারাও পাওয়া যায় না।

এ সব হচ্ছে বাহিরের প্রকৃতি যা সাধকের চারিদিকে ঘোরে (ঘুরে বেড়ায়)
প্রবেশ করবার জন্য। নিজের মন প্রাণ দেহ এই বাহিরের প্রকৃতির কবলে
থাকলে সেই রূপ পর্দা হয় বটে, কিন্তু মায়ের উপর নির্ভর করলে, মায়ের সঙ্গে
যুক্ত থাকলে, মায়ের শক্তি সে পর্দা সরিয়ে মন প্রাণ দেহ-চেতনাকে মায়ের
যন্তে পরিণত করবে।

এই সময় physical consciousness -এর উপর শক্তি কাজ করছে, সেই জন্য অনেকের এই physical consciousness -এর বাধা প্রবলভাবে উঠেছিল—তোমার চঞ্চলতার কারণ এই যে এই বাহিরের physical consciousness -এর সঙ্গে নিজেকে identify করেছিলে, যেন সে চেতনাই তুমি। কিন্তু আসল সন্তা ভিতরে যেখানে মায়ের সঙ্গে সংযোগ থাকে। সেইজন্য physical consciousness -এর অক্তান কামসিকতা ভুল-বোঝা ইত্যাদি নিজের বলে গ্রহণ করতে নেই, যেন বাহিরের যন্ত্র; সেই যন্তের যত দোষ অসম্পূর্ণতা সব মায়ের শক্তি সারিয়ে দেবে এই জ্ঞানই রেখে ভিতর থেকে

সাক্ষীর মত অবিচলিত হয়ে দেখতে হয়—মায়ের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রেখে।

মায়ের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও গ্রদ্ধা যার আছে, সে সব সময় মায়ের কোলে, মায়ের মধ্যে থাকে। বাধা উঠতে পারে, কিন্তু হাজার বাধা তাকে বিচলিত করতে পারে না। সে বিশ্বাস সে শ্রদ্ধা সব সময়, সব অবস্থায়, সব ঘটনায় অটুট রাখা, এ হল যোগের মূল কথা, আর সব গৌণ, এটাই হচ্ছে আসল।

এসব বিলাপ ও আক্রোশ তামসিক অহংকারের লক্ষণ——আমি পারি না, আমি মরব, আমি চলে যাব ইত্যাদি করলে বাধা আরও ঘনিয়ে এসে তামসিক অহংকারকে বাড়িয়ে দেয়, এতে সাধনার কোন উন্নতির সাহায্য হয় না। আমি একথা তোমাকে বার বার লিখেছিলাম, আসল কথা আর একবার লিখি। তোমার সাধনা নদট হয়নি, যা পেয়েছিলে তাও চলে যায়নি, পর্দার পিছনে পড়েছে শুধু। সাধনার পথে একটা সময় আসে যখন চেতনা একেবারে physical plane-এ নেমে যায়। তখন ভিতরের সভার উপর, ভিতরের অনভূতির উপর একটা অপ্রবৃত্তির ও অপ্রকাশের পদা পড়ে, এমন বোধ হয় যে সাধনা আর কিছুই নাই, aspiration নাই, অনুভূতি নাই, মায়ের সালিধ্য নাই, একেবারে সাধারণ মানুষের মত হয়েছি। এই অবস্থা যে ওধু তোমারই হয়েছে তা নয়, সকলের হয় বা হয়েছে, বা হবে, এমন কি শ্রেষ্ঠ সাধকেরও হয় ৷ কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে এই যে এটা সাধন পথের একটা passage মাত্র, যদিও বড় দীর্ঘ passage 👍 এ অবস্থায় না নামলে পুরো রাপান্তর হয় না ৷ এই ভূমিতে নেমে সেখানে স্থির হয়ে মায়ের শক্তির খেলা. রূপান্তরের কাজ ডেকে আনতে হয়, আন্তে আন্তে সব cleared হয়ে যায়, অপ্রকাশের বদলে দিব্য প্রকাশ হয়, অপ্রবৃত্তির বদলে দিব্য লীলা ও অনভূতির প্রকাশ হয়, ভুধু ভিতরে নয়, বাহিরে, ভুধু উচ্চ ভূমিতে নয়, নিম্ন ভূমিতে, শরীর চেতনায়, অবচেতনায়ও হয়। আর যে সব অনুভূতির উপর পদা পড়েছিল, সেগুলো বেরিয়ে আসে, এই সব ভূমিকেও অধিকার করে। কিন্তু সহজে শীঘ্র হয় না, আস্তে আস্তে হয়---ধৈর্য্য চাই, মায়ের উপর বিশ্বাস চাই, দীর্ঘকালব্যাপী সহিফুতা চাই ৷ যে ভগবানকে চায় তাকে ভগবানের জন্য কণ্ট স্বীকার করতে হয়। যে সাধনা চায়, তাকে সাধনার পথের কল্ট বাধা বিপরীত-অবস্থাকে সহ্য করতে হয়। শুধু সাধনায় সুখ ও বিলাস চাইলে চলবে না, বাধা আছে বলে, বিপরীত অবস্থা আসে বলে কেবল কান্নাকাটি ও নিরাশা পোষণ করলে চলবে না। তাতে পথ আরও দীর্ঘ হয়। ধৈর্য্য চাই, শ্রদ্ধা চাই, মায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর চাই।

এই কথা, মাকে প্রথম পেতে হবে ভিতর থেকে, বাহির থেকে নয়---বাহির

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ত থাকা চাই, কিন্তু সে সব উপরি-উপরি (out er surface) থাকা উচিত—তুমি নিজে ভিতরে মায়ের নিকট থাকবে, আর সেখান থেকে ওই সব দেখবে—ইহাই চাই,—ইহাই কম্ম্যোগের প্রথম সোপান—তার পর ভিতর থেকে মায়ের শক্তি দ্বারা সব বাহিরের কম্ম ইত্যাদি চালিয়ে নেবে, ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় অবস্থা। ইহা করতে পারলে আর কোন গোল—মাল থাকে না।

*

ভিতরের দিক দিয়ে প্রথমে মাকে পেতে হয়। পরে বাহিরটী যখন সম্পূর্ণ বশে আসে, বাহিরে সর্ব্বদা অনুভব করা যায়।

*

এইটী সব সময় মনে রাখতে হয় যে, যেই অবস্থা হোক, যতই বাধা আসুক, যতই সময় লাভক কিন্তু মায়ের উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে চলতে হয়, তাহলে গভব্য স্থানে পৌছে যাওয়া অনিবার্য—কোনও বাধা, কোনও বিলম্ব, কোনও মন্দ অবস্থা শেষ সফলতাকে ব্যর্থ করতে পারবে না।

*

যেমন এই সাধনায় চ্ঞালতা দূর করতে হয়, দুঃখকেও স্থান দিতে নাই। মায়ের উপর নির্ভর করে স্থির চিত্তে শান্ত প্রসন্থ মনে এগুতে হয়। যদি মায়ের উপর নির্ভর থাকে তাহলে দুঃখের স্থান কোথায়। মা দূরে নন, সর্কাদা কাছেই থাকেন। সে জ্ঞান সে বিশ্বাস সব সময় রাখতে হয়।

*

প্রণামে বা দর্শনে মায়ের বাহিরের appearance (চেহারা) দেখে তিনি সুখী বা দুঃখিত ইহা অনুমান করা উচিত নয়। লোকে তাই ক'রে কেবলই ভুল করে, মিথ্যা অনুমান করে মা অসম্ভল্ট মা কঠোর মা আমাকে চায় না দূরে রাখছে ইত্যাদি কত মিথ্যা কল্পনা আর তাতে নিরাশ হয়ে নিজের পথের নিজে ব্যাঘাত স্পিট করে। এই সব না করে নিজের ভিতরে মায়ের উপর মায়ের 'love (ভালবাসা) ও help (সাহায্য)-এর উপর অটল বিশ্বাস রেখে প্রফুল্প শান্ত মনে সাধনায় এগুতে হয়। যারা তাই করে, তারা নিরাপদ থাকে—বাধা এলে, অহংকার এলে তাদের স্পর্শ করতে পারে না, তারা বলে মা-ই আছেন, তিনি যা করেন তাই ভাল, তাঁকে আমি এমুহূর্ত্ত না দেখতে পেলেও আমার কাছে রয়েছেন, আমাকে ঘিরে রয়েছেন, আমার কোন ভয় নাই। ইহাই করতে হয়। এই ভরসা রেখেই সাধনা করতে হয়।

*

এমন অবস্থা হওয়া চাই যে চেতনা ভিতরে থাকবে মায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আর মায়ের শক্তি কাজ করবে, বাহিরের চেতনা সে শক্তির যত্ত হয়ে কাজ করবে—কিন্ত এই অবস্থা পুরোপুরি রূপে সহজে আসে না। সাধনা করতে করতে আসে, আর আন্তে আন্তে complete (সম্পূর্ণ) হয়ে যায়।

সূক্ষদৰ্শন-প্ৰতীক-বৰ্ণ

যেমন ধ্যানে নানা রকম দৃশ্য দেখা যায়, সেই রকম ধ্যানে লেখাও দেখা যায়। এই সব লেখাকে আমরা লিপি বা আকাশলিপি নাম দি, এই লেখাওলো বন্ধ চোখেও দেখা যায়, খোলা চোখেও দেখা যায়।

এই সকল হচ্ছে symbols — যেমন সাদা ফুল চেতনার প্রতীক, সূর্য্য জানের বা সত্যের, চন্দ্র অধ্যাত্ম-জ্যোতির, তারা স্পিটর, অগ্নি তপস্যার বা aspiration –এর।

সোনার গোলাপ = সত্যচেতনাময় প্রেম ও সমর্পণ। সাদা পদ্ম = মায়ের চেতনা (Divine Consciousness) ।

গাভী চেতনা ও আলোকের প্রতীক। সাদা গাভীর অর্থ উপরের শুদ্দ চেতনা।

শিশুটী তোমার psychic being, তোমার ভিতরে সত্যের জিনিষ বার করে আনছে—রান্তাটী হচ্ছে higher mind -এর রাস্তা, সত্যের দিকে উঠছে।

বেদযভে পাঁচটী অগ্নি থাকে, পাঁচটী না থাকলে যজ পূর্ণ হয় না। আমরা বলতে পারি psychic-এ, মনে, প্রাণে, দেহে ও অবচেতনায়, এই পাঁচটী অগ্নির দরকার।

গাছটী ভিতরের spiritual life, তার উপরে বসেছে সত্যের বিজয়ম্বরূপ স্থর্ণময়ূর, প্রত্যেক ভাগে: চন্দ্র অধ্যাত্ম শক্তির আলো।

মাথার উপরে একটা পদা আছে, সে হচ্ছে ওই উর্দ্ধেতেনার কেন্দ্র। সে পদাই হয়ত ফুটতে চায়।

প্রাণে যে আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ হতে আরম্ভ করেছিল, সেটাই অর্দ্ধচন্দ্র।
চন্দ্রপ্রহণ হয়েছিল। সবুজ রঙের অর্থ খাঁটি প্রাণশক্তি। সূর্য্যের উদয় =
সত্যচেতনার প্রকাশ প্রাণভূমিতে।

চন্দ্র=অধ্যাত্মের আলোক। হস্তি=বলের প্রতীক।

প্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

৩৭৪

সোনার হস্তি=সত্যচেতনার বল। সবুজ ত emotion -এর আলোর রং।

সূর্য্যের অনেক রূপ আছে, অনেক বর্ণের আলোরঃ সূর্য্য যেমন লাল, তেমনই হিরুদ্রয়, নীল, সবুজ, ইত্যাদি।

নীল= Higher mind, সূর্য্যের আলো= Light of Divine Truth. উজ্জ্বল লাল= Divine Love, নয় উর্দ্ধচেতনার Force .

প্রাণের উর্দ্ধৃগামী অবস্থা ভগবানের দিকে সত্যের দিকে। সত্যের (সোনার রং) ও higher mind -এর (নীল আলোর) প্রভাব মূর্ত হয়ে উঠে নেমে ঘুরছে, সেই উর্দ্ধৃগামী প্রাণচেতনায়।

নীল আলো আমার, সাদা আলো মায়ের—হখন উর্দ্তেতনা (higher consciousness) বিশ্বময় ভাব নিয়ে আধারে প্রথম নামতে সুরু করে, তখন নীল আলো দেখা খুব স্বাভাবিক।

ইহা হচ্ছে মনের উপর উদ্ধৃতিতন্য, যেখান থেকে আসে শান্তি শক্তি আলো ইত্যাদি—সাদাপদা মায়ের চৈতন্য, লালপদা আমার চৈতন্য—সেখানে জান ও সত্যের আলো সর্বাদা আছে।

নীল ত higher mind এর বর্ণ—নীল পদ্ম—সেই উর্দ্ধনের উন্দী-লন তোষার চেতনায়।

সাদ্য আলো Divine Consciousness –এর আলো—–নীল আলো higher consciousness –এর—রৌপ্যের মত আলো আধ্যাত্মিকতার আলো।

সাপ হচ্ছে Energy (শক্তি)-র প্রতীক। উদ্ধের একটি Energy মাথার উপরে higher consciousness -এ দাঁড়িয়ে আছে।

জল চেতুনার প্রতীক—যা ওঠে তা চেতুনার আকাৎক্ষা বা তপস্যা।

যদি সাদাটে নীল আলো (white blue) হয় সে আমার আলো— যদি সাধারণ আলো হয়, সে উপরের জ্ঞানের আলো। পত্ৰাবলী

৩৭৫

কমলালেবুর রংয়ের অর্থ Divine⊸এর সঙ্গে মিলন ও অপাথিব চেতনার স্পূৰ্ণ।

*

মূলাধার physical-এর Inner centre — পুকুরটি চেতনার একটি opening বা formation সে চেতনার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের presence **নাল** পদ্ম, আর inner physical –এ প্রেমের গোলাপী আলো নামছে।

.

সাপ হচ্ছে প্রকৃতির শক্তি—-মূলাধার (physical centre) তার একটি প্রধান স্থান—-সেখানে কুগুলিত অবস্থায় সুণ্ত হয়ে থাকে। যখন সাধনার দারা জাগ্রত হয়, তখন উপরের দিকে ওঠে সত্যের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য। মায়ের শক্তির অবতরণে সে এর মধ্যে স্থর্পময় হয়েছে, অর্থাৎ ভাগবত সত্যের আলোয় ভরা।

*

এই সব অডিজতায় পাথিব মাতা হচ্ছে পাথিব প্রকৃতি, সাধারণ বহিঃ– প্রকৃতির প্রতীক মাত্র।

*

(Red Lotus)-The Divine Harmony.

(Blue Light)-The Higher Consciousness.

(Golden Temple) - The Temple of the Divine Truth.

ধীর স্থির হয়ে থাক, তবে তোমার বাহিরেও, তোমার বহিঃপ্রকৃতিতে, তোমার জীবনে আন্তে আন্তে এই সকল ফলবে।

*

সাদা গোলাপ মায়ের কাছের প্রেমময় আত্মসমর্পণ, তার ফল সত্যের আলোকের বিস্তার আধারের মধ্যে। সাদা পদ্ম মায়ের চেতনা প্রস্ফুটিত তোমার মানস স্তরে। কমলালেবুর রংয়ের মত আলো(red-gold) দেহের মধ্যে প্রম সত্যের দীশ্তি (Supramental in physical).

শ্রদ্ধা–বিশ্বাস–নির্ভরতা

শান্তভাবে বসে মাকে সমরণ করে মায়ের কাছে নিজেকে খুলে রাখ—– ধ্যানের নিয়ম এই।

উভয় রকম করা শ্রেষ্ঠ। যদি দূরে থেকে শুধু সাধনা করা সম্ভব হত, তা হলে তাই শ্রেষ্ঠ হত, কিন্তু তা সব সময় করা যায় না। কিন্তু আসল কথা এই যে, psychic -এর মধ্যে তোমার দৃঢ় স্থান বা নিরাপদ দুর্গ করে সাধনা করতে হয়—অর্থাৎ স্থির ধীরভাবে মায়ের উপর নির্ভর করা। অধীর না হয়ে প্রসন্ধ চিত্তে বলা, "তুমি যা বলছ, তা সত্য—এই ছোট ছোট অসম্পূর্ণতা ইত্যাদিই এখন আসল অন্তরায় বড় বাধার চেয়ে।" কিন্তু এগুলো আন্তে আন্তে বার করতে হয়, অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণতায় রূপান্তরিত করতে হয়, হঠাৎ করা যায় না। অতএব সেগুলো দেখে দুঃখিত বা অধীর হতে নাই, মায়ের শক্তিই আন্তে আন্তে সেগতে করে ফেলবে।

সত্যের সোজা পথ খোলা অন্তরে। যা সমর্পণ করা হয় সেই অবস্থায় সহজ সরলভাবে উপরে মায়ের কাছে গিয়ে সত্যের সঙ্গে মিলিত হয়, সত্যময় হয়ে যায়।

ভীত বা বিচলিত হয়ো না, যোগপথের নিয়ম এই, অন্ধকারের অবস্থা অতিক্রম করে যেতে হয়, অন্ধকারেও শান্ত হয়ে থাক।

তপস্যা শুধু এই, স্থির থাকা, মাকে ডাকা, খুব শান্ত দৃঢ়ভাবে অশান্তিকে, নিরাশাকে, কামনা-বাসনাকে প্রত্যাখ্যান করা।

শান্তি সত্য ইত্যাদি আগে ভিতরে স্থাপিত হয়, তারপরে বাহিরে কার্যো পরিণত হয়।

শূন্য অবস্থাকে ভয় করতে নেই। শূন্য অবস্থার মধ্যেই ভগবৎ শান্তি নেমে আসে। মা তোমার মধ্যে সক্র্যাই আছেন—তবে শান্তি শক্তি আলো নিজের মধ্যে স্থাপিত না হলে তা সব সময় বোঝা যায়না।

এটা কি মন্ত বড় অহংকার নয় যে তোমারই জন্যে এত কাণ্ড হয়েছে? আমি খুব ভালো, খুব শক্তিমান, আমার দারাই সব হচ্ছে, আমা ছাড়া মায়ের কাজ চলতে পারে না, এ ত এক রকম অহংকার। আমি খারাপের চেয়ে খারাপ,

শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

আমারই বাধার জন্য সব বন্ধ হয়েছে, ভগবান তাঁর কাজ চালাতে পারেন না, এই আর এক উল্টো অহংকার।

সব সময়ে স্থির হয়ে থাক——মায়ের শক্তিকে শান্তভাবে ডেকে, সব উদ্বেগ ছেড়ে দিয়ে।

এই feeling, এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সব সময় রাখতে হয়; সাধকের এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস faith, conviction, মায়ের শক্তির প্রধান সহায়।

সাধনা করতে হয় দৃঢ় শান্ত মনে, মায়ের উপর অটুট শ্রদ্ধা ও নির্ভরতারেখে। Depression নক কখনও স্থান দিতে নাই। যদি আসে ত প্রত্যাখ্যান করে দৃর করে দিতে হয়। আমি নীচ, অধম, আমার দ্বারা হবে না, মা আমাকে দৃর করেছেন, আমি চলে যাব, আমি মরব, এ সব চিন্তা যদি আসে তবে জানতে হবে যে এইসব নিশ্ন প্রকৃতির suggestions, সত্যের ও সাধনার বিরোধী। এই সব ভাবকে কখন আশ্রয় দিতে নাই।

দুঃখ কেন পাচ্ছ? মায়ের উপর নির্ভর করে সমতা রাখলে দুঃখ পাবার কথা নাই। মানুষের কাছে সুখ ও শান্তি ও আনন্দ পাবার আশা র্থা।

এই চিন্তা ও ভয়ের বদলে এই নিশ্চয়তা ও শ্রদ্ধা রাখতে হয় যে যখন একবার মায়ের সঙ্গে ভিতরে যোগ হয়েছে,—তখন হাজার বাধা হলেও বহিঃ-প্রকৃতির যতই না দোষ বা অসম্পূর্ণতা থাকুক মায়ের জয় আমার মধ্যে অবশ্যভাবী, অন্যথা হতেই পারে না।

সব সময় মায়ের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে হয় যে তাঁরই হাতে আছি; তাঁর শক্তিতে সব হবে, তাহলে বাধার জন্য দুঃখ বা নিরাশা আসতে পারবে না।

তাতে ব্যস্ত হয়ো না। সব সময়ে চেপ্টা করে মনে রাখা সহজ নয়—– যখন মায়ের presence –এ সমস্ত আধার ভরে যাবে তখন সেই সমরণ আপনিই থাকবে, ভুলে যাবার যো থাকবে না।

শান্তভাবে সাধনা করতে করতে অগ্রসর হও——দুঃখ বা নিরাশাকে স্থান দিও না——শেষে সব অন্ধকার সরে যাবে।

*

ইহা ত সকলেরই হয়——ভাল অবস্থায় সকাদো থাকা বড় কঠিন, অনেক সময় লাগে——স্থির হয়ে সাধনা করো, বিচলিত হয়ো না। সময়ে হয়ে যাবে।

সাধনা ত মাকে feel করা কাছে ও ভিতরে, মা সব করছেন বলে অনুভব করা, মায়ের সব জিনিস ভিতরে receive করা। এই অবস্থা থাকলে পড়াতে মন দিলে কোন ক্ষতি হতে পারে না।

হাঁা, ওই রকম কাঁদলে দুর্বলতা আসে। সব সময়, সব অবস্থায় ধীর শাভ হয়ে মায়ের উপর নির্ভর করে মাকে ডাক। তাহলে ভাল অবস্থা শীঘ্র ফিরে আসে।

আমার কথা—যা অনেকবার বলেছি—তা জুলে যেয়ো না। উতলা না হয়ে স্থির শান্তভাবে সাধনা কর, তাহলেই সব আন্তে আন্তে ঠিক পথে আসবে। উচ্চিঃস্বরে ক্রন্দন ভাল নয়—শান্তভাবে মাকে ডাক, তাঁর কাছে সমর্পণ কর। প্রাণ যতই শান্ত হয়, ততই সাধনা steadily এক পথে চলে।

চৈত্য পুরুষ

শিশুটি তোমার psychic being যা বুক থেকে উঠে ও নামে তা বহিঃপ্রকৃতির বাধা, ভিতরের সত্যকে শ্বীকার করতে চায় না, ঢেকে রাখতে চায়।

সে স্থান পিছনে মেরুদণ্ডের মাঝখানে psychic being-এর স্থান। যা বর্ণনা করছ সে সবই psychic being-এর লক্ষণ।

হাঁা, মানুষের চেতনার কেন্দ্র বুকে যেখানে psychic being -এর স্থান।

ওই সোজা আলোকময় পথই আসল পথ, তবে তার মধ্যে পৌছাতে সময় লাগে। ছকবার ঐ পথে পৌছালে আর বিশেষ কোনও কলট বাধা স্খলন হয় না।

যদি গভীর হাদয়ের (psychic -এর) পথ ধর, মার কোলে শিশুর মত থাক, তা হলে এই সব sex impulse ইত্যাদি আক্রমণ করেও কিছু করতে পারবে না, শেষে আর আসতেও পারবে না।

এই কথার উত্তর আগেই দিয়েছি। ভিতরে থাক, ভিতরে থেকে সব দেখ, বাহিরের চক্ষুতে নয়। বহিশ্চৈতন্যে থাকলে চিন্তার আবরণে অনেক ভুল হবার কথা, ভিতরে থাকলে psychic being ক্রমণ প্রবল হয়, psychic being-ই সত্য দেখে, সব সত্যময় করে দেয়।

অভিজ্ঞতাগুলি ভাল—–এই অগ্নি psychic fire আর যে অবস্থার বর্ণনা করেছে সে অবস্থা – psychic condition, যার মধ্যে অশুদ্ধ কিছু আসতে পারে না।

সতা দেখা।— psychic consciousness -এর রাস্তা উপরের সত্য চেতনায়, সেই psychic -কে কেন্দ্র করে সব স্তর একভাবে ভগবানের দিকে ফিরতে আরম্ভ করেছে। সে রাস্তা উপরের দিকে উঠেছে—ছোট শিশু তোমার psychic being.

তাহাই চাই—হাদয়-পদ্ম সর্কাদা খোলা, সমস্ত nature হাদয়স্থ psychic being -এর বশ হওয়া, এতেই নবজনা হয়।

গ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গলা রচনা

Yes, this is the true psychic attitude. যে এই ভাবটিরাখতে পারে, সব সময়ে সব ঘটনার মধ্যে, সে গন্তব্যপথে সোজা চলে যায়। অহঙ্কার--অওদ্ধতা--ক্ষোভ--নিরাশা

যখন চেতনা বিশাল ও বিশ্বময় হয় আর সমস্ত বিশ্বেই মাকে দেখা যায় তখন অহং আর থাকে না, থাকে তথু মায়ের কোলে তোমার আসল সভা, মায়ের সভান মায়ের অংশ।

আমরা ত তোমাকে ছেড়ে দিইনি। যখন depression হয় তখন তুমি এ সব কথা ভাব। মাঝে মাঝে তুমি বাহিরের চেতনায় এসে আর মাকে feel কর না, তাই বলে ভাবা উচিত নয় যে মা তোমাকে ছেড়ে দিয়েছেন। আবার ভিতরে যাও, সেখানে তাঁকে feel করবে।

অর্থ এই—যে ভাল সাধক ভাল সাধনা করে, সে ভাল সাধনার মধ্যেও অহংকার, অক্তান, বাসনার ছাপ অনেকদিন বয়ে থাকে—কিন্ত চেতনা যখন আরও খুলে খুলে খাঁটি হয়—যেমন তোমার হতে আরম্ভ হয়েছে—তখন ওসব অক্তানের মিশ্রণ খসে যেতে আরম্ভ করে।

এই সব হচ্ছে প্রাণের নির্থক disturbance, শান্ত হয়ে যোগ পথে চলতে হয়, ক্ষোড ও নিরাশাকে স্থান দিতে নাই।

অবশ্য এইরূপ কথার মধ্যে প্রাণের অনেক অগুদ্ধ গতি চুকতে পারে, ক্ষোভ, মায়ের উপর অসভোষ, অপরের উপর হিংসা, বিষাদ, দুঃখ এই সব নিয়ে না থাকা ভাল।

এই অবস্থা, এই বুদ্ধিই সত্য, সব সময় রাখা উচিত। অহংকারের বুদ্ধিতে আর লোককে ও ঘটনাকে না দেখে এই অধ্যাত্মবুদ্ধিতে আর ভিতরের psychic _ এর দৃষ্টিতে দেখতে হয়।

চেতনার স্তরাবলী

মূলাধার থেকে পায়ের তলা পর্যান্ত physica! ⊸ন্তর বলা যায়, পায়ের নীচে অবচেতনার রাজ্য।

অনেক শুর আছে উপরে ও নিশ্নে, তবে মুখ্যত আছে ওই নীচে চারটি শুর, মনের শুর, psychic শুর, vital শুর, শরীর শুর——আর উপরের আছে উর্দ্ধু মনের অনেক শুর, তারপর বিজ্ঞান-শুর ও সচ্চিদানন্দ।

যদি নেমেই যাও, সেখানেও শান্ত হয়ে মার আলো শক্তি ডেকে নামিয়ে দাও। নিম্নে যেমন উপরে নিজের মধ্যে মায়ের রাজ্য সংস্থাপন করে দাও।

যখন চেতনা physical -এ নামে তখন এই রকম অবস্থা হয়। তার অর্থ এই নয় যে সব সাধনার ফল র্থা হয়েছে বা উপরে চলে গেছে—সব আছে, কিন্তু আবরণের মধ্যে পিছনে রয়েছে। এই obscure physical—এ মায়ের চেতনা আলা ও শক্তিতে নামাতে হয়—সেটা যখন প্রতিষ্ঠিত হবে তখন আর এ অবস্থা ফিরে আসবে না। কিন্তু যদি বিচলিত হও, depressed হও বা এই সব চিত্তা প্রবেশ করে যে আমার আর এ জীবনে হবে না, মরা ভাল ইত্যাদি, তা হলে একটা বাধা হয় সে চেতনা, শক্তি আলো নামবার পথে। সে জন্য এগুলোকে reject করে মায়ের উপর নির্ভর রাখা আর শান্তভাবে aspire কবা ও তাঁকে ভাকা উচিত।

সূচীপত্ৰ

সূচীপত্ৰ

	পৃষ্ঠা
দুর্গা-স্তোত্র (ধর্ম ১ কাত্তিক ১৩১৬)	٥
কবিতা	9
সবাই পাগল তোরা ঘুরি' ধরাতল (উষাহরণ কাব্য হইতে)	٦
কাহিন <u>ী</u>	
স্বপ্ন (সুপ্ৰভাত ১৩১৬)	55
ক্ষমার আদর্শ (ধর্ম ১১ ফাল্খন ১৩১৬)	১৭
বেদ	
বেদরহস্য (বিবিধ রচনা ১৯৫৫)	২১
তপোদেব অগ্নি (বিবিধ রচনা ১৯৫৫)	২৬
ঋগেুদ (বিবিধ রচনা ১৯৫৫)	<i>,</i> 9 0
উপনিষদ্	
উপনিষদ (ধর্ম ২৭ অগ্রাণ ১৩১৬)	৪৩
উপনিষদে পূৰ্ণযোগ (বিবিধ রচনা ১৯৫৫)	83
ঈশ উপনিষদ্ (১) (বিবিধ রচনা ১৯৫৫)	89
ঈশ উপনিষদ্ (২) (বিবিধ রচনা ১৯৫৫)	8≱
পরাণ	
ু পুরাণ (ধর্ম ১২ পৌষ ১৩১৬)	৫৩
গীতা	
গীতার ধর্ম্ম (ধর্ম ১৪ ভাল ১৩১৬)	ଓବ
সন্ন্যাস ও ত্যাগ (ধর্ম ২১ ভার ১৩১৬)	৬০
বিশ্বরূপ দুশ্ন (ধুম ২৫ মাঘ ১৩১৬)	৬৩
গীতার ভূমিকা (ধর্ম ১৮ আশ্বিন-২ ফাল্খন ১৩১৬)	৬৬
ধন্ম্	
জগন্নাথের রথ (প্রবর্ত্তক ১৯১৮)	১১৬
মানব সমাজের তিন ক্রম (বিবিধ রচনা ১৯৫৫)	224
অহঙ্কার (ধর্ম ৪ আশ্বিন ১৩১৬)	১১৮
পূর্ণত্য (বিবিধ রচনা ১৯৫৫)	১২০

	পৃষ্ঠা
স্তবান্তাত্র (ধর্ম ২ ফাল্ণ্ডন ১৩১৬)	১২১
আমাদের ধম্ম (ধম ৭ ভাজ ১৩১৬)	১২৪
মায়া (ধর্ম ২১ ভা ল ১৩১৬) `	১২৭
নির্ত্তি (ধর্ম ১ অঘ্রাণ ১৩১৬)	১৩১
প্রাকাষ্য (ধর্ম ১২, ১৯ পৌষ ১৩১৬)	১৩৩
জাতীয়তা	•
পুরাতন ও নূতন (বিবিধ রচনা ১৯৫৫)	১৩৯
অতীতের সমস্যা (ধর্ম ১১ আখিন ১৩১৬)	১৪০
দেশ ও জাতীয়তা (ধর্ম ২০ অঘ্রাণ ১৩১৬)	58७
স্বাধীনতার অর্থ (ধর্ম ২৫ আগ্রিন ১৩১৬)	587
সমাজের কথা (বিবিধ রচনা ১৯৫৫)	১৫০
ভ্ৰাকৃত্ব (ধৰ্ম ২৫ মাঘ ১৩১৬)	১৫১
ভারতীয় চিত্রবিদ্যা (ধর্ম ৯ ফাল্খন ১৩১৬)	896
হিরোব্মি ইতো (ধর্ম ২২ কাতিক ১৩১৬)	১ ৫৬
জাতীয় উত্থান (ধর্ম ৪ আশ্বিন ১৩১৬)	১৫৮
আমাদের আশা (ধর্ম ৪ মাঘ ১৩১৬)	১৬২
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (ধর্ম ১৮ মাঘ ১৩১৬)	১ ৬৫
গুরু গোবিন্দসিংহ	
গুরু গোবিশসিংহ (ধর্ম ২৫ আশ্বিন ১৩১৬)	১৭১
"ধর্ম" পত্রিকার সম্পাদকীয় (১৩১৬)	১৭৫
কারাকাহিনী	
কারাকাহিনী (সুপ্রভাত ১৩১৬)	২৫৭
কারাগৃহ ও স্বাধীনতা (ভারতী)	ミヤヤ
আর্য আদর্শ ও গুণক্রয় (সুপ্রভাত ১৩১৬)	900
নবজন্ম (ধর্ম ৪ ভাল ১৩১৬)	৩১২
পত্রাবলী	
মুগালিনীকে লিখিত (১৯০৫-১৯০৭)	৩১৭
পণ্ডিচেরীর পন্ন (বারীনকে লিখিত ১৯২০)	৩২৭
পরাবলী ('ন'-কে ও 'স'-কে লিখিত ১৯৫১-১৯৫৯)	ভভ৭